উত্তর আধুনিক মুসলিম মন

ফাহমিদ-উর-রহমান

উত্তর আধুনিক মুসলিম মন

ফাহমিদ-উর-রহমান

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিক মুসলিম মন

ফাহ্মিদ-উর-রহ্মান

www.pathagar.com

উত্তর আধুনিক মুসলিম মন
ফাহমিদ-উর-রহমান
প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১/বি গ্রীনওয়ে, মগবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৩৩২৪১০, ০১৭১১৫৮১২৫৫
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১০
বাসাপপ্র ২০১
প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান
মুদ্রণ
নিউ পানামা প্রিন্টিং প্রেস, মালিবাগ, ঢাকা
মূল্য
তিনশত টাকা

Uttar Adhunik Muslim Mon
(Post Modern Muslim Mind)
by Fahmid-Ur-Rahman
Published by : Abdul Mannan Talib
Director, Bangla Shahitto Parishad
1/B Greenway, Moghbazar, 1st Floor,
Dhaka 1217, Bangladesh
Phone : 9332410, 01711581255
First Published, April 2010

ISBN 984-70274-0017-5
BSP-201-2010

Price : Tk. 300.00 US$ 15.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ফজিলাতুন নেছা

আমার আম্মা

যাঁর পদতলে আমার বেহেশ্‌ত

www.pathagar.com

ফাহমিদ-উর-রহমান'র প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

ইকবাল মননে অন্বেষণে

অন্য আলোয় দেখা

উত্তর আধুনিকতা

সংস্কৃতির স্বপক্ষে

সেকুলারিজমের সত্যমিথ্যা

সম্পাদনা

জামাল উদ্দীন আফগানী

মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার জগতের মানুষেরা সাধারণত যারা সমকালের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকেন তারাই সমাজ পরিবর্তনের মত ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেন। সক্রেটিস তার যুগে এথেন্সবাসীর প্রতিষ্ঠিত চিন্তাভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। কনফুসিয়াস যুদ্ধরত চৈনিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন। মার্টিন লুথার তার বিপ্লবী চিন্তাভাবনা দিয়ে পুরো পশ্চিমের খ্রিস্টিয় সমাজকে পাল্টে দেন এবং লেনিন তার বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনৈতিক কর্মষনা দিয়ে বিশ শতকের ইতিহাসের গতিই অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলেন।

উনিশ ও বিশ শতকে মুসলিম সমাজের ভিতরেও এরকম কিছু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি আবির্ভূত হন যারা গতানুগতিক ব্যবস্থাকে রূপান্তর করতে উদ্যোগী হন, সমকালীন মানসিকতা ও নানারকম প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনা করেন এবং বিকল্প চিন্তার স্ফুরণের পাশাপাশি বিকল্প পথ ও পদ্ধতির উপায় নির্দেশ করেন। আজকের মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামী রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণবাদের এক ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে। এ মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই পুনর্জাগরণবাদের নৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন এবং তাদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্জাগরণবাদের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করছে। মুসলিম দুনিয়ায় এ পুনর্জাগরণবাদ কেন এলো ? এর কারণ বিবিধ। তবে অন্যতম একটি কারণ অবশ্যই মুসলিম দুনিয়ায় ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সূত্রে ধনবাদী আধুনিকতার সম্প্রসারণ, প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া। মুসলিম দুনিয়ায় আধুনিকতা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা, কারণ মুসলিম সমাজকে আধুনিকতা যেরকমভাবে বিধ্বস্ত ও বিকৃত করতে পেরেছে ইতিপূর্বে তা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিকল্পনা, নগরায়ন বা শিল্পায়ন, জাতীয়তাবাদ, উদারতাবাদ, মানববাদী ভাবনা-চিন্তা প্রভৃতিকে আধুনিকতার লক্ষণ মনে করা হলেও এটিই আধুনিকতার শেষ কথা নয়। আধুনিকতা একটি ক্ষমতা সম্পর্কিত ব্যাপার। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ, বাণিজ্যবাদ, অন্ধকারময় এশিয়া ও আফ্রিকায় সাদাদের আগমন এবং আধুনিকতা এসবগুলো প্রক্রিয়া মোটামুটি একই সময়ে শুরু হয়েছে।

পাশ্চাত্যের আধুনিকতা বিকাশের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিকতা কথাটার একটা বিশেষ মানে আছে। আধুনিকতা পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান সমাজের ভিতরকার একটা ঘটনা। সেই ঘটনার ভিতর দিয়ে সেখানে রাজনৈতিক বিপ্লব হয়েছে। বিজ্ঞানে, দর্শনে নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে। এরকম ঘটনা মুসলিম দুনিয়ায় কখনো ঘটেনি বা এরকম ঘটনার পিছনে যে সামাজিক কার্যকারণ থাকে তাও কখনো এখানে উপস্থিত হয়নি। ফলে ইউরোপীয়রা যেভাবে ও যে ধারায় আধুনিক হয়ে উঠেছে, মুসলিম জনপদে সেভাবে আধুনিকায়ন হয়নি। মুসলিম সমাজে আধুনিকতা একটা 'আরোপিত' ধারণা । ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সূত্রে এটি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানকার ইতিহাসের ধারায় এটি বিবর্তিত হয়নি। ফল হয়েছে এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে মুসলিম মানস তার সনাতনী চিন্তা প্রবাহ বিস্মৃত হয়েছে। আবার পশ্চিমা আধুনিকদের মত আধুনিক হয়েও উঠতে পারেনি। ফলে পশ্চিমা ধারার আধুনিকতা তাদের কাছে অস্পষ্ট, অহেতুক, দুর্বোধ্য এবং ধরাছোঁয়ার বাইরের এক কষ্টকল্পিত idiom- ভাষা হয়ে আছে। আধুনিকতার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজের এই টানাপড়েনকে মধ্যপ্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

হিশাম শারাবি বলেছেন deformed modernization।[১] এই বিকৃত আধুনিকতার তোপের মুখে পড়ে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতেও বড় রকমের নাড়া লাগে। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সূত্রে এবং ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রভাব-সংস্পর্শে মুসলিম সমাজে একদল সেকুলার বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। এরা ইসলামী ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের পরিবর্তে সমালোচনা করতে উদ্যোগী হন বেশি। এইসব দেশজ বুদ্ধিজীবীরা চেতনার দিক দিয়ে পশ্চিমের দাসত্ব করতেই অধিকমাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদের স্বার্থে এইসব বুদ্ধিজীবীদের ভাবমর্যাদাকে যথাসম্ভব উঁচু করে তুলে ধরার চেষ্টা করে।
ইউরোপে আধুনিক জ্ঞান বলতে একসময় বুঝানো হয়েছিল ঐশী জ্ঞানের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে মানববাদী-যুক্তিবাদী জ্ঞানধারার চর্চাকে সমুন্নত করা। লক, দেকার্তে ও কান্টের মত বুদ্ধিজীবীরা এই নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। একেই বলা হয় জ্ঞানের সেকুলারাইজেশন। এই ইউরোপীয় চেতনার অভিঘাতে দেশজ বুদ্ধিজীবীরাও ইসলামী ঐতিহ্যকে আঘাত হানতে শুরু করে এবং মসজিদ, মাদরাসা ও অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাসম্ভব প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে। এদের আক্রমণ শুধু কুরআনী জ্ঞানতত্ত্বের উপর সীমাবদ্ধ থাকে না, এরা মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকেও অবমূল্যায়নের চেষ্টা করে। এইভাবে ধনবাদী আধুনিকতা 'ঐতিহ্যকে' সরিয়ে মুসলিম সমাজে একটি ইউরোপীয় মডেল প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যের সাথে সাম্রাজ্যবাদী আধুনিকতার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বিরোধ শুধু রাজনৈতিক নয়, দুটি মৌলিকভাবে পৃথক জীবনদৃষ্টিরও বিরোধ। এইভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সূত্রে পশ্চিমী আধুনিকতা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রকে বদলে ফেলার চেষ্টা করে এক জটিল পরিস্থিতির জন্ম দেয় যাকে আমরা বলতে পারি ঔপনিবেশিকতা। বলার অপেক্ষা রাখে না এ ঔপনিবেশিকতা, যা কিনা আধুনিকতা ও আধুনিকায়নের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, মুসলিম মানসে ও বুদ্ধিজীবিতার বিভিন্ন স্তরে গভীর এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আধুনিকতা মুসলিম সমাজে শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক সুবিচারের ক্ষেত্রে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং অন্তর্জগতে যে বিপন্নতার বোধ তৈরি করেছে তার বিকল্প হিসেবে এক ইসলামী সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আজকের ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ মুসলিম সমাজে পশ্চিমায়ন ও আধুনিকায়নের বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফসল বলা যায়। এ কারণেই একালের অন্যতম ইসলাম বিশারদ পন্ডিত জন এল এসপোসিটো যথার্থ লিখেছেন ঃ That the most forceful manifestations of the Islamic resurgence have occurred in the more advanced and modernized (seemingly) secular countries of the Muslim world.[২]
এই ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ কোন মধ্যযুগীয় ঘটনা নয়। এটা পুরোপুরি একটা সমকালীন ঘটনা এবং আধুনিক পরিস্থিতি ও সমস্যা মোকাবিলার বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না আধুনিকতা মুসলিম সমাজে কাঙ্খিত ফল দেয়নি এবং মুসলিম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি, যা কিনা পশ্চিমে হয়েছে। অন্যদিকে সেকুলার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশকে আধুনিকতার চৌহদ্দীর মধ্যেও টেনে আনতে পারেনি। এই পরিস্থিতি মুসলিম সমাজে এক শূন্যতার আবহ তৈরি করেছে যা কিনা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে। এমতাবস্থায় ইসলামী পুনর্জাগরণবাদকে বলা যায় Counter-state ideology - আধুনিক সেকুলার রাষ্ট্রের এক বিকল্প বা আধুনিকতার Counter discourse - বিকল্প

www.pathagar.com

বয়ান। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ার পর ইসলামই এখন সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রীদের সামনে সবচেয়ে শক্তিশালী মতাদর্শ। বিশেষ করে অন্যান্য সেকুলার ইডিয়লজীর মতাদর্শিক ও প্রায়োগিক দুর্বলতা প্রকাশ পাবার পর মুসলিম মানসের সামনে ইসলাম নবরূপে একটি প্রেরণা সৃষ্টিকারী ইডিয়লজীর চেহারা নিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ইয়াংকি কালচারের সর্বনাশা প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামকে আদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। মুসলিম সমাজের এই সমকালীন প্রবণতাকে নাজি আইয়ুবী এভাবে দেখেছেন ঃ

[The] fact that the contemporary state lays claim to secularism has enabled some forces of political protest to appropriate Islam as their own weapon. Because the state does not embrace Islam (except in a 'defensive' reactive way), it can not describe its opponents as easily as the traditional state could as being simply heretic cults. Political Islam [Islamism] now reverses the historical process - it claims 'generic' Islam for the protest movements, leaving to the state the more difficult task of qualifying and justifying its own 'version' of Islam.[৩]

মুসলিম সমাজে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ধনবাদী আধুনিকতা ও নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান 'ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ' বিকাশের অন্যতম পূর্বলক্ষণ হলেও ঐতিহাসিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নিজের অন্তর্শক্তি ও প্রাণশক্তির জোরে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামের জেগে ওঠার এক নিজস্ব প্রবণতাও রয়েছে, যাকে আমরা বলি তাজদীদ। এই তাজদীদও ইসলামী পুনর্জাগরণবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী শিক্ষা বা আদর্শবাদে অন্তর্নিহিত এইরকম গতিশীলতা আছে বলেই দেড় হাজার বছর পেরিয়ে এসেও ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়ার মতো নতুন রূপে তার উত্থান ঘটে। আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী পুনর্জাগরণবাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামকে বুনিয়াদ করে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন এবং সমাজে সেকুলার নেতৃত্বের স্থলে ইসলামী নেতৃত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, যা কিনা একালে ইসলামী আইন, সরকার, শিক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলবে এবং ইসলামী উম্মাহর আন্তর্জাতিক ধারণার দিকে অগ্রসর হবে। ইসলামী পুনর্জাগরণবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এভাবে উল্লেখ করা যায় ঃ

১. এটি একটি আধুনিক ইসলামী ডিসকোর্স যা সমকালীন মুসলিম ইতিহাসের টানাপড়েনের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে।
২. রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মগতভাবে এটি একটি কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী (Anti-establishment) আন্দোলন।
৩. আধুনিক সেকুলার জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রত্যয়ের সাথে এটি একাত্ম নয়।
৪. এটি ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব ও ঐতিহ্যকে যুগোপযোগিতার ভিত্তিতে পুনঃব্যাখ্যা করে এক বৈপ্লবিক মাত্রা দিয়েছে।
৫. চরিত্রগতভাবে এটি আন্তর্জাতিক।

এ ইসলামী পুনর্জাগরণবাদ মুসলিম দুনিয়ায় একদিনে আসেনি। সাম্রাজ্যবাদী অভিঘাতে ইসলামের দুর্বলতর অবস্থানের প্রেক্ষিতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বকে পুনঃনির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং আগেই বলেছি এরাই আধুনিক মুসলিম পুনর্জীবনবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বুনিয়াদ প্রস্তুত করেছেন। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সূত্রে ঐতিহ্যবাহী আলেমরা যারা এতকাল মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও কতকটা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের জায়গাগুলো

www.pathagar.com

সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা দখল করে নেয়। উনিশ ও বিশ শতকের এ সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের আলেমরা যথার্থ অর্থে মোকাবিলা করতে পারেননি এবং মুসলিম সমাজ নিয়ে তাদের প্রস্তাবনাগুলোর বিকল্প নমুনা আলেমরা দেখাতে পারেননি। এই কারণেই ঐতিহ্যবাহী আলেমরা মুসলিম সমাজের একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে চলে আসেন। আলেমদের এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতেই তৃতীয় একদল বুদ্ধিজীবীর উত্থান ঘটে যারা চৈতন্যের দিক দিয়ে সেকুলার নন, আবার সেই সব আলেমদের মত নন যারা যুগোপযোগিতা বুঝতে অসমর্থ। এরা এমন একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো খাড়া করেন যা পুরোপুরি ইসলামী রসে সঞ্জীবিত আবার যুগোপযোগিতার প্রয়োজন মেটাতেও সক্ষম। এইসব বুদ্ধিজীবীরাই একালের ইসলামী পুনর্জীবনবাদের নির্মাতা। এদের চিন্তাভাবনাকেই আলোচ্য বইয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এইসব পুনর্জীবনবাদীদের অনেকেই আইনবিদ, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। অনেকে রাজনীতি করেছেন, অনেকে সুফী, দার্শনিক কিংবা কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কেউ ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পোশাকে আবৃত, কেউবা পশ্চিমী পোশাকে আচ্ছাদিত। কেউ কেউ শুধু নিজের ভাষা ও কুরআন শরীফ ভাল করে জানেন। অনেকে পশ্চিমী ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কেউ কেউ পশ্চিমে জন্মগ্রহণ করেছেন, পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করেছেন এবং পশ্চিমের ভোগবাদী-ধনবাদী সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এইরকম বিভিন্ন পরিবেশ, শিক্ষা ও প্রেক্ষাপট এইসব পুনর্জীবনবাদীদের ইসলাম ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য এনেছে সত্য, কিন্তু তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে একালে ইসলামের ভূমিকা, শক্তিমত্তা ও ইসলামী সমাজ কিংবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কৌশল নিয়ে কথা বলেছেন। এদেরকে উত্তর আধুনিক বলা হয়েছে এই কারণে যে, এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে আধুনিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন অথবা ইসলামকে ভিত্তি করে আধুনিকতার বিকল্প এক নবচেতনাবাহী জ্ঞানতত্ত্বের কাঠামো খাড়া করেছেন। এ বইয়ে যাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেই হিসেবে এ বইয়ের আলোচনাও একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে বলে মনে করা যায়।

এ বইয়ের প্রকাশক আবদুল মান্নান তালিব একজন উদ্যোগী, আলোকপ্রাপ্ত ও সদাতৎপর মানুষ– যার আগ্রহ ছাড়া এই বই প্রকাশ সম্ভব হতো না এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থাপক তৌহিদুর রহমান অতীতের মতই আমার এ বই প্রকাশে সীমাহীন আগ্রহ দেখিয়েছেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার সহধর্মীনি ডাঃ মীরা মমতাজ সাবেকাকে - এ বই লেখার সময় ছায়ার মত যিনি আমাকে সমর্থন দিয়ে গেছেন।

ফাহমিদ-উর-রহমান
১ বৈশাখ ১৪১৭, ১৪ এপ্রিল ২০১০
৬০ / সি পুরানা পল্টন, ঢাকা

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Hisham Sharabi, Neo-patriarchy : A Theory of Distorted Change in Arab Society. Oxford : Oxford University Press, 1988.
২. John L. Esposito, The Islamic Threat : Myth or Reality. New York : Oxford University Press, 1992.
৩. Nazih Ayubi, Political Islam : Religion and Politics in the Arab World. London : Routledge, 1991.

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী (জন্ম ১৮৩৯)	১৩
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (জন্ম ১৮৬৮)	২৬
আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী (জন্ম ১৮৭২)	৩৮
মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল (জন্ম ১৮৭৫)	৪৬
মোহাম্মদ ইকবাল (জন্ম ১৮৭৭)	৬০
মোহাম্মদ আসাদ (জন্ম ১৯০০)	৭৯
রুহুল্লাহ খোমেনী (জন্ম ১৯০২)	১০১
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (জন্ম ১৯০৩)	১১৯
আবুল হাশিম (জন্ম ১৯০৫)	১৩৮
মালেক বেন্নাবী (জন্ম ১৯০৫)	১৪৯
হাসান আল বান্না (জন্ম ১৯০৬)	১৬০
সাইয়েদ কুতুব (জন্ম ১৯০৬)	১৭৪
মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ (জন্ম ১৯০৮)	১৯১
মার্টিন লিংস (জন্ম ১৯০৯)	২০০
ইসমাইল রাজী আল ফারুকী (জন্ম ১৯২১)	২০৮
সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম ১৯২৪)	২২০
আলীয়া আলী ইজেতবেগভিচ (জন্ম ১৯২৫)	২২৯
হাসান জামান (জন্ম ১৯২৮)	২৪৯
মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান (জন্ম ১৯৩১)	২৬২
খুরশীদ আহমদ (জন্ম ১৯৩২)	২৭৩
হাসান আল তুরাবী (জন্ম ১৯৩২)	২৮৫
আলী শরিয়তি (জন্ম ১৯৩৩)	২৯৮
মরিয়ম জামিলা (জন্ম ১৯৩৪)	৩১৭
রশিদ আল ঘানুশী (জন্ম ১৯৪১)	৩২৯
আকবর এস আহমদ (জন্ম ১৯৪৩)	৩৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী

এক

এক শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রান্ত হলো সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী আমাদের ভিতর থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে পৃথিবী নামক গ্রহে নানা উত্থান-পতন, ধ্বংস, বিপর্যয় ও সৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মারণাস্ত্র ও যুদ্ধের বিভীষিকা, এক পরাশক্তির তিরোভাবে অন্য পরাশক্তির উত্থান, রাষ্ট্রীয় সীমানার পুনর্বিন্যাস, বিজ্ঞানের অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার সাথে এক অনন্য ধ্বংসকামী ক্ষমতা এবং একই সাথে মানবতার পারস্পরিক শত্রুতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও এক সর্বমানবিকতার কল্যাণবোধে উজ্জীবিত হওয়ার গভীর আকুতি। এই রূপান্তর ও পরিবর্তনের দিগন্তপ্লাবী স্রোতের মুখে আফগানীর বাণী ও বিশ্বাসের মূল্য আজও এতটুকু কমেনি বরং একালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আফগানী এখন ইস্তাম্বুলের এক নিভৃত ও অবহেলিত কবরগাহে চিরনিদ্রায় শায়িত। কিন্তু তার প্রিয় আফগানিস্তানের মানচিত্র আজ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। মুসলিম উম্মাহ্ যার ঐক্য ও সমৃদ্ধি কামনায় তিনি জীবনমান ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে, তাকে আজ খামচে ধরেছে হতাশা, অবিশ্বাস, অনৈক্য আর সাম্রাজ্যবাদী শকুন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম দেশগুলোর যে দিকবিদিশাহীন অবস্থা দেখে গিয়েছিলেন তার তুলনায় বর্তমানের চিত্রকে খুব কি ভিন্ন রকম বলা যাবে? উনবিংশ শতাব্দীতে সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর মত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর কেউ এত তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাননি। কিন্তু আজকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সেই ধ্বনিটুকুও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এই নীরবতা ও মুসলিম উম্মাহর মরণ ঘুমের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আফগানীর কণ্ঠস্বর আরও তীব্রভাবে শুনতে পাচ্ছি।

সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী প্যান ইসলামিজমের মন্ত্রগুরু হিসেবে গণবন্দিত হয়েছেন। আরো বিশেষ করে বললে একালে বিশ্বব্যাপী মুসলিম পুনর্জাগরণের যে ঢেউ উত্থিত হয়েছে তার অন্যতম বীজ রোপণকারী হিসেবে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। তিনিই প্রথমবারের মতো এশিয়া-আফ্রিকার মজলুম জনসাধারণকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিপদাশংকা সম্বন্ধে সতর্ক করেন এবং এর প্রতিরোধের জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও গভীরভাবে উল্লেখ করেন। আল্লামা ইকবাল সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীকে আধুনিককালের 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তাঁর মতো আর কেউ একালে ইসলামের আত্মাকে এতো গভীরভাবে নাড়া দিতে পারেননি।

www.pathagar.com

জীবদ্দশায় তিনি উল্কার মতো মুসলিম দেশগুলো চষে বেড়িয়েছেন। নানা দেশ পরিব্রাজনায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানদের সত্যিকারের দুর্বলতাগুলো কোথায় এবং কিভাবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ সেই দুর্বল জায়গাগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত বৃটেন তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ও মুসলিম ঐক্যের পক্ষে তাঁর অভাবিত কর্মসূচীর মুখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। একই ভাবে মুসলিম দেশসমূহের একনায়ক ও স্বৈরাচারী সুলতান ও রাজন্যবর্গের মুসলিম স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকায় তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। আফগানী যথার্থ বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় মুসলিম ঐক্যের চেয়ে বড় কোন অস্ত্র নেই; তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদকে প্রকৃত অর্থেই রুখতে হলে মুসলমানদের চাই আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করা। মুসলিম উম্মাহর শরীরে অনৈক্য ও জড়তার যে ব্যাধি বাসা বেঁধেছে তার প্রতিকারে আফগানীর এই মহৌষধের কোন বিকল্প আছে কি?

দুই

সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী উনিশ শতকের সন্তান। এ শতকেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রবল গতি ও নিষ্ঠুরতার সাথে মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটির পর একটি মুসলিম রাষ্ট্র ইউরোপীয় শক্তির সামনে অবনত হয়। এদের কাছে সেদিন মুসলমানদের শুধু সামরিক পরাজয়ই ঘটে না, এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বশ্যতার মধ্যেও তারা ডুবে যায়। মুসলমানদের এই নিমজ্জমান প্রক্রিয়াটি আফগানীর চোখের সামনেই ঘটে এবং তাঁর মনোজগতে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয় তা তাঁর চিন্তাভাবনা ও ব্যক্তিত্বের সংগঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে আপতিত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের জুলুম ও অপচারের বিরুদ্ধে তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদের প্রতীক। অসাধারণ বাগ্মিতা, দূরদৃষ্টি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি তাঁর প্রতিবাদের ভাষা আরো জ্বালাময়ী করে তোলেন। যেখানেই তিনি যান সেখানেই তিনি জাগরণের ঢেউ তোলেন এবং একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভক্ত ও কর্মীবাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর প্যান ইসলামিজমের লক্ষ্য ছিল মুসলিম দুনিয়াকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা এবং মুসলিম ভূখন্ডগুলোকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করা। আফগানী চেয়েছিলেন ইসলামী আদর্শের আলোয় মুসলমানরা পুনরুজ্জীবিত হোক। একই কারণে তিনি মুসলিম ঐক্যের স্বপক্ষে এক প্রবল জনমত গড়ে তোলেন।

আফগানীর জন্ম আফগানিস্তানে না ইরানে এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিস্তর মতান্তর রয়েছে। তবে প্রচলিত মতটি হলো তিনি কাবুলের নিকটবর্তী আসাদাবাদে ১৮৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবদ্দশায় তাঁর নামের সাথে আফগানী লকবটি এমনভাবে অপরিহার্য করে নেন যা তার জন্মভূমি আফগানিস্তানেরই ইংগিত দেয়। আফগানীর প্রথম জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না যদিও তাঁর জীবনীকাররা জানিয়েছেন আফগানিস্তান ও ইরানের বিভিন্ন জায়গায় তিনি অধ্যয়ন করেন। চার্লস এডামস তার

www.pathagar.com

Islam and Modernism in Egypt গ্রন্থে আফগানীর প্রথম জীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

By the time he was eighteen he had studied practically the whole range of Muslim sciences and acquired a remarkable familiarity with Arabic grammar, philosophy and rhetoric in all branches, Muslim history, Muslim theology, sufism, logic, philosophy, physics, metaphysics, mathematics, astronomy, medicine, anatomy and various other subjects.[১]

আঠার বছর বয়সে তিনি ভারতে আসেন, এখানে দেড় বছর অবস্থান করেন এবং ইংরেজিতে কিছু দক্ষতা অর্জন করেন। ভারতে অবস্থানকালেই তাঁর মুসলিম ও ইসলাম চিন্তার স্বরূপটি বিকাশমান হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক Nikki R. Keddie আমাদের জানিয়েছেন ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে মুসলমানরা যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের শিকার হয় তা আফগানীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ভারতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বৈপ্লবিক কার্যক্রম ও চিন্তাভাবনা আফগানীকে প্রভাবিত করে এবং পাশ্চাত্যবিমুখ করে তোলে, একই সাথে সমসাময়িক ইসলামের সমস্যাগুলোকে বাস্তবতার সাথে বিশ্লেষণ করতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে।[২]

এরপর তিনি আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন ও অনেক জীবনীকারের মতে আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদের মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় মন্ত্রী হিসেবে তিনি আমীরকে আফগানিস্তানের সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য নানা পরামর্শ দেন। আমীরের ইন্তেকালের পর তার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং সে দ্বন্দ্বে তিনি অধিকতর যোগ্য ও ব্রিটিশবিরোধী আযম খানকে সমর্থন দেন। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশ অনুরাগী শের আলী খানের কাছে ভাই আযম খানের পরাজয় ঘটে, সেই সাথে আফগানীরও ভাগ্যবিপর্যয় হয়। তিনি আফগানিস্তান পরিত্যাগ করেন এবং ভারত হয়ে কায়রো পৌছেন। সেখানে স্বল্পকালের জন্য অবস্থান করে তিনি ইস্তাম্বুল এসে হাজির হন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে যতদূর জানা যায় আফগানিস্তানে অবস্থানকালে আফগানী আমীরকে রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পরামর্শ দেন। তাঁর মন্তব্যসমূহ যা গোয়েন্দারা উদ্ধৃত করেছে তার সুর রীতিমত ব্রিটিশবিরোধী, যা তাঁকে আমৃত্যু অনন্য বিশিষ্টতা দিয়েছে।[৩] এইভাবে আফগানী ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ধর্মীয় নেতা বা সংস্কারক হিসেবে নয়, একজন নিখাদ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হন।

ইস্তাম্বুলে সুলতান আবদুল হামিদ কর্তৃক তিনি বন্দিত হন, তুরস্কের বুদ্ধিজীবী ও আলেমরা একযোগে তাঁকে খোশ আমদেদ জানান। কিন্তু আফগানীর অদম্য উৎসাহ, সাহস, অনমনীয় বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত চিত্ততা খুব শীঘ্রই শেখ উল ইসলাম ও তার অন্ধ স্তাবকদের প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। আফগানীর জীবনীকাররা লিখেছেন প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে সুলতান তাঁকে তুরস্ক ত্যাগের নির্দেশ দেন। বিতাড়িত আফগানী এবার কায়রো উপস্থিত হন। এখানে মিসর সরকার তাকে সামান্য বৃত্তি মঞ্জুর করে। অতঃপর তিনি এখানেই থাকবার সিদ্ধান্ত নেন ও সাম্রাজ্যবাদ আক্রান্ত ধ্বংসোন্মুখ

www.pathagar.com

মিসরের ত্রাণকর্তা রূপে অনতিকালের মধ্যে আবির্ভূত হন। মিসরে তাঁকে কেন্দ্র করে একদল আলোকপ্রাপ্ত ছাত্র একত্রিত হয়, তিনি তাদেরকে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাভাবনায় প্রবুদ্ধ করে তোলেন। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের কুচক্র ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি মিসরবাসীকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি ঘোষণা দেন ঃ মেসর লেল মেসরিয়িন, ওয়ামা সাহামা ফিহা লেল ওবরেয়িন - মিসরবাসীর জন্য মিসর, ইউরোপীয়দের তাতে কোন অংশ নেই। একটানা আট বছর বক্তৃতা দিয়ে, লেখালেখি করে, সর্বোপরি রাজনীতিতে অংশ নিয়ে মিসরবাসীর মধ্যে তিনি গণজাগরণ ও গণআন্দোলনের সৃষ্টি করেন যাতে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক সরকার ভীত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তাঁকে ১৮৭৯ সালে মিসর থেকে বহিষ্কার করে। মিসরে আফগানীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁর যোগ্য শিষ্য-সহচর ছিলেন মুফতি আবদুহু।
মিসর থেকে তাড়া খেয়ে আফগানী ভারতের হায়দারাবাদে আসেন। এখানে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা Refutation of the Materialists রচনা করেন। এ পুস্তিকায় তিনি ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ইংরেজের সাথে সহযোগিতার নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৮২ সালে ভারত অবস্থানকালে মিসরে কর্নেল আরাবীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, যার সূচনা আফগানী নিজেই করে এসেছিলেন। কর্নেল আরাবীর বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখে। বিদ্রোহ শেষে তিনি ভারত ত্যাগ করেন ও লন্ডন হয়ে প্যারিসে পৌঁছেন। এখানে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন এবং মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। তাঁর সাথে এসে যুক্ত হন পুরনো শিষ্য মুফতি আবদুহু, যিনি ইতিমধ্যে কর্নেল আরাবীর বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মিসর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। গুরু-শিষ্য মিলে এবার তাঁরা বের করেন বিখ্যাত আরবী পত্রিকা 'আল উরওয়াতুল উসকা' বা দৃঢ় রজ্জু। আফগানী এ পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। স্বল্প-স্থায়ী হলেও এ পত্রিকা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। 'আল উরওয়াতুল উসকা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আফগানী মস্কো আসেন ও সেন্ট পিটার্সবার্গে চার বছর অবস্থান করেন। তাঁর জীবনীকাররা লিখেছেন এখানে তিনি রাশিয়ার নেতৃবৃন্দকে বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরামর্শ দেন, কিন্তু সে আবেদনে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ তেমন সাড়া দেননি। এখানে বসেই তিনি ইরানের বাদশাহ নাসিরুদ্দীন শাহর আমন্ত্রণ পান। কিন্তু আফগানীর জীবনে ইরানেও একই ঘটনা ঘটেছিল। শাহের কুশাসন ও সাম্রাজ্যবাদীদের শাহ কর্তৃক অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি তার রোষের শিকার হন এবং আবার বহিষ্কৃত হন। মিসরের মতো ইরানেও শাহের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ইতিহাসে 'তামাক বিদ্রোহ' হিসেবে খ্যাত। এ বিদ্রোহের পিছনে আফগানীর সবিশেষ ভূমিকা ছিল। ইরান থেকে আফগানী বসরা যান, তারপর যান লন্ডন এবং সেখানে থেকে সবশেষে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করেন। তার মৃত্যুর তারিখটি ছিল ৯ মার্চ, ১৮৯৭। আফগানীর শেষ জীবন কেটেছিল অন্তরীণাবস্থায়। তুর্কী সুলতান ষড়যন্ত্র করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের এ মহানায়ককে তিল তিল করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে শুধু মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি সাধন

www.pathagar.com

করেননি, নিজের ধ্বংসকেও সেদিন ত্বরান্বিত করেছিলেন। ইতিহাস তার সাক্ষী। অধ্যাপক ই.জি.ব্রাউন এই অসাধারণ পুরুষের কৃত্বি মূল্যায়ন করেছেন এমনিভাবে ঃ Enormous force of character, prodigious learning, untiring activity, dauntless courage, extraordinary eloquence both in speech and in writing, and an appearance equally striking and majestic. He was at once a philosopher, writer, orator, and journalist, but above all politician, and was regarded by his admirers as a great patriot and by his antagonists as a dangerous agitator.[8]

তিন

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ও জুলুমবাজির মুখে উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দুনিয়ায় জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তাভাবনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা সেকালের মুসলিম মানসকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। জগৎ সংসারে মুসলমানদের দুরবস্থা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কার্যকারণগুলো আফগানী গভীর মমতা ও বুদ্ধিমানতার সাথে খুঁজে ও বুঝে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রধান বাধক শক্তি হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা হরণ। এ কারণেই তিনি তাঁর অপরিসীম উদ্যম ও সাহসকে আমৃত্যু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মেধা, মনন, মনীষা, বাগ্মিতা, লেখাজোখা সবকিছুর উদ্দেশ্যই ছিল এক বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের সাধনা। আফগানী তাঁর দূরদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন একমাত্র ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহই সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে সক্ষম। জীবদ্দশায় তিনি এ দাবি নিয়ে মুসলিম শাসক, উলেমা আর জনসাধারণের কাছে নিশিদিন ছুটে বেড়িয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর জন্য তিনি আরো কতকগুলো সমস্যার কথা বলেছেন যা মুসলমানদের অনৈক্য, বিভ্রান্তি ও দুর্দশার জন্য সমানভাবে দায়ী। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. মুসলিম দুনিয়ার একনায়ক, স্বৈরাচারী শাসক ও সুলতানবৃন্দ।
২. গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
৩. সে সব আলেম ও ধর্মীয় নেতা যারা হীনস্বার্থে কায়েমী স্বার্থধারীদের মদদ যোগায়।
৪. আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান অর্জনে মুসলমানদের ভয়ানক রকমের ব্যর্থতা।

আফগানী কুরআন ও হাদিস থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ঐক্য ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। অনেকে মনে করেন 'ইন্নামাল মুসলিমুনা ইখওয়াতুন'- মুসলমানরা পরস্পরের ভাই- কোরআনের এই বাণীর সত্যিকারের বাস্তব রাজনৈতিক ব্যবহার তাঁর চেয়ে কুশলতার সাথে অন্য কেউ করতে পারেননি। সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ করে বৃটেনের আগ্রাসী ভূমিকার কারণে তিনি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিবাদসমূহ মিটিয়ে ফেলে বহিঃশত্রুকে মোকবিলা করার আহ্বান জানান। তিনি তার সম্পাদিত উরওয়াতুল উসকা পত্রিকায় লেখেন 'লা জিনসিয়া লিল মুসলিমিন ইল্লা ফি দিনিহিম'- ইসলাম ছাড়া মুসলমানদের কোন জাতীয়তা নেই।[৫] তিনি স্বধর্মীয়দের বারবার স্মরণ করিয়ে দেন বিশ্বাসের এই ঐক্য ব্যতীত মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ক্ষমতাকে সংহত করতে পারবে না। মুসলমানদের তাই চাই পারস্পরিক সম্প্রীতিকে প্রবুদ্ধ করা, আল্লাহর রাস্তায় সদা সতর্ক অতন্দ্র প্রহরীর মতো যূথবদ্ধ থাকা আর নিজেদের ভিতরকার ভাঙ্গনের উৎসগুলো বন্ধ করে দেয়া।

আফগানী আরো লিখেছেন ইসলামের অভ্যুত্থান ঘটেছে সব ধরনের গোত্রতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে। ঈমানই হচ্ছে এর সাংগঠনিক ভিত্তি এবং ঐক্যের গোড়াপত্তনকারী। ইসলামী সমাজ তাঁর ভাষায় এক সর্বজনীন ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণ, গোত্র কিংবা ভাষা কোনটিই এর ঐক্যের প্রতীক নয়। যতদিন মুসলিম শাসকরা শরীয়াহ্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন আরবরা তুর্কীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, ইরানীদের আরবীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে অসুবিধা হয়নি তেমনি ভারতীয় মুসলমানরাও আফগান শাসকদের সাথে কোন রকম বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু যেইমাত্র শাসকরা শরীয়াহ্র নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত চলতে শুরু করল তখন তারা তাদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বসল। তাই আফগানীর মতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে বিদেশী আক্রমণ ও আগ্রাসন প্রতিহত করতে কুরআনী নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই এবং এমনি করে মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত ঝড় ও দুর্যোগকে মোকাবিলা করা এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। আফগানী তাই সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করেন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও জনগণ কি অতীতের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াতে পারবে এবং শক্তিশালী পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করা কি আদৌ তাদের পক্ষে সম্ভব হবে? আফগানীর শেষাবধি বিশ্বাস ছিল মুসলমানদেরকে ফের বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করা যাবে এবং বহিঃশত্রুর হুমকি মোকাবিলায় ইসলামী ঐক্যের বিকল্প আর কিছু নেই। ১৮৮৩ সালের দিকে তাই ত্রুটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও উসমানী খেলাফতকে কেন্দ্র করে তিনি মুসলিম ঐক্যের একটা ধারণা হাজির করেন, পাশ্চাত্যের কূটনীতি ও মিডিয়ার জোরে যা প্যান ইসলামিজম হিসেবে বহুল প্রচারিত হয়। উসমানী খেলাফতকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে সাম্রাজ্যবাদের তোপের মুখে পূর্বীয় জনসাধারণ বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কথা তিনি ভাবতে থাকেন। তখনকার মতো তাঁর মনে হয়েছিল উসমানী খেলাফতের বিপর্যয় ঘটলে মুসলিম ঐক্যের ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং এটিকে প্রাণপণে রক্ষা করা চাই।

বিভিন্ন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের পারস্পরিক ঐক্য প্রসঙ্গে উরওয়াতুল উসকা পত্রিকায় তিনি লিখেছেন ঃ আমি কোন একক ব্যক্তির শাসনের পক্ষে ওকালতি করছি না, যা কার্যকর করা বেশ অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। তারপরেও আমার বিশ্বাস কুরআনের নীতিসমূহ তাদের উপর কার্যকর থাকবে এবং ইসলাম ধর্মই সর্বরকমের ঐক্যের বিধায়ক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আফগানী আরো লিখেছেন প্রত্যেক শাসকের উচিত হবে তার প্রতিবেশী মুসলিম দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কেননা তাদের শক্তি ও অস্তিত্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তিনি এ কথাও বলেন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একটা যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার, যা কিনা সদস্য দেশগুলোর উপর বৈদেশীক আগ্রাসনের মুখে খলিফার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হতে পারে।[৬] এ থেকে স্পষ্ট হয় আফগানী মুসলিম ঐক্যের কথা বলতে সর্বতোভাবে এক খলিফাকেন্দ্রিক তামাম মুসলিম দুনিয়ার শাসনই চেয়েছেন এমন নয়। এটি বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ একটা সমঝোতা বা চুক্তি হতে পারে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের পারস্পরিক

www.pathagar.com

অনুমোদন সাপেক্ষে একজন খলিফা নির্বাচন করা যেতে পারে অথবা পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার মতো জরুরী বিষয়গুলোতে মুসলিম দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। এ ব্যাপারে হালজামানার NATO, WARSAW কিংবা ANZUS চুক্তির কথা বলা যেতে পারে। এ রকম তুলনীয় কিছু করবার জন্য মুসলিম বিশ্বকে আফগানী এক শতাব্দী আগেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যার প্রয়োজন আজ বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে।

রাজনৈতিক ঐক্যের পাশাপাশি আফগানী উলেমাদের ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দেন প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের উলেমাদের একটা সংগঠন থাকা দরকার যারা সকলে মিলে একটা কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তুলবে; আফগানীর সার্বিক বিবেচনায় এর সদর দফতর পবিত্র মক্কা নগরীতে হওয়াই সমীচীন। তিনি মনে করেন বৈদেশিক হস্তক্ষেপের মুহূর্তে উলেমাদের এই সংগঠন ধর্মীয় নেতৃত্ব দেয়া ছাড়াও তাঁর ভাষায় সকল প্রকার বিদআতের মোকাবিলায় ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও সংগ্রাম করবে। আফগানী মনে করেন এই সব ধরনের ঐক্য একটি খেলাফতের কাঠামোর মধ্যে হলে ভালো হয়। ইস্তাম্বুলকে রাজধানী করে তার প্রস্তাবিত ইসলামী ইউনিয়নের খলিফা হিসেবে যে কোন যোগ্য মুসলিমকে গ্রহণ করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। জানা যায়, তিনি বেশ কয়েকবার সুদানের মাহদী, শরীফ মোহাম্মদ ইবনে আউন অথবা ইয়েমেনের ইমামকে খলিফা হিসেবে গ্রহণের জন্য নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এটা সত্য আফগানীর এ সমস্ত পরিকল্পনা তাঁর জীবদ্দশায় তেমন একটা কার্যকর হয়নি, কিন্তু মুসলিম ঐক্যের পথে তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টার কোন ভাটা পড়েনি। এই ধরনের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি কার্যকরভাবে তিনি তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'আল উরওয়াতুল উসকা'য় প্রচারণা চালান। সকল মুসলিম শাসক, উলেমা ও সাধারণ জনগণের সমন্বয়ে এক মৈত্রী জোট গঠনের তিনি আহ্বান জানান। বিশেষ করে শিয়া-সুন্নী বিরোধ যা মুসলিম ঐক্যের বাধা তা নিরসনে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যকার তুচ্ছ ধর্মীয় বিরোধ মিটিয়ে ফেলতেও পরামর্শ দেন। তিনি ইরানী আলেম ও মুজতাহিদদের বিবদমান মুসলিম পক্ষকে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখালেখি করবার আহ্বান জানান। এমনি পরিস্থিতিতে ১৮৯২ সালে তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ আফগানীকে ইস্তাম্বুলে তার পরিকল্পিত ইসলামী ইউনিয়নের বাস্তবায়নের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তখনকার বাস্তবতাকে সামনে রেখে আফগানী সুলতানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ইস্তাম্বুলে হাজির হন। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় উচ্চ পর্যায়ে সুলতানের সাথে ইরানের নাসিরুদ্দিন শাহ, মিসরের খেদিব, মরক্কোর সুলতান প্রমুখের মধ্যে যোগাযোগ ও সমঝোতার সূত্রপাত করা হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ মুসলিম ঐক্যের প্রধান বাধা শিয়া-সুন্নী বিরোধের অবসানকল্পে ইরানের শাহর সাথে একটা আপোস রফায় আসা চাই।

তৃতীয়ত ঃ ইস্তাম্বুলে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের দু'জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ দু'জন সদস্যের একজন রাষ্ট্রেরতরফ থেকে, অপরজন জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একজন আলেম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই কমিটি সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সমস্যাদি পর্যালোচনা করবে এবং এর সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে নির্দ্বিধায় অনুমোদন করতে হবে। যদি কোন ইউরোপীয় শক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করে সেক্ষেত্রে এই মুসলিম রাষ্ট্র সংস্থা জিহাদ ঘোষণা করবে

www.pathagar.com

এবং ঐ শক্তির সাথে সকল রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ সংস্থার প্রাণভোমরা ছিলেন জামাল উদ্দীন আফগানী। তিনি অপরিসীম উৎসাহে মুসলিম শাসক, উলেমা ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন এবং আশাপ্রদ সাড়া লাভে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আফগানী তাঁর এই আজন্ম, লালিত সাধনার ধনকে বেশিদূর অগ্রসর করাতে পারেননি। তাঁর জীবনীকাররা জানিয়েছেন আফগানীর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রতিহিংসাপরায়ণ সুলতানের স্তাবকবৃন্দ তাঁর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ান ও সুলতানকেও সন্দেহপরায়ণ করে তোলেন। এইভাবে মুসলিম ঐক্যের গৌরবময় প্রচেষ্টা চক্রান্তের অপঘাতে হারিয়ে যায়।

এটা সত্য সুলতানের সাথে আফগানীর সম্পর্কটা কখনোই পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে লালিত হয়নি। আর তাছাড়া মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে দু'জনের চিন্তাভাবনায়ও মৌলিক তফাৎ ছিল। আফগানী ছিলেন যথার্থ মুজাহিদ। তিনি সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের প্রধান বাধক অনৈক্য ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে নির্মূল করতে। অন্যদিকে সুলতান এই প্যান ইসলামিজমের ধারণায় সমর্থন দেন পতনোন্মুখ ও দুর্নীতিগ্রস্ত খেলাফতকে টিকিয়ে রেখে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে।

এছাড়া আফগানী আজীবন একটি নিয়মতান্ত্রিক ও জনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন এবং জনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিকতার স্বার্থে সমর্পণ করতে রাজি ছিলেন না। সুতরাং সুলতানের সাথে তাঁর বিরোধটা অনিবার্য ছিল।

অন্যদিকে এ রকম একটা বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সংস্থা গড়ে উঠুক এটা সাম্রাজ্যবাদীরা কখনোই চায়নি। সুতরাং এ পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের কোন ভূমিকা থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

চার

আফগানীর রাজনৈতিক চিন্তার অন্য একটি দিক বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। সাম্রাজ্যবাদের মতোই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দুর্ভোগ ও দুর্দশার জন্য তিনি এখানকার দুর্নীতিগ্রস্ত, জুলুমবাজ স্বৈরশাসক ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছিলেন। জনগণের অনুমোদনহীন ও জনগণের কল্যাণে অসমর্থ এসব ক্ষয়িষ্ণু সরকারগুলোর উৎখাতের ঘোষণাও তিনি দিয়েছিলেন। ইসলামী নীতির বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন শরীয়াহর আলোকে খলিফা হবেন সেই ব্যক্তি, যিনি শরীয়াহর আইনে পারদর্শী, একই সাথে সেগুলোর প্রয়োগেও দক্ষ ও কুশলী এবং জনগণের সমর্থনপুষ্ট। খেলাফতের মর্যাদা কখনো, উত্তরাধিকার সূত্র, বর্ণ ও গোত্রীয় আধিপত্য, শারীরিক ক্ষমতা কিংবা ধনের প্রাচুর্যে অর্জনযোগ্য নয়।

১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারি ইস্তাম্বুলে তুর্কী বিধায়কদের এক সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন ঃ ইসলামী নীতি অনুসারে খলিফা হবেন মুসলমান জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধি। তার এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার কেবলমাত্র সকল মুসলমানের অনুমোদন সাপেক্ষেই সম্ভব এবং একজন ব্যক্তি মাত্র কেবলমাত্র রাজরক্ত ধমনীতে ধারণ করার কারণে কোটি কোটি মুসলমানের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসতে পারেন না। খলিফা একটি

www.pathagar.com

সাধারণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন এবং তাকে চালনার জন্য ইসলামের প্রথম যুগের খলিফাদের মতো একটা পরামর্শ সভা থাকতে হবে। এ পরামর্শ সভা একালের পার্লামেন্টের অনুরূপ হতে পারে।[৭]

আফগানীর ব্যাখ্যাত এই জনতান্ত্রিক খেলাফতের অস্তিত্ব তাঁর জীবদ্দশায় আদৌ ছিল না এবং এ কারণেই মুসলিম দেশগুলোর স্বৈরশাসকদের সাথে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এসব স্বৈরশাসকরা জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী হয়ে উঠেছিল। আফগানী মনে করেন এ কারণেই মুসলিম সমাজের সংহতি বিপন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে, যাবতীয় উন্নয়নের সূচকগুলো নামতে থাকে, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ স্তিমিত হয়ে যায়। আফগানী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এ অবস্থার পরিবর্তনে কয়েকটি শর্ত দেন ঃ

১. স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তে ধর্মীয় গণতন্ত্রের (Democratic theocracy) প্রতিষ্ঠা;
২. পূর্ণ গণতন্ত্রায়নের জন্য শাসনতান্ত্রিক সরকারের প্রবর্তন; এবং
৩. খেলাফতের সংরক্ষণ।

পাঁচ

রাজনীতির মতই ধর্মীয় জগতেও আফগানী এক ধরনের রিফরমেশনের কথা বলেছিলেন। খ্রিস্টান জগতে মার্টিন লুথারের চেষ্টায় যে রিফরমেশনের আন্দোলন গড়ে ওঠে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। পুরো ইউরোপ সেদিন শত বছরের জড়তা, ক্লেদ আর প্রাচীনতা ভেঙ্গে জেগে ওঠে এবং লুথারের চেষ্টায় যাজকতন্ত্রের আধিপত্য ভেঙ্গে যায়, যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে খ্রিস্টধর্মের পুনঃবিচার শুরু হয়। এইভাবেই আসে রেঁনেসা, শিল্প বিপ্লব এবং সবশেষে পুরো বিশ্বকে ইউরোপের শাসন করবার অধিকার। জামাল উদ্দীন আফগানী লুথারের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন মুসলিম বিশ্বেও চাই রিফরমেশন।

তিনি আরো বলেছেন খ্রিস্ট জগতে যে অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছিল সে রকম অবস্থা ইসলামে এখনও অনুপস্থিত। কারণ ইসলাম কুসংস্কার নির্মূলকারী, তকলিদ অগ্রাহ্যকারী এবং যুক্তিবাদের সহায়ক। তাই তিনি পূর্বতন উলেমা ও ফকীহদের সিদ্ধান্তকে বর্তমানে অনুপযোগী হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং বলেছেন, ইসলামী আইন কোন মৃত জিনিস নয়, সময়ের পরিবর্তন ও চাহিদার আলোকে এটিও পরিবর্তনযোগ্য। মৌলিক বিষয়কে অবিকৃত ও অক্ষত রেখে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে ইসলামী আইনের সংস্কারের উপর তিনি তাই জোর দিয়েছেন। ইজতিহাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আফগানী মন্তব্য করেন ঃ

The miseries of Islam are due to the despotic Muslim rulers and the Ulama who interpreted Islam to suit their own purposes .... Instead of adapting faith to reason and logic they wish that reason and logic should be adapted to faith as concieved by them .... They should realize that unless they clothe religion in knowledge they would not be included among civilized and educated peoples.[৮]

www.pathagar.com

আফগানী সংগত কারণে তকলীদের বদলে যুক্তি ও বুদ্ধি ব্যবহারের কথা বলেছেন এবং সেই সব আলেমদের সমালোচনা করেছেন যারা মনে করে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি মনে করতেন আইন হবে সময় ও বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং উলেমাদেরও উচিত বাস্তবের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা।

ছয়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের কাছে আফগানীর অভয়মন্ত্র বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে তিনি এক ধরনের প্রাণ প্রবাহের সঞ্চার করেছিলেন। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার আন্দোলন ও সংগ্রাম রীতিমত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তিনি অভিষিক্ত হন কিন্তু স্বৈরাচারী দুঃশাসক ও প্রতিক্রিয়াশীল উলেমারা দুঃস্বপ্নের মতো তাঁকে সবসময় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। তাঁর চিন্তা ভাবনার ছাপ সেকালেই মুসলমান বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের উপর গভীরভাবে পড়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে এর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। যদিও এ অঞ্চলে আফগানীর অবস্থান ছিল স্বল্পস্থায়ী, তবুও তিনি সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিলেন। W.S. Blunt ভারতে আফগানীর জনপ্রিয়তার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

For Jamal-ud-Din they professed something like worship.[৯]

ভারতে বিংশ শতাব্দীর প্রায় অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও উলেমা মুসলিম জাগরণে আফগানীর কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গত শতাব্দীর বিশ শতকে ভারতব্যাপী মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে যে খেলাফত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার পিছনে আফগানীর প্যান ইসলামী চিন্তার প্রভাব একটা বড় উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এমনিভাবে ঃ During the reform and resurrection in the East during the nineteenth century, there is hardly a personality which can in natural brilliance, and creative power be compared to Syed Jamal-ud-Din. It can be unhesitatingly said that he ranks very high among the makers of history and leaders of thought of modern East.[১০]

রাজনৈতিক জগতের পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে আফগানীর বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চিন্তাভাবনায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত হয়েছিলেন আল্লামা ইকবাল। তিনি তাঁর কবিতায় আফগানীকে আধুনিক মুসলমানদের ত্রাতা ও প্রধান মুখপাত্র হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইকবাল তাঁর জাভিদনামায় আফগানীর চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তারিতভাবে। মুরশিদ রুমীর সাথে আসমান পরিভ্রমণের সময় তিনি ইকবালকে জামাল উদ্দীন আফগানী ও সাঈদ হালিম পাশার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন ঃ প্রাচ্য এ দুই কীর্তিমান পুরুষের চেয়ে উত্তম কাউকে আজ অবধি জন্ম দিতে পারেনি। যাদের চিন্তাভাবনা আমাদের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান দিয়েছে। মহান সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর এতটাই উদ্যম ও প্রাণ প্রাচুর্য ছিল যে তাতে পাথর ও নুড়িও জীবন লাভ করতো এবং কথা বলে উঠতো।[১১]

www.pathagar.com

ইরানের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও উলেমাদের উপর তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব এত ব্যাপক হয়েছিল যে এটি একটি গণআন্দোলনে রূপ নেয় ও সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে ১৯০৫-০৬ সালের গণবিপ্লবের মধ্যে তার অবসান ঘটে। অধ্যাপক Nikki R. Keddie মনে করেন সাম্প্রতিককালের ইরান বিপ্লব ও ইরানী উলেমাদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে আফগানীর চিন্তাভাবনা বড় একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে।[১২]

আরব জগতে আফগানীর প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে মিসরের মধ্য দিয়ে। কারণ এখানেই আফগানী সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের মিশনকে এখানে সবচেয়ে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়েছিলেন তার যোগ্য শাগরিদ মুফতি আবদুহু, রশিদ রিদা এবং আল মানারের বুদ্ধিজীবীরা। সিরিয়ায় আফগানীর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন আবদুল রহমান আল কাওকাবী। এ ছাড়া রাশিয়ার তুর্কী নেতা ইসমাইল বে গ্যাসপ্রিনিসকি, আজারবাইজানী নেতা রসুল জাদেহ আফগানীর চিন্তাভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এটা সত্য বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সেকুলার ন্যাশনালিজমের ধারণা প্রচার পায় যা আফগানীর প্যান ইসলামী চিন্তাভাবনাকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম জনসাধারণের মন থেকে প্যান ইসলামী চিন্তাভাবনাকে নির্মূল করা কখনো সম্ভব হয়নি। আশার কথা দুনিয়া জুড়ে বর্তমান মুসলিম জাগরণের যে আভাস লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের যে সব লক্ষ্য ও কর্মসূচী রয়েছে তাতে প্যান ইসলামী মূল্যবোধ একটা শক্তিশালী উপাদান। নতুন পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটিকে আফগানীর চিন্তাভাবনারই নব উন্মেষ বলা যেতে পারে।

সাত

আফগানীর বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের আহ্বানে নিঃস্ব দীন বাঙ্গালী মুসলমানও সেদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনে বাঙ্গালী মুসলমানের ভূমিকা অপরিসীম। সেই উনিশ শতকেই টাঙ্গাইলের রিয়াজ আল দীন আহমদ মাশহাদী 'সমাজ ও সংস্কারক' নামে আফগানীর এক জীবনী লিখেছিলেন। অনেকের ধারণা আফগানী প্যারিস থেকে যে প্যান ইসলামী পত্রিকা আল উরওয়াতুল উসকা বের করতেন তার কিছু ব্যয়ভার বাংলার কেউ কেউ বহন করতেন।[১৩]

আফগানী যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁকে নিয়ে বাংলার মুসলিম নেতারা সেদিন দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠেন। নওয়াব আবদুল লতীফের মতো মুসলিম নেতারা ব্রিটিশের সাথে কৌশলগত মিত্রতার কারণে ব্রিটিশবিরোধী আফগানীকে কলকাতা মাদ্রাসায় বক্তৃতা দিতে দেননি। জাস্টিস আমীর আলীর চেষ্টায় আলবার্ট হলে তার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। এরকম দু'একটা ঘটনা ছাড়া তাঁর প্রতি বাংলার মুসলমানদের প্রীতি ও অনুরাগের সম্পর্ক বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতারা আফগানীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিশেষ করে আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সেকালে বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে

www.pathagar.com

আফগানীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী ঐক্যের বাণী ছড়িয়েছে। ইসমাইল হোসেন শিরাজী, গোলাম মোস্তফা ও কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতাই প্যান ইসলামী প্রেরণা সঞ্জাত। আফগানীকে নিয়ে কাজী কবির লেখা বিখ্যাত সংগীতটিতে সুর দিয়েছিলেন শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ। আফগানীর প্রভাব বাংলার গণজীবনে কত গভীরভাবে পৌছেছিল এসব দু'একটা ঘটনা তার প্রমাণ।

আট

আফগানী বহু ক্লান্ত মুহূর্তে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে হযরতের ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়তেন ঃ হযরত তোমার ধর্ম শোভা, সৌন্দর্য, ও চাকচিক্যে এমনই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে ধর্মকে তুমি এসে যদি আবার দেখ তুমিই তাকে চিনবে না।[১৪]

এ ঘটনা প্রমাণ করে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা সম্পর্কে আফগানীর মনঃপীড়া ও আত্মপীড়নের গভীরতা। তাঁর সমকালে মুসলিম উম্মাহর যে অবস্থা বিরাজমান ছিল, তাঁর তুলনায় বর্তমান কালের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্যদশা আরো গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে বললে ভুল হবে না। এটা সত্য সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ইতোমধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত এই সদ্যলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতাও আজ বিপন্ন হতে চলেছে। একই সাথে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আফগানীর জীবদ্দশায় নাম মাত্র হলেও মুসলিম ঐক্যের প্রতীক খেলাফত নামীয় প্রতিষ্ঠানটি টিকে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও মুসলিম নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে সেটিরও অবসান ঘটেছে। সেখানে উদ্ভব হয়েছে গুটিকয়েক জাতিরাষ্ট্রের। এসব ভিন্ন নামের মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে এখন পারস্পরিক সমঝোতা ও মিত্রতার চেয়ে বৈরিতার সম্পর্কই বেশি, কোন কোন ক্ষেত্রে সে সম্পর্ক সশস্ত্র ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। সাম্প্রতিককালের ইরান-ইরাক যুদ্ধ ও উপসাগরীয় যুদ্ধ এর বড় প্রমাণ।

এসব সমস্যা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বৈরতান্ত্রিক দুঃশাসকদের কারণে, যে সমস্যার ইংগিত আফগানী তাঁর জীবদ্দশায় দিয়ে গেছেন। আজও অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত। জনগণের অনুমোদনহীন এসব স্বৈরশাসকরা নিজেদের অব্যবস্থাগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীরাও এসব শাসকদের তাদের নিজ জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

আফগানীর জীবদ্দশায় কয়েকটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম ভূখণ্ডে হামলে পড়েছিল। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে একক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এর প্রভাববলয়ের বাইরে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের নামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিম দেশগুলোর আমেরিকায়ন চলছে। আরো বিশেষভাবে বললে মুসলমান দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে জিম্মি হয়ে পড়ছে। আমেরিকার দেয়া ব্যবস্থাপত্রের বাইরে কেউ চলতে চাইলে সেই মুসলিম দল বা রাষ্ট্র এই নব্য সাম্রাজ্যবাদের টার্গেট হয়ে উঠছে। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর করণীয়

www.pathagar.com

কি? এক শতাব্দী আগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য আফগানী যে নীতিসমূহের কথা বলেছিলেন গভীরভাবে বিবেচনা করলে তাই কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না?

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Charles Adams, Islam and Modernism in Egypt, London, 1933.
২. Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism : Political and Religious Writings of Sayyid Jamal-ud-Din 'al-Afghani, Calfornia :University of California Press, 1983.
৩. প্রাগুক্ত।
৪. E. G. Browne, Persian Revolution, London, 1910.
৫. Anwar Moazzam, Jamal al-Din al-Afghani. New Delhi : Concept Publishing Company, 1984.
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. Wilfrid Scawen Blunt, India Under Ripon : A private Diary, London, 1904.
১০. Quoted in the Political Philosophy of Iqbal, Parveen Shawkat Ali. Lahore : Publishers United Ltd, 1978.
১১. প্রাগুক্ত।
১২. Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism.
১৩. কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ। উদ্ধৃত : কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (১ম খন্ড), সম্পাদনা, আব্দুল হক। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।
১৪. আবুয যোহা নূর আহমদ, জামালুদ্দীন আফগানী। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩।

www.pathagar.com

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

এক

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিম বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্যের উদ্বোধক। তার চিন্তাশীলতা ও সৃজন সমৃদ্ধ মনীষা বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় চেতনার উজ্জীবন ও বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছে। এবং এর প্রভাব যে সুফলপ্রদ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। মওলানার মনীষার স্ফুরণ ঘটেছিল তিনটি ভূমিকার ভেতর দিয়ে। রাজনীতিক হিসেবে তিনি একরকম ভূমিকা নিয়েছেন এবং সেই কর্তব্যের ভেতর দিয়ে পরাধীন আমলে বাঙ্গালী মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তার সাংবাদিকের ভূমিকাও একরকম অনন্য। দুর্বল বাঙ্গালী মুসলমানের মতামতকে যথার্থ অর্থেই তুলে ধরে তিনি তাদের সচেতন করেছেন। তাদের আত্মবিস্মৃতিকে আত্ম উজ্জীবনে পরিণত করেছেন। মওলানা যেনতেন সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন লড়াকু সাংবাদিক ও কলম সৈনিক। বাঙ্গালী মুসলমানের অধিকার ও প্রাপ্য আদায়ের সংগ্রামে তিনি রীতিমত কলমী হিাদ চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তার এসব প্রত্যক্ষ কীর্তিকে ছাপিয়ে মনীষার যে গুরুদায়িত্বভার মওলানা নিজে গ্রহণ করেছিলেন সেটি হলো আলেম হিসেবে তার ধর্ম ও সংস্কৃতি চিন্তায় এক সচল অংশগ্রহণ। তার এই সচল অংশগ্রহণে বাঙ্গালী মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি শত রকমের আবর্জনা ও সংস্কারের স্তূপের তলা থেকে পরিশ্রুত হয়ে একেবারে মৌলিক রূপে ভাস্বর হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

দুই

মওলানা আকরম খাঁ ১৮৬৮ সালের ৭ জুন (বাংলা ১২৭৬ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ) বর্তমান ভারতের অন্তর্গত পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জনশ্রুতি আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন এক পূর্বপুরুষ আর মওলানা সাহেবের জনৈক পূর্বপুরুষ ছিলেন সহোদর ভাই। ধর্মান্তরিত হয়ে মওলানা সাহেবের পূর্বপুরুষগণ ইসলামের খেদমতে নিজেদের উৎসর্গ করেন। তখনকার দিনে এই উপমহাদেশে ওহাবী ও মুজাহিদ আন্দোলনের যে বিস্তার ঘটেছিল হাকিমপুরের এই পরিবারটিও সে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এই বংশের একজন খ্যাতিমান যোদ্ধার কবর আজো বালাকোটে বিদ্যমান।[১] মওলানার পিতা আবদুল বারী খাঁ নিজেও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী পরিচালিত বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গাজী উপাধিতে ভূষিত হন। মওলানার পিতামহ তোরাব আলী খাঁও ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ। তিনি শহীদ তিতুমীরের সহযোদ্ধা ছিলেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী গ্রামের মক্তবে মওলানার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এসময় তিনি কুরআন শরীফের পাশাপাশি শেখ সাদীর গুলিস্তা ও বুস্তা শেষ করেন। মওলানার

www.pathagar.com

বয়স যখন এগার বছর তখন তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং নানার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। নানা তাকে কলকাতার জুবিলী ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করেন কিন্তু পরবর্তীতে আরবী ভাষায় উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রতি বিশেষ আগ্রহের কারণে মওলানা স্কুল ত্যাগ করে ১৮৯৬ সালে কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯০০ সালে এফ এম (ফাইনাল মাদরাসা) পাস করেন। পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রে মওলানার লহুতে মুজাহিদ আন্দোলনের স্রোতধারা প্রবাহিত ছিল। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর পরিচালিত মুজাহিদ আন্দোলন পরবর্তীতে মোহাম্মদী তরিকা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। আবার এ আন্দোলনের এক শাখা আহলে হাদিস আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে এই উপমহাদেশে হানাফী ভাবধারার মধ্যে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। মওলানা সাহেব ওহাবী-আহলে হাদিস এবং মোহাম্মদী তরিকার জেহাদী জোশ ও জ্ঞানসাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। এর সাথে তার বহুমুখী প্রতিভা যুক্ত হয়ে মাজহাব ও তরিকা নির্বিশেষে তাকে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের নবযুগের পথিকৃৎ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। মওলানার চিন্তাধারা ঠিক কোন বিশেষ মাজহাবে বন্দী ছিল না, তবে তিনি ইমাম তাইমিয়া, মোজাদ্দেদ আলফেসানী, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী, মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখের প্যান ইসলামী ভাবধারার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক। এদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সংস্কারমুখী চিন্তাভাবনা তাকে স্বদেশ ও স্বজাতীয় কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মওলানা আকরম খাঁকে বলা হয় মুসলিম বাংলার শতাব্দীকালের জীবন্ত ইতিহাস। বাঙ্গালী মুসলিম সাংবাদিকতার বিকাশের জন্য তার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও একাগ্র সাধনার জন্য তাকে বলা হয় সাংবাদিকতার জনক বা সাংবাদিকতার দাদা পীর।[২] ধর্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা মোটকথা যা কিছুর সমাবেশে ইতিহাসের ধারা গড়ে ওঠে মওলানা সাহেবের জীবন সাধনায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অমৃত ফলেছে।

মওলানা আকরম খাঁ তরুণ বয়সে তার চারপাশে বিভিন্ন খ্রিস্টান ও হিন্দু লেখকদের ইসলামবিরোধী প্রচারণায় পীড়িত বোধ করতেন। তার কর্মজীবন শুরু হয় এই সব বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিবৃতি দানের মাধ্যমে। ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করতে পারলে ইসলামবিরোধী প্রচারণার অবসান হবে বলে তিনি যুক্তি দেখান। তখন থেকেই মওলানা জাতীয় জাগরণে সংবাদপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, বিশেষ করে তিনি লক্ষ্য করেন প্রতিবেশী হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের কোন ভাল সংবাদপত্র নেই। কওমের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা আর মাত্র ৫১ টাকা সম্বল করে তিনি ১৯০৩ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা বের করেন। তারপর থেকে মওলানাকে ফিরে তাকাতে হয়নি সত্য, কিন্তু এই একটি মানুষ তার প্রবল মানসিক শক্তির জোরে দুর্যোগের সব অগ্নিসেতু পাড়ি দিয়ে এসেছেন। চলার পথের সব অন্ধকারকে অস্বীকার করেছেন। মাসিক মোহাম্মদীর পর একে একে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক জামানা, দৈনিক সেবক এবং সবশেষে দৈনিক আজাদ ও সাপ্তাহিক কমরেড এ জাগ্রত সাংবাদিক চেতনারই একেকটি অগ্নিফসল। সাম্রাজ্যবাদী

www.pathagar.com

কোপানলে পড়ে একটি কাগজের কণ্ঠরোধ হলে প্রায় রাতারাতি তিনি আরেকটি কাগজ বের করতেন। দীর্ঘদিন ধরে মওলানার এসব পত্র পত্রিকা জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে, অন্ধতা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করার আবেগকে ভাষা দিয়েছে। শুধু তাই নয় এসব পত্র পত্রিকার মাধ্যমে অসংখ্য কলম সৈনিক তৈরি হয়েছে যারা নিশিদিন বাঙ্গালী মুসলমানদের জাগরণের লক্ষ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ চালিয়েছেন।

খেলাফত আন্দোলনের পত্রিকা ছিল সেবক। সে পত্রিকায় এক রাজবিরোধী জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য মওলানাকে কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয় এবং ব্রিটিশ সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। মাসিক মোহাম্মদীর পাতা থেকে মওলানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুয়ানী সিলেবাস ও শ্রীপদ্ম প্রতীকের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিলেন। সে প্রতিবাদের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কংগ্রেসের বন্দে মাতরম সংগীতের বিরুদ্ধেও মওলানার প্রতিবাদ ছিল দ্ব্যর্থহীন। এই সব আন্দোলন, সংগ্রাম ও লেখালেখি আমাদের তমুদ্দুনিক স্বকীয়তা ও আত্মস্থতা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদ। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মচেতনা নির্মাণে আজাদের অবদান তুলনাহীন। পাকিস্তান সংগ্রামের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিল এই পত্রিকা।

মওলানার সংবাদিকতা এবং রাজনীতির সঙ্গে পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধের একটা মধুর সংমিশ্রণ ছিল। এরকম বহুগুণ বিভূষিত ব্যক্তির সংখ্যা সেকালেও খুব বেশি ছিল না।[৩] সর্বভারতীয় পর্যায়ে মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের মত মনীষীরাই তার তুলনীয় হতে পারতেন। মওলানা সাংবাদিকতার পাশাপাশি একই সময় বাংলার রাজনীতিতেও প্রবেশ করেন কারণ তিনি আমাদের তমুদ্দুনিক আজাদীর সাথে রাজনৈতিক আজাদীও চেয়েছিলেন। তার এই বহুমুখী সংগ্রামের পিছনে তৎকালীন মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা একটা ভূমিকা রেখেছিল অবশ্যই। ইংরেজের সর্বাত্মক জুলুম ও বর্বর অত্যাচারের স্টীম রোলার মুসলিম বাংলার উপরই চলেছিল সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকের শেষার্ধে যে সময় মওলানা জন্মগ্রহণ করেন সে সময় এই মুসলিম বাংলাতেই ইংরেজের শয়তানী তান্ডবলীলায় এক ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। এই অন্ধকার মোকাবিলায় তাই মওলানাকে একাই বহুমুখী দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। বস্তুতঃ মওলানার জীবন মুসলিম বাংলার সামগ্রিক পুনর্জাগরণের ইতিহাস। মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণে তিনি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে কখনো বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যম মনে করেননি। এটাকে তিনি মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন মনে করতেন।

মওলানা ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যদিও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেই মুসলমান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মওলানা আকরম খাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ১৯১৩ সালে তিনি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল্লাহিল বাকি প্রমুখ দূরদর্শী আলেমদের সহযোগিতায় আঞ্জুমানে উলামায়ে বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংস্থার মুখপত্র আল ইসলাম প্রকাশ ও সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। মওলানা

www.pathagar.com

আকরম খাঁ ও তার সহকর্মী আঞ্জুমানে উলামার মুবাল্লিগরা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুসলিম স্বকীয়তা ও জাগরণের বাণী ছড়িয়ে দেন, নানাবিধ ইসলামবহির্ভূত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে ইংরেজের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ করেন। এটাই ছিল আঞ্জুমানে উলামার সেই যুগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। খেলাফত আন্দোলনের সময় মওলানার এক বিপ্লবী রূপ আমরা দেখি। এই সময় ইতালির ত্রিপোলি অধিকার, তুর্কী খেলাফত নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র, তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ খিস্টানদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে মওলানা গর্জে ওঠেন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে নির্ভুল নেতৃত্ব দেন। খেলাফতের বাণী নিয়ে পায়জামা আচকান সবুজ পাগড়ী শোভিত মওলানা আকরম খাঁ বিখ্যাত আলী ভাইদের (মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী) সাথে পুরো ভারত চষে বেড়ান এবং তার অসাধারণ বাগ্মিতায় সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলেন। শুধু বাগ্মিতা দিয়ে নয় তিনি তার সম্পাদিত পত্রিকার ভিতর দিয়েও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তার পত্রিকার যে কতবার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার সীমা-সরহদ নেই।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও মওলানার বিপুল কর্মষনা কেবল এই রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কংগ্রেস, খেলাফত আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রজা সমিতি, আঞ্জুমানে উলামা প্রভৃতি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এবং এইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই জাতীয় মুক্তি ও আজাদীর সন্ধান করেছেন।

১৯২৩ সালে মওলানা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিমূলক বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তিতে অন্যতম নায়কের ভূমিকা পালন করেন। যদিও এ চুক্তি পরবর্তীকালে সংকীর্ণমনা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতার ফলে কার্যকারিতা হারায়। প্রথম জীবনে মওলানা উপমহাদেশের অন্যান্য প্রধান মুসলিম নেতাদের মত হিন্দু-মুসলিম যৌথ অংশীদারিত্বে ব্রিটিশ বিতাড়ন ও আজাদীর কথা ভেবেছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে একমঞ্চে কাজ করবার তাগিদ অনুভব করেছেন। আজাদীর দুরন্ত পিপাসা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মওলানাকে কংগ্রেসের দিকে টেনেছিল। কংগ্রেসের সামগ্রিক রূপ ও পরিণতি সম্পর্কে তখনও মুসলমানের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি। দেশসেবার ও জাতীয় স্বাধীনতার অকৃত্রিম আগ্রহ নিয়ে মওলানা তার সমসাময়িক কংগ্রেস নেতাদের সাথে কাজ করেছিলেন এবং কারো কারো সাথে একত্রে বন্দী জীবনযাপনও করেছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অনুদারতা, ১৯২৯ সালের নেহরু রিপোর্ট প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরায় মুসলিম নেতারা উপলব্ধি করেন কংগ্রেসের যৌথ জাতীয়তাবাদের মাপকাঠিতে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে বেঙ্গল প্যাক্টের অপমৃত্যু কংগ্রেস সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটায়। পরে কায়েদে আযমের আহ্বানে তিনি নিরংকুশভাবে মুসলিম লীগ তথা মুসলিম সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। যুক্ত বাংলায় মুসলিম লীগের পাটাতনে বিভিন্ন সময় তিনি এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন। বিভিন্ন মুদ্দতে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম

www.pathagar.com

লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সমাজ চেতনা ও বাগ্মিতা মুসলিম সমাজের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
১৯৩৫ সালে তিনি প্রজাসমিতির টিকিটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের প্রতি তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন দেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার ও সাফল্যমন্ডিত করার ব্যাপারে দৈনিক আজাদ ও আকরাম খাঁর পথ নির্দেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হয়তো দৈনিক আজাদ যথাযথ পথনির্দেশ দানে ব্যর্থ হলে সেদিন বাঙ্গালী মুসলমান এমন আত্মপ্রত্যয়ে জেগে উঠতে পারত না।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মওলানা তার দীর্ঘ জীবনের সৃষ্টিশীল কর্মক্ষেত্র কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তিনি কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। যদিও মুসলিম লীগের সাথে তার সম্পর্ক বরাবর ছিল। ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন।
মওলানার সুদীর্ঘ ১০০ বছরের জীবন যেমন একাধারে সংগ্রাম, সাধনা, অধ্যবসায়, শ্রম ও পান্ডিত্যে পরিপূর্ণ, তেমনি প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতার আলোয় সমুজ্জ্বল। জীবন সাধনায় তিনি কখনো পরাভব মানেননি। শাসন, নিষ্পেষণ ও প্রতিরোধের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেননি। জীবনকে তিনি মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হয়েছিল তেমনি তাকে লড়তে হয়েছিল সামাজিক স্থবিরতা ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে। তার এই সংগ্রাম এককথায় বাঙ্গালী মুসলমানের জেগে ওঠার শুভক্ষণে বাতিঘরের কাজ করেছিল।

তিন

মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন গভীরগ্রাহী পন্ডিত। আলেম ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব। এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার মওলানার সংস্কৃতি চিন্তা ছিল ধর্মাশ্রিত। ধর্মকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি ভাবনা বিবর্তিত হয়েছে। আজকালকার মতো পশ্চিমী দর্শনের ফাঁদে আটকে তিনি কোন ধর্মমুক্ত সংস্কৃতির চর্চা করেননি। এ কারণেই ইসলাম আর সংস্কৃতি তার কাছে একই মুদ্রার এ পিঠ ও পিঠ ঠেকেছে।
ইসলামকে নিয়ে মওলানা আদৌ কোন হীনম্মন্যতায় ভোগেননি। এটা তিনি অবশ্য বুঝতে পারতেন মুসলিম সমাজের নানা প্রকার আচরণ, চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের স্থবিরতা চলে এসেছে এবং সেই স্থবিরতার কারণে মুসলমানরা আজ অন্যের চিন্তার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। কিন্তু সেজন্য তিনি কখনোই সমকালীন অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং একজন স্থিতধী চিন্তাবিদের মতো ইসলামের মধ্যেই যুগ সমস্যার সমাধান খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি চিন্তার স্থবিরতার জন্য তিনি ইসলাম অনুবর্তীদের অলসতা, জড়তা, সৃষ্টিহীনতাকে দায়ী করেছেন, তেমনি দায়ী করেছেন তাদের ইজতেহাদের প্রতি উদাসীনতাকে। মওলানা তার বহুল আলোচিত ও সমালোচিত সমস্যা ও সমাধান গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছিলেন ঃ যাহা এছলাম তাহা অচল নহে, আর যাহা অচল তাহা এছলাম নহে।[৪] এ উক্তি মওলানার মানস ও অন্তর্ভাবনাকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে বৈকি।

www.pathagar.com

মোস্তফা চরিত হচ্ছে মওলানার ম্যাগনাম ওপাস। এ বই শুধু হযরত রসুল (স.) এর পূত জীবনের বিবৃতিমাত্র নয়। মওলানা সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন মুসলমান সমাজের নানা রকমের সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক কল্পনারাশি হযরতের প্রকৃত মানবিক আদর্শাবলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যার ফলে আজকালকার মুসলমানরা হযরতের অতিপ্রাকৃত একটি চরিত্রকে পূজা করতে শুরু করেছে। কিন্তু যে মানবিক গুণের জোরে রসুল (স.) ইসলামকে বিশ্বশক্তিতে রূপ দিতে পেরেছিলেন তার অবর্তমানে যে মুসলমানরা নানা রকম পঙ্গুত্বের শিকার তা বলাই বাহুল্য। মওলানা আকরম খাঁ কল্পনা নয় বাস্তবের রসুলকে, অতিপ্রাকৃত নয় মানবিক রসুলকে তার বইয়ে পূর্ণাঙ্গ যথার্থতার দাবি নিয়ে তুলে ধরেছেন। এসব লেখায় তার মধ্যে যুক্তিবাদিতার প্রতি এক ধরনের সহমর্মিতা লক্ষণীয়। কিন্তু তার এই যুক্তিবাদিতা কখনোই ইসলামের সুনির্দিষ্ট সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে যায়নি। তিনি বলেছেন কুরআনের বানী প্রশ্নোর্ধ্ব আর কেবলমাত্র হযরতের সহী হাদিস মুসলমানদের মান্য করা অবশ্য দায়িত্ব। এই সীমার মধ্যে মওলানার যুক্তিবাদিতা বিহার করেছে।

মোস্তফা চরিতের উপক্রমণিকা ভাগে হযরতের জীবন সংক্রান্ত তথ্য বিচারের একটা নীতি তিনি পেশ করেছেন। এ নীতি তিনি শুধুমাত্র রসুলের জীবনী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই প্রয়োগের কথা বলেননি, ইসলামের সবরকমের নীতি ও শাস্ত্রের বিশ্লেষণেও একই রকম প্রয়োগ যোগ্যতার কথা বলেছেন। মওলানা লিখেছেন ঃ

মুছলমান জাতির সংস্কার করিতে হইলে, তাহার মস্তিষ্কের সংস্কার অগ্রে করিতে হইবে। .. . . মুছলমানকে আজ আবার নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রছুল ব্যতীত যিনি যত বড় পীর, দরবেশ, অলি বা আলেম হউন না কেন, যুক্তি প্রমাণ ও দলিলের বিপরীত হইলে তাঁহার কথা মানিব না, কারণ ইহা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক শিক্ষা।[৫]

মওলানার বিশ্বাস জন্মেছিল মুসলমান জগতে চিন্তার যে স্থবিরতা, পঙ্গুত্ব, দাসত্ব নেমে এসেছে এর মূল কারণ এগুলো। কারণ অতীতের ঐতিহ্য যত গৌরবজ্জ্বলই হোক যুগোপযোগী সংস্কার ব্যতীত কালে তাও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়। অতীতে আমাদের আলেম ও বিজ্ঞজনরা যত বড় ভূমিকাই রাখুন না কেন বা সৃষ্টিশীলতার কাজ করুন না কেন তা যদি যুগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারে তবে তা যতই চাকচিক্যমূলক হোক না কেন কার্যত অচল মুদ্রায় পর্যবসিত হবে। ইসলামের মধ্যে এই সচলতার উপাদান আছে বলেই মওলানা বাস্তববর্জিত কোন কিছুকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছেন।

মওলানার ভাষায় ঃ

সেই অন্ধকার যুগের এক অশুভ প্রভাতে মুছলমান হঠাৎ বলিয়া বসিল- সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, ভূগোল বল, খগোল বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, হাদীছ বল, তফসীর বল, ফেকহ্ বল, অছুল বল, সমস্তের পূর্ণতা চরমভাবে হইয়া গিয়াছে।[৬]

প্রত্যেক নীতি ও আদর্শের গুরুত্ব বোঝা যায় তার বাস্তব কার্যকারিতা দেখে। আর এই কার্যকারিতাকে সচল রাখার জন্য পূর্বতন আলেম ও বিদ্বজনদের নীতি ও বিবরণকে প্রয়োজনমত সংশোধন বা পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধনের দরকার হয়। শুধুমাত্র গতানুগতিকতার অনুসরণে জাতির মন মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর উত্তম

www.pathagar.com

নজিরতো আজকের মুসলমানরা। মওলানা সাহেব মনে করতেন কুরআন ও সহী হাদীসের নীতির আলোকে যেমন আমাদের কর্মপন্থাকে যুগোপযোগী ও সৃষ্টিশীল করা চাই, একই সাথে শুধুমাত্র শাস্ত্রের চর্চা নয়, শাস্ত্র বর্ণিত মূল্যবোধকেও জীবনে ও সমাজে ব্যবহারযোগ্য ও উদাহরণযোগ্য করে তোলা দরকার। শাস্ত্র ও তার ফলিত প্রয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ নজির হচ্ছেন আমাদের রসুল (স.)। মওলানা সাহেব লিখেছেন ঃ

অনেকে মনে করিয়া থাকেন- কেবল নামায, রোযা ইত্যাদি কয়েকটা ফরয কাজ আঞ্জাম দেওয়ার নামই এছলাম। ইহা ব্যতীত মানুষের প্রতি মানুষের অন্য যে সকল কর্তব্য আছে, সেগুলিকে তাঁহারা দুনিয়াদারী ও রাজনীতি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুত ইহা অনৈছলামিক বরং এছলামের সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। নিজের, নিজের স্বজনদের, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীদিগের এবং বিশ্বমানবের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তাহা যথাযথভাবে পালন করাই এছলাম। . . . . . . এখানে সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়ার লোক পুঁথি পুস্তকের স্তূপ হাঁটকাইয়া কোন ধর্মের বিচার করে না। সাধারণত ঃ ধর্মের বিচার হয় সেই ধর্মালম্বী লোকদিগের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, এবং তাহাদের ভাব, চিন্তা ও মানসিকতার মধ্য দিয়া। চিন্তাশীল পাঠক ও ভক্তিভাজন আলেমবৃন্দকে এই কথাগুলো একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি ।[৭]

দুঃখের বিষয় রসুল (স.)-এর নীতি ও আদর্শ আজ স্রেফ কেতাববন্দী হয়ে পড়ে আছে। এই নীতি আজকাল আমাদের নেতৃত্বের কথার ফুলঝুরিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এর আদৌ কোন প্রয়োগ নেই। বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে এই যে ব্যবধান তাই বোধ হয় আজকের মুসলমানদের অধঃপতনকে দ্রুততর করে তুলছে। মওলানা সাহেব যথার্থ লিখেছেন ঃ মুছলমান সমাজের বর্তমান হাদী ও নেতৃবৃন্দ, একবার বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখুন, 'আমি বলিতেছি- তোমরা কর'- এরূপ নেতার উপদেশ, ওয়াজের মজলিস বা বক্তৃতা মঞ্চের বাহিরে কোনই প্রেরণা জাগাইতে পারে না। তাই আজ আমাদের সমস্ত ওয়াজ-নছিহত, সমস্ত লেকচার বক্তৃতা অরণ্য রোদন মাত্রে পরিণত হইতেছে। সমাজের পক্ষে যাহা কর্তব্য, হযরত তাহা বলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তিনি নিজে সর্বপ্রথমে সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। খলীফা চতুষ্টয়ের স্বর্ণযুগের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার এই আদর্শের পুনরায় সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন না করিলে, আমাদের নেতৃসমাজের কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।[৮]

মোস্তফা চরিতে মওলানা সাহেবের একদিকে যেমন যুক্তিবাদিতার প্রতি ঝোঁক লক্ষণীয়, তেমনি তার কঠোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা স্পষ্ট। এক হিসেবে বলা যায় মোস্তফা চরিত হচ্ছে মওলানা সাহেবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উত্তুঙ্গ নজির। সাংবাদিক হিসেবে, রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনমনীয় এক ভূমিকা নিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবী হিসেবে, চিন্তক হিসেবে, আলেম হিসেবে তিনি সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বাঙ্গালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার মত এমনি সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে আর কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে পারেননি। সাম্রাজ্যবাদের নীতি ও দর্শন মুসলিম চিন্তার জগতকে কিভাবে দূষিত ও বিকৃত করে ফেলেছে তা তিনি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ কারণেই তিনি প্রাণপণে ইসলামী নীতি ও দর্শনের পুনরুজ্জীবন চেয়েছেন। তার সমকালে ইউরোপ জুড়ে প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা ইসলাম ও তার

www.pathagar.com

নবীকে নিয়ে বিপুল সাহিত্য রচনা করে, যার অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা আর তার নবীর চরিত্র হনন করা। মোস্তফা চরিতের বিরাট অংশ জুড়ে মওলানা সাহেব পাশ্চাত্যের এই প্রচারবিশারদদের মিথ্যাচারের সমুচিত ও অব্যর্থ জওয়াব দিয়েছেন। তার এই জওয়াব দানের প্রক্রিয়ার মধ্যেও এক ধরনের যুক্তিবাদ প্রীতি লক্ষণীয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আজকাল প্রাচ্যবিদ্যার রচয়িতাদের বিরুদ্ধে যে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির অভিযোগ উঠেছে এবং এ নিয়ে দুনিয়াজুড়ে যে তুলকালাম তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে বাংলাদেশে তিনি তার সূত্রপাত করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলিম দুনিয়াকে নিয়ে ইউরোপের এই Intellectual dishonesty'র প্রতিবাদে যারা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন মওলানা তার অন্যতম পথিকৃতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।

চার

যে যুক্তিশীলতার দাবি নিয়ে মওলানা সাহেব মোস্তফা চরিত লিখেছিলেন, সেই একই সূত্র ও আধুনিক মন নিয়ে তিনি কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ ও তফসীর রচনা করেন। তফসীর রচনা করতে মওলানা সাহেব তার প্রকান্ড কান্ডজ্ঞান, বাস্তববুদ্ধি, বিশ্লেষণধর্মী মনন ও বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে তার তাৎপর্য পরিমাপ করার শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তফসীর রচনা করতে মওলানা সাহেব দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং বিস্তর পঠন-পাঠন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের পথ ধরে তিনি এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলায় তফসীর সাহিত্য আজও পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করেনি। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে দু'একজন সে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা কখনোই আন্তর্জাতিকতার বৃত্ত স্পর্শ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম মওলানা সাহেব। বিপুল অধ্যয়ন ও মনীষার স্পর্শে মওলানার তফসীর হয়ে উঠেছে তথ্যপূর্ণ, বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ও সমকালীন যুগ জিজ্ঞাসার আলোকে খুবই কার্যকর ও প্রয়োগসম্মত। সম্ভবতঃ মওলানা তার তফসীর রচনার সময় শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও মুফতী আবদুহুর রচনা ও তফসীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এদের যুক্তিশীলতা, গতানুগতিকতা বর্জনের ধারা এবং সৃজনশীলতা মওলানা সাহেবের তফসীরে প্রবলভাবে দৃশ্যমান। বিশেষ করে অন্ধ অনুকরণ বা তকলীদের পথ বর্জন করে প্রকৃত সত্যকে যাচাই, বাছাই ও সন্ধান করে নেয়ার প্রবৃত্তি তার মধ্যে খুবই বর্তমান। পূর্বতন আলেম কিংবা ইমামরা বলে গেছেন, তাই সেটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে এমন ধারণা অন্তত তিনি বাছবিচার ছাড়া মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তিনি জোরের সাথে বলেছেন ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইসলাম সম্বন্ধে কোন বিষয়ের স্বাধীনভাবে বিচার ও আলোচনার অধিকার সকল মুসলমানের আছে, অবশ্য তা ইসলামী আওতার মধ্যে হতে হবে। অন্তত এটি হচ্ছে মুসলমানদের জ্ঞান সাধনার ঐতিহ্য। মওলানা সাহেবের এই যুক্তিবিচারের ধারণার প্রয়োগ আমরা কিছুটা দেখি তার কুরআন শরীফের তফসীরে। উদাহরণস্বরূপ তিনি কিছু অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজা বিচারের ক্ষেত্রে তার কান্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করেছেন বেশি। ফলে তার মনোভঙ্গি হয়ে পড়েছে যুক্তিবাদীর, গতানুগতিকতার অনুসরণকামী নয়। যেমনি তিনি মেরাজের ঘটনাকে বলেছেন এক ধরনের আত্মিক ব্যাপার যা ছিল স্বপ্নযোগে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি। মেরাজ যে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছিল এ কথা তিনি মেনে নেননি।

www.pathagar.com

আবার হযরত মুসার সদলবলে নীল নদ পার হয়ে যাওয়া, তার আশার আঘাতে নদীর পানি দুভাগ হয়ে যাওয়া, জানালা খচিত নদীর পানির দেওয়ালের ভিতর দিয়ে হযরত মুসা ও বনি ইসরাইলের নদী অতিক্রম এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনকালে সদলবলে ফেরাউনের সলিল সমাধি, এসব কাহিনী মওলানা সাহেব তার তফসীরে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি তার স্বভাবসুলভ যুক্তিশীলতা দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন হযরত মুসা ও বনি ইসরাইল নদী অতিক্রম করেন ভাটার সময়, অন্যদিকে ফেরাউন ও তার অনুসরণকারীরা জোয়ারের সময় নদী অতিক্রমকালে জলোচ্ছ্বাসে নিমজ্জিত হয়। একইভাবে মোস্তফা চরিতে হযরত রসুল (স.) এর বক্ষবিদারণের ঘটনাটার স্বাভাবিক অর্থ তিনি করেছেন হযরতের হৃদয় উন্মুক্ত বা প্রশস্ত হওয়া।

এইভাবে কুরআন শরীফের নানা ঘটনার কিংবা হযরত রসুল (স.) ও ইসলাম সংক্রান্ত নানা বর্ণনা প্রসঙ্গে মওলানা সাহেব পুরোপুরি অলৌকিকতার উপর নির্ভর না করে মানবিক কান্ডজ্ঞান ও যুক্তিশীলতার ব্যবহার করেছেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় বাঙ্গালী মুসলমানকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। মওলানা সাহেব যা বলেছেন তা কোন নতুন কথা নয়। ইসলামের ইতিহাস জুড়েই আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এসব ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। তাবারী, জামাখশারী, ইবনে কাছির থেকে শুরু করে আজকের মোহাম্মদ আসাদ পর্যন্ত অনেকেই এইসব ঘটনার অতিপ্রাকৃত চরিত্র নিয়ে যে মতানৈক্য আছে তার কথা স্বীকার করেছেন। মওলানা সাহেব ইসলামের এই যুক্তিশীল ঐতিহ্য ও ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন মাত্র। আমাদের এখানকার গতানুগতিক ও ঐতিহ্য আক্রান্ত আলেমরা মওলানার এই পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেননি। তাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে মোস্তফা চরিত ও তার কৃত কুরআন শরীফের তফসীরের মত অসাধারণ কাজও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। যুক্তিশীলতাকে মানুষ গ্রহণ করে ধীরে। সমালোচনা, অনুসন্ধান, গতানুগতিকতা বর্জন, জ্ঞানের সম্প্রসারণ প্রভৃতি হচ্ছে মনীষার কাজ, যার গ্রহণ সামর্থ্য সাধারণ মানুষের সব সময় থাকে না। তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। মওলানা সাহেবের মোস্তফা চরিত ও কুরআন শরীফের তফসীর বাঙ্গালী মুসলমানদের সেই প্রস্তুতির শুরুটা সম্পন্ন করেছে। তবে এসব আলোচনায় যুক্তিশীলতার প্রতি দুর্বলতা থাকায় মওলানা কুদরত ও ফিতরতের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় করতে পারেননি বলে মনে করারও সংগত কারণ আছে, যা কিনা পাঠককে অনেক সময় বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

পাঁচ

মওলানা সাহেব সমস্যা ও সমাধান নামে একটি বই লিখেছিলেন। এ বইয়ে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে এক নবতর ইংগিত দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যে দর্শন ও নীতি যত বেশি ব্যবহার উপযোগী, জনসমাজে তার গ্রহণযোগ্যতাও অনেক বেশি। মওলানা এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্বের সাথে বুঝেছিলেন। কলোনীর কালে ইসলাম ইউরোপীয় নীতি ও দর্শনের সংস্পর্শে আসে। তখন থেকে ইসলাম অনুবর্তীরা ইউরোপের সাথে নিজেদেরটাও তুলনা করে দেখার চেষ্টা করে। এই তুলনার বোধ থেকেই তারা প্রতিদিনকার উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজতে থাকে। এতকাল সঙ্গীত-চিত্রকলা-সুদ-নারীর অধিকার প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে ইসলাম

www.pathagar.com

অনুবর্তীদের তেমন কিছুই ভাবতে হয়নি। ইউরোপের সংস্পর্শ তাদের জন্য নতুন এক জ্বালামুখ তৈরি করে। কোন কোন মুসলিম আবার ইউরোপের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে ওদের মত করে যুগ সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর হন। বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর একটি পক্ষের মধ্যে এরকম একটা আন্দোলন সমুপস্থিত হয় গত শতকের গোড়ার দিকে। এ আন্দোলনের নাম ছিল শিখা আন্দোলন। এর নেতৃত্বে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখ বিজ্ঞজনেরা। এরা নব্য মুতাজিলাপন্থী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। এরা ইউরোপের রেনেসাঁ ও লিবারালিজমের ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে ইসলামের মধ্যে একধরনের সংস্কার চেয়েছিলেন। তাদের ভাবনা চিন্তার সততা যাই থাকুক না কেন, সেটা করতে গেলে ইসলামকে ইউরোপীয় নীতি ও দর্শনের স্থায়ী গোলামী কবুল করে নিতে হতো।

মওলানা সাহেব এই সব শিখাপন্থীদের কিছু কিছু লেখার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এসব লেখার মূল প্রতিপাদ্য ছিল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে ইসলামের নীতি ও দর্শনের আলোয়। অন্যের কাছ থেকে ধার করা আদর্শে নয়। এর থেকে মওলানা সাহেবের স্বাতন্ত্র্যকামী ও আত্মানুসন্ধানী মনের একটা পরিচয় মেলে।

মূলতঃ মওলানার এই সব সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন হচ্ছে সমস্যা ও সমাধান গ্রন্থ। এখানে তিনি সঙ্গীত, চিত্রকলা, সুদ, নারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে ইউরোপীয়দের প্রচারণা ইসলামে নারী সবরকমের মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত এই ধারণা যুক্তি, প্রমাণ, উপাত্ত দিয়ে খন্ডন করেছেন। মওলানার সব যুক্তি ও সমালোচনা হয়তো সকলে গ্রহণ করেননি। এর অনেক কিছুই সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধানে বাস্তবানুগ কোন বিকল্প না দিয়ে নিছক সমালোচনায় কোন কৃতিত্ব নেই। সেই কালে মওলানা সাহেব বাস্তব অর্থেই বিকল্প একটি পথের নির্দেশ দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মনীষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র।

সমস্যা ও সমাধান গ্রন্থের প্রবন্ধাবলিতে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে মওলানা সাহেব দেখানোর চেষ্টা করেছেন ইসলামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে কঠোরতা কিংবা গোঁড়ামির স্থান নেই। ইসলামের মৌলিক নীতি ও বিধানগুলি আধুনিক যুগের এমনকি সকল যুগের উপযোগী। যে কঠোরতা বা গোঁড়ামির প্রাচীর আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হয় তা মূলতঃ আমরাই তুলেছি। ইসলাম এরকম নির্দেশ কখনো জারি করেনি। মওলানা সাহেবের সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক প্রবন্ধের একটি অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা আমাদের চিন্তার অস্বচ্ছতাকে পরিশ্রুত করতে সাহায্য করবে ঃ জ্ঞানের, ভাবের ও বিশ্বাসের দিক দিয়া নিজেদের খোশ খেয়ালের যে পরিকল্পনাকে আজ আমরা এছলাম বলিয়া ধরিয়া লইতেছি, সত্যকার এছলামের সহিত তাহার মিল অপেক্ষা অমিলের পরিমাণই অধিক।[৯]

এটা সত্য এ গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলোর অনেক কিছুই আজ আর সমস্যা নয়। সুদী ব্যাংকিং এর বদলে ইসলামী ব্যাংকিং এসেছে। ইসলামে সংগীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধে বরাবরই একটা নীতি ছিল। নতুন পরিস্থিতিতে একালের মুজতাহিদরা নতুন সমাধান সূত্র খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছেন। তবু মওলানা সাহেব সেইকালে যে উদযোগ নিয়েছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

ছয়

মওলানা সাহেবের সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস। এ গ্রন্থে তিনি একজন বিশুদ্ধ ধর্মচিন্তাবিদ ও স্বাতন্ত্র্যকামী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। বাঙ্গালী মুসলমানের অধঃপতনের জন্য তিনি এ সমাজের আদি ও অকৃত্রিম ইসলামের পিউরিটানিক জীবনাদর্শ থেকে পশ্চাদাপসরণকে দায়ী করেছেন। মুসলমানদের দুর্দশার জন্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে আকবর, জাহাঙ্গীর ও দারাশিকোহর নানারকম ইসলাম বৈরী ক্রিয়াকলাপ এবং ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণকে যেমন তিনি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তেমনি বাঙ্গালী মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রভাব, মধ্যযুগে শ্রী চৈতন্যের কর্মকান্ড ও কিছুসংখ্যক সুফী নামধারী ব্যক্তি ও আউল-বাউল সম্প্রদায়কে সমানভাবে দায়ী করেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নানা রকমের শিরক, বিদআত ও অনৈসলামিক ক্রিয়াকান্ড। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আজকাল শ্রী চৈতন্য ও নানা রকম আউল-বাউল সম্প্রদায়কে সেকুলার ও সমন্বয়ী সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানোর একটা প্রয়াস লক্ষণীয়। এ প্রয়াস যে ইসলামের জন্য আত্মহত্যার শামিল তা বলাই বাহুল্য। মওলানা সাহেব নানা রকম ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে সুপ্রমাণ করেছেন শ্রী চৈতন্য একজন ঘোরতর সাম্প্রদায়িক চরিত্রসম্পন্ন লোক ছিলেন। অথচ এই ব্যক্তিটিকেই প্রেমের অবতার বানিয়ে আজকাল মুসলিম সমাজের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। যা হোক মওলানা সাহেব এসবের প্রতিকারের পথ বাৎলেছেন আদি ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের ও মুসলিম সমাজের বিশুদ্ধকরণের মধ্যে। মওলানার এসব চিন্তার সাথে ওহাবী মতাদর্শের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এর মানে এই নয় মওলানা অতীতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের আদি ও মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সংলগ্ন হয়ে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, জিজ্ঞাসা ও অগ্রসরমানতার চর্চা করা। মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে ইসলামের উপর আপতিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও কালের জঞ্জালের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন এবং এসব থেকে ইসলামকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে যুক্তিশীলতা ও যুগোপযোগিতার সঙ্গে ইসলামী ধারণার সমন্বয় করে মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসকে চলিষ্ণু ও গৌরোবজ্জ্বল করে তোলাই ছিল তার জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য।

সাত

মওলানা সাহেব তার প্রোজ্জ্বল মনীষা ও প্রগাঢ় সমাজ হিতৈষণার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের উজ্জীবনের পথ নির্ণয়ে অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। বিশেষ করে তার চিন্তার বিশিষ্ট দিকগুলো বাঙ্গালী মুসলমানের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উজ্জীবনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এটা সত্য মওলানার মনীষা মূলতঃ বিহার করেছে ইসলামের নীতির ভিতরে। ফলে আমাদের দেশে যেসব পশ্চিমাগত ধারণা ইতোমধ্যে অনেককে উজ্জীবিত করেছে তা মওলানা সাহেবের মনীষালব্ধ চিন্তাভাবনার সাথে অনেকখানি সাংঘর্ষিক হয়ে উঠেছে ও তার ভাবনা চিন্তার আবেদনকে খর্ব করেছে। আশার কথা সাম্প্রতিককালে পুরো মুসলিম দুনিয়ায় সেই অর্থে বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যেও পশ্চিমাগত প্রভাবের বাইরে আত্মউজ্জীবনের একটি প্রক্রিয়া সঞ্চারিত হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া যতই গভীর ও চলিষ্ণু হয়ে উঠবে মওলানার মনীষার মূল্যায়ন ততই দ্রুততর হবে এবং মনীষালব্ধ সম্পদ অধিকতর মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. আখতার-উল-আলম, 'জাতীয় চেতনায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ,' উদ্ধৃত ঃ মওলানা আকরম খাঁ, সম্পাদনা, আবু জাফর। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬।
২. আবুল মনসুর আহমদ, 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রনায়ক,' উদ্ধৃত ঃ সুধীবৃন্দের তুলিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সম্পাদনা, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী। ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭১।
৩. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্মরণে, 'সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন,' উদ্ধৃত ঃ প্রাগুক্ত।
৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, উদ্ধৃত ঃ আবদুল হক, বাঙালির জাগরণ। ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০১।
৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত। ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান। উদ্ধৃত ঃ আবদুল হক, বাঙালির জাগরণ।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী

এক

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন কুরআন শরীফের অনন্য ভাষ্যকার হিসেবে। ১৯৩৮ সালে ইংরেজি ভাষায় তিনি তার এই অসাধারণ ভাষ্যটি প্রকাশ করেন। সেই থেকে এই ভাষ্যটির অগণিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ইংরেজি ভাষী ও ইংরেজি জানা পাঠকদের কাছে রীতিমত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। বিশ শতকের ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে কুরআন শরীফের এই ভাষ্যটি একটি গৌরবময় ও অবিসংবাদী স্থান দখল করে আছে। এর কারণ হচ্ছে একদিকে তরজমা ও তফসীর হিসেবে এর নির্ভরযোগ্যতা, অন্যদিকে এটির অনন্য প্রকাশভঙ্গি। তফসীরটি পড়তে গেলেই বোঝা যায় আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। আরবী ও ইংরেজি উভয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর তার অধিকার, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, বিশ্ব ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান সবকিছুর সারাৎসার নিংড়ে তিনি এই ভাষ্যটি রচনা করেন।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ছিলেন ১৮৭০-এর দশকের মেধাবী মুসলিম প্রজন্মের একজন যাদের সুযোগ হয়েছিল অক্সব্রিজে (Oxbridge) পড়বার কিংবা লন্ডনে বার এট ল'করার। ইউসুফ আলীর দুটোরই সৌভাগ্য হয়েছিল। এই প্রজন্মের তার সমসাময়িক যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী জওহর, মোহাম্মদ ইকবাল এবং স্বল্প পরিচিত অথচ প্রভাবশালী ফজলে হুসেন ও শেখ আব্দুল কাদের। এরা কোন না কোনভাবে আধুনিক মুসলিম ভারতের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ করেছেন। ইউসুফ আলী এই নির্মাণের কেন্দ্রে না থাকলেও কেন্দ্র থেকে খুব একটা দূরবর্তীও ছিলেন না। চরিত্র ও মেজাজের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন জাত শিক্ষাবিদ। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ভারতের বিশেষ করে পাঞ্জাবের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং সেকালের রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত অনেক সরকারি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণোদ্যমে অংশগ্রহণ করেন। ইউসুফ আলী তার সমকালের অনেক রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচিত ছিলেন। এমনকি উনিশ শতকের প্রধান প্রধান মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও সমাজ নেতার সাথেও তার যোগাযোগ হয়েছিল। বিশেষ করে তাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এরা হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান, বদরুদ্দীন তাইয়েবজী এবং বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী।

বিশ শতকের শেষ দিকে এসে ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের আত্মআবিষ্কারের লক্ষণ দেখা যায় এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জাগরণের আভা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর সময় এ লক্ষণগুলো অনুপস্থিত ছিল এবং তিনি তার সমকালের বুদ্ধিবৃত্তিক যে প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করতেন তা ছিল দীর্ঘ

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিকতার ফলস্বরূপ কাটাছেঁড়া করা এক ইসলামের খণ্ডিত ছবি। তারপরেও স্বীকার করতে হবে যুগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইউসুফ আলী ইসলামের জন্য যে অসামান্য খেদমত করে গেছেন বিশেষ করে তার কোরআনের ইংরেজি ভাষ্যটি পূর্ব-পশ্চিমের ইংরেজি জানা পাঠকদের কাছে যেভাবে ঘরে ঘরে ইসলামের বাণীকে পৌঁছে দিয়েছে তার তুলনা একেবারেই বিরল।

দুই

জন্মগতভাবে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ছিলেন গুজরাটী। গুজরাটের বস্ত্র শিল্প অধ্যুষিত সুরাট নগরে ১৮৭২ সালের ৪ এপ্রিল তার জন্ম। তার পরিবার ছিল সুরাটের একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্য যারা বোহরা হিসেবে পরিচিত। বোহরারা হচ্ছে ইসলামের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। বলা হয়ে থাকে মিসরের ফাতেমী খলিফাদের বিশেষ উদ্যোগে এদের পূর্বপুরুষরা ভারতে ইসলাম প্রচারের জন্য আসে।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী পিতার মত তাদের সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক বৃত্তিতে যুক্ত না হয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হন। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর পিতা ইউসুফালী আল্লাহ বকশ ছিলেন গুজরাট পুলিশের একজন কর্মকর্তা। লেখাপড়ার জন্য তিনি তার পুত্রকে মাত্র আট বছর বয়সে সুরাট থেকে বোম্বে পাঠান। প্রথমে ইউসুফ আলী বোম্বের মুসলমানদের সংগঠন আঞ্জুমানে ইসলামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তি হন। পরে স্কুল পরিবর্তন করে উইলসন মিশনারী স্কুলে চলে যান। উইলসন স্কুলে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বোম্বে অঞ্চল থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাস করেন এবং বৃটেনে উচ্চ শিক্ষার জন্য বোম্বে সরকারের বৃত্তি পান।

১৮৯১ সালে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী বিলাত যান। বিলাত যাওয়ার সামান্য আগেই ইউসুফ আলীর পিতা আল্লাহ বকশ ইন্তেকাল করেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে ভর্তি হন এবং আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৫ সালে তার আইনের কোর্স শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি আইসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। সেকালে রাজকীয় চাকরি বলতে বুঝাতো আইসিএস এবং এই সার্ভিসের সদস্যরাই মূলতঃ ভারত শাসন করতো। সাম্রাজ্য রক্ষায় এই সার্ভিসের সদস্যরা তাই প্রাণপণ খাটাখাটি করতো। যদিও ভারতীয়দের জন্য এই সার্ভিসে প্রবেশ বেশ দুরূহ ছিল- তবু আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী সহজাত প্রতিভার জোরে এই দুরূহ কাজটি অনায়াসে সমাধা করে ফেলেন। এভাবে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন রাজানুগত্য ও সাম্রাজ্যনুগত্যের ভিতর দিয়ে যা তার জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। ইউসুফ আলী তার জীবদ্দশায় ভারতীয়দের স্বাধীনতার লড়াই দেখেছেন, মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবির কথাও শুনেছেন, কিন্তু কোন কিছুই তার রাজানুগত্য টলাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেছেন, ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বৃটিশ আনুগত্যই কল্যাণকর হবে।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে তরুণ আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ভারতের নতুন আইসিএস অফিসার হিসেবে যোগ দেন এবং ১৮৯৬ সালে যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুরের এ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দেন। এরপর তাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের যোগ্যতায় তিনি এ সার্ভিসে তরতর করে উপরের দিকে উঠে যান।

www.pathagar.com

সার্ভিসে থাকা অবস্থায়ই তিনি একজন খ্রিস্টান রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। এর নাম ছিল তেরেসাঁ মেরী শেলডারস। মুসলমান হয়ে খ্রিস্টান রমণী বিয়ে করা কোন নজিরবিহীন ঘটনা ছিল না। কিন্তু তার এ বিয়েটা হয়েছিল পুরোপুরি গির্জায় খ্রিস্টীয় পদ্ধতিতে যা একজন ভারতীয় মুসলমানের জন্য সে সময় পুরোপুরি অবিশ্বাস্য ছিল। তেরেসাঁর সাথে তার বিয়েটা সুখের হয়নি। একটি পর্যায়ে তেরেসাঁ বিশ্বাসঘাতিনী হয়। পর পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে । অন্যদিকে তেরেসাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলীর সন্তানেরা তার সাথে ভাল ব্যবহার করে না। এই সন্তানেরা ইউসুফ আলীকে প্রত্যাখ্যান করে। ইউসুফ আলী পরবর্তীতে আরেকজন বিলাতী রমণীকে বিয়ে করেন। কিন্তু সে সম্পর্কও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এসব ঘটনা ইউসুফ আলীর পারিবারিক জীবন এলোমেলো করে দেয়। তার মানসিক স্বস্তি কেড়ে নেয়। তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে অকালে অবসর নেন। এরপর তিনি যে কয়দিন বেঁচেছিলেন ততদিন এক অস্থির সময় কাটিয়ে যান। এ সময় তিনি বহুবার বৃটেন-ইন্ডিয়া যাতায়াত করেন। হাউস অব লর্ডসের বহু সভ্যের সাথে তার সখ্য ছিল। তিনি ১৯১৯ সালে প্যারিস পিস কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। লীগ অব নেশনসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বৃটেনের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন জায়গা সফর করেন, বৃটেনের পক্ষে প্রচারকার্যে অংশ নেন এমনকি তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বৃটেনের ভূমিকাকেও তিনি ঔজস্বী ভাষায় তুলে ধরেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেছেন পাঞ্জাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের তিনি সদস্য ছিলেন। মাঝখানে কিছুকাল তিনি লাহোর ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করেন। স্বল্পকালের জন্য তিনি পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির রাজনীতির সাথে শরীক হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় ইন্ডিয়া, বৃটেন ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন ইসলাম, মুসলিম সংস্কৃতি, শিল্পকলা, ভারত-বৃটেন সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনা ও বক্তৃতা দিয়েছেন এবং লেখালেখি করেছেন।

এ ছিল আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর বাইরের দিক। কিন্তু অন্তর্জগতে তার চলছিল ঝড়। পরপর দুটি অসুখী ও ব্যর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক, পুত্রদের উপেক্ষা তার অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর তখনকার বিশ্ব পরিস্থিতি তথা ভারতের টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে তার জীবনতরী অনিশ্চয়তার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলছিল। এরকম একটি মানসিক অবস্থায় আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী কুরআন শরীফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বহুদিন পর তার জীবনীকার এম এ শরীফ এ ঘটনাকে বলেছেন Searching for Solace।[১] আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এই অস্থিরতার মধ্যে স্বস্তির সন্ধান করেছিলেন নিবিষ্ট চিত্তে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করে। পরে কুরআন শরীফের তফসীর লিখে এবং এভাবে কুরআন শরীফের সাথে তার একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তিন

১৯৩৪ থেকে তিন বছরের মধ্যে মাসিক কিস্তিতে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এ ভাষ্যটি রচনা করেন এবং লাহোরের বিখ্যাত আশরাফ পাবলিকেশনস কিস্তি আকারে এটি প্রকাশ করে। যদিও তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধাদি ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন কিন্তু এটিই ছিল তার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। এটি তাকে রাতারাতি ইংরেজি ভাষী

www.pathagar.com

মুসলিমদের কাছে পরিচিত করে তোলে। এ তফসীরটিতে তিনি প্রায় ৬০০০ পাদটীকা ও অসংখ্য টীকাভাষ্যযোগ করেন এবং কবিতার ছন্দে মূল ভাষ্যটি রচনা করে যান। এ তফসীরটি জুড়ে কোরআনের মহিমার সাথে তার মেধাবী ও ভাবুক মনের পরিচয়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ইউসুফ আলী ইসলামের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শক্তির পুনরুভ্যুত্থানের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। তার এ ধরনের ভাষ্য রচনার পিছনে জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা, অস্থির সংসার জীবন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা, সবকিছু মিলিতভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে মধ্যবিত্ত পটভূমি থেকে ইউসুফ আলী একজন আধুনিক ইংরেজনবিস ভদ্রলোকে পরিণত হন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে সেকালে হাতেগোনা কয়েকজন মুসলমানের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাই বলকানে তুর্কীদের কিংবা আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের হাতে মুসলমানদের বিপর্যয় তাকে তেমন নাড়া দেয়নি, যেমন ইকবাল কিংবা মোহাম্মদ আলীকে দিয়েছিল। প্রথমে তিনি ভারতের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসগুলোকে অন্যান্য অনেক আইসিএস সার্ভিসের বুদ্ধিজীবী প্রশাসকের (Scholar - Administrator) মতো সামাজিক ঐতিহাসিকের (Social Historian) দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর সংক্ষুব্ধ পারিবারিক জীবন মধ্য বয়সে ইউসুফ আলীর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকখানি পাল্টে দেয়। তার সাম্রাজ্যানুগত্য পুরোপুরি টুটে না গেলেও তার মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় অনুভূতির জাগরণ ঘটে। আগেই বলেছি তার মনের এই অস্থিরতার কালে কুরআন শরীফের সাথে তার এক ধরনের মনোসংযোগ ঘটে। তিনি এর মধ্যে এক ধরনের স্বস্তির সন্ধান করে ফেরেন। এ কারণেই ইউসুফ আলীর কুরআন অধ্যয়ন ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। কোরআনের মধ্যে মানুষকে আশা ও প্রতিকারের যে সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে তাই তাকে সবচেয়ে বেশি উজ্জীবিত করেছে। দুঃসময়ে ইউসুফ আলীর কুরআন আবিষ্কার প্রচ্ছন্নভাবে তফসীরটির বিভিন্ন স্থানে তার একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। যেমন তিনি লিখেছেন ঃ

Many violent settlements of the spirit are but heralds of the refreshing showers of spiritual understanding that come in their wake. They purify our souls and produce spiritual life where there was a parched spiritual desert before.[২]

তফসীরটিতে এক ধরনের সুফীবাদী একাকীত্ব, তন্ময়তা, পারলৌকিক অনুভূতি এবং নশ্বর পৃথিবীর অস্থায়িত্ব নিয়ে পুনঃপুনঃ আলোচনা হয়েছে। এখানে তাই জীবনবিচ্ছিন্ন পারত্রিকতার একটি আমেজ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন তিনি লিখেছেন :

Where is the bravery and beauty of yesterday? All that is left is dust and ashes! What more can we get from this physical material life?[৩]

এই একান্ত অনুভূতি ও পারত্রিকতার পাশাপাশি কুরআনের ভাষ্য লেখার সময় ইউসুফ আলীর প্রথম জীবনের গ্রীক ও হেলেনীয় সংস্কৃতির উপর পঠন-পাঠনও এক ধরনের প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। হেলেনীয় ভাষা ও সংস্কৃতির গুণমুগ্ধ ইউসুফ আলী

www.pathagar.com

কুরআন শরীফে উল্লিখিত জুলকারনাইন (যাকে আলেক্সান্ডার দি গ্রেট হিসেবে মনে করা হয়) চরিত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন :

I have studied the details of Alexander's extraordinary personality in Greek historians as well as in modern writers...... few readers of Quranic literature have had the same previlege of studying the details of his career.[8]

হেলেনীয় সংস্কৃতিতে প্রতীকের প্রচুর ব্যবহার লক্ষণীয়। ইউসুফ আলীকে দেখা যায় কুরআন শরীফের গুপ্ত অর্থ আবিষ্কারে অত্যন্ত আগ্রহশীল। এ ধরনের রহস্যের মধ্যে তিনি আল্লাহর ইঙ্গিতই খুঁজে পান। এজন্য তিনি লিখতে পারেন ঃ

The signs of God were many, in His great world, in nature, in the heart of man, in revelation. If we study such signs in the right spirit, we learn the highest lessons for our spiritual life.[৫]

কুরআনের এ ভাষ্য রচনায় তার আরেকটি দিক লক্ষণীয়। ইউসুফ আলী লাহোর ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছাত্রদের নৈতিক উন্নয়নের উপর খুব বেশি জোর দিতেন। তিনি তার ভাষ্যটিতেও একই রকম শিক্ষকসুলভ চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। শিক্ষক যেমন তার ছাত্রকে বারবার পথ বাৎলে দেয়, ভুল শুধরে দেয় তেমনি তিনিও তার মুসলিম ভাইদের সাথে একই ভঙ্গিতে কথা বলে যান। এ ধরনের একটি বর্ণনা দেখা যাক ঃ

In all things be moderate. Do not go the pace, and do not be stationary or slow. Do not be talkative and do not be silent. Do no be loud and do not be timid or half hearted. Do not be too confident and do not be cowed down.[৬]

ইউসুফ আলী সমকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবর্তনের সাথে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। এই হিসেবে তিনি আধুনিক শিক্ষিত মনের চাহিদাকে আঁচ করতে পারতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গতানুগতিক আলেমরা নতুন শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে ইসলামের বাণীকে যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারছে না। ইউসুফ আলী যুগের এই চ্যালেঞ্জকে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের মেধা ও ইংরেজী জ্ঞানকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ঃ

If the traditional scholars had not risen to the challenge of explaining the message of Islam to the new educated classes, the younger generation that is pressing in upon us well demand that our interpretation is consonant with the best knowledge that we possess.[৭]

এর মানে এই নয় তিনি পশ্চিমের নৈতিকতার আলোকে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মত তিনি কুরআনীয় বিষয়বস্তুকে Apologetic হিসেবে উপস্থাপন করেননি। কার্যত: তিনি এই ভাষ্য রচনার সময় কুরআনের মৌলিক বিষয়বস্তুর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। তিনি মনে করতেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বরং ধর্মীয় সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে। তিনি

www.pathagar.com

ইউরোপীয় অর্থে যুক্তিবাদী (Rationalist) ছিলেন না। স্যার সৈয়দের মত তিনি মুজিজাকে যুক্তিবাদীর মত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেননি।
আগেই বলেছি ইউসুফ আলীর মনোজগতে এক ধরনের ব্রিটিশ আনুগত্য ভর করেছিল। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে পা না দিয়ে ব্রিটিশ আনুগত্যের পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত। এ কারণেই বোধ হয় তিনি তার ভাষ্যটিতে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার কথা তেমন কিছু আলোচনা করেননি। যা করেছেন তা একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে । এ ভাষ্যটিতে তাই বেশি করে শোণা যায় এই পৃথিবীর অনিশ্চয়তা ও অস্থায়িত্বের কথা, অন্তর্জগতের তাৎপর্যের কথা ও নৈতিক উন্নয়নের কথা। তিনি কুরআনের বাণীকে ব্যক্তি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার উৎস হিসেবে উপস্থাপন করেন। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার দিকদর্শন হিসেবে কুরআন যে বড় ভূমিকা রাখতে পারে সে দিকটি আলোচনায় তেমন আনেননি। তাকওয়াকে তিনি মনে করতেন একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এর তাৎপর্যকে তিনি কখনো রাষ্ট্রীয় সমস্যার নিরসনে ব্যবহার করার কথা ভাবেননি।

চার

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী তার চাকরির প্রথম দিকে একবার স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে মোলাকাত করেছিলেন। দীর্ঘ শ্মশ্রুমন্ডিত স্যার সৈয়দের সামনে ইংরেজি কেতায় স্যুট পরিহিত ইউসুফ আলীর চেহারা মূলতঃ তখনকার পরিবর্তনশীল মুসলিম ভারতের একটি ছবি তুলে ধরে। এই পরিবর্তন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু উভয় দিক দিয়ে সূচিত হয়েছিল। এই প্রজন্ম ১৮৫৭-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর রাজশক্তিকে প্রত্যক্ষ করে এবং এক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের মুখোমুখি হয়। স্যার সৈয়দ ও তার সহকর্মীরা বাস্তবতা বিবেচনা করে, ইংরেজ রাজের অনুগত থাকার চেষ্টা করেন। ইউসুফ আলী ও তার মানসিকতার লোকজন ব্রিটিশ রাজের শ্রেষ্ঠত্বকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন।
এটা সত্য ইউসুফ আলী তার বিখ্যাত সমসাময়িকদের পটভূমিতেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। ইকবাল, জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলীর মতই তিনি মিশনারী স্কুলে পড়েন, পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান। তারপরেও ইউসুফ আলীর ব্রিটিশ আনুগত্য ছিল ব্যতিক্রমী ধরনের। তার এক হাত তাকে টেনেছে ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠত্বের দিকে। অন্য হাত টেনেছে মুসলমানের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দিকে। তার জীবন ও বিশ্বাসের এই টানাটানির মধ্যে তার মানসিক অস্থিরতার ধরন কিছুটা আঁচ করা যায়। আজ থেকে একশ' বছর আগে তিনি বৃটেনে লেখাপড়া করতে এসে যে ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন আজও অনেকক্ষেত্রে মুসলমানরা পশ্চিমের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ধরনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুভব করছেন।
ইউসুফ আলী ও তার মহান সমসাময়িক ইকবাল কিন্তু একই সময় দুটি ভিন্ন মুসলিম পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ইউসুফ আলীর বিশ্বচিন্তার মধ্যে বৃটেন ও পাশ্চাত্যের স্থান ছিল অপ্রতিহত। ইকবাল মনে করতেন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখতে চায়। ইউসুফ আলী স্বপ্ন দেখেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক ধরনের মিলন ও সমন্বয়ের। যদিও বাস্তব অর্থে এমনকি

www.pathagar.com

তার ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই চেষ্টা তেমন ফলবতী হয়নি। ইকবাল এ ধরনের চিন্তাভাবনায় আদৌ আগ্রহী হননি। উল্টো ইউসুফ আলী মনে করতেন ইকবাল পাশ্চাত্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রুটি সন্ধানে বেশি আগ্রহী। লীগ অব নেশনস নিয়ে তাদের দু'জনার চিন্তাভাবনার মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যায়। ইউসুফ আলী লীগ অব নেশনসকে একটি বৈধ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করতেন। ইকবাল মনে করতেন এটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের 'শব চোরদের' (Coffin thieves) একটি আখড়া। ইউসুফ আলী হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত যৌথ জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতিতত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন। ইকবালের চিন্তাভাবনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করে দিয়েছিল। ইউসুফ আলীর কাছে ধর্ম ছিল একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়। ইকবাল মনে করতেন ধর্ম ব্যক্তির পরিসর ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজের গভীরেও প্রবেশ করে এবং কর্ম ও সংগ্রামের প্রেরণা দেয়।

পাঁচ

ইউসুফ আলীর জীবন শুরু হয়েছিল বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে। জীবনের মধ্যখানে তিনি সাফল্যের শীর্ষে উঠে যান। আবার একই সাথে তিনি হতাশার মধ্যে ভূপতিত হন এবং তার জীবন শেষ হয়ে যায় ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে। অনেকটা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের মতই তার জীবন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তার কর্মমুখর জীবনের ছন্দপতন ঘটে। স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধ ইউসুফ আলীর এক গভীর নিঃসঙ্গতার জীবন শুরু হয়। তার পুরনো বন্ধু আকবর হায়দারী, লেমিংটন, মেসটন, ইয়ং হাসব্যান্ড তখন আর নেই। শেখ আবদুল কাদের দেশে ফিরে এসেছেন। ততদিনে ভারত ভাগ হয়ে গিয়েছে। দেশে ফিরে আসারও তেমন কোন আমন্ত্রণ তিনি পাননি। বিশেষ করে যে পাঞ্জাবের রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন সেখানকার কেউ তাকে মনে রাখেনি।

ইউনিয়নিস্ট রাজনীতিবিদরা তখন মুসলিম লীগে জড়ো হয়েছেন। তারাও ইউসুফ আলীকে স্মরণ করেনি। এই মহান বুদ্ধিজীবীর শেষ জীবন কাটে নিদারুণ অবহেলা, উপেক্ষা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে। ইউসুফ আলীর মৃত্যুকালীন দুর্দশা ও পেরেশানির কথা লিখেছেন তার একমাত্র জীবনীকার এম এ শরীফ ঃ

The winter of 1953 was a harsh one in Britain. On Wednesday 9 December, a confused old man was found out of doors sitting on the steps of a house in Westminster. The police took him Westminster Hospital. He was discharged the following day and a London country council home for the elderly in Dove house street, chelsea, took him in. He suffered a heart attack on 10 December and was rushed to st stephen's Hospital in Fulham. Three hours after admission he died. Unusually, there were no relatives to claim the body and arrange for the funeral. However, the deceased was known to the Pakistan High Commission and as soon as the coroner for the county of London, had

www.pathagar.com

completed the inquest, an Islamic burial was arranged in the Muslim section of Brookwood cemetery, Surrey. So in these enigmatic circumastances, ended the remarkable life of Abdullah Yusuf Ali, at the age of 81.[৮]

মুসলিম সমাজ তার চিন্তানায়ক ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে কি নির্মম হতে পারে ইউসুফ আলীর অন্তিম মুহূর্ত তারই গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। যারা এখনও মুসলিম সমাজকে নিয়ে ভাবেন, ইউসুফ আলীর ট্র্যাজেডি তাদের চিন্তার স্রোতে ছেদ টেনে দেবে এবং মুসলিম সমাজের মৌলিক ইস্যুগুলোকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করবে আশা করি।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. M A Sherif, Searching for Solace : A Biography of Abdullah Yusuf Ali : Interpreter of the Quran. Islamabad : Islamic Research Institute, 2000.
২. The Holy Qur'an – text, translation and commentry, third edition (1938), Note 3107.
৩. প্রাগুক্ত, note 1412
৪. প্রাগুক্ত, Appendix vii, 'who was Zul-qarnain?'
৫. প্রাগুক্ত, note 3993, 4573
৬. প্রাগুক্ত, note 3604
৭. Quoted in M A Sherif, Searching for Solace.
৮. M A Sherif, Searching for Solace.

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল

এক

মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল পবিত্র কুরআন শরীফের তরজমা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কৃত The Meaning of the Glorious Koran তরজমা হিসেবে যেমন সুখদ ও সুপাঠ্য তেমনি এক হিসেবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্যও বটে। এই প্রথম ইংরেজিতে এমন একজন মুসলমানের হাতে কুরআনের তরজমা সম্পন্ন হলো যার মাতৃভাষা ইংরেজি এবং সঙ্গত কারণেই এ তরজমা দুনিয়া জুড়ে ইংরেজি ভাষা-ভাষী পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে বন্দিত হয়েছে।

মারমাডিউক পিকথল ছিলেন এক হিসেবে সৃষ্টিশীল কর্মী। তার জীবনব্যাপী সাধনা ও সৃষ্টিশীলতার আলোয় তিনি ইসলামের জাগরণ ও অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকে ফলবতী করতে চেয়েছেন। বস্তুত একজন মুমীনের শুদ্ধতা, নিষ্ঠতা ও লক্ষ্যের প্রতি আত্মসমর্পিত চিত্ততার গুণ তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকতো। বিশ্বাসী হৃদয়ের এই উত্তাপ যে কেউ তার সংস্পর্শে আসতো সেই অনুভব করতে পারতো। তার প্রথম অমুসলিম জীবনীকার আন ফ্রিম্যান্টেল (Anne Freemantle) তার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে লিখেছেন যদি তিনি অন্যকোন ধর্মও গ্রহণ করতেন তবে তার এই বিশ্বাসী চরিত্রের কোন ব্যত্যয় ঘটতো না।

...... had he changed from evangelical or even from high church Anglicanism to the Roman faith, doubtless the machinery of sanctification would have by now been set to work.[১]

তার মৃত্যুর পর তার ত্যাগশীলতার কথা প্রকাশিত হয়; তিনি কিভাবে বিপুল পরিমাণ লোভনীয় ও বৈষয়িক সুবিধাকে প্রত্যাখ্যান করে তার দৃষ্টিতে তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হায়দারাবাদের একটি মুসলিম স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরি নেন। জীবদ্দশায় তিনি তার প্রিয় উসমানী খেলাফতের পতনকে পর্যবেক্ষণ করেন যা তাকে মর্মাহত করে এবং তিনি এর প্রতিকারের কথাও ভাবেন। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সিদ্ধান্তকে ন্যায়ানুগ হিসেবেই মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন আজকের দিনের অন্যায় বিশ্ব ব্যবস্থার ভিতরকার চরিত্র পাল্টিয়ে ইসলামের বিজয় সূচিত হবে।

দুই

মারমাডিউক পিকথলের ধমনীতে ছিল অভিজাত রক্ত। কিন্তু তা কখনো তার বিনয় ও চরিত্র মাধুর্যের জন্য হানি হয়ে ওঠেনি। তার এক পূর্বপুরুষ স্যার রজার ডি পকেয়কটু ছিলেন রাজা উইলিয়ামের সময়কার নাইট। পিকথলের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৫ সালে ইংল্যান্ডের সাফকের (suffolk) এক গ্রামীণ পরিবেশে। তার পিতা চার্লস ছিলেন

www.pathagar.com

একজন এ্যাংলিকান ধর্মযাজক, যিনি পুত্রের জন্মের পাঁচ বছর পর মারা যান। পিকথলের মা মেরী ও ব্রায়েন ছিলেন আইরিশ ও সুবিখ্যাত এ্যাডমিরাল ডোনাট হেনরী ও ব্রায়ানের কন্যা, যিনি নেপোলিয়নের সাথে ট্রাফালগার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সাফকের গ্রামীণ শান্ত পরিবেশ ছেড়ে এই পরিবারটি লন্ডনের এক ছন্দহীন একঘেয়ে বাড়িতে এসে জায়গা নেয় যা শিশু পিকথলের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এই জন্যই দেখি পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার মধ্যে পিকথল এক ধরনের স্বাধীনতার আনন্দ খুঁজে পান। যা বোধ হয় তার শৈশবের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। বিখ্যাত স্কুল হ্যারোতে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানকার বাধাধরা নিয়মের সাথেও তিনি পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে পারেননি যার ছাপ তার পরবর্তীকালের উপন্যাস Sir Limpidus এ দেখতে পাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধুরাই ছিল তার আনন্দের একমাত্র উৎস। তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ইংল্যান্ডের পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল।

অচিরেই পিকথল হ্যারো ত্যাগ করেন এবং কিছু যুবকসুলভ কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন। জুরাতে তিনি তার প্রিয় পর্বতারোহণে (mountaineering) দক্ষতা অর্জন করেন এবং ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডে ওয়েলশ ও গেলিক ভাষা আয়ত্ত করেন। ভাষার উপর তার এতটা দক্ষতা জন্মে যে তার শিক্ষক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটা চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে উৎসাহ দেন, যদিও পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন। উল্টো তিনি মরিয়েল স্মিথ নামে এক তরুণীর সাথে এসময় প্রেমে জড়িয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে তাকে বিয়ে করেন। এরপর ফিলিস্তিনের কনসুলার অফিসে চাকরী পাওয়ার জন্য যথেষ্ট আরবী শেখা হয়েছে এই ভাবনায় তিনি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে পোর্ট সাঈদের জাহাজে উঠে পড়েন। তখন পিকথলের বয়স মাত্র আঠারো। প্রাচ্যের জীবন ও সমাজের প্রতি বরাবর তিনি এক ধরনের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছেন। পশ্চিমের জড়বাদী ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধাবঞ্চিত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে সহজ সরল প্রকৃতি সংলগ্ন এই রকম জীবন ধারার মধ্যে তিনি অন্যরকম অর্থ খুঁজে পান। তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা এভাবে লিখেছেন ঃ

When I read the Arabian Nights I see the daily life of Damascus, Jerusalem, Aleppo, Cairo, and the other cities as I found it in the early nineties of last century. What struck me, even in its decay and poverty, was the joyousness of that life compared with anything that I had seen in Europe. The people seemed quite independent of our cares of life, our anxious clutching after wealth, our fear of death.[২]

পিকথলের এই বর্ণনার সাথে পরবর্তীকালের আর এক পর্যটক লিউপোল্ড উইস আসাদের বর্ণনার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। এরা দুজন শুধু মধ্যপ্রাচ্য সফর করেননি, মধ্যপ্রাচ্যের আত্মাকেও আবিষ্কার করেছেন।

জাহাজে অবস্থানকালেই পিকথল এক খোজার কাছ থেকে ভাল করে আরবী শেখেন এবং সাবলীল ভঙ্গিতে আরবীতে কথা বলতেও আরম্ভ করেন। জাহাজ জাফায় পৌঁছলে স্থানীয় ইউরোপিয়ান ও মিশনারীদের অবাক করে দিয়ে তিনি এখানকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন এবং ফিলিস্তিনী জনগণের সাথে মিশে যান। আরব জগতে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ ও সুখদ অনুভূতির কথা পিকথল তার সফরনামা Oriental Encounters এ বিবৃত করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি এখানে এমন এক স্বাধীনতার আস্বাদ পান যার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন রাষ্ট্রপূজার আবহে বড় হয়ে ওঠা পাশ্চাত্যের কোন স্কুলছাত্রের পক্ষে তা বোঝা অকল্পনীয়। তার মতে অধিকাংশ ফিলিস্তিনীরাই সরকারী পুলিশের দিকে তাকায় না এবং যুগের পর যুগ সরকারের সাথে কোন সম্পর্ক ছাড়াই তারা জীবন চালিয়ে যায়। স্থানীয় আলেম ও কাজীদের দ্বারাই চলে ইসলামী আইনের ধারাবাহিকতা। গ্রামবাসী তাদের নেতা নির্বাচিত করে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায় এবং বেদুইন কবিলাগুলোও এই ধারা অনুসরণ করে। সাধারণ জনগণ সুদূর ইস্তাম্বুলে অবস্থানরত খলিফাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এও বিশ্বাস করে তাদের জীবনধারায় হাত দেয়া খলিফার কাজ নয়।

এই রকম স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তির আবহ পিকথলকে এমন এক অভিযাত্রার দিকে টেনে নিয়ে যায় যা তাকে কালক্রমে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিম দুনিয়ার পশ্চিমীকরণকে তাই পিকথল মনে করেন এখানকার চিরাচরিত স্বাধীনতার উপর বড় রকমের হুমকি। তার মতে পশ্চিমের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আদর্শবাদ, আমলাতন্ত্র, গোপন পুলিশ সবকিছু এখন এই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে উদ্যত। মুসলিম হিসেবে এই এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা তার কখনো মনঃপুত হয়নি।

আজীবন পিকথল ইসলামকে দেখেছেন মুক্তি ও স্বাধীনতার সমার্থক হিসেবে। এই স্বাধীনতা যেমন রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা থেকে, তেমনি আত্মস্বার্থপরায়ণতা থেকে। এই স্বাধীনতা ধর্মান্ধতা ও গোত্রপরায়ণতার হাত থেকেও। উসমানী খলিফাদের ফিলিস্তিনে প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল। যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনা নিয়ে বেশী তৎপর থাকতো। পিকথল মনে করতেন এই পবিত্র ভূমিতে প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টান ধর্মীয় দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত, যা তার কাছে বাস্তব কারণে অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগতো। মুসলিম ও খ্রিস্টান জেরুজালেমের ভিতরকার তফাৎ তিনি এভাবে করেছেন ঃ

... Christian Jerusalem was a maze of rival shrines and liturgies, where punches were frequently thrown in churches, while the Jerusalem of Islam was gloriously united under the Dome, the physical crown of the city, and of her complex history.[৩]

এরপরে পিকথল দামাস্কাস শহরে আসেন, যেটিকে তিনি ছোট গলি, গোলাপকুঞ্জ ও আখরোট গাছের শান্ত শহর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার পরিব্রাজক জীবনের এই গভীর স্বস্তির দিনগুলোতে তিনি আরবী ব্যাকরণের গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি কবিতা ও ইতিহাস পড়েন এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বাধামুক্তভাবে কুরআন শরীফের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। প্রথমে কৌতূহল নিয়েই শুরু করেন, পরে তার কাছে মনে হতে থাকে তিনি তার ভিতরকার লুকিয়ে থাকা মানুষটির গোপন ধর্মীয় জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে শুরু করেছেন। পিকথলের জীবনের এই ধরনের ধর্মজিজ্ঞাসার সূত্র খুঁজতে হলে তার চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বিলাতের ডিগারস আন্দোলন ও খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রের পুরোধা জেরারড উইনস্ট্যানলি ও থমাস ট্রাহিরিন প্রমুখের প্রচারিত শক্তিশালী রাষ্ট্র ও যাজকতন্ত্রের বাইরে প্রাকৃতিক আধ্যাত্মবাদ (Nature-Mysticism) এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (Personal Freedom) ধারণাগুলো কিছুটা বোঝা দরকার। ডিগাররা ছিল খ্রিস্টান প্রোটেসট্যান্টবাদের সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ, যারা সামাজিক বৈষম্যহীনতা ও শ্রমের মর্যাদার এক তত্ত্ব তুলে ধরে খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রের গোড়া পত্তন করে। এই তত্ত্বের

www.pathagar.com

আলোকে ডিগাররা ১৬৪৯ সালে কিছু পতিত জমি নিজেদের দখলে নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে। মূল খ্রিস্টান ধর্মে ডিগারদের এই ভিন্নমতের কোন সুযোগ ছিল না, পিকথল দামেস্কে বসে খেয়াল করেন ডিগারদের এই নীতি আসলে ইসলামী শরিয়ায় বর্ণিত 'ইয়াহিয়া আল মাওয়াতের' নীতির মধ্যে বিধৃত হয়েছে যেখানে নাকি পতিত জমি আবাদকারীকে জমির মালিকানার বৈধতা দেয়া হয়েছে। ডিগাররা ঠিক প্রচলিত ধর্মীয় আনুগত্যে বিশ্বাস করতো না বরং শ্রমের মর্যাদা ভিত্তিক পারস্পরিক সম্প্রীতি চেতনায় বিশ্বাসী ছিল।

অচিরেই পিকথলের কাছে পরিষ্কার হয় ডিগারদের ভিন্নমত যা তাদেরকে মূল খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাসের বাইরে নিয়ে এসেছিল এবং তাদের প্রকৃতির সাথে ঐকাত্মের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝা ও জানার ব্যাপারটা আসলে ইসলামের বাণীর খুব কাছাকাছি। এটা ছিল একরকম ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে স্বচালিত, স্বশাসিত একটা সম্প্রদায় যারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত দিতে পারতো ও প্রতিনিধি নির্বাচন করতো। কোয়াকারদের মত ডিগারদের নেতা উইনস্ট্যানলিও ইতালির সন্ন্যাসী ফিসিনো, ব্রুনো ও ক্যাম্পানেলার মাধ্যমে অনেক ইসলামী মূল্যবোধ আত্মস্থ করেছিলেন। ডিগারদের আর একটা নীতি পিকথলকে আকর্ষণ করেছিল, তা হচ্ছে এর সমবায়ী আদর্শবাদ (Communitarian Optimism)। সিরিয়ায় বসে তিনি যে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ছবি দেখেছিলেন, শিয়া-সুন্নীতে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ধর্মস্থানে সবরকমের সামাজিক বৈষম্যহীনতা এ আসলে ক্রমওয়েলের সময়কার এই ইংরেজ বিপ্লবীদের মনের কথাই ছিল। এই মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ধারণা পরবর্তীকালে পিকথলের লেখালেখিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এবং এটি তিনি প্রচারও করেছেন। ডিগারদের সমতাবাদী চিন্তার উপর ইসলমের প্রভাব ও সাদৃশ্য দেখে তিনি এর সাথে নৈকট্য অনুভব করেন। দামেস্কে এসে পিকথলের কাছে তাই মনে হয় এ যেন তার স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন। ঠিক যেমন মোহাম্মদ আসাদ আরও পরে মক্কায় আসাকে বলেছিলেন Home coming। ফিলিস্তিন, সিরিয়ায় ঘোরাঘুরির ভিতর দিয়ে পিকথল এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যটনও করেন। শেষ পর্যন্ত তার কাছে ইসলামকেই মনে হয় সংস্কারমুক্ত, যুক্তিধর্মী, ন্যায়ানুগ ধর্মের বিলাতী স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন হিসেবে। এ কারণেই ১৯৩০ সালে New Statesman পত্রিকা তার কুরআন শরীফের তরজমার আলোচনা করতে যেয়ে লিখেছিল ঃ

Mr. Marmaduke Pickthall was always a great lover of Islam. When he became a Muslim it was regarded less as conversion than as self-discovery.[8]

মোহাম্মদ আসাদের মক্কার পথের মতো এ হচ্ছে পিকথলের দামেস্কের পথ, যেখানে ধীরে ধীরে তার ভিতরকার মানুষের নবজন্ম ঘটছে, যদিও তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো বেশ কিছুদিন। এই অপেক্ষার কারণ হিসেবে অনেকে বলেছেন বৃদ্ধ মায়ের অনুভূতি সম্পর্কে পিকথলের আশঙ্কা ও তার নিজের খ্রিস্টীয় সংস্কার। যদিও পিকথল নিজেই সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

The man who did not become a Muslim when he was nineteen years old because he was afraid that it would break his mother's heart does not exist, I am sorry to say. The sad fact is that he was anxious to

www.pathagar.com

become a Muslim, forgetting all about his mother. It was his Muslim teacher-the Sheykh-ul-Ulema of the great mosque at Damascus a noble and benign old man, to whom he one day mentioned his desire to become a Muslim, who reminded him of his duty to his mother and forbade him to profess Islam until he had consulted her. 'No, my so,' were his words, 'wait untill you are older, and have seen again your native land. You are alone among us as our boys are alone among the christians. God knows how I should feel if any Christian teacher dealt with a son of mine otherwise than as I now deal with you' [---] If he had become a Muslim at that time he would pretty certainly have repented it-quite apart from the unhappiness he would have caused his mother, which would have made him unhappy because he had not thought and learnt enough about religion to be certain of his faith. It was only the romance and pageant of the East which then attracted him. He became a Muslim in real earnest twenty years after.[৫]
তখনকার মত পিকথল ইসলাম ছাড়াই দামেস্ক ত্যাগ করেন। তার জন্য তার পুরো পরিবার ও হবু স্ত্রী মরিয়েল অপেক্ষা করছিল। বৃটেনে ফিরে আসার পর কিন্তু পিছনের দিনগুলো নিয়ে তিনি তার রোমন্থন অব্যাহত রাখেন। পিছনের প্রতিটি পদক্ষেপের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেন। তার কাছে মনে হয় সেই দিনগুলো ছেড়ে আসার মানে হলো সবধরনের সৌজন্য ও প্রশান্তিকে ফেলে আসা। মুসলমানদের তখনকার মত তার মনে হয় দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ যারা ভয়ানক বিপদের মধ্যেও কোন অভিযোগ করে না। খ্রিস্টানদের তারা একসময় আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। পিকথল বিস্মিত হয়েছেন যে অটোম্যান বলকানে সুলতানরা প্রতিদ্বন্দ্বী চার্চের যুদ্ধে আক্রান্ত খ্রিস্টানদের আশ্রয় দিয়েছে, সেখানেই পরবর্তীকালে সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালানো হয়েছে। গ্রীসে মুসলমান অধিবাসীদের অধিকাংশকে খ্রিস্টান যাজক ও কৃষকরা জবাই করেছে। অটোম্যান ইউরোপের অন্যত্রও একই ভাগ্য ঘটেছে। পিকথল লিখেছেন তারপরেও তারা হাসছে। এটা বোধ হয় রিদার ফসল।

তিন

লন্ডনে ফিরে ১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বরে পিকথল মরিয়েলকে বিয়ে করেন। বিয়ের আগের দিন এই দম্পতি চার্চের নিয়ম মেনে উপবাস করেন। বিয়ের পর তারা যান জেনেভায়। জেনেভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লেক, পর্বত, সূর্যাস্ত, মুখ ঢাকা রমণীর মত কুয়াশাচ্ছন্ন শহর পিকথলের ভিতরকার ঔপন্যাসিক হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতির কাছাকাছি এসে এখানে তিনি বরং এক ধরনের নশ্বরতা, অস্তিত্বহীনতার বোধে আক্রান্ত হন। মানুষের ক্ষণিক অস্তিত্বের এই ধারণা তার উপন্যাসগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে ইসলামের দিকেও তাকে টেনেছে। তার এ সময়কার লেখালেখি তার সমসাময়িক দুই নও মুসলিম চিত্র শিল্পী Ivan Agneli এবং Etienne Dinet এর চিত্রকর্মের অনুভূতির সাথে

www.pathagar.com

তুলনীয়। Agneli এক কুয়াশাচ্ছন্ন সময়হীনতার বোধ প্রকাশ করেছেন এবং Dinet এর আলজেরীয় ও মক্কা পেন্টিংসগুলো সেই ধরনের মুসলিম মুডকে আত্মস্থ করেছে যার মানে হলো আল্লাহ আমাদের প্রতিদিনের আনন্দের সাথে মিশে আছেন। পিকথলের উপন্যাসগুলো এই দুটো স্টাইলকেই ধারণ করেছে যেমন করে তিনি এসময় একই সাথে ইসলামী নীতি ও বিশ্বাসকে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ভিতরে খুঁজে ফিরছিলেন। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম All Fools যার মধ্যে তার কাঁচা বয়সের ছাপ পরিস্ফুট। আরব জীবন নিয়ে লেখা তার দ্বিতীয় উপন্যাস Said the Fisherman এ এক পরিণত ঔপন্যাসিকের ছাপ দেখি আমরা। এই উপন্যাস পড়ে সুবিখ্যাত H. G. Wells তাকে অভিনন্দন জানান। আরবী জীবন নিয়ে লেখা তার অপর উপন্যাসের নাম Veiled Women। তার অন্য উপন্যাসগুলোর একটি হচ্ছে Enid, সাফকের স্মৃতি নিয়ে লেখা এবং The House of Islam, মায়ের মৃত্যুশয্যায় বসে রচিত।

১৯০৭ সালে পিকথল প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা ফাহমীর উপদেষ্টার স্ত্রীর আমন্ত্রণে মিশর সফর করেন। তিনি সেখানকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক আবার গায়ে জড়ান এবং আরব জীবনের সাথে পুরোপুরি মিশে যান। এর ফল হিসেবে তার কাছ থেকে কয়েকটি ছোট গল্প ও উপন্যাস Children of the Nile বেরিয়ে আসে।

১৯০৮ সালে শুরু হয় মহাযুদ্ধের তান্ডব। সেই যুদ্ধে পিকথল তুর্কীদের পক্ষ নেন। বিশেষ করে তুরস্ক নিয়ন্ত্রিত ইউরোপের বলকান অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের পরিচালিত গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান এবং এ গণহত্যার সময় ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতা ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি ক্রুসেডের পুনর্জীবন হিসেবে দেখতে থাকেন। ইউরোপীয় নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

.... blood sucking French Banks, Gladstonian Christian Islamophobia, and a vicious pan-slavism...[৬]

তুর্কী খেলাফতের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ছিলেন মর্মাহত। একদিকে তখন তিনি খেলাফতের পক্ষে বৃটেনে বসে প্রচারণা শুরু করেন অন্যদিকে উপন্যাস লেখাও চালিয়ে যান সমানতালে। এ সময় লেখা তার উপন্যাসের নাম Lark meadow যা ১৯১১ সালে প্রকাশ পায়। বিশেষ করে এ সময় তিনি বিখ্যাত নিউ এজ পত্রিকায় লেখা শুরু করেন যার সাথে বার্নার্ড শ, এজরা পাউন্ড, ডি.এইচ. লরেন্স ও জি. কে চেস্টারটনের মত সাহিত্যিক প্রতিভারা যুক্ত ছিলেন।

যুদ্ধের ডামাডোলের ভিতরেই তিনি ইস্তাম্বুল সফর করেন এবং সেখান থেকে তিনি তার উপন্যাস With the Turk in Wartime ও Early Hours এর মালমশলা সংগ্রহ করেন।

যুদ্ধ ইউরোপের নীতি-নৈতিকতাকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে পিকথল খুজে পান নতুন ভাবনার খোরাক। তিনি দেখেন মানুষের অবাধ স্বাধীনতার গর্ব যা একদিন ইউরোপের মাটিতে বিকশিত হয়েছিল তা এখন এক ভয়ংকর জীবননাশা ও আত্মনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থা থেকে আল্লাহই কেবল উদ্ধার করতে পারেন আমাদের। ১৯১৪ সালের ২৯ নভেম্বর ইসলাম ও প্রগতি বিষয়ক এক বক্তৃতা দেবার সময় তিনি তার জীবনের ভবিষ্যৎ গতি ও যাত্রাপথ নির্ধারণ করে ফেলেন এবং

www.pathagar.com

১৯১৭ সালে এসে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অচিরেই তার স্ত্রী মরিয়েল তাকে অনুসরণ করেন। এভাবে তার পিতৃপ্রদত্ত নাম উইলিয়াম পিকথলের স্থলে মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল জায়গা করে নেয়।
পিকথলের ইসলাম কবুলের সময়টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে তুরস্কের অবস্থা তখন টলটলায়মান। খেলাফতের ভবিষ্যৎও একরকম অনিশ্চিত। পুরো মুসলিম দুনিয়ায় তখন পাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোটের উপর এ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের এক সংকটাপন্ন দিন। এরকম অবস্থায় পিকথল নিশ্চয় ইসলামের জাগতিক সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কথা বিবেচনা করে নয় বরং এর অভ্যন্তরীণ মর্ম ও সৌন্দর্যের কথাটাই বিবেচনা করেছিলেন বেশি করে যার ছবি তিনি ইতোপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের অন্তরে-শরীরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
ইউরোপীয়রা যখন একে অন্যের গলায় ছুরি শানিয়ে চলেছে এবং অন্যকেও সেই কাজে পুরোদমে উৎসাহ দিচ্ছে তখন পিকথল একজন ইউরোপীয় মুসলিম হিসেবে নিজের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ইসলাম কবুলের পর পিকথল স্বযোগ্যতায়ই রাতারাতি বৃটেনের বিকাশমান মুসলিম জনগোষ্ঠীটির নেতৃপদ লাভ করেন এবং তাদের স্বার্থের পক্ষ নিয়ে লড়াই শুরু করেন।
পিকথল ১৯১৯ থেকে বিখ্যাত ওকিং মসজিদে খুতবা দিতে শুরু করেন। এই খুতবার কিছু অংশ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে অনেকেরই তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এছাড়া লন্ডনভিত্তিক ইসলামী তথ্যব্যুরোর একজন হয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সাপ্তাহিক প্রকাশনা মুসলিম আউটলুক তখন নিয়মিত ভাবে যুদ্ধে তুরস্কের পক্ষে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। আউটলুক পত্রিকাটা খেলাফত ভক্ত মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে চলতো। ১৯২০ সালে প্রখ্যাত খেলাফত ও প্যান ইসলামী নেতা কমরেড সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আলী লন্ডনে এলে পিকথল তার জন্য উষ্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করেন। মূলত এ সময় থেকেই ভারতে পিকথলের একদল অনুগ্রাহীর সৃষ্টি হয় এবং সেই সূত্রে একই বছর (১৯২০) তিনি খেলাফত সমর্থক বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার সম্পাদনার আমন্ত্রণ পান। এভাবে ভারত তার জীবনের পরবর্তী ১৫টি বছরের জন্য একান্ত আবাসভূমি হিসেবে নির্ধারিত হয়। বোম্বে বন্দরে মুসলমানরা বিশেষ করে খেলাফত কর্মীরা তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানায়। মুসলমানরা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাকে বক্তৃতা বিশেষ করে জুমার খুতবা দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। ভারতের মুসলমানদের কথা ভেবে আরো বিশেষ করে তাদের ভাষা ও তমুদ্দুনের কথা চিন্তা করে তিনি তাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (Lingua Franca) উর্দু ভাষা আয়ত্ত করতে শুরু করেন। এইভাবে পিকথল ভারতীয় মুসলমানদের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে দ্রুত মিশে যান। পিকথল বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার দায়িত্ব নেয়ার পর এর প্রশাসনিক অবস্থার উন্নতি হয়, কাটতি বাড়ে, বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে পত্রিকাটির বলিষ্ঠ ভূমিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি খেলাফত প্রেমিক পিকথল মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর যৌথ নেতৃত্বে চালিত অহিংসা ও খেলাফত আন্দোলনের কর্মসূচিতে জড়িয়ে পড়েন। খেলাফত আন্দোলনের সূত্রেই অচিরেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে চলে আসেন। এইভাবে একজন বিলাতী সাহেব উর্দুতে পারদর্শী, মাথায় তুর্কী টুপি পরিহিত ভারতীয়

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী নেতায় পরিণত হন। পিকথল সে সময়কার অভিজ্ঞতার কথা এভাবে এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন ঃ

They expect me to be a sort of political leader as well as a newspaper editor. I have grown quite used to haranguing multitudes of anything from 5 to 30000 people in the open air, although I hate it still as much as ever and inwardly am just as miserably shy.[৭]

১৯২৪ সালে বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকাটির স্বাধীন চেতা ভূমিকার জন্য ব্রিটিশ সরকার এটির উপর শক্ত জরিমানা আরোপ করে। ফলে পিকথল পত্রিকাটি থেকে পদত্যাগ করেন। এ বছর কামাল আতাতুর্কের খেলাফত উচ্ছেদের ঘোষণার পর তার প্রিয় খেলাফত আন্দোলনও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পিকথল সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। যদিও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর কাছে পাঠানো বার্তায় মহাত্মা গান্ধী স্মরণ করেছেন এভাবে ঃ

Your husband and I met often enough to grow to love each other and I found Mr. Pickthall a most amiable and deeply religious man. And although he was a convert he had nothing of the fanatic in him that most converts, no matter to what faith they are converted, betray in their speech and act. Mr. Pickthall seemed to me to live his faith unobtrusively.[৮]

চার

পত্রিকার চাকরি চলে যাওয়ার পর পিকথল মোটেই হতোদ্যম হননি, বরং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটি নিযামের হায়দারাবাদে কাজ করবার জন্য এবার আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯২৫ সালে তিনি এখানে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি নিয়ে আসেন। পিকথলের মেধা ও মননের পরিপূর্ণ বিকাশে হায়দারাবাদের অবদান অনস্বীকার্য। এই অক্লান্ত জীবন সাধকের কর্মষনা এখানে আত্মউন্মেষের পথ খুঁজে পায়। পিকথল তার কর্মমূখর জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ কাটিয়েছেন দক্ষিণাত্যের এই হায়দারাবাদ রাজ্যে। সেকালে হায়দারাবাদ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে একটি দেশীয় রাজ্য। এর শাসক ছিলেন মীর উসমান আলী খান। যিনি হায়দারাবাদের নিযাম হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। একনায়ক হলেও উসমান ছিলেন উদার শাসক। যিনি হিন্দুপ্রধান এক রাজ্যের প্রধান হয়েও সকল প্রজার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কুড়াতে পেরেছিলেন। পিকথল নিযামের এই শাসন কুশলতার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন ইসলামের সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির রাজনীতির চমৎকার উদাহরণ।

নিযাম নিজে উর্দু ও ফারসী ভাষায় সুন্দর কবিতা লিখতেন। সংস্কৃতি মনস্ক এই শাসকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় হায়দারাবাদকে কেন্দ্র করে মুসলিম বুদ্ধিবাদের জগতে সেদিন এক বড় ধরনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে দিল্লী ও লাক্ষ্ণৌর পতনের পর হায়দারাবাদই হয়ে উঠেছিল সেদিন মুসলিম সংস্কৃতির যথার্থ রাজধানী। সেকালে নিযামের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হতো Islamic Culture

www.pathagar.com

নামে একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। মুসলিম সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সেদিনের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এ পত্রিকায় আলোচনা করতেন। বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত ও সমন্বিত করা এ পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিযামের বিশেষ উৎসাহে ১৯২৭ সালে মারমাডিউক পিকথল এ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় ১০ বছর তিনি এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এভাবেই এ পত্রিকা তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের দিকে অগ্রসর হয়।

Islamic Culture পত্রিকার সাথে আরো দুজন বুদ্ধিজীবী যুক্ত হয়েছিলেন যারা পরবর্তীকালে ইসলামী সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবাদের দিকটি বিশ্বব্যাপী তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরা হচ্ছেন ডঃ মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ ও মোহাম্মদ আসাদ। এরা আবার উভয়েই কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীরকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রথমজন ফরাসী ভাষায় এবং দ্বিতীয়জন ইংরেজিতে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ও পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি পিকথল হায়দারাবাদের সরকারি কর্মচারীদের আইন কানুন শেখানোর একটি স্কুলও চালাতেন। এরকম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তার জাত ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি হারাননি। তিনি মোগল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে ১৯২৬-এ তার শেষ উপন্যাস লেখেন Dust and the Peacock Throne। পরবর্তী বছর মাদ্রাজের কমিটি অফ মুসলিমস পিকথলকে ইসলামের সাংস্কৃতিক চিন্তার উপর ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এ বক্তৃতাগুলোই পরবর্তীকালে Cultural Side of Islam নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এসব বক্তৃতা পিকথলের জীবনব্যাপী ইসলাম অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সারাৎসার। এখানে পিকথল ইসলামী সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র দেয়ার চেষ্টা যেমন করেছেন তেমনি মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান ও পতনের কারণগুলো খুঁজে ও বুঝে দেখতেও প্রয়াস পেয়েছেন। পিকথল জোর দিয়ে বলেছেন ইসলামের মত শক্ত একেশ্বরবাদী (monothiestic) ধর্ম আর একটাও নেই। তেমনি তৌহীদকে কেন্দ্র করে ইসলাম যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তার নজিরও বিরল। ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদ হচ্ছে এ সংস্কৃতির শক্তির উৎস। রসুল (স.)-এর শিক্ষার বদৌলতে এবং এই শক্তিকে পুঁজি করে সেকালে আরবের যুদ্ধমান ও কলহরত গোত্রগুলো একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছিল। এই সীসা ঢালা ঐক্য এবং ইসলামের সরলতার শিক্ষাই মুসলিম সংস্কৃতিকে একদিন বিশ্বজনীন ও পরাক্রমশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। পিকথল লক্ষ্য করেন মুসলিম সংস্কৃতির এই ধারা রসুল (স.) পরবর্তী পুণ্য খলিফা চতুষ্টয় ও উমাইয়া খেলাফতের সময় পর্যন্ত টিকে ছিল। আব্বাসীয় খেলাফতের সময় ইরানী প্রভাবের ফলে মুসলিম জীবনে ভোগবিলাস ও আত্মঅহং-এর প্রবেশ ঘটে এবং এই ভোগ ও বস্তুতান্ত্রিকতার অব্যবহিত পরিণতি হিসেবে মুসলিম সমাজের সংহতি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। পূর্বেকার সরলতা ও অটল বিশ্বাসের জায়গায় স্থান নেয় দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও অবিশ্বাস।

পিকথল তাই আক্ষেপ করে বলেন ঃ The conduct and condition of the Muslims now is a very bad advertisement for the teaching of Islam.[৯] তার মানে মুসলমানের জীবনে ইসলামের অনুশীলন নেই, ইসলামের প্রভাবও

www.pathagar.com

মাত্রাতিরিক্তভাবে হ্রাস পেয়েছে। পিকথল চিহ্নিত করেছেন এর একটা অসুবিধা হচ্ছে যারা মুসলমান নয় তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। কারণ তাদের ধারণা হবে ইসলামই বোধ হয় একালের মুসলমানদের অধঃপতন ও পরাজয়ের জন্য দায়ী। পিকথল জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলামের উপরে এ অপবাদ আরোপ করা এক ধরনের অবিচার। তেমনি আজকের খ্রিস্টান জগতের বৈষয়িক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির জন্য খ্রিস্টধর্মের অবদান ভাবাটাও এক ধরনের ভুল। মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবটাই ছিল চূড়ান্ত। যাজকতন্ত্রের দাপটে বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার কথা সেদিন ভাবাই যেত না। ইউরোপের সে যুগকে বলা হতো অন্ধকার যুগ। অন্যদিকে ইসলামের সমৃদ্ধির দিনগুলোতে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল, যাজকতন্ত্রের বালাই ছিল না। একই কারণে ইসলাম অনুসারীরা বিশ্বজুড়ে গৌরবময় স্থান অধিকার করে বসেছিল। এটা স্পষ্ট ইসলাম থেকে সরে যাওয়ার কারণেই এ কালে মুসলমানদের এ পরাজয় সূচিত হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বললে কুরআনের ভাষায় মুসলমানরা এখন আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুকে প্রভু হিসেবে বরণ করে নিচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না হাল জামানার জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, বস্তুবাদ, গণতন্ত্র প্রভৃতি নতুন নতুন প্রভু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এর পরিণতিতে এক ধরনের বিশ্বাসের সংকট মুসলিম সমাজে দানা বেঁধে উঠেছে। এই সংকটের সাথে পিকথল লক্ষ্য করেছেন মুসলমানরা শরীয়াহর একটা অংশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যা কিনা শিক্ষা, জ্ঞানান্বেষণ, বুদ্ধি ও বিবেচনার শক্তিকে উৎসাহিত করেছে এবং খোদার সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণার আহ্বান জানিয়েছে। মুসলিম দুনিয়ায় এখন চলছে এক সার্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তা। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্থান নেই বললেই চলে। এসব কিছুই শরীয়াহর নীতির পরিপন্থী।

পিকথল মুসলিম সমাজের এই দুর্বিষহ অবস্থাগুলোকে এক এক করে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন এবং যা বলতে চেয়েছেন তা হলো মুসলিম সমাজের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য একমাত্র মুসলমানরাই দায়ী এবং তাদেরকে তাদের গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে ইসলামের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

পিকথলের ষষ্ঠ বক্তৃতার শিরোনাম হচ্ছে The Charge of Fatalism। এ বক্তৃতায় বিশেষ করে তিনি মুসলমানদের দুর্দশার জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। এ হচ্ছে জিহাদ। খ্রিস্টান ইউরোপের প্রমাদপূর্ণ প্রচারণায় জিহাদ বলতে এখন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মতো অবস্থাকেই বুঝায় এবং মুসলমানরাও একালে জিহাদ বলতে সেরকম একটা ব্যাখ্যাকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আসল অবস্থা কি? জিহাদ মানে হচ্ছে প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা আত্মউন্মেষ ও আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা, সার্বিক কল্যাণ অর্জনের প্রচেষ্টাও বটে। রসুল (স.) বলেছেন নিজের কামনার বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ।

পিকথল বলেছেন এ ধরনের জিহাদের কোন আগ্রহ কি মুসলমানদের মধ্যে আজ অবশিষ্ট আছে? যেহেতু মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের চেতনা একেবারে নেই বললেই চলে আর থাকলেও নানা রকম অপব্যাখ্যার জটাজালে জিহাদ তার মৌলিক আবেদন একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। সে কারণেই মুসলমানরা আজ অবলীলায় তাদের উপর আরোপিত দুর্দশাগুলোকে নীরবে হজম করে চলেছে। মুসলিম সমাজের ভিতরে জিহাদের চেতনা উজ্জীবিত না হলে পিকথল মনে করেন দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও অশিক্ষা এসবের অভিশাপ

www.pathagar.com

থেকে মুসলমানরা মুক্তি পাবে না। কারণ এসবের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আজকে সর্বতোভাবে জিহাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
মোটের উপর পিকথলের বক্তৃতা সমষ্টি Cultural Side of Islam হচ্ছে এ কালে মুসলমানদের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিকাশের একটা বড় রকমের দালিলিক গ্রন্থ। একালের প্রয়োজন ও বিশ্বাসের আলোয় পুনর্বিন্যস্ত করে ইসলামকে সকলের সামনে পরিবেশন করার সাফল্য যেমন পিকথলের তেমনি এ বইয়ের মধ্যে এ কালের পাঠক খুঁজে পাবেন অনাবিল সুস্বাদ ও পথের ঠিকানা।

পাঁচ

মুসলমানদের জন্য পিকথলের সবচেয়ে বড় সওগাত হচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফের তরজমা। ১৯২৮ সালে তিনি এ পবিত্র গ্রন্থ তরজমা শুরু করেন। যাকে তিনি মনে করতেন তার জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজ। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদের মতোই পিকথলও বিশ্বাস করতেন আল্লাহর সরাসরি বাণী হওয়ার কারণেই কুরআনের তরজমা প্রকৃত অর্থে অসম্ভব, এ কারণেই তিনি তার কৃত তরজমার ভূমিকায় লেখেন The Quran can not be translated। হয়তো এ কারণেই তিনি তার তরজমার নামকরণ করেন The Meaning of the Glorious Koran। তিনি বিশেষভাবে বলেন এ হচ্ছে স্রেফ কুরআনের বাণীসমূহকে ইংরেজিতে পরিবেশন করার একটা প্রচেষ্টা, কখনোই মূল আরবীর ইংরেজি তরজমা নয়।
ইসলাম কবুলের পর থেকেই পিকথল কুরআন শরীফ তরজমা করার জন্য নিজের মন ও মানসিকতাকে একরকম প্রস্তুত করে তুলছিলেন। বিশেষ করে তিনি যেখানে মনে করতেন প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন শরীফ জানা ও বোঝা হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য। ১৯১৯ সালে লন্ডনে তিনি যখন ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন তখন থেকেই খুতবা দেয়ার সময় প্রচলিত তরজমাসমূহকে বাদ দিয়ে পিকথল নিজেরটাই উল্লেখ করবার চেষ্টা করতেন।
এ পবিত্র গ্রন্থের প্রতি তার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি একে উল্লেখ করেছেন a wonder of the world। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য ঘটনা হিসেবে। তিনি বিশেষভাবে নিজের প্রসঙ্গ টেনেই বলেছেন, যেখানে তার মাতৃভাষা ইংরেজিতে কোন একটি অংশ বা অধ্যায় মুখস্থ রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে সেখানে কুরআনের পাতার পর পাতা মূল আরবীতে নিখুঁতভাবে মনে রাখতে তার কোন বেগ পেতে হয় না। তিনি মুসলমানদেরকে এ পবিত্র গ্রন্থ স্রেফ সম্মান করা নয়, এর মর্মের আলোকে তাদের উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
নিযাম পিকথলকে কুরআনের তরজমা সম্পূর্ণ করার জন্য ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ছুটি দেন। মুসলিম ভারতও অপেক্ষা করছিল কখন এই তরজমা সম্পূর্ণ হবে। পিকথল লিখেছেন : All Muslim India seems to be possessed with the idea that I ought to translate the Quran into real English.[১০]
তিনি নিজেও এই পবিত্র গ্রন্থের যথার্থ তরজমা সম্পূর্ণ করবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। পিকথল এ গ্রন্থ তরজমা করার সময় ইউরোপের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের সাথে খোলামেলা

www.pathagar.com

আলোচনা করেন। সি.ই. বসওয়ারথ তার Encyclopedia of Islam- এ লিখেছেন পিকথল ইউরোপীয়দের কুরআন সমালোচনার সাথে পরিচিত ছিলেন। এ তরজমার সময় তিনি তার সেই জ্ঞান অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেন।

পিকথল তার এ তরজমার পক্ষে অনুমোদনের জন্য মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উলামাদের সাথেও দেখা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯২৯ সালে মিশর সফর করেন এবং কায়রোতে তিন মাস অবস্থান করেন। এসময় তার সাথে বিখ্যাত সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী রশীদ রিদার সাক্ষাৎ হয়। রিদা পিকথলের তরজমাকে যথাযথ হিসেবে মতামত দেন। অবশ্য মিশরের সর্বস্তরের আলেমদের কাছ থেকে তার কৃত তরজমার পক্ষে অনুমোদন পাওয়া এত সহজ হয়নি। পরবর্তীকালে পিকথল Islamic Culture পত্রিকায় সেখানকার সংরক্ষণশীল আলেমদের সাথে তার লড়াইয়ের এক বর্ণনা দিয়েছিলেন এভাবে ঃ

Many Egyptian Muslims were surprised as I was at the extra ordinary ignorance of present world conditions of men who claimed to be the thinking heads of the Islamic world – men who think that the Arabs are still 'The patrons', and the non-Arabs their 'freedmen,' who can not see that the positions have become reversed, that the Arabs are no longer the fighters and the non-Arabs the stay-at-homes but it is the non-Arabs who at present bear the brunt of the Jihad; that the problems of the non-Arabs are not identical with those of the Arabs ; that translation of the Quran is for the non-Arabs a necessity, which of course, it is not for Arabs; men who can not concieve that there are Muslims in India as learned and devout, as capable as judgement and as careful for the safety of Islam, as any to be found in Egypt.[১১]

শেষ পর্যন্ত পিকথল সেখানকার আলেমদের এক সমাবেশে আরবীতে বক্তৃতা দেন এবং তাদের বোঝাতে সমর্থ হন এ তরজমা প্রকাশের ফলে ইংরেজি ভাষী জগতে ইসলাম প্রসারের বিপুল সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শায়খ-উল-আজহার আল মারাঘী পিকথলের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন এবং তার সাফল্য কামনা করেন। পরবর্তীকালে পিকথলের তরজমা পড়ে অসংখ্য ইংরেজি ভাষী ইসলাম কবুল করেন।

মূল আরবীসহ পিকথলের তরজমা হায়দারাবাদ থেকে নিযাম সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রথম প্রকাশ পায়। এরপরে অবশ্য এ তরজমা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে ছাপা হয়েছে এবং একটার পর একটা সংস্করণ চলছে। শুধু তাই নয়, পিকথলের মূল তরজমার তরজমা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। আরবী, উর্দু, তুর্কী, পর্তুগীজ ও মরো মুসলিমদের ভাষা তাগালোগ-এ। এটা পিকথলের তরজমার অসাধারণ পাঠকপ্রিয়তার প্রমাণ।

১৯৩০ সালে এই তরজমা প্রকাশের পর Times Literary supplement এটিকে a great literary achievement বলে অভিহিত করে। এখন থেকে পিকথলের বুদ্ধিজীবিতার পাশাপাশি তার ধর্মীয় নেতৃত্ব দেয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জটিল ও

www.pathagar.com

আইনী বিষয়ে তার কাছে মতামত চাইলে তিনি সে সম্পর্কে যথাযথ ফতওয়া দেন। ১৯৩৫ সালে পিকথল নিজাম সরকারের চাকরি থেকে অবসর নেন এবং ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার প্রিয় Islamic Culture পত্রিকা আর এক নও মুসলিম মোহাম্মদ আসাদের সম্পাদনায় ছেড়ে দিয়ে আসেন এবং বৃটেনে নতুন করে ইসলামিক সোসাইটি তৈরি করে কাজ শুরু করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। নতুন কার্যক্রম সত্ত্বেও তার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তিনি হয়তো Gerard Win stanley'র মতোই ভাবছিলেন ঃ

And here I end, having put my arm as far as my strength will go to advance righteousness. I have writ, I have acted, I have peace : and now I must wait to see the spirit do his own work in the hearts of others and whether England shall be the first land, or some other, where in truth shall sit down in triumph.[১২]

পিকথল ১৯৩৬-এর ১৯ মে করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ওকিং-এর কাছে সারে ব্রুকউড মুসলিম গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আশ্চর্যের ঘটনা, আরো কয়েক বছর পর কুরআন শরীফের অন্যতম তরজমাকারী আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর শেষ শয্যাও একই স্থানে পিকথলের সাথে রচিত হয়।

পিকথলের ইন্তেকালের পর Islamic Culture পত্রিকা যে শোক নিবন্ধ প্রকাশ করে তার শিরোনাম ছিল ঃ Soldier of faith ! True servant of Islam- আদর্শের সৈনিক, ইসলামের সত্যিকার খাদেম। মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য এরকম একজন অক্লান্ত কর্মসাধক এবং ইসলামী জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতের এই সিপাহসালারকে তারা সত্যিকার মর্যাদা দিতে পারেনি। এ যাবৎকাল মুসলিম সমাজে তাকে নিয়ে কোন আলোচনা বা লেখালেখি হয়েছেও বলে মনে হয় না। এটা কি মুসলমান সমাজের এক ধরনের নির্জীবতা ও জড়তার উদাহরণ নয়। এই বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তাকে পিকথল অনেক আগেই মুসলিম সমাজের অধঃপতন ও অনিশ্চয়তার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যার থেকে তারা আজও রেহাই পায়নি।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Anne Jackson Fremantle, Loyal Enemy. London : Hutchinson, 1938
২. Peter clark, Marmaduke Pickthall : British Muslim. London : Quartet, 1986.
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৮. প্রাগুক্ত।
৯. Marmaduke Pickthall, The Cultural Side of Islam. New Delhi : Kitab Bhaban, 1990.
১০. Marmaduke Pickthall, 'Mr. Yusuf Ali's Translation of the Quran.' Islamic Culture IX (1935), 519-21.
১১. প্রাগুক্ত।
১২. Gerard Win Stanely, A New Years Gift for the Parliament and Army, 1650.

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ইকবাল

এক

তুমি তৈরি করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম পান-পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য;
আমার হ'ল তৈরি ফুলের কানন, গোলাপ, ফলের বাগান।
আমি সে যে 'পাথর'কে করে দেয় আয়না,
বিষ হতে যে বানায় মধু।[১]

মনুষ্যত্বের জাগরণ ও তেজস্ক্রিয়তার এরকম দুকূল প্লাবী নমুনা ইকবালের কবিতা, দর্শন ও উচ্চাঙ্গের বক্তৃতাতে ভূরি ভূরি দেখতে পাওয়া যায়। কবি মানুষের অপরাজেয় শক্তি ও সম্ভাবনার কথা যেমন বলেছেন তেমনি তার অশেষ সংগ্রাম ও মুক্তির কথাও তার কাব্য ও দর্শনের প্রধান উপজীব্য হয়ে আছে। ইকবাল মানুষের আত্মবিকাশ ও স্রষ্টার পাশে মানুষকে তার সহকর্মী (Co-worker) হিসেবে যেভাবে চিত্রিত কচ্ছেন উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথের ভাষায় তা একালের ধর্মজগতে এক রীতিমত বিপ্লব হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। কেননা এটি খোদার দূরবর্তী অবস্থানের পুরনো চিন্তাকে ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং খোদাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে। এই নবতর চিন্তা খোদার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষের সমস্যাগুলোকে বুঝবার এবং নতুন ও উন্নততর পৃথিবী নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[২]

ইকবাল কেন এই গতিধর্মী ও বিপ্লবী ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে গেলেন ? তিনি তার অফুরন্ত চিন্তাশক্তি ও উদ্যম দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন একদিকে সর্বভূক আগ্রাসী পাশ্চাত্যের দাপাদাপি অন্যদিকে স্বসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তমুদ্দুনিক নির্জীবতা, অবক্ষয় ও দূষণের মধ্যে এটিই হচ্ছে উত্তরণের একমাত্র পন্থা। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মুসলমানের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নির্ভুল উপায়।

ইকবাল চেয়েছিলেন অবক্ষয়িত মুসলমানের পুনরায় আত্মশক্তিতে প্রত্যয়লাভ, আর দুর্জয় শক্তিলাভের জন্য দেশজাতির গন্ডিমুক্ত এক ধর্মবন্ধনের ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ একটি সৃষ্টিশীল উন্নতিপরায়ণ জাতি। সত্য ধর্ম ও নীতির প্রতিপালক, আত্মনাশা ও প্রয়োজন পরিপন্থী প্লেটোনিক, বৈদান্তিক ও সুফী চর্যার প্রভাবহীন ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র, হয়তো ইসলামী খেলাফত বা কমনওয়েলথের ভাবনাও তার ভিতরে ছিল। তবু তার সে স্বপ্ন যেভাবে যতদূর সাধিত হোক বা না হোক ইকবাল ঐতিহাসিকের বিচারে স্থান পেয়েছেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি ও দার্শনিক হিসেবে।

www.pathagar.com

দুই

মোহাম্মদ ইকবালের জন্ম ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। শিয়ালকোট হচ্ছে জম্মু সন্নিহিত পশ্চিম পাঞ্জাবের এক প্রাচীন শহর। ইকবালের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন সাপ্রু বংশীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময় জনৈক সুফীর সংস্পর্শে এ পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় পরিবারটি কাশ্মীর ত্যাগ করে শিয়ালকোটে বসতি কায়েম করে। কবি তার ব্রাহ্মণ্য উৎস নিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'ব্রাহ্মণজাদা আমি, ঋদ্ধ হয়েছি রোম আর তব্রিজের গূঢ় জ্ঞানে।[৩]

ইকবালের পিতামহ শেখ রফিক ছিলেন এক শাল বিক্রেতা। পিতা নূর মোহাম্মদ ছিলেন সূচী শিল্পী- টুপি ও শালের উপর নকশা তোলায় দক্ষতা ছিল তার। দরিদ্র হলেও নূর মোহাম্মদ ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক, তাসাউফের প্রতি আকর্ষণ ছিল তার। বস্তুত তিনি ছিলেন এক সুফী তরিকার অনুবর্তী।

নূর মোহাম্মদের স্ত্রী ইকবালের আম্মা ইমন বিবি ছিলেন সমান ধর্মপ্রাণা। দর্জির কাজে নূর মোহাম্মদের দক্ষতা দেখে একদা এক সরকারি কর্মচারী তাকে একটি সিঙ্গার সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমন বিবি যখন শুনলেন ঐ সরকারি কর্মচারী অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে মেশিনটি কিনে দিয়েছেন তখন তিনি মেশিনটি ফেরত দিতে বললেন স্বামীকে। নূর মোহাম্মদ স্ত্রীর কথা যুক্তিযুক্ত মনে করে সেলাই মেশিনটি ফেরত দিয়ে টুপির উপর নকশা তোলার কাজেই ফিরে আসেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তার সততা কিছুটা পুরস্কৃত হয়। তার টুপির উপর নকশা তোলার কাজ এমন সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে যে তাকে কয়েকজন কর্মচারী রাখতে হয়। ইকবাল তার বাল্যকালের একটি ঘটনা নিয়ে একটি কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, যা থেকে ধারণা করা যায় তিনি কি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন। একবার তিনি এক ভিখারীকে প্রহার করে তার ভিক্ষালব্ধ অর্থ নিয়ে নেন। নূর মোহাম্মদ এই ঘটনা জেনে ব্যথিত হয়ে অশ্রুপাত করতে করতে বলেছিলেন শেষ বিচারের দিন এই ভিক্ষুক কাঁদবে আর পয়গম্বর আমাকে শুধাবেন, এই বালক মুসলমানকে তোমাকে দিয়েছিলাম মানুষ করার জন্য, কিন্তু এ মানুষ না হয়ে কাদার তাল হয়েছে কেন? ইকবালের লেখা সেই কবিতাটি হচ্ছে ঃ

একটু চিন্তা করো পুত্র, স্মরণে আনো-
আমার সাদা দাড়ির দিকে তাকাও আর দেখো,
পয়গম্বরের সামনে শেষ জমায়েতে
ভয় আর আশার দোলাচলের মধ্যে
কেমন কাঁপছি আমি।
পিতাকে এমন বিশ্রীভাবে আঘাত করোনা,
আল্লাহর সামনে তাঁকে লজ্জায় ফেলো না,
মুহাম্মদ বৃক্ষের একটি কুঁড়ি তুমি![৪]

নূর মোহাম্মদ দুই পুত্র ও তিন কন্যার জনক ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল কনিষ্ঠ পুত্র ইকবালকে মাদ্রাসায় দেয়া। কিন্তু পারিবারিক বন্ধু মৌলভী মীর হাসানের পরামর্শে তাকে শিয়ালকোট শহরে স্কটিশ মিশনারী স্কুলে ভর্তি করানো হয়। মীর হাসানের সাহচর্য ইকবালের জীবনে খুব কাজে এসেছিল সন্দেহ নেই। ইসলামী বিষয়ে পন্ডিত হয়েও মীর

www.pathagar.com

সাহেব বুঝেছিলেন প্রথাগত মাদ্রাসা শিক্ষা মেধাবী ইকবালের কোন উপকারে আসবে না। বলাবাহুল্য এই সুপন্ডিত মওলানাই ইকবালকে প্রথম কবিতা চর্চায় উৎসাহিত করেন।

শিয়ালকোটে প্রাথমিক ও প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করবার পর এই শহরের স্কচ মিশন কলেজ থেকে ইকবাল এফ.এ পাস করেন। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি লাহোরে এসে সরকারি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে তিনি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে একই কলেজ থেকে সম্মানের সাথে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে দর্শনে এম.এ পাস করেন। তার কৃতিত্বের সাক্ষর হিসেবে তাকে একটি স্বর্ণপদকও দেয়া হয়। লাহোর সরকারি কলেজে অধ্যয়নকালে ইকবাল প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী থমাস আর্নল্ডের সংস্পর্শে আসেন। ইতিপূর্বে আর্নল্ড ১৮৯৮ সালে লাহোর কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যাপক আর্নল্ডের প্রগাঢ় জ্ঞান মুগ্ধ করে তরুণ ইকবালকে। অন্যদিকে অধ্যাপক আর্নল্ডও নব্য যুবক ইকবালের মধ্যে আবিষ্কার করেন এক প্রতিশ্রুতিবান কবিকে। আরম্ভ হয় এক গুরু-শিষ্য পরম্পরা। শিয়ালকোটের মৌলভী মীর হাসান ইকবালের জীবনে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, লাহোরের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অধ্যাপক আর্নল্ড। ইকবালের কবি প্রতিভাকে উৎসাহিত করলেও তিনি তাকে বোঝান কাব্যচর্চা ভারতের মত অনগ্রসর দেশে মানুষের জীবিকা হতে পারে না। মূলত তার প্রেরণায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন ইকবাল। ১৯০৪ সালে আর্নল্ড লন্ডনের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করলে ইকবাল ব্যথিত হয়ে লেখেন নালায়ে ফিরাক নামক এক কবিতা।

এম.এ পাশ করার পর ইকবাল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবীর প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু কিছুদিন পর ইংরেজি ও দর্শনের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে লাহোর সরকারি কলেজে বদলি হয়ে আসেন। এই কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ১৯০৫ সালে ইকবাল ইংল্যান্ড যান। এখানে তিনি অগ্রবর্তী ছাত্র হিসেবে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেন। পাশাপাশি লিংকনস ইনে আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ম্যাকটেগার্টের তত্ত্বাবধানে তিনি কাজ করেন এবং 'ফিলসফিক্যাল ট্রিপস' ডিগ্রি অর্জন করেন। এসময় তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য যোগ দেন এবং এখানে তার বিখ্যাত অভিসন্দর্ভ 'দ্যা ডেভেলপমেন্ট অফ মেটাফিজিকস ইন পারসিয়া' জমা দেন। ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার পর ইকবাল ইংল্যান্ডে ফেরেন এবং লিংকনস ইন থেকে ১৯০৭ সালে ব্যারিস্টারি পাস করেন। তিন বছর প্রবাস জীবন শেষে ইকবাল ১৯০৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ লিখেছেন ইকবাল যখন ইংল্যান্ডে যান তখন তার যোগ্যতা ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না। ইতিপূর্বে তিনি যা বলেছিলেন হয়তো ভারতে তা অনেকেই একইভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর তিনি যখন ইংল্যান্ড ও জার্মানী থেকে ফিরে আসেন তখন তার কণ্ঠে নতুন ও উত্তেজক সুর। এটা শুধু অভাবনীয় বলিষ্ঠতার সাথেই উচ্চারিত হয়নি, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের পর ভারতীয় ইসলামের জন্য এটি ছিল সবচেয়ে বড় অবদান।[৫]

www.pathagar.com

তিন

বিলাত যাওয়ার আগেই ইকবালের কবিখ্যাতি ঘটেছিল। লাহোরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আঞ্জুমান-ই-হিমায়েত-ই-ইসলাম ছিল ইকবালের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত স্থান। ইকবাল তার কোন কোন সাড়া জাগানো কবিতা এ সংগঠনটির সাহিত্যসভায় প্রথম পাঠ করেছিলেন। তার কবি জীবনের প্রথম অংশের কবিতাসমূহ মূলত তার দেশাত্ম সাধনার ধারায় উজ্জীবিত। বিদেশ যাওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল ইকবালের স্বপ্ন আর আবেগের বস্তু। তিনি লিখলেন সারে জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা। এ সময় তার মুখে ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ভাবনার কথা, ভারতীয় ওয়াতানিয়াত ও ন্যাশনালিজমের কথা। এটা সত্য ইউরোপীয় সংঘ শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সামনে তার স্বাদেশিকতা জাগ্রত হয়েছিল, পাশাপাশি তখনকার মতো তার মনে হয়েছিল ভারতের কল্যাণ আসতে পারে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিতর দিয়ে। এ পর্যায়ে ইকবাল একজন পুরোপুরি ন্যাশনালিস্ট। তার এ সময়ের একটা কবিতার নমুনা নেয়া যাক ঃ

ওগো ব্রাহ্মণ! মন্দিরের দেবতা তোর পুরনো হয়ে গেছে!
নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ - এতো তুই তাঁর কাছেই শিখেছিস,
খোদাইত শিখিয়েছেন ওয়ায়েজকে ঝগড়া বিবাদ করতে
মসজিদ মন্দির কোনটাতেই আমার ভক্তি নেই।
ব্রাহ্মণ মোল্লা দুইই ছেড়েছি আমি।
তুই ভেবেছিস পাথরের মন্দিরে দেবতা আছে,
জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা কিন্তু আমার দেবতা!
নূতন শিবালয় তৈরি করব প্রাণের বসতভূমিতে
উদার আকাশে মেলে দেবে এ চূড়ার পাখা।
সকল তীর্থের সেরা তীর্থ হবে এই
মানুষের মুক্তি আসবে প্রেমের ভিতর দিয়ে।[৬]

তার এ যুগের কবিতার মধ্যে আছে হিমালা, নালায়ে এতীম, পরিন্দে কি ফরিয়াদ, তসবির-ই-দর্দ, গুল-ই-রঙিন, শামা ও পরওয়ানা, এক আরজু, চাঁদ, রাভি কিনারে, তরানা-ই-হিন্দ প্রভৃতি। এসব কবিতার অধিকাংশের ভাষা এক রোমান্টিক জাতীয়তার মধুস্রাবী গন্ধে আমোদিত। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালে ইউরোপ প্রবাসের সময় ইকবালের কবি জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। আতঙ্কিত হয়ে তিনি লক্ষ্য করেন দেশপ্রেম প্রবল ব্যাধিজ্বরের উত্তাপে শক্তিমান সব জাতি রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটিয়েছে ইউরোপে। এই সব নেশনের মধ্যে রেষারেষির ফল হলো প্রাধান্য লাভের আর নতুন নতুন উপনিবেশ অধিকারের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। অন্য নেশনকে জয় করে নেয়ার পৈশাচিক উচ্চাশায় সবাই বিভোর। ইউরোপের ইতিহাস বিশদ বিশ্লেষণ করে যুক্তিবিচার সহকারে ইকবাল দেখানোর চেষ্টা করেন মার্টিন লুথারের আবির্ভাবের ফলে খ্রিস্টধর্ম আর ইউরোপের ঐক্যবিধায়ক শক্তি রইলো না। আর তারই পরিণামে জাতি রাষ্ট্রগুলো উন্মাদ হয়ে পড়ল পররাজ্য দখলের নেশায়।

ইকবাল আধুনিক সভ্যতার সংকট প্রত্যক্ষ করলেন এর সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ধনতন্ত্রী চরিত্রের ভিতর। তিনি গভীর প্রজ্ঞার সাথে বিশ্লেষণ করে দেখলেন ইউরোপীয়

www.pathagar.com

সভ্যতার যে চাকচিক্য তা নির্মিত হয়েছে ধর্মহীনতার সৌধের উপর যার শুরু হয়েছিল ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতির ভিতর দিয়ে।

তাই তিনি এই সভ্যতাকে অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন এটি এখন ভেঙ্গে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, ধ্বংসের পূর্বাভাষ দিচ্ছে এর আগ্রাসী রাজনীতি আর ঔপনিবেশিকতা। দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন অচিরেই রাজনৈতিক হারিকিরি (আত্মহত্যা) করবে ইউরোপ ঃ

হে পাশ্চাত্যবাসী
আল্লাহর পৃথিবী একটি দোকানঘর নয়।
আর তোমরা যাকে সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা মনে করেছ
তা মেকী বলেই প্রমাণিত হবে।
তোমাদের নিজেদের খঞ্জরের উপরই
আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা।
ভঙ্গুর বৃক্ষ শাখায় নির্মিত কুলায়
ভেঙ্গে পড়বে - আজ নয় আগামীকাল।
কখনো এ স্থায়ী হবার নয়।[৭]

ইউরোপের বণিক চরিত্রের দিকেও ইকবাল ছুটিয়েছিলেন তার শ্লেষাত্মক তীর। তিনি তার বহুনন্দিত লেনিন কবিতায় পরলোকগত এই বলশেভিকের জবানীতে বলছেন ঃ য়ুরোপে আলো, জ্ঞান এবং শিল্প দেখো আজ অপর্যাপ্ত। তার প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

স্থাপত্য চাও তো দেখো ব্যাঙ্কগুলির দিকে,
ধনিকের সৌধগুলি চার্চের চেয়ে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন।
বাণিজ্য-নিশ্চয় আছে, বস্তুত সেটা জুয়েএ খেলা,
একজনের লাভে হাজার জনের মৃত্যু।
যে-মহাজাতি হারালো ভগবানের প্রসাদ,
চরম তার উৎকর্ষ দেখো ইলেকট্রিসিটি এবং স্টীম....
লক্ষণ স্পষ্ট-তকবির নামক দাবা-খেলিয়ে
করল বাজিমাত তদবির-দাবাড়ুকে।.....
সরাইখানার ভিতে লাগল ধাক্কা,
সরাইরক্ষকেরাও বসে ভাবছে ভাগ্যের কথা।.....
রাত্রে পথের লোকের মুখে দেখছ স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা
তার কারণ ওদের শরাব পান, অথবা কসমেটিক।[৮]

মোটের উপর ইকবাল ইউরোপীয় সভ্যতার নৈরাজ্যের ফলে যে অন্ধকার আজ বিশ্বজনীনরূপে দেখা দিয়েছে তার সম্বন্ধে তিনি বারবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। এই সাবধানবাণী কবির দার্শনিক প্রজ্ঞার নিদর্শন। আরও দু একটি উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

য়ুরোপীয়েরা আবিষ্কার করেছিলে গোপন রহস্য
যদিও বিজ্ঞ লোকেরা তা প্রকাশ্যে বলেনি-
ডেমোক্রাসি হ'ল সেই রাষ্ট্রবিধান
যাতে মানুষকে গোনা হয়, ওজন করা হয় না।[৯]

www.pathagar.com

রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত হল চার্চের হাত থেকে,
য়ুরোপীয় পলিটিকস সেই দানব যার শিকল কেটেছে;
কিন্তু অন্যের সম্পত্তি যখন দানবের চোখে পড়ে,
চার্চের দূতেরা চলে যুদ্ধবাহিনীর আগে আগে।[১০]

রাজতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র যাই হোক না কেন
দীন থেকে পৃথক হলে তা চেঙ্গেজীই হবে জেন।[১১]

ইকবালের এ সব ভাবনা চিন্তা ইউরোপীয়দের কাছে প্রথম প্রথম প্রাচ্যের মরমীবাদ ভারাক্রান্ত মনে হতে পারে কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের হলোকস্ট যখন ইউরোপকে পেঁচিয়ে ধরলো। ইকবাল যে সংকট প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইউরোপের মধ্যে সেরকম সংকটের ভবিষ্যদ্বাণীর খবর কিন্তু আমরা টি এস এলিয়ট বা ডব্লু, এইচ. অডেনের কবিতায়ও পেয়েছি। এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস, জর্জ বার্নার্ড শ অথবা সি. ই. এম. জোয়াডের মত বুদ্ধিজীবীরা জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও কর্মসূচীকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কেননা তারা বুঝতে পেরেছেন ক্রমক্ষীয়মান ব্যবধান আর ক্রমবর্ধমান মেলামেশার এই দুনিয়াতে বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি যাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে সেখানে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের মোহে কোন কিছুর প্রাপ্তিযোগ ঘটবে না। তার ফলাফল শুধু শ্রেণী সংঘর্ষ, বাণিজ্যিক রেষারেষি, যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধি। বিপজ্জনক দক্ষতায় মানুষের শান্তি ও সুখের ব্যাপারটা এই দর্শন কেড়ে নিচ্ছে। যদিও এসব বুদ্ধিজীবীদের মতামতের সাথে ইকবালের চিন্তার একটা মৌলিক তফাৎ আছে। তিনি পুরো ব্যাপারটা বিচার করেছেন নীতি ও ধর্মের নিরিখে, আধ্যাত্মিক ও লোকহিতৈষণার বিচারে। তার মতে, শোষণ আর ঘৃণা যে মতবাদের মূলকথা, মানুষের চিত্তে গ্রথিত সত্য বা অঙ্গী মানবতার ভালো যে বুঝতে পারে না, সে অগ্রহণীয়, কেননা মানুষের আধ্যাত্মসত্তার বিকাশ, বিস্তারের সে শত্রু।[১২]

ইকবাল মানসের এই রূপান্তরগুলো দেখলে বোঝা যায় জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তার মোহভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন উচ্চতর মূল্যবোধ আর মহত্তর চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে। তিনি মনে করেছিলেন এই নতুন সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে দেবে ইসলাম। ইসলামের ভিত্তিতে তিনি মানব ঐক্যের এক স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ইকবালের মন সরে গিয়েছিল ন্যাশনালিজম থেকে, সেই সূত্রে পশ্চিম থেকে তিনি এবার পরিপূর্ণ নির্ভরতার সাথে মুখ ফেরালেন পূর্বীয় দেশগুলোর দিকে। এতদিন যে ইসলাম তার চৈতন্যের গভীরে দল মেলবার প্রত্যাশায় দিন গুনছিলো, পূর্ণ প্রত্যয়ে এবার তা বিকশিত হবার দাবি জানালো। বলা চলে ইকবালের মধ্যে ইসলামের নবজাগরণও ঘটলো। তার এই ভাবনাই তাকে প্রাণিত করলো জাতীয়তার অন্দর পার হয়ে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের দিকে অগ্রসর হতে। তরানা-ই-হিন্দের কবি এবার লিখলেন তরানা-ই-মিল্লী ঃ

চীন ও অরব হমারা হিন্দুস্তাঁ হমারা
মুসলিম হ্যাঁয় হম ওতন হ্যাঁয় সারা জহাঁ হমারা।[১৩]

www.pathagar.com

আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে,
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া।
মুসলিম তুমি
আবদ্ধ করোনা তোমার অন্তর
কোন দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে;
জয় কর অন্তর
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্মবিলুপ্ত হতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থনিবাস।[১৪]

আগেই বলেছি জাতীয়তাবাদকে তিনি মানবিকতার বৃহত্তম দায়িত্ব পালনে অক্ষম মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই তাকে ইসলামের আন্তর্জাতিক চিত্রটি নিয়ে অগ্রসর হতে হলো। নতুন সভ্যতার বিন্যাসের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি কুরআনের সমাধান সূত্রগুলো নিয়ে অগ্রসর হলেন। জাভিদ নামায় তিনি লিখেছেন ঃ

কুরআন কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা, আর
অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কুরআন আশ্রয় তার।
আমরা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটি জল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার এক আত্মাই।
মনের ভিতরে তা পৌঁছে যায় যদি, বদল হয়ে যায় মনে
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে।[১৫]

এই বিশ্বাসের উন্মুখরতা নিয়ে ইকবাল চাইলেন মানবিকতাকে আরো ঋদ্ধ করতে। এই ভাবনায় ইসলাম তার কাছে এসে পৌঁছল অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠে আসার একটি পদ্ধতি হিসেবে। ইহজগতের সব সমস্যা সমাধানের বৈতরণীরূপে। এইভাবে ইকবাল বললেন ফকরই হচ্ছে সব কল্যাণের ভিত্তি। যার প্রচ্ছায়ায় বর্ধিত হয় জিকর ও ফিকর। এর মানে খোদার প্রতি ভালবাসা ও সমীহ আমাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগায়। কিন্তু সে ভালবাসার প্রকাশ ঘটে মানবিকতার পরিচর্যায়। চাই সাম্রাজ্যবাদ পিষ্ট অনাথ জাতিসমূহের মুক্তি, চাই ধনিক ও শোষকের ধ্বংস আর গরীব মানুষের কল্যাণ। এ-ই হচ্ছে ইকবালের ফকর।

ইকবাল মনে করেন যে, মানব নিয়তির এই ব্যাখ্যাই ইসলাম একদিন দিয়েছিল। কিন্তু মানব সমাজ আজো তাকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করতে পারেনি। তিনি দাবি করেন, মানবতার অগ্রগতি ও কল্যাণে এখনও ইসলামের কালজয়ী ভূমিকা নিস্পন্দ হয়ে যায়নি। বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণে ইসলামের নবঅভ্যুত্থানের মধ্যে আজ তাই আর কোন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য নেই। সমস্ত মানবতা যেখানে আসন্ন রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করছে- অনুভব করছে পুনর্গঠনের, সেখানে মানবতার এক পরীক্ষিত সত্যের

www.pathagar.com

পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব। ইসলাম তার কাছে এখন আদর্শের প্রতিকৃতিতে দন্ডায়মান। ইকবালের নিজের ভাষায় ঃ

The object of my Persian 'masnavis' is not to attempt an advocacy of Islam. My real purpose is to look for a better social order and to present a universally acceptable ideal (of life and action) before the world, but it is impossible for me, in this effort to outline this ideal to ignore the social system and values of Islam whose most important objective is to demolish all artificial and pernicious distinctions of caste, creed, colour and economic status .... I have selected the Islamic community as my starting point not because of any national or religious prejudice, but becaause it is the most practicable line of approach to the problem.[১৬]

চার

তিন বছরের ইউরোপ প্রবাস ইকবালের ভাবজগতে পরিবর্তন এনেছিল আমরা দেখেছি। শুধু তাই নয় এই প্রবাস তাকে ভাবজগত থেকে কঠোর বাস্তবেও নামিয়ে নিয়ে আসে। আধুনিক শস্ত্র-শাস্ত্র পরাক্রমী, বর্ণবিদ্বেষী পাশ্চাত্যের সামনে দাঁড়িয়ে ইকবাল আবিষ্কার করেন মুসলমানের জরাজীর্ণ চেহারা। এই সেদিনও ছিল তার স্বর্ণযুগ। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ জুড়ে তার অপ্রতিহত গতি। অটোম্যান, সাফাবিদ, মোগল রাজত্বের পরাক্রম এই সেদিনের ঘটনা। আর আজ শুধু চারিদিকে হার হওয়ার পালা। বণিক বুদ্ধি পশ্চিমের অভিঘাতে চারিদিকে ক্ষয়ে আসছে ইসলামী দুনিয়া। কেন এমন হলো?

ইকবাল ইসলামের ধ্রুপদী যুগের কথা মাথায় নিয়ে আজকের এই অবক্ষয়ের কারণ খোঁজা শুরু করেন। এই কারণ অনুসন্ধান অবশ্য ইতিমধ্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। আরবে, সুদানে, লিবিয়ায়, বাংলাদেশে, মিসরে, ওহাবী, মাহদী, সানুসী, ফরায়েজী, সালাফিয়ারা অবক্ষয় ঝেড়ে ফেলে আত্মশুদ্ধিতে মন দিয়ে আঙ্গুল ফিরিয়েছিল ধ্রুপদী ইসলামের দিকে। তাদের মনে হয়েছিল ইসলাম থেকে সরে আসার জন্যই আজ এ দুর্গতি। দেশে ফেরার পর ইকবালের লেখায়ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল একই রকমের দেশনা, আত্মবোধ। তিনিও চাইলেন ধ্রুপদি ইসলামের দিনের তেজস্ক্রিয়তাকে একালে ফিরিয়ে আনতে। আসরার-ই-খুদীর কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি ঃ

ফিরে চলো তুমি আরবের কাছে।
তুলেছ ইরানী-বাগানে গোলাপ,
দেখেছ বসন্তের জোয়ার ইন্দোস্তানে ইরানে।
আস্বাদন করো এবার মরুভূমির তাপ,
পান করো পুরানো মদ খেজুরের।
বাসা বেঁধে রইবে কতদিন উদ্যানে?
বাঁধো নীড় উঁচু পর্বতে
বিদ্যুৎ এবং বজ্রের মাঝখানে।
ঈগলের নীড়ের চেয়েও উঁচুতে।

www.pathagar.com

যোগ্যতা হোক তোমার জীবনযুদ্ধের,
শরীর আত্মায় জ্বলে উঠুক জীবনের আগুন।[১৭]

ইসলামী মিল্লাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত ছিলেন ইকবাল। ১৯০৯ এ লাহোরের আঞ্জুমানে তিনি পাঠ করলেন শেকোয়া। আল্লাহর বিরুদ্ধে বেচারি মুসলমানের শেকোয়া-অভিযোগ। তার বিধ্বস্ত বাগানে ফুলের মরশুম আজ শেষ হয়ে গেছে, বাঁশি থেমে গেছে ঃ অহদে গুল খৎম্ হুয়া, টুট গয়া সাজে চমন। আল্লাহর কাছে সে বর মাগছে ঃ হিন্দ্ কে দৈর-নশীনোঁ কে। মুসলমাঁ কর দে । ১৯১০ এ ইকবাল আলীগড়ে গিয়ে ভাষণ দিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে। এরপর লাহোরের মোচি গেটের মুশায়েরায় তিনি পড়লেন শেকোয়ার জবাব (তুর্ক আর বুলগারদের যুদ্ধে তুর্কীদের সাহায্যার্থে এ বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাঠানো হয়েছিল, ১৯১৩), যেখানে আল্লাহ্ মনেকরিয়ে দিচ্ছেন ঃ তোমার এক নবী, এক দ্বীন, এক ঈমান, একটাই পুণ্য কাবা, এক আল্লাহ্, এক কুরআন, তাহলে কেন সর্বত্র মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারো না ? আল্লাহ্ বলছেন, তুমি কি সত্যিই মুসলমান ? সত্য মুসলমান আজ কোথায়? তোমার জীবনযাত্রায় আজ খৃস্টানি, কৃষ্টিতে হিন্দুয়ানি। প্রত্যেকটা মিথ্যার বিরুদ্ধে শানিত কৃপাণ ছিল যে, বীরত্বে অতুলনীয় সাহসে দুর্জয়, সেই তোমার পিতৃপুরুষের সঙ্গে কি আজ সম্বন্ধ তোমার? সভ্যতা ধাঁধিয়ে দিয়েছে আজকে চোখ, বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে আপন বন্ধন ভেঙ্গে, কাবা থেকে বেরিয়ে দলে দলে ঢুকছে সব আজ সনমখানায়। শেকোয়ার শেষে ইকবাল মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমার গান ভারতীয় হলেও এর প্রাণ হিজাজী ঃ নগমা হিন্দী হ্যয় তো ক্যা, লয় তো হিজাজী হ্যয় মেরী। অনেকেই বলেছেন শেকোয়া আর জওয়াবে শেকোয়া এই লেখা দিয়ে ইকবাল হয়ে উঠেছেন বিশ্ব মুসলমানের কবি কণ্ঠ। অনেকের ধারণা এটা দিয়ে ভারতে দ্বিজাতি চেতনা প্রখর হয়েছে। এটা অবশ্য ভুল কথা। দ্বিজাতি চেতনা সব ধর্মেই আছে। স্বধর্মবন্ধন দৃঢ় করার সূত্রেই। তবুও একালের ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিজাতি চেতনার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। অষ্টাদশ-উনিশ শতকের পশ্চিমের সামরিক-সংস্কৃতিক চাপে খন্ডিত, সংকুচিত, বিপন্ন প্রায় মুসলিম দুনিয়া, এর পাশে ভারতে মুসলিম রাজত্বের অবসানে পশ্চিমের চেয়েও হিন্দু ভারতের চতুর্বেষ্টিত সংখ্যালঘুত্বের অনিশ্চয়তা তাদেরকে বিশেষভাবে দ্বিজাতি চেতনার দিকে ঝুঁ সাহায্য করেছিল। ইকবালের আগে থেকেই অনেকেই এর প্রতিকারে এগিয়ে এসেছিলেন। দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ, রায় বেরিলীর সৈয়দ আহমেদ শহীদ, ফরিদপুরের ফরায়েজীরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয় স্তরে মুসলমানদের রক্ষা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। জামালুদ্দীন আফগানী এশিয়া-আফ্রিকা সফর করেছিলেন, ভারতে এসেছিলেন কয়েকবার, সভাও করেছিলেন কলকাতায়। আলীগড়ীদের মত ইংরেজ শাসকদের সাথে সমঝোতা নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়ে এক খলিফার নেতৃত্বে সকল মুসলমানকে সংঘবদ্ধ করে তোলার প্যান ইসলামী মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। ইকবাল নিঃসন্দেহে তার অনুগামী।

জাভিদ নামায় বিশ্ব পরিক্রমার পথে বুধগ্রহে গিয়ে পুনরায় তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন আল আফগানী আর তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনের নেতা সৈয়দ হালিম পাশার। আফগানি জানতে চেয়েছেন মুসলমানের অবস্থা এখন কেমন দুনিয়াতে ? ইকবাল বলেছেন তুরস্ক, ইরান, আরব আজ সব পশ্চিমের পদানত। রাজনীতি থেকে ধর্মের ভূমিকা চলে গেছে।

www.pathagar.com

আল আফগানীকে ইকবাল ইসলামের পুনর্জীবনকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন,যিনি ভূগোলের, জাতীয়তার, রাষ্ট্র পরিচয়ের বাইরে এক ইসলামী কমনওয়েলথের ধারণা দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করার মুসলমানদের সেও ছিল এক উপায়। আফগানীর এই মত ইকবাল আজীবন বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছেন।

পাঁচ

ইকবালের আসরার-ই-খুদী প্রকাশ পায় ১৯১৫ সালে। এই কাব্যের প্রকাশভঙ্গি ও বিশিষ্ট বাণীর প্রবলতায় পাঠক সচকিত হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে আসরার-ই-খুদীর ইংরেজি তরজমা করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসী ভাষার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নিকলসন। নিকলসন ইকবালের কবিকৃতির উঁচু প্রশংসা করেন। তখন থেকেই ইকবালের একটা আন্তর্জাতিক পরিচয় মাথা উঁচু করতে থাকে।

আসরার-ই-খুদীর পরে কবি লেখেন রমুজে বেখুদী এবং আরও পরে মহাকাব্যিক পটভূমিতে তিনি তার বিশ্বাসের উচ্চারণ করেন জাভিদ নামায়। কবিতার পাশাপাশি তার চিন্তাভাবনাকে সমন্বিত করে ইংরেজিতে দেয়া ছয়টি বক্তৃতা এক সময় মুসলিম চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ছয়টি বক্তৃতা ১৯৩০ সালে একত্রে বই আকারে প্রকাশিত হয় Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে।

কি বলতে চেয়েছিলেন কবি তার এই কাব্যগ্রন্থ ও বক্তৃতাবলিতে ? ইকবাল ভাগ্যবাদী দর্শনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো মানুষের অধঃপতনের সূচনা হয় ঠিক তখনই যখন সে জীবন বিমুখ হয়ে পড়ে। যখন সে মনে করে ইহলৌকিক অস্তিত্ব এতই মায়া যে তার থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়াতেই আছে চূড়ান্ত মুক্তি তখন সে হয়ে পড়ে ক্ষমতাহীন। অন্যেরা এসে তার উপর প্রভুত্ব করে। ভাগ্যবাদের এই ধারণাটা প্রায় সব ধর্মের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে। প্লেটোর মায়াবাদ, শংকরাচার্যের ব্রহ্মবাদ, আর মুসলিম সুফীদের আত্মবিলোপনের রহস্য অনেকটা একই রকম যার থেকে আসে একটা জাতির বিপর্যয়। জীবনকে অস্বীকার করার পরিণাম হিসেবে নেমে আসে এক সার্বিক নিষ্ক্রিয়তা। ইকবালের সমসাময়িককালে মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ভাগ্যবাদী দর্শনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কবি চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে নাড়া দিয়ে সৃজনবাদী ধারণার চাষাবাদ করতে। কাজেই ইকবালের নিতে হলো এমন এক দর্শনের আশ্রয় যার মধ্যে মানুষের সচলতার কথা, তেজস্ক্রিয়তার কথা বেশি করে উচ্চারিত হলো। তিনি তার জনগণকে আকাঙ্ক্ষার কিরণে প্রজ্বলিত হবার আহ্বান জানালেন এবং সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে শিক্ষা নিতে বললেন ঃ

> দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীর তীব্র বেগে
> বলে গেল ঃ আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান
> যখন হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।[১৮]

ইকবাল জোর দিলেন মানব ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর। সেই বিকশিত ব্যক্তিত্বের পথ ধরে তিনি বিবৃত করলেন এক বিকশিত জাতির কথা যা তার ভাষায় ফুটে উঠলো মিল্লাত হিসেবে। জাতি তৈরি হয় ব্যক্তিকে নিয়ে। জাতির অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি ব্যক্তি

www.pathagar.com

জীবনও বিপন্ন হয়ে যায়। তাই ইকবালের প্রধান কাজ হলো ব্যক্তির জীবনকে প্রবুদ্ধ করা। কিভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই প্রবুদ্ধ আত্মা? তার জন্য প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষার। এই আকাঙ্ক্ষার আলোয় মানুষ যদি নিজেকে জ্বালিয়ে নেয়, মানুষ যদি অবিরত এই আগুনে পুড়তে পুড়তে এগিয়ে যায় তবে সে আত্মপ্রকাশের একটা পথ খুঁজে পায়। এই আত্মার ক্রমাগত পথ চলার শক্তি হচ্ছে ভালোবাসা। তাকে দুর্বল করে দেয় ভিক্ষা। তেজস্ক্রিয়তার এই দীক্ষা অর্জন করতে ইকবাল আসরার-ই-খুদীতে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন যার ভিতর দিয়ে মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমটি হচ্ছে কানুনের প্রতি আনুগত্য। দ্বিতীয়টি আত্মশাসন আর তৃতীয়টি আল্লাহর প্রতিভূত্ব।
ইকবালের জাভিদনামা প্রকাশ পেয়েছিল আসরার-ই-খুদীর ১৭ বছর পরে। এ সময়ের মধ্যে কবি দেখতে পাবেন বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা, সাম্রাজ্যবাদীদের জিঘাংসা, সমাজতন্ত্রের উত্থান, ফ্যাসিবাদের অনাচার। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁর চিন্তার পরিবর্তনতো ঘটেই না, আরও সংহত রূপ লাভ করে, চিন্তার দিগ্বলয় বিস্তৃত হয়। জাভিদনামায় এসে তার সেই পরিণত কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। জাভিদনামায় কবি মুর্শীদ রুমীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। রুমী কবিকে আত্মবিকাশের পথ বাতলে দিচ্ছেন এমনিভাবে ঃ

সত্তার আবেগ শুধু অবিরাম আত্মপ্রকাশন-
জীবন মানেই হলো আত্মবোধে নিজেকে সাজানো
নিজের সত্তার কাছে সত্য হতে চাওয়াই জীবন।
প্রথম আদির দিনে মিলেছিল সমস্ত যেখানে
নিজেরেই সত্তার কাছে সত্য হতে চেয়েছিল তারা।
মৃত না জীবিত তুমি? নাকি জীবন্মৃত হয়ে আছো?
সে কথা জানার জন্য তিন সাক্ষ্য তোমার সাহারা।
প্রথম সাক্ষ্যটি হলো আত্মসচেতন হয়ে ওঠা
নিজের আলোয় তুলে দেখে নেওয়া যথার্থ নিজেকে
এবং দ্বিতীয় সাক্ষ্য আমি ছাড়া অন্যের চেতনা
যেখানে নিজেকে দেখি অন্যের আলোর পাশে রেখে।
তৃতীয় সাক্ষ্যের নাম নিভৃত চেতনা ঈশ্বরের
ঈশ্বরের আলো দিয়ে নিজেকে যেখানে দেখা যায়
সে-আলোর সামনে এসে যদি তুমি স্থির হতে পারো
তবে জেনো, আছো তুমি, বেঁচে আছো ঈশ্বরের প্রায়।
জীবন মানেই হলো সেই পরিণাম ছুঁতে চাওয়া
জীবন মানেই হলো নিরাবৃত পরমকে পাওয়া।[১৯]

নিজের সামনে, অন্যের সামনে আর আল্লাহর সামনে নিজেকে উন্মোচন করার এই আত্মবৃত্তি থেকে মানুষ পায় আত্মবিকাশ আর আত্মউজ্জীবনের শক্তি। সে শুধু এগিয়ে যায়। আত্মবিকাশের এই ধারায় সে হয়ে ওঠে আল্লাহর সহকর্মী (Co-worker)। এই পর্যায়ের মানুষকেই ইকবাল চিহ্নিত করেছেন মর্দে মুমীন হিসেবে। ইকবালের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

তোমার মর্যাদাকে এমন উত্তুঙ্গ আসনে অধিষ্ঠিত করো
যাতে নিয়তির ছাপ ফেলবার পূর্বেই
শক্তিধর স্রষ্টা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হন ঃ
হে জীব বলো, তোমার কি ইচ্ছে।[২০]

www.pathagar.com

অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে নিজের সাধনায় সম্পূর্ণ করে তোলার ডাক দিয়েছেন কবি এই মর্দে মুমীনকে। এই বিশিষ্ট চিন্তা ভাবনা একান্তই ইকবালীয়। ইকবালের চিন্তার সাথে জার্মান দার্শনিক নীটশের এক ধরনের অভিনিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়। নীটশে বলেছেন VOLO ERGO SUM - আমি সংকল্প করি তাই আমার অস্তিত্ব। ইকবালও সংকল্পের কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা (Will) বলেছেন। কিন্তু নীটশে যেমন করে ভেবেছেন মানুষের সব চেষ্টার শেষ কথা হলো ক্ষমতা লাভ, ক্ষমতার লড়াইয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এক দুর্দমনীয় তাড়া ইকবাল তেমন করে ভাবেননি। তিনি মনে করেছেন এভাবে ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেত মানুষের সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। উল্টো ইকবাল সমাজের কথা, সংঘের কথা বেশি করে ভেবেছেন। আসরার-ই-খুদীতে নিয়মের কথা, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে ঠিক কিন্তু তা দিয়ে কি জাতি গঠন করা যায়। ইকবালকে তাই লিখতে হলো রমুজে বেখুদী। এই খুদী আর বেখুদী, আত্ম আর নৈরাত্ম মিলেই হলো ইকবাল দর্শনের মিনার। রমুজে বেখুদীতে কবি দেখান কিভাবে ব্যক্তি সংঘের মধ্যে হারিয়ে যায়, সংঘ আবার কি করে ব্যক্তিকে আত্মবিকাশের শক্তি দেয়।

এই যে এগিয়ে যাওয়ার কর্মষনা, বিকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠা এর প্রাণ কথা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা নয় তেজস্ক্রিয়তা, ভাববাদ নয়, জীবনবাদ। কিন্তু তার মানে কি ইহলোককেই সবকিছু বলে মনে করা। এক সর্বৈব ঐহিক টানে ভেসে যাওয়া?

ইউরোপ বাসকালে কবি পশ্চিমের কর্মষনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এটা দেখতে ভুল করেননি ইউরোপীয়দের ঐহিক টানের মধ্যে আছে এক ধরনের অবিশ্বাসের প্রবলতা। সে অবিশ্বাস সৃষ্টিকর্তার প্রতি, সৃষ্টিকর্তার নীতি নিয়মের প্রতি। ইকবাল এই ইউরোপীয় দর্শনের আনুগত্য কবুল করেননি। একালে তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে দর্শণজগতে তিনি পশ্চিমের একক আধিপত্যের স্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, মানবকল্যাণে ঐ চিন্তা ও দর্শনের অসারতা তুলে ধরেছেন এবং একালে পাশ্চাত্যের বাইরে মানবকল্যাণোপযোগী দর্শনের এক বিকল্প মডেল হাজির করেছেন।

ইকবাল এবার এমন এক দর্শনের কথা বললেন যা বস্তুকে অস্বীকার করবে না কিন্তু এটাও সত্য বস্তুকে পরম বলে পূজাও করবে না। ইকবাল বললেন বস্তু আর ভোগের তাড়না নয়, পৃথিবী শাসন করবে ধর্ম। এ ধর্ম আমাদের চর্মচক্ষুতে দৃশ্যমান আচারবাহুল্য কোন ধর্ম নয়। কবির ব্যাখ্যাত ধর্ম জীবনী শক্তিতে ভরপুর সচলতার এক প্রতীক যা বারংবার মানবমুক্তির প্রশ্রয় খোঁজে। কবি তাঁর জীবদ্দশায় মানবমুক্তির পথ খুঁজেছেন। ইউরোপীয় সভ্যতার সম্ভাব্য অনেক গতিপথ উল্টেপাল্টে দেখেছেন তিনি। জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ আর ফ্যাসিবাদ কোনটিই তার কাছে উত্তম বিবেচিত হয়নি। মার্কসবাদের দিকেও ঝুঁকেছিলেন কবি। কিন্তু খোদাহীনতাই যে ও তত্ত্বের বড় একটা স্খলন তা তিনি বলতে ভোলেননি। ইকবাল এমনি করে বাতলে দিয়েছেন নতুন পথ যা আমাদের পশ্চিমমুখিনতা, পশ্চিম নির্ভরতারও অবসান ঘটাতে পারে। আগেই বলেছি ইকবালের বাতলে দেয়া পথটি অবশ্যই ইসলাম। কারণ ইসলামে কর্মের প্রণোদনা আছে, ভোগের তাড়না নেই। জীবন আর জগতের বাস্তবতাকে ইসলাম অস্বীকার করে না। আবার ইসলাম সেই ধর্মের মতোও নয় যা পৃথিবীকে মনে করে মায়া এবং এর থেকে নির্বাণেই আছে মুক্তি।

www.pathagar.com

ইকবাল তাই যেমন আক্রমণ করেছেন ভোগবাদীদের তেমনি আক্রমণ করেছেন সুফীবাদীদের। ইকবাল তার ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন বক্তৃতামালায় এ কথাটাই বলতে চেয়েছেন কুরআন শরীফের ব্যাখ্যাত ইসলাম হচ্ছে কর্মষনার ধর্ম। নিয়তিবাদের ধারণা স্ফীত হওয়ার কারণেই মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে এক ধরনের নির্জীবতা। কুরআনের মর্মবাণী নিয়তির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ ধরনের Fatalism দর্শনের ধারণা কুরআন প্রশ্রয় দেয়নি। কুরআন অনুসারে মানুষের জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি ঃ ঐশীবাণী, ইতিহাস ও বিশ্বপ্রকৃতি। সুতরাং কুরআনের মতেই বিশ্বপ্রকৃতি হতে পারে বিজ্ঞানের উৎস। আর সব বিজ্ঞানের মূলেই আছে জগতের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান।

ইকবাল আরো বলেছেন কুরআন অনুসারে মানুষের অন্তর বিশ্ব আর বর্হিবিশ্ব (আনফুস ও আফাক) উভয়ই হলো মানব অভিজ্ঞতার উৎস। মুসলমানরা শুধু অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির কাছ থেকে কিছুই একালে নিতে পারেনি। জীবনের সংগ্রাম থেকে তারা পিছিয়ে পড়েছে।

ইকবাল কোন সংকীর্ণ বিবেচনায় ইসলামের কথা বলেননি। ইকবাল ইসলামকে দেখেছেন এক আন্তর্জাতিক সমাজ শক্তি হিসেবে। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদেরকে সচলতার ধর্মে দীক্ষিত করে বিশ্বমানবের কল্যাণ নিশ্চিত করতে। ইসলামকে তিনি এক বৈশ্বিক পটভূমিতে দেখতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদ, গোত্রপ্রীতি আর ক্ষুদ্র রাজনীতির কারণে ক্ষতবিক্ষত ইসলামের কথা তিনি বলেননি। তাঁর ইসলামের ধারণা এক বিশ্বজনীন মানবধর্মের ধারণা। মানব মুক্তির কথা বলতে গিয়ে কবি এই জীবন ধর্মের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। তবে এটা সত্য ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন যুগ-যুগান্তের ইতিহাসের ধারায় ইসলামের মধ্যে অনেক অনাচার ঢুকে পড়েছে এবং নানা রকম বিকৃতি ও দূষণ ইসলামের শরীরকে পেঁচিয়ে ধরেছে। এর ফলে ইসলামের জীবনীশক্তির বিপুল অপচয় হয়ে গেছে। এর জন্য ইকবাল ইসলামের সংস্কারের প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন এবং সেই সংস্কারের প্রেরণা তিনি ইসলামের ইতিহাস থেকেই পেয়েছিলেন। তিনি একালের ইসলামে ইজতেহাদের ধারণাকে নতুন করে নিয়ে আসেন এবং দাবী করেন ইজতেহাদের মাধ্যমেই ইসলাম তার জীবনীশক্তি ফিরে পাবে। তিনি তার ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন বক্তৃতায় বলেছেন ঃ

The ultimate spiritual basis of all life as concieved by Islam is eternal and reveals itself in variety and change. A society based on such a conception of reality must reconcile, in its life, the categories of permanence and change. It must possess eternal principles to regulate its collective life; for the eternal gives us a foot hold in the world of perpetual change.[২১]

ছয়

ইকবালের কবি পরিচয়ের পাশে রাজনীতিক ইকবালের পরিচয় একান্তই ম্লান। নানা রকম সামাজিক কার্যকারণের ফলে রাজনীতিতে তিনি কিছুটা অংশ নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু তা কখনো পুরোপুরি সতেজক হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া রাজনীতির কূটকলার সাথে তার কবিমনও পুরোপুরি আপোস করতে পারেনি। রাজনীতির ভিতর দিয়ে তিনি বরং

www.pathagar.com

তার কবি ও দার্শনিকতাসুলভ মনোভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এই কারণে রাজমোহন গান্ধী তার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ Iqbal was more a visionary than a politician.[২২]

ইকবালের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে আছে ১৯২৬ সালে পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া, এর তিন বছর পর এলাহাবাদের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান, ১৯৩১-৩২-এ দুইবার লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কায়েদে আজমকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পক্ষে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা।

এলাহাবাদের মুসলিম লীগের সম্মেলনে ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের এক গভীর দিকনির্দেশের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য ইসলামের সাথেই জড়িত। এটি মানুষের কোন ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়। সুতরাং কোনক্রমেই ভারতীয় মুসলমানরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। আর তা হবে তার আত্মবিকাশের পক্ষে চরম আত্মঘাতী। সুতরাং উপমহাদেশের মধ্যে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা জরুরী। কারণ ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এর পটভূমি নির্মান করেছে। তাই তার কথা হলো ঃ

I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state .... The formation of a consolidated North Western Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslim, at least of North West India.[২৩]

একই বক্তৃতায় ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের প্রসঙ্গে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাটা এভাবে যোগ করে দেন ঃ

One lesson I have learnt from the history of the Muslims. At critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not vice versa. If today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever vitalizing ideas embodied in it, you will be only resembling your scattered forces, regaining your lost integrity and thereby saving yourself from total destruction.[২৪]

তরানা-ই-হিন্দের কবি যিনি নাকি একদিন লিখেছিলেন তার স্বদেশের প্রতিটি ধূলিকণা হচ্ছে দেবতার তুল্য, তিনি আজকে আয়োজন করছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির। কি ছিল তার মনে। ন্যাশনালিজমের উন্মত্ত চরিত্র তার মন ঘুরিয়ে দিয়েছিল তা আগেই বলেছি। আর ছিল তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির চরম বাস্তবতা ও জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা। তখনকার মত ইকবালের ভাষ্য হচ্ছে এরকম ঃ

The talk of united nationalism is futile. The word has existed on the lips of the people of this country for the last fifty years, and like a hen it has cackled a great deal without laying a single egg .... In this country one community is always aiming at the destruction of the other community.[২৫]

www.pathagar.com

তবে একটি সমতামূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ইকবাল ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী খেলাফত শেষ হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে ইকবালের কাছে হয়ত মনে হয়েছিল এখন ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামের নিশান উঁচু করে ধরার সময় এসেছে। ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে এ ধরনের মনোভাব তিনি ১৯৩০ এর আগেও প্রকাশ করেছিলেন ঃ

Indian Muslims who happen to be a more numerous people than the Muslims of all other Asiatic countries put together, ought to consider themselves the greatest asset of Islam.[২৬]

পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী রিফাত হাসান ইকবাল প্রস্তাবিত এই নতুন মুসলিম রাষ্ট্রকে মনে করেছেন ঃ ... only a means to achieving a universal brotherhood of man baptized with love.[২৭]

এটা অবশ্য অনেকে বলেছেন ইকবাল পরিকল্পিত এই মুসলিম অঞ্চল বা রাষ্ট্র ভারতীয় উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যেই থাকবার কথা ছিল। মোটেই ভারতীয় ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন ভূখন্ড হিসেবে নয়; যা পরবর্তীকালের ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইতিহাসের গতিকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। সেই রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা তাতে ইকবালের স্বপ্ন কতটুকু কার্যকরী হয়েছে সেটা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু তখনকার মত ইকবাল সেই মুসলিম রাষ্ট্রটির বাস্তব কার্যকারিতার উপর জোর দিয়েছিলেন যদিও তার মৌলিক লক্ষ্য ছিল মূলতঃ আদর্শিক। রাজমোহন গান্ধী লিখেছেন ইকবালের প্রবল আদর্শবাদ তাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দিকে চালিত করেছে, এটি মোটেই হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটেনি।[২৮]

১৯৩৬-৩৭ সালে ইকবাল কায়েদে আযম জিন্নাহকে চিঠি লিখে সহমতে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

Why should not the Muslims of North West India and Bengal be considered as nations entitled to self determination?[২৯]

এখানে দেখবার বিষয় হচ্ছে বাঙ্গালী মুসলমানকে তিনি নতুন করে তার মুসলিম জাতীয়তার মধ্যে টেনে এনেছেন, যদিও তা ছিল ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে পৃথক। একই চিঠিতে তিনি ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী ভূখন্ডের উপর জোর দেন, কেননা এটি ছাড়া ঐ নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত কবির কাছে ভারতবর্ষের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারটা প্রধান হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই এবং হিন্দু মুসলিম যৌথ জাতীয়তাবাদের উপর কবি আস্থা হারিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইকবাল আর মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে যে বাদানুবাদ হয়েছিল এখানে তার উল্লেখ উপযোগী হতে পারে। জানুয়ারি ১৯৩৮-এ মওলানা তার দিল্লীতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ এখনকার দিনে নেশন গড়ে ওঠে দেশ-রাজ্যের সূত্রে, জাতি বা ধর্মের নীতিতে নয়।[৩০] এই বক্তৃতা পড়ে মৃত্যুর মাত্র দুই মাস আগে রোগশয্যা থেকে ইকবাল মওলানার তীব্র সমালোচনা করে এক কবিতা লেখেন ঃ

আজম জানে না আজও ধর্মের রহস্য বিবরণ,
নইলে দেওবৃন্দ থেকে হুসেন আহমেদ এই আজব কথাটি

www.pathagar.com

যাজকের মঞ্চ থেকে বলছেন যে জাতই নাকি গড়ে দেয় দেশ।
আরবী মহম্মদের ঘরানা সম্বন্ধে একেবারে বেখবর!
মুস্তাফাশরন হও, ধর্মের ঐকাত্মই শুধু তার,
অন্যথা আর সব বোধ-আচার সকলই বু লাহাবী।[৩১]

এখানেও ইকবাল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে ইসলামকে ধরেছেন, নেশন বা টেরিটরিকে নয়। বলা আবশ্যক ইকবালের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ছিল না, ছিল স্বাতন্ত্র্যধর্মী। বস্তুত ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের আত্মপরিচয় ফিরিয়ে দেন, রাজ্যহারা দলিত মুসলমানদের মনে তিনি আত্মবিকাশের কথা তুলে ধরেন এবং নির্ভুলভাবে মুসলিম সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাৎলে দেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থ লিখেছেন ঃ Iqbal gave Indian Islam a sense of seperate destiny.[৩২]

সাত

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ চৌধুরী খালিকুজ্জামান ভারতবর্ষে কবি ইকবালের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

Meeting the Brothers (Ali Brothers) was like gulping wine. It made us fresh and lively. When we are not talking the Brothers generally song poems of Iqbal from Shikwa, Shama aur Shair, Sicily, Fatima etc. These were of course, the poems which had made Iqbal the idol of Muslim youth. We loved Iqbal the revolutionary, calling upon his people to rise to action, the Iqbal who introduced Muslim heroes in their true glory, the Iqbal who by his new interpretations of Quranic injunctions put life into what had been made state by philosophical pondering.[৩৩]

এ মতামতের মধ্যে একটুও বর্ণনা বাহুল্য নেই। কবি হিসেবে ইকবাল এক অনন্য সাধারণ স্থান অধিকার করে আছেন। দরিদ্র সাধারণ মানুষের দেশে তার মতো হৃদয়বান উচ্চ শিক্ষিতের তুল্য খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি কবিতা লিখেছিলেন সামাজিক দায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে এবং এর বাণী ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। কোন সন্দেহ নেই তার বাণী ছিল সর্বজনীন, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। যদিও তার বাণী ইসলামের আওতার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল কিন্তু তা ছিল সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। ইকবালকে ইসলামের প্রতিভূ কবি বলা হয়। কিন্তু সেতো কোন অপরাধ নয়। মিল্টন ও টি. এস. ইলিয়টওতো খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিভূ। কালিদাস হিন্দু ধর্মের। শঙ্খ ঘোষ তার ইকবাল চর্চার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

রবীন্দ্রনাথ যদি নতুন সভ্যতার বিন্যাসের কথা ভাবতে গিয়ে তপোবনের ভারতবর্ষের বর্ণনা করতে পারেন, যদি পুরান বা উপনিষদের নানা শ্লোকে প্রশ্রয় খোঁজেন বারেবারেই, তাঁকে কি বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবি তখন? তবে ইকবালই বা কেন ভাবতে পারবেন না যে কুরআনের মধ্যেই থেকে গেছে অনেক সমাধান-সূত্র?[৩৪]

www.pathagar.com

১৯৩৮ সালে জীবন সায়াহ্নে এসে লাহোর রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত নববর্ষের এক বাণীতে ইকবাল বলেন ঃ

Only one unity is dependable, and that unity is the brotherhood of man, which is above race, nationality, colour and language ... . so long as men do not demonstrate by their actions that they believe that the whole world is the family of God ...... the beautiful ideals of liberty, equality and fraternity will never materialize.[৩৫]

এ এক সর্বমানবিকতার বাণী। ইসলামনিষ্ঠ হয়েও তিনি মানবতার ডাক দিয়ে গেছেন। এটা সত্য অনাগত বিশ্ব মানব সমাজের কাছে ইসলামের ধ্যান ও কর্মষনাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি দেখিয়ে গেছেন ইসলামনিষ্ঠতা মানে সংকীর্ণতা নয়। সংকীর্ণতা অতিক্রম করে যাওয়া। অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ

ইকবাল সর্বধর্মের মহান ভূমিকায় যে ইসলামের পরিচয় দিলেন তা যেমন আদর্শিক, তেমনি ব্যবহারিক জগতের প্রসঙ্গতায় নবীন সমুজ্জ্বল। মিলনমন্ত্র আছে তার ইসলামী বাণীতে শুভকর্মের প্রেরণায়; এই ধর্ম মানবের সর্বোত্তম প্রত্যহ সাধনার সহায়ক।[৩৬]

১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল মুসলিম ভারতের দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক ইকবাল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি তার শেষ কবিতায় যা লিখেছেন তা ছিল এক সুফীবাদী অন্তর্লীনতা ও আধ্যাত্মগভীরতার মধুর প্রকাশ। যদিও জীবদ্দশায় ইকবাল সুফীবাদের নির্জীবতাকে আঘাত করেছেন, এর সংশোধনের কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো তার ভিতরকার মানুষটি ছিল পরিপূর্ণ এক সুফী। সুফীর প্রেম দিয়ে তিনি বিশ্বকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তার শেষ কবিতার সুরও তাই ঃ

ধার্মিকজন মোমিন মানুষ তাঁহার কাহিনী শোন,
বলিতেছি শোন তার পরিচয় লিপি ঃ
মরণ যেদিন তাহার দুয়ারে বাজাবে রুদ্র বাঁশী,
মোমিন তাহারে হাসিমুখে নিবে বরি

....
অতীতের সুর আবার বাজিবে
হয়তো বাজিবে নাকো!
হেজাযের বায়ু তুলিবে শিহরে
হয়তো তুলিবে নাকো !
এই যে ফকির দূর দরবেশ তাহার জীবন দিন।
আজিকে তাহার চির অবসান হল
তারপরে এই জীবন খেয়ানী রহস্যজ্ঞানী জন
হয়তো আসিবে এই ধরণীর ঘরে;
কে জানে সে কথা বল?
চলে যাওয়া জন হয়তো আসিবে নাকো।[৩৭]

www.pathagar.com

গ্রন্থঋণ ঃ

১. পায়ামে মাশরিক থেকে। উদ্ধৃত ঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।
২. Wilfred C. Smith, Modern Islam in India. Delhi : Usha Publications, 1979.
৩. উদ্ধৃত ঃ সৈয়দ মুজফফর হোসেন বারনী, ইকবাল। অনুবাদ : দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ঃ সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৯৮।
৪. রমুজে বেখুদী থেকে। উদ্ধৃত ঃ রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচ্যের কবি ইকবাল। কলকাতা ঃ অমৃতশরণ প্রকাশন, ১৪০৯।
৫. W. C. Smith, Modern Islam in India.
৬. বাঙ্গ-ই-দারা থেকে। উদ্ধৃত ঃ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, কবি ইকবাল। কলিকাতা ঃ বুলবুল হাউস।
৭. উদ্ধৃত ঃ মীযানুর রহমান (সম্পাদনা), ইকবাল : দেশে বিদেশে। ঢাকা : ইকবাল একাডেমী, ১৩৭৪।
৮. বাল-ই-জিব্রীল থেকে। উদ্ধৃত ঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।
৯. যরবে কলীম থেকে। উদ্ধৃত ঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।
১০. পূর্বোক্ত।
১১. উদ্ধৃত ঃ মীযানুর রহমান (সম্পাদনা), ইকবাল : দেশে বিদেশে।
১২. Eminent Scholars, Iqbal as a Thinker. Lahore : Sh. Muhammad Ashraf, 1960.
১৩. বাঙ্গ-ই-দারা থেকে।
১৪. রমুযে বেখুদী থেকে। উদ্ধৃত ঃ খাজা গোলামুস সাঈয়েদাইন, ইকবালের শিক্ষা দর্শন। অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান। ঢাকা : মাহফুয পাবলিকেশন্স, ১৯৫৮।
১৫. জাভিদনামা থেকে। উদ্ধৃত ঃ শঙ্খ ঘোষ, ঐতিহ্যের বিস্তার। কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৮।
১৬. উদ্ধৃত ঃ মনির উদ্দীন ইউসুফ, ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২।
১৭. আসরার-ই-খুদী থেকে। উদ্ধৃত ঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।
১৮. উদ্ধৃত ঃ ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, অনুবাদ ঃ ফররুখ আহমদ। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০।
১৯. জাভিদনামা থেকে। উদ্ধৃত ঃ শঙ্খ ঘোষ, ঐতিহ্যের বিস্তার।
২০. উদ্ধৃত ঃ মীযানুর রহমান (সম্পাদনা), ইকবাল : দেশে বিদেশে।
২১. Dr. Sir Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore : Shaikh Muhammad Ashraf, 1951.
২২. Rajmohan Gandhi, Understanding the Muslim Mind. New Delhi : Penguin Books Ltd., 1987.
২৩. Shamloo (ed.), Speeches and Statements of Iqbal. Lahore : 1948.

www.pathagar.com

২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. Hafeez Malik (ed.), Iqbal : Poet Philosopher of Pakistan. New York : Columbia University Press, 1971.
২৬. Sheikh Muhammad Ikram, Modern Muslim India and the Birth of Pakistan. Lahore : Institute of Islamic Culture.
২৭. Hasan in Malik (ed.), Iqbal.
২৮. R. Gandhi, Understanding the Muslim Mind.
২৯. Sheikh Muhammad Ashraf (ed.), Letters of Iqbal to Jinnah. Lahore, 1956.
৩০. সৈয়দ মুজফফর হুসেন বারনী, ইকবাল।
৩১. আরমুঘান-ই-হিজাজ থেকে। উদ্ধৃত ঃ পূর্বোক্ত।
৩২. Vincent A. Smith, The Oxford History of India. Oxford and London : 1964.
৩৩. Choudhury Khaliquzzaman, Pathway to Pakistan. Lahore · Orient Longmans, 1961.
৩৪. শঙ্খ ঘোষ, ঐতিহ্যের বিস্তার।
৩৫. Quoted in R. Gandhi, Understanding the Muslim Mind.
৩৬. অমিয় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।
৩৭. উদ্ধৃত ঃ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, কবি ইকবাল।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আসাদ

এক

মোহাম্মদ আসাদ তার ইসলাম কবুলের ঘটনাকে বলেছেন Home coming of the heart- স্বদেশে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।[১] ইহুদী লিউপোল্ড উইস থেকে মুসলমান মোহাম্মদ আসাদে উত্তরণ, এ শুধু নিছক একটি সাদামাঠা ধর্মান্তরের ঘটনা নয়, এ হচ্ছে একটি জীবন চেতনার নবনির্মাণ, একটি নতুন সংস্কৃতির মধ্যে নির্ভার আত্মসমর্পণের কাহিনীও বটে।

মোহাম্মদ আসাদের অভিযাত্রী মন ইসলামী চৈতন্যের মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি যেমন বুঝতে পেরেছিলেন ধর্ম হিসেবে ইসলামের চমৎকারিত্ব তেমনি সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে এর প্রচন্ডতা। একই কারণে তার দৃঢ়মূল ধারণা হয়েছিল ইসলামের মধ্যেই ফিরে আসা হলো মানব নিয়তি। কারণ ইসলাম হলো ফিতরাতের ধর্ম। মানব চরিত্র আর প্রকৃতির সাথে এর অবস্থান খুবই নিবিড়। ইসলামের সাথে তার এই নিবিড়তার সম্পর্ক স্থাপনকে তাই তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সাথে তুলনা করেন।

সংসারে অনেকেই ধর্মের পরিবর্তন ঘটায়। কেউ জাগতিক প্রয়োজনে, কেউ লালসার চাপে। কিন্তু মোহাম্মদ আসাদের প্রয়োজনটা কি ছিল? ইউরোপীয় সভ্যতার মর্মে জন্মগ্রহণ করে তিনি টের পেয়েছিলেন এর বন্ধ্যাত্ব। আরাম, আয়েশ, বিলাস আর অনিয়ন্ত্রিত ভোগ সুখ সর্বস্ব এই সংস্কৃতির ভিতর তিনি মানব চৈতন্যের এক ধরনের বিকৃতি দেখতে পেয়েছেন। তরুণ বয়সেই তার এ বিশ্বাস জন্মেছিল ইউরোপের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সাফল্য সেখানকার মানুষের শরীরের চাহিদাকে মিটিয়েছে মাত্র কিন্তু তার এই বাহ্য জাঁকজমকের অন্তরালে অতলগর্ভ শূন্যতাকে মুছে দিতে পারেনি। আমরা যে মানব সমাজের কথা বলি তা গড়ে উঠেছে কতকগুলো মানবীয় সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে। এ সূত্রগুলোকেই আমরা বলি মানবীয় নৈতিকতা। ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের মনের উপর থেকে এই নৈতিকতার প্রভাবকে মুছে ফেলে সেখানে জন্ম দিয়েছে এক নিরাকার, নিরবয়ব অসীম নিঃস্বতা। সেই নিঃস্বতার ভিতর থেকে স্বাভাবিকভাবে কোন নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ না ঘটায় সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, আত্মিক চাঞ্চল্য আর হতবুদ্ধির যাবতীয় লক্ষণাদি। ইউরোপের এই নিঃস্বতা ও একাকিত্বের সামনে ধীমান লিউপোল্ড উইস অন্য কোন বিকল্পের সন্ধান করবেন তাতো স্বাভাবিক কথা। প্রাচীন আরামাইক ও হিব্রু ভাষায় পারদর্শী, ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঠ শেষ করা যুবক উইসের সত্যানুসন্ধিৎসা তাকে কোন কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি ঝুঁকলেন খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের প্রতি, তারপর একে একে বৌদ্ধ ধর্ম, প্রাচীন চৈনিক দর্শন এবং সবশেষে সেকালের ভিয়েনায় ঔৎসুক্য অর্জনকারী ফ্রয়েড ও তার অনুসারীদের মনোবিকলন তত্ত্বের

www.pathagar.com

(Psycho analysis) দিকে। কিন্তু এর সবকিছুই তার মনে হয়েছে মানব প্রকৃতির জন্য একান্তই অপূর্ণাঙ্গ, মানুষকে তার সমগ্রতায় কেউই উন্মোচন করতে পারেনি।

উইস তার এই অতৃপ্তির দিনগুলোতে গৃহত্যাগ করেন। তার সামনে দুটি বিকল্প রাস্তা খোলা ছিল। একটি পশ্চিমমুখী রাস্তা, বহু পরিব্রাজনায় যা সচরাচর মুখর, অন্যটি প্রাচ্যমুখী, পরিব্রাজকরা যেখানে কম হাঁটাহাঁটি করেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতি মন্থনকারী তরুণ লেখক, পরিব্রাজক, ভাষাবিদ লিউপোল্ড উইস প্রাচ্যমুখী মক্কার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেন। তিনি এই রাস্তায় মোহাম্মদ আসাদ নামে পরিব্রাজনা করেন এবং তখন থেকে তার নাম বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সারিতে জায়গা করে নেয়।[২]

কিভাবে আসাদ পশ্চিমের রাস্তায় পরিব্রাজনা বাদ দিয়ে পূর্বমুখী এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ভ্রমণের যাত্রী হন তার কাহিনী তিনি এক অসাধারণ ভাষা ও শৈলীতে The Road to Mecca নামক বইয়ে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনার শিহরণে ইন্দ্রিয় রীতিমত জাগ্রত হয় ঃ

After all, it was a matter of love and love is composed of many things, of our desires and our loneliness, of our high aims and our short-comings, of our strengths and our weaknesses. So it was in my case. Islam came over me like a robber who enters a house by night ; but, unlike a robber, it entered to remain for good.[৩]

জার্মানীর নওমুসলিম মুরাদ হফম্যান (Murad Hofmann) মোহাম্মদ আসাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এভাবে ঃ আসাদ হচ্ছেন ইউরোপের পক্ষ থেকে ইসলামের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার। ইউরোপ এ যাবৎকাল ইসলামের প্রতি যে বৈরিতা পোষণ করে এসেছে আসাদের মাধ্যমে হয়ত সে ক্ষত কিছুটা পুষিয়ে যেতে পারে।[৪]

বলাবাহুল্য প্রজ্ঞার জগতের এই মনীষী এতকাল দুর্বহ অবহেলার শিকার হয়ে এসেছেন। তার জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন যেমন ইউরোপে হয়নি তেমনি তার পান্ডিত্যের প্রতি মুসলিম দুনিয়াও যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারেনি। ভোগ ও জড়পূজারী ইউরোপ যে এতকাল তার প্রতি নির্মোহ আচরণ ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে এসেছে তার কারণ আসাদ ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্তঃসারশূন্যতা বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেই তাকে বিদায় জানিয়েছিলেন। এমনি একজন মানুষ যিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতির বুক ফুড়ে বিদ্রোহের নিশান উঁচিয়ে ধরেছিলেন তাকে কেন ইউরোপ সহজভাবে গ্রহণ করতে যাবে। আসাদের প্রতি ইউরোপের অবহেলার কারণটা এখন আমরা বুঝি। কিন্তু যে মুসলিম দুনিয়ার উন্নতি ও প্রগতির কথা তিনি আজীবন ভেবেছেন, আধুনিককালে ইসলাম বিশ্বাসীরা আবার কিভাবে জগৎ সংসারে চালকের আসনে অধিষ্ঠিত হবে এই ভাবনায় যিনি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন তার প্রতি এই আমরা মুসলিমরা কোন সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাতে পেরেছি? বোধ হয় এসব প্রশ্নের উত্তর আসাদের জীবন আর কর্মের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আসাদের এ কথা বুঝতে কষ্ট হয়নি মুসলমানরা আজ একটা অতীতশূন্য সংস্কৃতিবর্জিত জাতি। বহু বছর ধরে মুসলিম জ্ঞান আর প্রজ্ঞার জগতে বিকাশশীলতা একেবারে নেই বললেই চলে। এমনি মরিচা ধরা উন্মুল একটা জাতির পক্ষে যেমন তার অতীতকে

www.pathagar.com

ভালবাসা সম্ভব হয় না, তেমনি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকেও কদর জানানো কঠিন হয়ে পড়ে।

মুসলিম জ্ঞান আর প্রজ্ঞার জগতে আসাদ ছিলেন এক পরিশ্রমী সৈনিক। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রজ্ঞা ও মননের জগতে মুসলমানরা যদি তাদের পূর্ব পুরুষদের মত শ্রম না দিতে পারে, আরো বেশি করে ত্যাগ স্বীকার না করতে পারে তবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। স্বাভাবিকভাবে আসাদের মত পরিশ্রমী মানুষ আগামী দিনগুলোতে বেশি বেশি না আসলে মুসলমানদের বহু শত বছরের ঘুমও ভাঙ্গানো কঠিন হবে।

দুই

মোহাম্মদ আসাদের জন্ম ১৯০০ সালের ২ জুলাই পোল্যান্ডের অধীন গ্যালিসিয়ার লোভভ শহরে। তখন পোল্যান্ড ছিল অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অংশ। আসাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইহুদী রাব্বি, যে ধারা ভেঙ্গে তার পিতা ব্যারিস্টার হন এবং আরো পরে হন অস্ট্রিয়া সরকারের একজন মন্ত্রী। পরিবারের রাব্বি ঐতিহ্যের সূত্র ধরে শৈশবেই আসাদ ভালোমত ধর্মীয় শিক্ষা পান এবং প্রাচীন হিব্রু ও আরামাইক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এই বয়সেই তিনি মূল তৌরাত পড়েন এবং তালমুদের ভাষ্য মিশনা ও জিসারাও আয়ত্ত করেন। বাইবেলের ভাষ্য তারগুমও আয়ত্ত করেন এসময়।

আসাদের চৌদ্দ বছর বয়সের সময় তার পরিবার ভিয়েনায় চলে আসে। তখন থেকে তিনি স্কুল ছাড়েন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য অস্ট্রিয়ার সেনাদলে নাম লেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার যোগদান নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সেই সাথে যুদ্ধে তার শৌর্য ও বীর্যবত্তা দেখানোর স্বপ্নও খান খান হয়ে যায়।

যুদ্ধের পর আসাদ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও শিল্পকলার ইতিহাস পড়াশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই লেখাপড়া তাকে তৃপ্তি দেয় না। তাই তিনি এসব বাদ দিয়ে অন্যত্র আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করেন। এই সময় ভিয়েনা ছিল ইউরোপের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম অগ্রসর কেন্দ্র। শুধু শিক্ষাকেন্দ্রেই নয়, এর কাফেগুলোও উত্তেজক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় মুখর হয়ে থাকতো। ফ্রয়েড, এ্যাডলার, লুডউইগ উইটজেনস্টিনের মত প্রতিভারা এসময় ভিয়েনার বুদ্ধিবৃত্তির জগতকে আলোকিত করেছিলেন। এই সব উত্তেজক আলোচনা আসাদের কানেও এসে লাগতো এবং এ আলোচনার মৌলিকত্বে তিনি বিস্মিতও হতেন কিন্তু এর ফলাফলের কথা ভেবে তিনি আবার অনিশ্চয়তার ভিতর ডুবে যেতেন। ১৯২০ সালে আসাদ ভিয়েনা ত্যাগ করেন এবং মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন শহর ঘুরে তিনি বার্লিন পৌছেন। এর মাঝে তিনি চলচ্চিত্রের অভিনেতা থেকে শুরু করে পত্রিকা অফিসের টেলিফোন অপারেটরের মত নানা রকম কাজ করেন এবং সবশেষে একদিন তার সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয় মাদাম গোর্কীর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার নেবার ঘটনার মধ্য দিয়ে। এরপরেই তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। ম্যাক্সিম গোর্কীর পত্নী তখন বার্লিনে এক গোপন মিশনে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

মাত্র ২২ বছর বয়সে সাংবাদিক আসাদ জেরুজালেমে অবস্থানরত মামা ডোরিয়ানের কাছ থেকে চিঠি পান সেখানে পাথরে তৈরি পুরনো আরব স্থাপত্যের এক মনোরম বাড়িতে (delightful old Arab stone house) আথিত্য গ্রহণ করার। এই একটিমাত্র চিঠি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং একদিন সত্যি জেরুজালেমের পথে তিনি ইউরোপ ত্যাগ করেন। এই বয়সেই তখনকার জার্মানী ও ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা Frank furter Zeitung তাকে নিকট ও দূরপ্রাচ্যের সংবাদদাতা নিযুক্ত করে। সাংবাদিকতার সূত্র ধরে তরুণ আসাদ আরব দুনিয়ার বিভিন্ন জনপদ ঘুরে বেড়ান, রোমাঞ্চ ও আবিষ্কারের নেশা তাকে পেয়ে বসে। এ শুধু সাংবাদিকতার প্রয়োজনে তথ্য আবিষ্কারের নেশা নয়, একটি নতুন সংস্কৃতির মর্মমূলে পৌছানোর জন্য ক্লান্তিহীন সফরও বটে।

এভাবে তার এক নতুন জীবনের অভ্যুদয় ঘটে এবং সেখান থেকে তার পিছনের অতীত একটু একটু করে দূরে সরে যেতে থাকে। আর দশজন ইউরোপীয়দের মতই আরবদের সম্পর্কে তিনি যে ভুল ধারণা নিয়ে আসেন তা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। তিনি যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির তুলনা করতে থাকেন, বলা চলে নিজের মধ্যে নতুন এ সংস্কৃতির আবিষ্কার করেন তখন তার মনের কুয়াশা দূর হয়। তার কাছে মনে হয় ইসলামকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তা কত না জীবন ঘনিষ্ঠ, জীবন আর ধর্ম এদের কাছে একাকার হয়ে গেছে। ইসলাম নিছক ধর্মের স্তর অতিক্রম করে এদের সামাজিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, সামাজিক মানুষের আচরণবিধি, রাষ্ট্রব্যবস্থা সবকিছুই ইসলামের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি ধর্মের সাথে একাত্ম করে দেয়ার প্রবণতা ইসলামেই প্রবল। ঐহ্যিকতার সাথে পারত্রিকতার এমন সমন্বয় আসাদের মনে হয়েছে অন্য কোন ব্যবস্থায় দুর্লভ। মানুষের যেমন দেহ আছে, তেমনি মনও। দুইএর প্রয়োজন সম্পূর্ণ হলেই মানুষ। আসাদ তাই মনে করেন ইসলাম এক সামঞ্জস্যশীল মানবধর্ম। ইউরোপ যেমনি জড়পূজা ও আত্মরতিতে মগ্ন, ইসলাম ঠিক তা নয়। তাই ইউরোপীয় চোখ দিয়ে ইসলামকে বুঝবার চেষ্টা করা একটা মস্ত বড় ভুল।

তিন

Frankfurter Zeitung পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে ১৯২২ সালের মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে আসাদ ফিলিস্তিন, ট্রান্স জর্ডান (আম্মান), সিরিয়া, মিসর (কায়রো ও আলেক্সান্দ্রিয়া), তুরস্ক (স্মার্ণা ও কনস্টান্টিনোপল) ও মাল্টা সফর করেন। বার্লিন ফিরে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পরামর্শে তিনি এই সফরের এক চমকপ্রদ ও মনোরঞ্জক বর্ণনা লেখেন যা বই আকারে জার্মানী ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তার আসল নামে ঃ Leopold Weiss, Unromantisches Morgenland -Ausdem Tagebuch einer Reise – Frankfurt : Societas – Druckrei G. m. b. H. 1924. এ ছোট বইটি নানা দিক থেকে আকর্ষণীয়। সবচেয়ে যে দিকটা লক্ষ্যণীয় তা হলো তরুন লেখকের লেখনশৈলী। মাত্র ২২ বছরের এক যুবকের লেখা এ বইয়ের মধ্যেই আভাসিত হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ আসাদের মুখ। লেখক হিসেবে ভবিষ্যৎ আসাদের প্রজ্ঞা ও মননের ঝলক এ বইতে স্পষ্ট। আরো বিশেষ করে বললে সফরের সময় দেখা মানুষ প্রকৃতি আর

www.pathagar.com

তার অতলান্তিক রহস্যের রসগ্রাহী সব বর্ণনা পাঠকের মনকে দারুণ উত্তেজনায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দু' একটা উদাহরণ দেয়া যাক - আলোর রং এর বর্ণনা দিতে গিয়ে উইস লিখেছেন, Shell like- খোলসের মত অথবা তার কাছে মুসাফীররা সবাই Silent, as if wrapped up in the great landscape- শব্দহীন, যেন আদিগন্ত ছবির চাদর মুড়ি দিয়ে আছে।

জেরুজালেমের কথা বলতে গিয়ে তিনি এখানে খুঁজে পান heard history roar by- ইতিহাস গর্জন করছে এবং যখন এর মোলায়েম মাটিতে হাঁটতে থাকেন তখন যেন feet took comfort from walking- পা উষ্ণ আনন্দ অনুভব করতে থাকে।

উইসের বর্ণনার এ ধরন, উপমা, প্রতিকতা ও চিত্রকল্প আমাদেরকে তার একটি কবিচিত্তের দিকে ইংগিত দেয়, যে শুধু সাংবাদিকতার কাজে শুধু ফরমায়েসী লেখা লিখতেই অভ্যস্ত নয়, এর বাইরে এক সুদূরবর্তী ভাবনার তলদেশেও পৌঁছে যেতে সে পারঙ্গম।

এ প্রসঙ্গে আমরা জার্মান কবি রাইনার মারিয়া রিলকের কথা স্মরণে আনতে পারি। উইস যখন এ বই রচনা করেন তখনই তিনি খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। শোনা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহু জার্মান সৈনিকের পকেটে থাকতো রিলকের কবিতা। তরুণ উইসের পক্ষে রিলকের কবিতার অন্তর্ভেদী আবহ ও স্পিরিচুয়ালিটির গীতি সংরাগে আবিষ্ট হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তরুণ উইস মেধা যার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, রিলকের কাব্যিক বৈশিষ্ট্যের কাছে তেমন ধরা দেননি। তার সাহিত্যশৈলী, বিশেষ করে ইংরেজিতে লেখা Road to Mecca'র বর্ণনাভঙ্গি এতই স্বতন্ত্র, পরিণত ও উজ্বল, যে ১৯২২ এই তা স্পষ্টতর ইংগিত দিতে শুরু করেছিল।

এ বইতে তরুন উইসের আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আরবদের সবকিছুর প্রতিই তার এক ধরনের রোমান্টিক মুগ্ধতা এখানে ঝরে পড়েছে। তিনি নিজেকে দেখিয়েছেন আরবদের নিঃশর্ত বন্ধু হিসেবে। তার কাছে 'Arabs are blessed'- আরবরাই হলো আর্শীবাদ পুষ্ট ও প্রকৃতিগতভাবে কমনীয়। তার ধারণা এটা হচ্ছে 'a wonderful expression of the widely alert Arab being'-সদা প্রাণবন্ত আরব অস্তিত্বের অদ্ভুত সুন্দর প্রকাশ, যা কিনা 'does not know of any seperation between yesterday and tomorrow, thought and action, objective reality and personal sentiment'- গতকাল ও আগামীকাল, চিন্তা ও কর্ম, উদ্দেশ্যের বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে কোন ভেদ করতে জানে না।[৫]

আরবরা তার কাছে Always identify with the simple things happening out of no where (and are therefore free of tragedy and remorse)- সর্বদা ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে এমনভাবে সপ্রকাশ যেন তেমন কিছুই ঘটেনি (এবং একারণে তারা সবরকমের বেদনা ও অনুতাপের উর্ধ্বে)।[৬] আরবদের 'a wonderfully simple life that in a direct line leads from birth to death'- সরলরেখার মত চমৎকার অনাড়ম্বর এক জীবন যা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বিস্তৃত।[৭]

ট্রান্স জর্ডানে এসে উইস এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতার সময় আরবদের আদর্শবাদিতাকে এক মহাপুরুষের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন ঃ

You are timeless. You jumped out of the course of world history .... You are contemporary ones until you will be invested by Will and

www.pathagar.com

then you will become bearers of the Future. Then your power will become dense and pure- তোমরা সময়ের অতীত। ইতিহাসের গতির বাইরে গিয়ে তোমরা আশ্রয় নিয়েছে। প্রচন্ড এক ইচ্ছাশক্তির বিস্ফোরণ ছাড়া তোমরা কখনো বর্তমানে ধরা দেবে না, এবং তখনই তোমরা হবে ভবিষ্যতের নিশানবরদার। তখনই তোমাদের ক্ষমতা হবে সংহত ও পবিত্র।[৮] (এসব বর্ণনায় রিলকে যেন উইসের ঘাড়ে চেপে বসেছেন)।

এ বইতে উইসের বর্ণনায় আরবদের সম্পর্কে সবসময়ই একধরনের নস্টালজিয়া কাজ করে বলে মনে হয়। কখনো কখনো আরবদের সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন কেননা 'their lives flow with the naivete of animals'-তাদের জীবন প্রাণীর আদিমতার মতই প্রবহমান।[৯]

ইস্তাম্বুলে এসেও তিনি আরবদের ভুলতে পারেন না। তার কণ্ঠে বেদনার ভঙ্গি ঝরে পড়ে 'oh, my Arab people- ও আমার আরব ভাইয়েরা।

আরবদের সম্পর্কে এ বই থেকে তার আর একটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

'During several months, I was so impressed by the uniqueness of the Arabs that I am now looking everywhere for the strong centre of their lives .... recognizing the eternally, exciting, the stream of vitality, in such a great mass, in so strange a nation.

এই কয়েক মাসের ব্যবধানে, আরবদের একক চরিত্র বৈশিষ্ট্যে আমি এতটই মুগ্ধ হয়েছি যে তাদের জীবনের ভরকেন্দ্রটা আমি এখন প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরছি। তাদের চির উত্তেজনাময় প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের রূপটিই এমন, যে তাদেরকে এক বিস্ময়কর জাতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।[১০]

উইসের অবাক হওয়ার মত এসব বর্ণনায় রয়েছে একমাত্র আরবদের সম্পর্কেই প্রীতিমুগ্ধ উচ্চারণ, এর মধ্যে কোন ইসলামী রং নেই যার দিকে তিনি ভবিষ্যতে ঝুঁকেছিলেন। তরুণ উইস তাই এ বইয়ের ভূমিকায় তার মনের কথাটি বলে ফেলেন ঃ

In order to understand their genius one would have to enter their circle and live with their associations. Can one do that ? আরবদের মেধা বুঝতে হলে চাই তাদের সাহচর্যের বৃত্তে প্রবেশ করা। কেউ কি তা করতে রাজি হবে?[১১]

আমাদের বোঝা দরকার উইস সেই কাজটিই করেছিলেন এবং সকলের পক্ষেই যে কাজ করা প্রায় অসম্ভব সাংস্কৃতিকভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া তা তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি একজন পুরোপুরি আরবে পরিণত হয়েছিলেন এবং পিছনের সব স্মৃতিই মুছে ফেলেছিলেন। এই রূপান্তর আসাদের জীবনের একটা বড় রকমের ঘটনা।

'The Road to Mecca' থেকে একটা জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে তা হলো ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অবৈধ কর্মকান্ডের বিরোধিতাই তাকে কতকটা ইসলামের দিকে টেনে আনে। আসাদের উপলব্ধি ও বিশ্বাসের ধরন বুঝতে হলে আমাদের এ কথাটা মনে রাখা চাই। আসাদের প্রথম বই Unromantisches Morgenland এও সেই জায়নবাদের বিরোধিতা তীব্রভাবে লক্ষ্যণীয়। সেদিনের তরুণ উইসের নিকট মনে

www.pathagar.com

হয়েছে জায়নবাদীরা পশ্চিমী মোড়লদের সাথে এক 'অপবিত্র সমঝোতায়' উপনীত হয়ে নিকট প্রাচ্যের বুকে রীতিমত এক ক্ষত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারপরেও উইস দূরদৃষ্টিমানের মত ইহুদীদের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন কেননা তারা ইসরাইল প্রকল্প হাতে নিয়ে এক অসুস্থ নৈতিকতার মধ্যে ডুবে গেছে। উইস এই ধারণায় বিশ্বাস করেন না, ইহুদীদের একটি বাসভূমি প্রতিষ্ঠিত হলেই তাদের দুঃখের অবসান হবে, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই জায়নবাদের দুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।

উইস দৃঢ়ভাবে মনে করেন ইহুদীরা বিনা কারণে ফিলিস্তিন হারায়নি, খোদায়ী নৈতিকতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতাই তাদের এমনতর পরিণামের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতার এই পথ থেকে ফিরে আসা ব্যতীত ফিলিস্তিনের উপর দখলদারী প্রতিষ্ঠা করে সব হারানোর যন্ত্রণা থেকে ইহুদীরা কখনোই পরিত্রাণ পাবে না। উইসের ইহুদী ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই, এ বই থেকে তাই মনে হয়। তার যত বিদ্বেষ জায়নবাদের বিরুদ্ধে যার জন্ম ঘৃণিত রাজনীতির পঙ্কে, কোন শাশ্বত ধর্মের ছায়ায় নয়। আসাদের প্রথম বই থেকে তার মানসিক লক্ষণের আর একটা দিক আমাদের চোখে পড়ে। তা হলো পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের ক্ষেদোক্তি। তখন থেকেই এই সংস্কৃতি তার কাছে ক্ষয়িষ্ণু, জরাজীর্ণ, শোষণমূলক ও হৃদয়হীন ভোক্তা (mindlessly consumerist) হিসেবে মনে হয়েছে। সদ্য ঘটে যাওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা তিনি অবশ্য এখানে উল্লেখ করেননি। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব ইউরোপের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাদির কথা, বোঝা যায় তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি। উইস ইউরোপীয়দের আত্মিকভাবে নিঃশেষিত, বস্তুতে অনুগত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নবীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এ বইয়ে উইসের মতামত, সেদিনের অনেকের মতই আশাব্যঞ্জক, এর মধ্যে তিনি পৃথিবীর সম্ভাব্য মুক্তির (Liberation of the entire world) কথাও ভেবেছিলেন। Unromantisches Morgenland এ লিউপোল্ড উইস একজন কবি, আরব প্রেমিক, জায়নবাদবিরোধী সর্বোপরি একজন নৈয়ায়িক হিসেবে আবির্ভূত হন। তার বলার দক্ষতা, ঘটনার বিশ্লেষণ, মানবচরিত্রের সঠিক পর্যবেক্ষণ পাঠককে অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়। বিশেষ করে নিকট প্রাচ্যের উপর রীতিমত এক বিশেষজ্ঞ হিসেবে এ বইতে তিনি নিজের ভূমিকা পালন করে যান। আসাদ উল্লেখ করেছেন পুরো সফরের সময় তিনি মাত্র একবারই অনুবাদকের সাহায্য নিয়েছিলেন। আঞ্চলিক ভাষার উপর এ তার কর্তৃত্বের প্রমাণ। সেই ১৯২২ এ বসেই তিনি আরবদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যা বিস্ময়কর বলেই মনে হয় ঃ

Arab unity will only come long after Arab freedom has been achieved in the individual countries; and not before? এককভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আজাদী অর্জনের বহু বছর পর আরবদের ঐক্য আসবে এবং তার আগে নয়।[১২] এ কি কোন গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফল!

পাঠকের জন্য এখানে আরও একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। এই দীর্ঘ সফরনামার মধ্যে উইস ইসলামের নাম নেননি। অথচ ইসলামই হচ্ছে এখানকার মানুষের শক্তি ও গৌরবের উৎস। একবার মাত্র ইসলামের উল্লেখ করে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা বাতিল করেছেন এই বলে যে এটা আরবীয় মেধা ও বৈশিষ্ট্যের কাছে অপ্রয়োজনীয় কেননা তা তার রক্তের সাথেই মিশে আছে। এ কি কোন উগ্র আরব প্রেমের (Arabophilia) ফল!

www.pathagar.com

এ বইয়ে তাই বহু প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার উল্লেখ থাকলেও আসাদের ইসলাম কবুল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা দেয় না।

Frankfurter Zeitung পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী নবীন লেখকের প্রতিভা আঁচ করতে দেরি করেননি। তাই খুব সংগত কারণে তারা তার কাছে থেকে আর একটা সফরনামা দাবি করে বসেন। উইস তাতে সম্মতি দেন, টাকা গ্রহণ করেন কিন্তু চুক্তি মোতাবেক বই লিখতে ব্যর্থ হন (এবং একই কারণে তাকে চাকরি ছাড়তে হয়)। যাই হোক Unromantisches Morgenland প্রকাশ পাবার দু বছর পর ১৯২৬ এ বার্লিনে স্ত্রী এলসাসহ উইস ইসলাম কবুল করেন এবং মোহাম্মদ আসাদে পরিণত হন।

চার

মোহাম্মদ আসাদের উপর এই প্রাককথন ও পটভূমি আলোচনার পর এটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তার মানসিক লক্ষণগুলো কিভাবে একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করেছে। এর সাথে আমরা দেখতে পারি আসাদের বর্ণাঢ্য জীবন কিভাবে বিংশ শতাব্দীর ইসলামের উপর গুরুত্বপূর্ণ আচড় কেটেছে এবং সেই ১৯২২-এ দেয়া তার গৌরবজনক প্রতিশ্রুতি ফলতে শুরু করেছে।

আসাদ তার তারুণ্যে ইউরোপীয় চিন্তানায়ক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ধারণা প্রবল দেখেছিলেন তা হলো ইসলাম তার রাজনৈতিক গুরুত্ব এ কালে হারিয়ে ফেলেছে। এরকম ধারণা করবার হয়ত তাদের কিছুটা কারণ ছিল। অধিকাংশ মুসলিম ভূখন্ড তখন ইউরোপীয়দের করতলগত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তি মুসলমানদের বুকের উপর দিয়ে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে চলেছে। এর সাথে শুরু হয়েছে এক সার্বিক de-Islamization-অনৈসলামিককরণ প্রক্রিয়া। প্রভাবশালী মুসলমানেরা, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাদের মধ্যে ইসলামের জন্য দরদ শিথিল হয়ে পড়েছে। এক কথায় পাশ্চাত্য তার শক্তি ও গতিশীলতা নিয়ে মুসলিম দুনিয়াকে কিপলিং এর ভাষায় সভ্য করবার মিশন হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। রেনান, ম্যাক্স হেনিং প্রমুখের মত দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা যখন এসব কথা বলেছিলেন যে ইসলাম এ যুগে অচল তখন কিন্তু তারা ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে কথা বলেননি। বিশ শতকের শেষে ও একুশ শতকের প্রদোষে এসে মুসলমানদের মধ্যে যে আত্মজাগরণের আভাস দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে তা সেদিনকার ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ, পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করবার জন্য আজ যথেষ্ট। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, মুসলমানদের এ আত্ম উন্মেষের পিছনে কোন ঘটনা ক্রিয়া করেছে। এর উত্তরে বলা যায় এ শতকেই কয়েকজন মুসলিম পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন এবং তাদের চেষ্টা, শ্রম ও অসীম ত্যাগের ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের জড়তা, নিবীর্যতা ও শত বছরের ঘুম কাটতে শুরু করেছে।

এরা হলেন ঃ সাইয়েদ জামাল আদ-দীন আল আফগানী (মৃ. ১৯৯৭), মোহাম্মদ আবদুহু (মৃ. ১৯০৫), মোহাম্মদ রশীদ রিদা (মৃ. ১৯৩৫), মোহাম্মদ ইকবাল (মৃ. ১৯৩৮), হাসান আল বান্না (মৃ. ১৯৪৯), সাইয়েদ কুতুব (মৃ. ১৯৬৬) এবং সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (মৃ. ১৯৭৯)। জাগরনের এই পথিকৃতদের নামের পাশে মোহাম্মদ আসাদের

www.pathagar.com

নাম সহজেই রাখা যায়, কেননা চিন্তানায়ক ও ইসলামী পুনরুজ্জীবনের অসামান্য রূপকার হিসেবে তার স্থান অনন্য।

মুরাদ হফম্যান লিখেছেন আসাদের The Road to Mecca জার্মান ভাষায় প্রকাশের পর এটি রাতারাতি বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়। এমনকি তিনি একথাও উল্লেখ করেন জার্মানীতে : Perhaps no other book except the Quran itself led to a greater number conversions to Islam- সম্ভবত কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ এত বেশী পরিমানে ইসলামের দিকে ধর্মান্তর ঘটাতে সমর্থ হয়নি।[১৩] এ অবাক করা তথ্য কি সেরকম সত্য নয় যা stranger than fiction- কল্পনার চেয়ে চমকপ্রদ।

The Road to Mecca এমন একটা বই যাতে সত্য ও কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এই কল্পনা ও সত্যের মধুর মিশ্রন আসাদের মত গ্যাটের হাতেও ধরা দিয়েছিল। তিনি তার আত্মজীবনীকে বলেছিলেন Dichtung and Wahrheit- সত্য ও কল্পনা। কল্পনা ছাড়া যেমন শিল্পী সম্ভব নয় তেমনি সত্য ছাড়া শিল্পীর গ্রহণযোগ্যতা অসম্ভব। আসাদ Road to Mecca তে পুরোপুরি এক জীবনশিল্পী যেখানে তার ইসলামী অভিজ্ঞতার সত্য আর ইসলামের আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক মনোরম ছবি বিধৃত হয়েছে। The Road to Mecca তে আসাদ পূর্বাপর আরবদের বন্ধুই রয়ে গেছেন। Unromantisches Morgenland এ আসাদ আরবদের দেখেছেন মিত্রের মত, এখানে তিনি দেখছেন ইসলামী আয়নায়। তাই আরবীয় মূল্যবোধ ও সভ্যতা তার কাছে মনে হচ্ছে ইসলামের দান, আরবীয় রক্তের গুণ নয়, যা তিনি আগে ধারণা করেছিলেন। Road to Mecca প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়। এখানে আসাদ ইসলাম কবুলের যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, বার্লিনের সাবওয়েতে (ভূগর্ভস্থ রাস্তা) দেখা একটি ঘটনার সাথে কুরআন শরীফের সুরা আত তাকাসুরের বিশেষ একটি আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার ব্যাখ্যায়ন প্রাপ্তি প্রকৃত অর্থে একটি ভাললাগারই প্রতিশ্রুতি। সাবওয়ের ঘটনাটি আসাদ তার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

একদিন, ১৯২৬ সনের সেপটেম্বর মাসে আমি এবং এলসা আমরা দুজন সফর করছিলাম বার্লিনের ভূগর্ভস্থ রেলপথে। ওটি ছিলো একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা। আমার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি পড়লো আমার ঠিক বিপরীত দিকে বসা পরিপাটি পোশাক পরা একজন মানুষের উপর ঃ বোঝা যাচ্ছে লোকটি একজন ধনী ব্যবসায়ী ; তার হাঁটুর উপর রয়েছে একটি চমৎকার ব্রীফকেস এবং ডান হাতে একটা বড় আকারের হীরার আংটি। আমার মনে এ অলস ভাবনার উদয় হলো ঃ এ স্থূলকায় লোকটির চেহারা, তখনকার দিনে মধ্য ইউরোপের সর্বত্র সমৃদ্ধির যে চিত্র দেখা যেতো সেই চিত্রের মধ্যে কি চমৎকারই না মানিয়েছে ঃ যে সমৃদ্ধি এ কারণে আরো বেশি পষ্ট যে, তা এসেছিলো কয়েক বছর স্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির পরে, যখন গোটা অর্থনৈতিক জীবনই লন্ডভন্ড হয়ে পড়েছিলো এবং কদর্য চোহারা হয়ে পড়েছিলো ব্যতিক্রমহীন। এখন প্রায় সব লোকই ভাল পোশাক পরে, খেতে পায় প্রচুর, আর এ জন্যই আমার বিপরীতদিকের লোকটিকে কোনো ব্যতিক্রম মনে হলো না। কিন্তু আমি যখন তার মুখের দিকে তাকালাম, মনে হলো না একটি সুখী মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হলো, লোকটি যেন উদ্বিগ্ন ঃ এবং কেবল উদ্বিগ্ন নয়, বরং তীব্র অসুখী। তার চোখ দুটি উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে আর মুখের কোনা যেন যন্ত্রণায় কুঁচকানো, তবে দৈহিক যন্ত্রণায় নয়। আমি অভদ্র হতে চাই না। এ

www.pathagar.com

জন্য আমি আমার চোখ সরিয়ে নিই এবং তার ঠিক পরেই দেখতে পাই একটি মহিলাকে, দেখতে বেশ নাজনীন, সুন্দরী। তার মুখেও দেখা গেলো এক অদ্ভুত অসুখী অভিব্যক্তি, যেন এমন কিছু সে ভাবছে অথবা এমন কিছুর অভিজ্ঞতা তার হচ্ছে যা তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক। তা সত্ত্বেও তার মুখ অচঞ্চল রয়েছে, যেন একটা স্থির হাসির মধ্যে, আমার সন্দেহ নেই মেয়েটির জন্য এ ছিল একটি অভ্যস্ত ব্যাপার। এরপর আমি ঘুরে কম্পার্টমেন্টের অন্য সকল যাত্রীর মুখের উপর তাকাতে থাকি। ব্যতিক্রমহীনভাবে সবই সেই সব লোকের মুখ, যাদের পরনে রয়েছে মূল্যবান পোশাক, যারা খায় দায় প্রচুর আর ওদের প্রায় সকলের মধ্যে দেখতে পেলাম গোপন দুঃখের এক অভিব্যক্তি। এতো গোপন যে, সেই মুখের মালিক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন বলেই মনে হলো। ....
আমি জানি যে, ওরা তা জানে না। যদি জানতোই তাহলে যেভাবে ওরা জীবনের অপচয় করে চলেছে তা করতে পারতো না। বাধ্যতামূলক সত্যে বিশ্বাস না করে, নিজেদের জীবন মান উন্নত করার কামনার বাইরে জীবনের কোনো লক্ষ্য না রেখে, অধিকতরো বৈষয়িক আরাম-আয়েসের উপকরণ, অধিকতরো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি (gadgets) এবং সম্ভবত অধিকতরো ক্ষমতা অর্জনের আশা ছাড়া অন্যকোনো আশাই না রেখে এভাবে জীবনকে বরবাদ করা সম্ভব হতো না ওদের পক্ষে।
আমরা যখন বাড়ি ফিরে এলাম হঠাৎ আমার চোখ পড়লো আমার ডেস্কের উপর মেলা রয়েছে একখন্ড কুরআন যা আমি আগে পড়ছিলাম। যান্ত্রিকভাবে আমি কুরআনটি হাতে তুলে নিই তুলে রাখবার জন্য। কিন্তু আমি যখন ওটি বন্ধ করতে যাচ্ছি আমার চোখ পড়লো আমার সামনে মেলা পৃষ্ঠাটির উপর এবং আমি পড়তে শুরু করি ঃ
তোমরা, আরো চাই, আরো বেশি চাই, এই লোভে আচ্ছন্ন হয়ে থাকো যতক্ষণ না তোমরা পৌছাও তোমাদের কবরে- না, এটা ঠিক নয়, তোমরা জানতে পারবে- না, ওটা ঠিক নয়,। অবশ্যই জানতে পারবে তোমরা ; যদি তোমরা জানতে সুনিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পেতে তোমরা রয়েছো জাহান্নামের মধ্যে। একসময় অবশ্য তা দেখতে পাবে নিশ্চিত দৃষ্টিতে এবং সেইদিন তোমাদের জিজ্ঞাস করা হবে তোমরা কি করেছিলে যে-অনুগ্রহ তোমাদের দান করা হয়েছিলো তা দিয়ে?
মুহূর্তের জন্য আমি নির্বাক হয়ে যাই, আমার মুখে কোন কথা সরে না। মনে হলো বইটি আমার হাতে কাঁপছে। তারপর আমি তা তুলে দিলাম এলসার হাতে - এটি পড়ো। আমরা পাতাল রেলপথে যা দেখেছিলাম একি তারই জবাব নয়? হ্যাঁ, এটি তারই জবাব ঃ এমন এক চূড়ান্ত জবাব যে অকস্মাৎ সমস্ত সন্দেহ চুরমার হয়ে গেলো। এখন আমি উপলব্ধি করলাম সন্দেহাতীতভাবে আমার হাতে যে কিতাবটি আমি ধরে আছি তা একটি ইলাহী প্রত্যাদিষ্ট কিতাব ঃ কারণ যদিও তা মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছিলো ১৩০০ বছরেরও বেশি আগে। তবু এতে এমন কিছুর আগাম ধারণা করা হয়েছে যা কেবল আমাদের এই জটিল যান্ত্রিক, অবাস্তব কল্পনা কবলিত জামানায়ই, সত্য হতে পারে।[১৪]
এই ভাবে আসাদ ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু তার এই ভাললাগার ব্যাখ্যা কি সকলকে সমানভাবে আকর্ষণ করে? সেন্ট অগাস্টাইন তার Confession এবং ইমাম গাজ্জালী তার আল মানকিদ মিনদালাল-এ যে সব উত্তর দিয়েছেন তাকি সবাইকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করেছে? কোন ধর্মান্তরিতই পারে না ধর্মান্তরের কারণ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে। যেমনভাবে ভাল লাগার প্রত্যেকটি কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না ; কিছুটা অব্যাখ্যাতই রয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত The Road to Mecca হচ্ছে আসাদের ভাষায় এক ইউরোপীয়'র ইসলাম আবিষ্কার ও মুসলিম সমাজের সাথে তার একাত্ম হওয়ার কাহিনী। এ কাহিনী তিনি লিখেছিলেন নিউইয়র্কে তার এক পশ্চিমা কূটনীতিক বন্ধুর অনুরোধে যিনি তার ধর্মান্তর ও ইসলামী সমাজে একাত্ম হওয়ার ঘটনায় বিস্মিত হয়েছিলেন। এই কাহিনীর সীমানা আসাদের জন্ম সাল ১৯০০ থেকে ১৯৩২ এ তার আরবের শেষ মরুভূমি পরিভ্রমণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটির মধ্যে জুড়ে আছে এক বস্তু ও অবস্তুর জগতের ভ্রমণ কথা, এক বিরাট ভৌগোলিক এলাকা আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর গল্প এবং মানুষের অন্তর্জগত উন্মোচনের এক সুখদ অনুভূতি। The Road to Mecca মূলতঃ একজন মানুষের সত্য আবিষ্কারের শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান কথা। এর অংশ জুড়ে আছে আধ্যাত্মিক আত্মকাহিনী। কিছুটা লেখকের ইসলাম সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিশ্লেষণ আর কিছুটা সত্যিকারের ভ্রমণ কাহিনী। অজস্র অভিযান কথা, মুহূর্তের ধ্যান এবং তাজা ও রঙ্গিন বর্ণনা হচ্ছে এটির বৈশিষ্ট্য। মোটের উপর এ বই হচ্ছে একজন আধুনিক মানুষের গল্প। একজন আধুনিক মানুষের অন্তর্গত অস্থিরতা ও একাকিত্ব, আবেগ ও অনুভূতি, আনন্দ ও দুঃখ, উদ্বেগ ও প্রতিশ্রুতি, স্বপ্ন ও মানবীয়তার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক জীবন্ত প্রোট্রেট এবং শেষ পর্যন্ত এ বইয়ের ভিতর দিয়ে লেখক নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং তার উদ্দেশ্য সাধনে কামিয়াব হন। এ বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে চোখ খুলে যায়। আসাদ এ বই লিখবার জন্য পাকিস্তানের কূটনৈতিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ বই লেখার মাধ্যমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত থেকে আসাদ ইসলামের রাষ্ট্রদূতে পরিণত হন এবং আবিশ্ব তার ভূমিকা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইসলাম কবুলের পর আসাদের সাথে তার পিতার সম্পর্কের অবনতি হয়, তিনি পত্রিকা অফিসের চাকরি ছেড়ে দেন এবং সস্ত্রীক মক্কায় হজ্ব করবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। মক্কায় আসবার পর আসাদের জীবনে আরো ব্যাপক পরিবর্তন হয়। তার স্ত্রী এলসা কয়েকদিনের জ্বরে মারা যায় এবং সেই শোক তিনি বহন করেন দীর্ঘদিন। তিনি পুনর্বার দেশে ফিরে না গিয়ে মক্কা মদীনা আর আরবের মরু প্রান্তরে ৬ বছর কাটিয়ে দেন। তিনি এখানে কুরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এই অধ্যয়ন তার মনে সৃষ্টি করে ঃ

The firm conviction that Islam, as a spiritual and social phenomenon, is still, in spite of all drawbacks caused by the deficiencies of the Muslims, by far the greatest driving force mankind has ever experienced.[১৫]

এরপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত হয় ইসলামের পুনর্জীবন ভাবনায়। হিব্রু ও আরামায়িক ভাষার সাথে পরিচয়ের সূত্রে আরবীতে তার জ্ঞান বৃদ্ধি সহজ হয় এবং আরবের বেদুইনদের সাথে ঘোরাঘুরির ফলে তার ভাষাজ্ঞান আরও শক্তিশালী হয়। এ সময় তিনি বাদশাহ আবদুল আজিজের সখ্য ও পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেন।

প্রাচ্যের মুসলমানদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আরো নিবিড়ভাবে বোঝার জন্য তিনি ১৯৩২ সালে সৌদী আরব ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। এখানে তার মোলাকাত ঘটে প্রাচ্যের কবি ও দার্শনিক ইকবালের সাথে। বয়সে অনুজ হওয়া সত্ত্বেও আসাদের

www.pathagar.com

সাথে কবির এই সাক্ষাৎ ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেননা এই দুই মনীষই সেদিন ইসলামের সামনে আপতিত পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে এক অভিন্ন কর্মসূচী নির্মাণের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। একমাত্র ইকবালের ইচ্ছাতেই আসাদ ভারতে থেকে যান। কবি তাকে বুঝিয়েছিলেন ভারতের মুসলমানরা যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রটির গোড়াপত্তন করতে যাচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের পুনর্গঠনে আসাদের মত লোকের প্রয়োজন অনেক বেশি।

পাঁচ

মোহাম্মদ আসাদের চিন্তার স্তরগুলো বুঝতে হলে তার রচনাবলীর দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। কারণ এই বইগুলোই হচ্ছে তার চিন্তাভাবনার আকর, তার বিশ্বাস ও উপলব্ধির উচ্চারণ। এর থেকেই আসাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা মজবুত হয়ে উঠবে কি গভীর বিশ্লেষণী মন নিয়ে তিনি ইসলামকে নেড়েচেড়ে দেখেছেন একইভাবে বিশ শতকের ইসলামের উপর তার প্রভাব কত গভীর হয়েছে।

তার প্রথম বই Islam at the Crossroads প্রকাশ পায় লাহোর থেকে ১৯৩৪ সালে। এর পরিচিতি লিখে দেন কবি ইকবাল। এ বইতে আসাদ একজন রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক সমালোচক, ধর্মের সমাজবিজ্ঞানী এবং অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে আবির্ভূত হন। এর প্রথম অধ্যায় The Open Road to Islam এ আসাদ একজন পুরোপুরি ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবেও দেখা দেন। বিশেষ করে প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিপুলভাবে জননন্দিত হওয়ার কারণে এটি পৃথকভাবে The Spirit of Islam শিরোনামে কয়েকবার প্রকাশিত হয়। এ বইতে আসাদ যেমন খ্রিস্টান ধর্মের সংকটের কথা উল্লেখ করেন তেমনি পুজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মাঝখানে তৃতীয় পন্থা হিসেবে ইসলামের অভ্যুত্থানেরও আভাস দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার কাছে মনে হয় এক ভয়ানক বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসের ফল যার পরিণতিতে আত্মগর্বী পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এমন বিপর্যয়ের মুখে পৌছাতে বাধ্য, যেখান থেকে তাদের নতুন করে ভাবতে হবে ধর্মের কথা, বিশ্বাসের কথা, আধ্যাত্মিকতার কথা। পুরো পাশ্চাত্য কি এখন সে অবস্থার মধ্যেই চলছে না।

১৬০ পৃষ্ঠার এ ছোট বইটি মূলতঃ খ্রিস্টধর্ম এবং সার্বিকভাবে পাশ্চাত্যের এক যুগান্তকারী, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার ফসল এবং বিবেচনা করা যায় এর মাধ্যমে ইউরোপ এবং পশ্চিমা আদর্শ অস্বীকার করার প্রথম একটা প্রচেষ্টাও বটে। এ প্রচেষ্টাই আমরা পরবর্তীকালে সাইয়েদ কুতুবের মধ্যে দেখি এবং সেই ধারা এখন বিভিন্নজনের হাতে সুসমন্বিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এদিক দিয়ে আমরা আসাদকে একালের উদারপন্থী লেখক William Ophuls এর Requiem for Modern Politics এবং Michel Houllebecia'র The World as Super Market এর পূর্বসূরী হিসেবেও ধরতে পারি।

এ বইতে আর একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় সেটা হলো তিনি পুরোদস্তুর একজন আলেমের মত সুন্নাহর বিরুদ্ধে অযাচিত আক্রমণকারীকে রুখে দিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে Ignaz Goldziher এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি Joseph Schacht এর মত লেখকদের জন্য এ বই একটি যোগ্য প্রত্যুত্তর হতে পারে। সেই ১৯৩৪ এ বসে তিনি

www.pathagar.com

এখানে ইসলামী আইনের পুনর্জীবনের সম্ভাবনার কথা বলছেন কারণ ফিকাহর মৃত্যু (Petrifiction of fiqh) এবং আলেমদের সংকীর্ণতার (Narrow mindedness of Ulama class) মুখে এর প্রয়োজনটা খুব জরুরী। এ বইতে তিনি আরও ইংগিত দিচ্ছেন সেই কথার যার মূল প্রতিপাদ্য হলো পশ্চিমের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা উচিত কিন্তু দর্শনকে নয়, যা আজকে জ্ঞানের ইসলামীকরণের ধারণার সাথে বেশ মানানসই। কারণ এর উদ্দেশ্য ইসলামের সংস্কার নয়। আসাদ মনে করেন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামের আর উন্নতি সম্ভব নয়। এ বইতে আসাদ তার নতুন ধর্ম সম্পর্কে প্রবল আশাবাদ ব্যক্ত করেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সোনালী স্বপ্নের মধ্যে যা পাঠকের কাছে পরিবেশিত হয়েছে।

আসাদের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম The Early Years of Islam, এটি সহী আল বুখারীর কতকাংশের তরজমা, এর সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে আসাদের টীকা টিপ্পনিসহ হাদিস ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। এ বই লাহোর থেকে ১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এখানে আসাদকে আমরা দেখি এমন একটা কাজের সাথে জড়িত হতে যা কিনা এতদিন গতানুগতিক আলেমদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। আসাদের তরজমার মধ্যে কিছুটা নতুনত্বও লক্ষ্য করা যায়। তিনি হাদীসের বিন্যাসের (chronology) মধ্যে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে পরিবর্তন আনার চিন্তা করেছেন বলে মনে হয়। এর একটা উদ্দেশ্য হতে পারে পাঠকের জন্য হাদিস পাঠকে সহজবোধ্য ও সামঞ্জস্যশীল করা। এ পুনর্বিন্যাসের অর্থ এই নয় হাদীসের বহুবছরের বিন্যাস পণালীকে পরিবর্তন করা। এতদসত্ত্বেও আসাদের এ উদ্যোগ সেদিন অনেকের কাছেই ব্যতিক্রমী মনে হয়েছিল, কেননা গতানুগতিকতার বাইরে এসব আলেমরা কখনোই ভিন্নতর কিছু চিন্তা করতে পারতেন না।

এ বইতে বিশেষভাবে দেখবার বিষয় হলো আসাদ হাদীসের উপর সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন, যা হাদীসের প্রয়োজনীয়তা যে এ কালেও ফুরিয়ে যায়নি এবং তার পুনর্জীবন যে আমাদের জীবনে আরও বহুমুখী হওয়া উচিত সেই গুরুত্বের কথাই তুলে ধরেছে। হাদীসের উপর তার আলোচনার ধরন এত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী যে এ বই আমাদেরকে তার পরবর্তীকালে প্রকাশিত The Message of Quran এর আলোচনাশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ বইতে সুন্নাহ সম্পর্কে তার যে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তা তার ইতিপূর্বে প্রকাশিত Islam at the Crossroads এরই অনুরূপ। তিনি জোরের সাথে বলেছেন ফিকাহ নয়, কুরআন ও সুন্নাহই হওয়া উচিত মুসলমানদের মূল লক্ষ্যবস্তু এবং এর দিকে যথাযথ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না আসাদ সহী আল বুখারীর এ তরজমার মাধ্যমে হাদীসের উপর আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আসাদ সহী আল বুখারীর বাকী অংশের তরজমা নিয়ে আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। ১৯৩৮ সালে জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকারের পর তিনি স্বাভাবিকভাবে জার্মান নাগরিকে পরিণত হন, ফলে ব্রিটিশ সরকার তাকে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ভারতে অন্তরীণ করে রাখে। এ সময় তিনি কোন কাজ করতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বহু পরিশ্রমলব্ধ কাগজপত্র ও তথ্যাবলী আসাদ হারিয়ে ফেলেন যা তার হাদীসের উপর ভবিষ্যৎ কাজের ধারাকে চরমভাবে ব্যাহত করে।

www.pathagar.com

আসাদ রচিত The Principles of State and Government in Islam ১০৭ পৃষ্ঠার ছোট কলেবরের বই। ইসলামী আইনের পুনর্জীবনকল্পে বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি তৈরির ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলা চলে। বইটি লেখা হয়েছিল পাকিস্তানকে সামনে রেখে। পাকিস্তানের জন্য যখন একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরির চিন্তাভাবনা চলছিল, যে শাসনতন্ত্রের ভিত্তি গোত্র কিংবা জাতীয়তা নয়, শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিষ্ঠার কথা উঠেছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আসাদ এ বইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য একটি তত্ত্বীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

আসাদ ভাল করেই জানতেন ইসলামের ইতিহাস থেকে এরকম একটা রাষ্ট্রের নমুনা পাওয়া বেশ কঠিন হবে। মদীনা কনফেডারেশনের জন্ম হয়েছিল এক বিশেষ পরিস্থিতিতে। বলার অপেক্ষা রাখে না সেটি আবার পরিচালিত হতো স্বয়ং আল্লাহর রসুলের নির্দেশক্রমে। এ ছাড়া ইসলামী ইতিহাসের প্রায় পুরোটাই স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী রাজা-বাদশাহদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ কথাও স্পষ্ট আজকের এই শিল্পযুগে নিজাম-উল-মুলক ও আল মাওয়ারদীর পরিকল্পনাও কোন ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা হিসেবে সফল হবে না। আসাদ তাই গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে প্রাপ্ত ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কানুনগুলো পৃথক করা এবং তাকেই কেবলমাত্র শরীয়াহ হিসেবে চিহ্নিত করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা। ফিকাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন শেষ বিচারে এটির উৎস কুরআন ও সুন্নাহ হলেও, এর বিপুল কলেবর মূলতঃ মানুষের মেধা দ্বারাই স্ফীত হয়েছে।

আসাদ যখন শরীয়াহ ও ফিকাহর মধ্যে এরকম সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণের কথা ভেবেছিলেন, তখন তা ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক, যদিও আজ তা স্বাভাবিকে পরিণত হয়েছে। সেদিক দিয়ে আসাদ পথিকৃতের ভূমিকাই পালন করে গেছেন। আসাদ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য এই কারণে যে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি কোন বিশৃঙ্খলভাবে খাড়া করেননি কিংবা কোন অনায়াসলব্ধ উপায়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেননি। এমনকি তার পদ্ধতি সেই সব বিকৃতি থেকেও মুক্ত যা কিনা ইসলামী ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে বারবার। ক্ষমতার অপব্যবহার, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, একচ্ছত্র চাপ প্রয়োগ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণহীনতা, শুরাহর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চূড়ান্ত অবহেলা সব মিলিয়ে ইসলামী ইতিহাসে যে সব বেদনাদায়ক নজির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে আসাদ পাশে সরিয়ে রেখে ভবিষ্যৎ ইসলামের সুন্দর চিত্র এঁকেছেন।

আসাদ তার বইয়ের পরিসমাপ্তি টেনেছেন এসব কথা বলে ঃ government subject to the people's consent is a most essential prerequisite– জনগণের অনুমোদন সাপেক্ষ সরকার ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত, the leadership of the state must be of an elective nature– রাষ্ট্রের নেতৃত্ব অবশ্যই নির্বাচিত হওয়া চাই, the legislative powers of the state must be vested in an assembly chosen by the community for that purpose– রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা উচিত সেই প্রতিষ্ঠানের উপর যা কিনা জনগণ কর্তৃক পছন্দকৃত।[১৬]

আসাদ শেষ কথা বলেন এমনভাবে ঃ

a presidential system of government, somewhat akin to that practical in the United states, would correspond more closely to the

www.pathagar.com

requirement of an Islamic polity– একটি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার যা কিনা অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের, ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে পারবে।[১৭] আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বলেন ইসলামের সাথে গণতন্ত্র বেমানান অসামঞ্জস্যপূর্ণ, আসাদের এ আলোচনা হয়ত তাদের জন্য কিছুটা হলেও বুদ্ধির খোরাক যোগাতে পারে।

আসাদের প্রবন্ধ সংকলনের নাম This Law of ours and other Essays। এ সংকলনের অনেকগুলো লেখাই ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ এর দিকে লেখা যা কিনা তারই সম্পাদিত এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত আরাফাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি মূলত ১৯৪০ থেকে ১৯৮৭ সময়কাল পর্যন্ত আসাদের চিন্তাভাবনার একটা দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রতিনিধিত্বশীল সংকলন। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আসাদের লেখাগুলো ও রেডিওতে দেয়া বক্তৃতাসমূহ আসাদের স্ত্রী পোলা হামিদা আসাদ একত্রিত করে ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করেন। এ বইয়ে আসাদ কর্ডোভার ইবনে হাজমের সাথে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ খুঁজে পান যিনি তার মতই সময়ের বিধিবদ্ধ প্রথার (sanctified convention) বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য কিছুকে ইসলামী আইনের চৌহদ্দীতে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

শরীয়াহ ও ফিকাহর মধ্যে একটা সীমারেখা টানবার জন্য আসাদের জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এ বইতে একটা গুরুত্বপূর্ণ আকার পেয়েছে। আসাদ খুবই জোরের সাথে বলেছেন প্রকৃত শরীয়াহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার। ইবনে হাম্বল, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজমের পদ্ধতি অনুসরণ করে আসাদও এমন এক আপোসহীন অবস্থান নিয়েছেন তা হলো শুধুমাত্র ইজমা ও কিয়াস নির্ভর কোন কিছুই শরীয়াহর সমমর্যাদাপূর্ণ হতে পারে না। কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহকে নির্ভর করে ইজতেহাদের জন্য কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত, যার উদ্দেশ্য হবে একালের প্রয়োজনকে সামনে রেখে ফিকাহর উন্নতি সাধন করা। নতুন এ ফিকাহর প্রকৃতি হওয়া চাই সহজ, জটিলতামুক্ত, যা এতকাল ফিকাহর শরীরে পেচিয়ে ছিল। আসাদ আরও যোগ করেন ঃ এ ছাড়া নতুন ইজতেহাদ থেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে না, নতুন এ ফিকাহ পূর্বতনের পরিণতিই ভোগ করবে, নতুন আইনেরও ধীরে ধীরে জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটবে।

এ বই পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য বিশেষ আগ্রহের দাবি রাখে, বিশেষ করে এর What do we mean by Pakistan অধ্যায়টি পাকিস্তানকে নিয়ে তার গভীর চিন্তাভাবনারই ফল। এর মধ্যে অন্তর্গত হয়েছে পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশ্যে দেয়া তার সাতটি হৃদয়গ্রাহী বেতার ভাষণ। পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিছক রাজনৈতিক ঘোষণার ছলনা ও চাতুরীর দিকে ইংগিত করে যখন তিনি বলেন শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তি, কিংবা সরকারি উচ্চপদগুলো মুসলমান কর্তৃক পূরণ অথবা শরীয়াহর ব্যক্তিগত প্রয়োগের কারণেই একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে মনে করবার কোন কারণ নেই। তিনি পরিষ্কার করে বলেন, নিছক যাকাতের নিয়ম চালু, রিবা নিষিদ্ধকরণ, হিজাবের প্রথা প্রবর্তন অথবা হুদুদ আইনের প্রয়োগের মধ্যে একটি দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার একটা কৌশল কাজ করে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন আসাদের মতে তা হলো একটি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শের ছায়াতলে অবস্থান করা এবং এরকম কোন সম্প্রদায় বর্তমানে আদৌ দৃশ্যমান নয়।

www.pathagar.com

আসাদের এ পর্যবেক্ষণ তার এক ধরনের মনঃপীড়ার ফল, মুসলিম দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি এ আদর্শবাদী নও মুসলিমকে কিভাবে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেছিল এ তারই নমুনা।

ছয়

আসাদের মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীলতার পূর্ণতর বিকাশ ঘটেছে তার কৃত কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর The Message of the Quran এর মধ্যে। দীর্ঘ ১৭ বছরের পরিশ্রম ও সাধনার ফল হচ্ছে এই তফসীর যা আসাদের ৮০ বছর বয়সে পূর্ণ প্রকাশিত হয়। এই তফসীর হচ্ছে তার ম্যাগনাম ওপাস ও বহুদিনের লালিত স্বপ্নের ফসল। ইংরেজি পাঠকদের কাছে কুরআনের মর্মবানী তুলে ধরবার ক্ষেত্রে সেক্সপিরীয় ইংরেজীতে লেখা এ তরজমার সাফল্য মরহুম আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মারমাডিউক মোহাম্মদ পিকথলের তরজমারই অনুরূপ। আসাদের তফসীর অন্যভাষায় যেমন তুর্কী ও সুইডিশ ভাষায় সম্পূর্ণ অনূদিত হয়েছে। বেদুইনদের কথ্য আরবী ভাষার উপর আসাদের অসাধারণ অধিকার থাকার কারণে এ তরজমায় এক ধরনের সুনিপুণ সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায়, যা এটির অনন্য পাঠকপ্রিয়তার রহস্য। আসাদ এখানে অনুবাদের সমস্যা, অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দ কিংবা বাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগ, ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দের বিভিন্ন রকম প্রয়োগ বা নির্বাচন, সেই নির্বাচনের পিছনে যথাযথ যুক্তি এবং কেন তিনি সেই বিশেষ অনুবাদকে পছন্দনীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন তার ব্যাখ্যা মোটামুটি দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আসাদের তফসীরের বিপুল বন্দনার পাশাপাশি সমালোচনাও হয়েছে যথেষ্ট। এর একটা কারণ হিসেবে বলা যায় কুরআন শরীফের কোন তরজমাই পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। আল্লাহর বাণী মানুষের পক্ষে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা করা কতটুকু সম্ভব তা বলা বেশ কঠিন। একই কারণে বিভিন্ন তফসীরে ব্যাখ্যার কিছুটা ভিন্নতা আসতে পারে কারণ সকল তফসীরকারের চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি একই প্রকৃতির নয়। তাছাড়া আল্লাহ যে ভাষায় কথা বরেন, যে সুনির্দিষ্ট ভাবার্থ সে ভাষা বহন করে তা তরজমা ও তফসীরের মধ্যে একজন মানুষের পক্ষে কত নির্ভুল ও নিপুণভাবে তুলে আনা সম্ভব তাও ভাবার বিষয়। এবার আমরা The Message of the Quran এর দিকে একটু নজর দিতে পারি। মরহুম মারমাডিউক পিকথলের তরজমার সাথে আসাদের তরজমার একটা বড় পার্থক্য হলো কুরআনের সংক্ষিপ্ত, সংহত ও ছোট শব্দে বা বাক্যাংশে গভীর ভাব ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির যে শৈলী তা পিকথলের তরজমায় যে রকম দৃশ্যমান আসাদে তা অনুপস্থিত। এর কারণ আসাদ শব্দ বা শব্দাংশের অর্থ ও তাৎপর্যের অধিকতর কাছাকাছি পৌঁছাতে চেয়েছেন, কোন কোন সময় শব্দ বা শব্দাংশের মধ্যে বর্তমান সূক্ষ্ম পার্থক্যও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তরজমার সময় যেখানে আরবী ও ইংরেজি উভয় ভাষায় একই ধরনের Noun এবং verb অনুপস্থিত সেখানে আসাদ adjective এবং adverb এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন যা কোরআনেও দেখা যায় না। এমনকি কখনো কখনো noun এর ক্ষেত্রে দুবার অনুবাদ দেখিয়েছেন। যেমন ৫ঃ৪৮ সুরায় সিরাহ শব্দের তরজমায় তিনি লিখেছেন ঃ law and way of life। যার ফলে আসাদ কোন কোন আরবী শব্দের তরজমার ক্ষেত্রেও দীর্ঘ

www.pathagar.com

একটি বাক্য তৈরি করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহর উদাহরণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে। পিকথল তরজমা করেছেন এভাবে ঃ In the name of Allah, the Benificient, the Merciful.

আসাদেরটা এরকম ঃ In the name of God, the Most Gracious, the Dispenser of Grace. এখানে Dispenser of Grace শব্দের মাধ্যমে আসাদ বোধ হয় আল্লাহর এ গুণটিকে অধিকতর তাৎপর্যমন্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু তার বিরোধীরা বলছেন এর ফলে কুরআনের সরল ভাষাশৈলীর হানি হয়েছে। একইভাবে আসাদ আল্লাহর গুণবাচক নাম রহমান শব্দের তরজমা করতে ইংরেজি superlative form এর ব্যবহার দেখিয়েছেন ঃ the Most Gracious (আল্লাহর অন্যান্য নাম যেমন আল হাকিম, আল আজিজ, আল কাদির ইত্যাদি তরজমার ক্ষেত্রেও আসাদ একই কাজ করেছেন)। এরকম ব্যবহার অবশ্য আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলীর তরজমাতেও লক্ষ্যণীয়।

তরজমায় আসাদের ইংরেজির ধরন দেখেই বোঝা যায় এ ভাষার উপরও তার দখল ছিল কত ব্যাপক; তরজমার ইংরেজি পুরোপুরি ক্লাসিকাল। এটি পড়তে যেয়ে অনেকের হয়ত পুরনো বাইবেলের ইংরেজীর কথাও স্মরণে আসতে পারে। আসাদের সমালোচকরা বলতে চেয়েছেন তরজমার ভাষা যদি এত লৌকিক, আলংকারিক ও কৃত্রিমতাপূর্ণ হয় তবে তা পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। তরজমার ক্ষেত্রে পার্থক্যটা হয়তো তেমন নয় কিন্তু তা ভাললাগা না লাগার জন্য যেমন একটা বড় প্রশ্ন তেমন শ্রবণসুন্দর অসুন্দর হওয়ার জন্যও প্রশ্ন বটে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক- পিকথল ১৭ ঃ ৪০ সুরার আয়াত এভাবে তরজমা করেছেন ঃ Verily, ye speak an awful word, আসাদ লিখেছেন : Verily you are uttering a dreadful saying.

আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এখানে আসাদের সাংস্কৃতিক মেজাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি আসাদের প্রাচীন হিব্রু ও আরামায়িক ঐতিহ্যের ধারা। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের সাথেও তার যোগ ছিল। আরবী শিখেছিলেন বেদুইনদের কাছ থেকে। ইংরেজি ভাষায় তার অধিকার ইংরেজি ভাষীদেরকেও অতিক্রম করেছিল। মুসলমান হওয়ার পর ইসলামী বুদ্ধিবাদের জগতে তার উজ্জ্বল পরিভ্রমণ একটা মস্ত বড় ব্যাপার। এই বুদ্ধিজীবী তাই যখন কুরআন শরীফের তরজমা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সাহিত্য ও শিল্পচেতনা একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব ফেলে বৈকি। আসাদের জন্য এটা কি কোন সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আমার মনে হয় এরকম সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে কারো পক্ষেই ওঠা সম্ভব নয়। আসাদের তফসীরের বিপক্ষে এমন আরো কিছু অভিযোগ রয়েছে। সে অভিযোগের হয়তো কিছুটা হেতু আছে, এর ফলে কিছু ভুলবুঝাবুঝিরও হয়তো অবকাশ রয়েছে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার অবকাশ নেই। এমনকি তার বিরুদ্ধে বিচ্যুৎ হওয়ার অভিযোগও ভিত্তিহীন। তফসীরে দেখা যায় আসাদ কখনো কখনো প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করেছেন। যেমন তিনি জ্বীন শব্দের ব্যবহার করেননি, এর বদলে তিনি লিখেছেন good or bad impulses - শুভ ও অশুভ শক্তিসমূহ। একি তার যৌবনে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান পড়ার ফল।

আসাদের এ ধরনের তরজমার পদ্ধতি আরো গ্রহণযোগ্য হতে পারতো যদি তিনি এসব কথা পাদটীকা হিসেবে ব্যবহার করতেন, যেমন তিনি Appendix-III তে জ্বীন সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিশদ উল্লেখ করবার চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি জ্বীন বা শয়তানের অর্থ করেছেন ঃ Spiritual forces, angelic forces, satanic forces, occult forces, invisible or hitherto unseen beings- অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহ, দৈব শক্তিসমূহ, শয়তানী শক্তিসমূহ, গুপ্ত শক্তিসমূহ, অদৃশ্য অথবা এ যাবৎ অদেখা অস্তিত্বসমূহ। সূরা নাসে আসাদ জ্বীন শব্দের অর্থ করেন অদৃশ্য শক্তিসমূহ। ৪১ঃ২৬ এবং ৫৫ঃ৩৩ সুরাতে আসাদ অর্থ করেছেন অদৃশ্য অস্তিত্বসমূহ এবং ৭২ঃ১ ও ৪৬ঃ২৯ সুরাতে তিনি লিখেছেন অদেখা বস্তুসমূহ। তফসীরের পরিশিষ্টে এবং ৪৬ঃ২৯ ও ৭২ঃ১ সুরার পাদটীকায় জ্বীন সম্পর্কে বলতে যেয়ে আসাদ এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে এর দ্বারা কখনো কখনো মানুষকেও বোঝানো হয় ; সেক্ষেত্রে অপরিচিত (stranger) অর্থে এটিকে ব্যবহার করতে হবে।

তফসীরের পরিশিষ্ট-৪ এ আসাদ ইসরা ও মেরাজের ঘটনাকে বলেছেন এটা কোন শরীরি পরিভ্রমণ ছিল না, এটা প্রকৃতপক্ষে একটা অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক ঘটনা। রসুল (স.)-এর আত্মা শরীরবিহীন অবস্থায় মেরাজের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আসাদের মতে পুরো ঘটনাটাই ঘটেছিল অবস্তুর জগতে (Non-meterial World)। আসাদের এ ব্যাখ্যার সাথে হযরত আয়েশার (রা.) বর্ণনার মিল রয়েছে এবং তার এ ব্যাখ্যা অপ্রমাণ করার জন্য তেমন কোন হাদীসের বর্ণনাও পাওয়া যায় না। তার বিরোধীরা অবশ্য বলেছেন মেরাজের ঘটনার সময় আয়েশা ছিলেন ছোট এবং তখন রসুল (স.)-এর সাথে তার শাদীও হয়নি। আসাদ অবশ্য সমালোচকদের উত্তরে বলেছেন তার নিজের ব্যাখ্যার পাশাপাশি মেরাজের গতানুগতিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেও রাজি আছেন। কিন্তু আসাদের এ আপোস প্রস্তাবেও বিরোধীদের মন গলেনি।

মেরাজের পরিভ্রমণ শরীরি না আধ্যাত্মিক ঘটনা, এ নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বরাবরই একটি বিতর্ক চলেছে। সেক্ষেত্রে আসাদ একটি পক্ষ নিয়েছেন মাত্র। আমাদের দেশে মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ যখন আর তফসীরে মেরাজকে একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা বলতে চেয়েছিলেন তখনও তিনি এরকম সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

আসাদের এ সব আলোচনার মধ্যে যুক্তিবাদের যে একটা প্রবল যোগ রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত ঈসা (আ.) এর ভূমিষ্ঠ হয়ে কথা বলা কিংবা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গে আসাদের ব্যাখ্যা অথবা লোকমান, খিজির এবং জুলকারনাইনের ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকারের কথা বলা যেতে পারে। তার সমালোচকরা বলেছেন আসাদ কুরআন শরীফের অনেক বিষয়কেই নিছক উপমা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কুরআন শরীফে উল্লিখিত লোকমানকে আসাদ legendary sage – কিংবদন্তীর দরবেশ এবং mythological figure- পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খিজিরকে বলেছেন mysterious sage- রহস্যময় দরবেশ এবং allegorical figure, symbolizing mystical insight accessible to man- মানুষের বোধগম্য রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এক প্রতীক পুরুষ। আর জুলকারনাইনের ঐতিহাসিকতাকে তিনি একেবারেই স্বীকার করেননি, আসাদ মনে করেন যার সম্পর্কে কুরআনের উদ্দেশ্য ঃ sole purport is a parabolic discourse on faith and ethics- কল্পিত চরিত্রের মাধ্যমে নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া।

www.pathagar.com

কোরআনে বর্ণিত এই তিনটি চরিত্র সম্বন্ধে বড় জোর আমরা বলতে পারি আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম সম্বন্ধে (২১ঃ৬৯, ২৯ঃ২৪) আসাদ যখন বলেন তিনি শুধু আগুন থেকে রক্ষাই পাননি, আগুনে তাকে কখনোই নিক্ষেপ করা হয়নি তখন আমাদের মনে কি একটুও দ্বিধা জেগে ওঠে না আসাদের এই ব্যাখ্যা চোখ বুজে মেনে নিতে। এটা সত্য কোরআনে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়নি হযরত ইব্রাহীম আগুনের মধ্যেই ছিলেন। কুরআনের ভাষা ঃ আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন (২৯ঃ২৪)। আসাদ এরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন তাকে কখনোই আগুনে নিক্ষেপ করা হয়নি। এর মাধ্যমে কি আল্লাহর শক্তি ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সীমিত করে দেখা হয়নি, সেটা অবশ্য বিতর্কের বিষয়।

আসাদের এই বিশিষ্ট ভঙ্গি অন্যত্রও তার তফসীরে দৃশ্যমান। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভূমিষ্ঠকালীন অবস্থায় কথা বলা (১৯ঃ৩০-৩৩) সম্পর্কে তফসীরে লিখেছেন ঃ মনে হয় এটা এমন অবস্থা, যা একটা প্রকৃত আকার নেয়ার অপেক্ষায় আছে .... অতীত কাল ব্যবহার করে এখানে এমন একটা অবস্থার কথা বলা হয়েছে যা ভবিষ্যতেই বাস্তব রূপ পেতে পারে।

আবার যেমন হযরত ঈসার ঘোষণা (১৯ঃ৩০-৩৩) প্রসঙ্গে আসাদ লিখেছেন 'সম্ভবত' তিনি তা বলেছিলেন পরবর্তী সময়ে তার পূর্ণতা প্রাপ্তির পরে। সুতরাং এ আয়াতগুলো তার কাছে মনে হচ্ছে an anticipatory description - আগাম বর্ণনা। এখানেও দেখছি আসাদ যুক্তিবাদী প্রবণতার কারণে অলৌকিকতাকে বাদ দিয়েছেন।

কিছু কিছু আলেম আসাদের সমালোচনা করেছেন এ কারণে যে তিনি কোরআনে উল্লিখিত নাসিখ ও মানসুখ প্রসঙ্গে বলেছেন এর অর্থ এই নয় যে কুরআনের পরবর্তী আয়াত দ্বারা পিছনের আয়াতের কার্যকারিতা লোপ বরং নাসিখের প্রয়োগ হওয়া উচিত দুই ঐশী গ্রন্থের ভিতরে। তিনি মনে করেন ২ঃ১০৬, ১৩ঃ৩৯ এবং ৮৭ঃ৬ নং সুরার আয়াতে পিছনের ঐশী গ্রন্থের কথাই বলা হয়েছে, যে বাণীর কার্যকারিতা (১৬ঃ১০১) পরবর্তী ঐশী গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়ার ফলে শেষ হয়ে গেছে। এর ফলে আসাদের মতে একটা সরল রেখার গতিতে নৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি এগিয়ে গেছে, তওরাত থেকে যার শুরু এরপর ইঞ্জিল হয়ে কোরআনে গিয়ে যা শেষ হয়েছে। তিনি মনে করেন এটা ভাবতেও খারাপ লাগে যে কয়েক বছরের মধ্যে আল্লাহ তার মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং পিছনের বাণীগুলোকে অকার্যকর করে দিয়েছেন সামনের বাণী দিয়ে ; যেখানে আল্লাহই স্বয়ং কোরআনে বলেছেন এমন কিছু নেই যা তার বাণীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে (১৮ঃ২৭)।

একই কারণে আসাদ তার বিরুদ্ধ ধারণাকে প্রমাদপূর্ণ ও সুন্নাহ কর্তৃক অসমর্থিত বলে বাতিল করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে সব আয়াত বাতিল বলে মনে করা হয়েছে তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় না। তিনি বরং সন্দেহ করেছেন সেই সব উলামাদের যারা কুরআনের আপাত সামঞ্জস্যহীনতাকে ব্যাখ্যা করতে না পেরে নাসিখের প্রশ্নটা তুলেছেন, কেননা তারা চাননি এসব আয়াতের কোন আয়াসসাধ্য উচ্চতর চিন্তা ও বুদ্ধির সাহায্যে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বের করে আনতে। আসাদ তার তফসীরে মুসলিম নারীর ভূমিকা ও অধিকার প্রসঙ্গে যে সব কথা বলেছেন অনেকেই সেটা দেখতে

www.pathagar.com

চেয়েছেন এক ধরনের দুর্বল মানসিকতার (apologetic) প্রকাশ হিসেবে। বিশেষ করে ২৪ঃ৩১ সুরার আয়াতে ইল্লা মা জাহরা মিন্নার যে ব্যাখ্যা করেছেন তার জন্য তাকে সমালোচিত হতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। আসাদ উল্লেখ করেছেন মুসলিম নারীর মাথা আবৃত করার বাধ্যবাধকতা নির্ভর করছে সমকালীন সাংস্কৃতিক প্রথা ও পদ্ধতির উপর। আসাদের মতে তাই এ আয়াত মানুষের নৈতিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য যে সময় নির্ভর পরিবর্তনের প্রয়োজন, তার সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা বরাবরই সময়ের সাথে পাল্টায়। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কালে আসাদ বলেছেন অধিকাংশ আরবের নারীরা এক ধরনের মস্তক আবরণী খিমার ব্যবহার করতো যার উল্লেখ কোরআনে আছে (২৪ঃ৩১)। আসাদ মনে করেন এ আয়াতের নির্দেশ হচ্ছে খিমার কিংবা অন্যকোন উপায়ে মেয়েদের বক্ষকে আবৃত করে রাখা। অন্যভাবে আসাদের এ ব্যাখ্যাকে বলা যায় আল্লাহ যেন আদৌ মুসলিম নারীকে মস্তক আবৃত করতে নির্দেশ দেননি, অবস্থা এমন যে তাদের মস্তক আবৃতই রয়েছে। আসাদ মনে করেন ২৪ঃ৩১ সুরায় মেয়েদের যৌনাঙ্গ দৃষ্টির অগোচরে রাখবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মেয়েদের চুল নয়। আসাদ এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন ঐতিহ্যগতভাবে মেয়েদের মুখ, হাত, পা প্রদর্শন করবার নিয়ম আছে, কিন্তু তিনি কোন হাদীসের সমর্থন দেখাতে পারেননি।

একইভাবে ৩৩ঃ৫৯ সুরার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা ২৪ঃ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যার মতই। বাইরের পোশাক দ্বারা মেয়েদের আবৃত করার নির্দেশ প্রসঙ্গে (মিন জালাবি বিহান্না) আসাদ সেই একইভাবে সময়ের সাপেক্ষে দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিচালনা করতে চেয়েছেন কারণ এর উদ্দেশ্য কোন মাধ্যম (পোশাক) নয় বরং ফলাফল (সুন্দর পোশাক)। আসাদ যোগ করছেন ঃ নিয়ত পরিবর্তনশীল সময় ও সামাজিক পরিবেশকে মনে রেখে একটি নৈতিক নীতিমালা অনুসরণযোগ্য হওয়া উচিত।

আসাদের এ ব্যাখ্যা অবশ্যই আলেমরা মেনে নেননি কিন্তু তিনি যে পরিপ্রেক্ষিত ও সমস্যা সামনে রেখে এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন তা ঠিক ভালভাবে বুঝে বুদ্ধিগতভাবে এর একটা উত্তর তৈরি করাও যে তাদের উচিত ছিল তা একরূপ বলা চলে।

হিজাব প্রসঙ্গে আসাদ যে ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার একটা সমস্যা হচ্ছে এর ফলে যারা হিজাবের বিরোধী তারা এতে উৎসাহিত হবে এবং আসাদকে এ ব্যাপারে নজির হিসেবে তারা তুলে ধরবে। পরিণতিতে মুসলিম সমাজের মধ্যে মতান্তরের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে আসাদ তার জীবনব্যাপী সাধনায় ইসলাম নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো বারবার নেড়েচেড়ে দেখেছেন, এর সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভেবেছেন এবং একালে ইসলামের ভিতরকার জঞ্জালগুলো অপসারণ করে একে কিভাবে পয়মন্ত করা যায় এ ভাবনায় তিনি ক্লান্তিহীন সময় কাটিয়েছেন। শরীয়াহ, ফিকাহ ও ইজতেহাদ নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা, যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের তফসীর রচনা এসবের উদ্দেশ্য একই। তার প্রচেষ্টায় এক ধরনের যুক্তিবাদের প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে আয়োজনের বলিষ্ঠতা নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিবাদের জগতে পানি সিঞ্চন করতে চেয়েছিলেন তাকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

সাত

আসাদ শুধু একজন আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবীই ছিলেন না, একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং Frankfurter Zeitung এর মত মশহুর পত্রিকার নিকট প্রাচ্যের একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকও (১৯২২-২৬) ছিলেন। দীর্ঘদিন বাদশাহ্ আবদুল আজিজের রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের অশুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাদশাহকে সতর্ক করেন এবং ব্রিটিশ নাগরিক Harry St. John Philby'র সাথে প্রতিযোগিতায় নামেন। কেননা এই Philby ও বৃটেনের প্রতিনিধি হিসেবে বাদশাহকে বৃটেনের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া আসাদ লিবিয়ায় ইতালীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। পাকিস্তানের বুদ্ধিবৃত্তির জগতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করেছেন এবং দেশটির পররাষ্ট্র বিভাগে মধ্যপ্রাচ্য সেলের প্রধান হিসেবে, পরে জাতিসংঘে মন্ত্রীর মর্যাদায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ হচ্ছে আসাদের বহুমুখী প্রতিভার কয়েকটি দিক।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের কূটনৈতিক দায়িত্বে ইস্তফা দিয়ে তিনি Road to Mecca লেখা শুরু করেন। বই লেখা শেষ হলে তিনি ১৯৫৫ সালে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত স্পেনে স্থায়ী হন। এখান থেকেই আমৃত্যু তিনি তার বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৯২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আসাদ ইন্তেকাল করেন।

এ আলোচনার পর আমরা এখন আসাদ সম্পর্কে এটুকু অন্তত ধারণা করতে পারি মুসলিম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে এ কালে তার অবদান এক অসামান্য ব্যাপার। বিশেষ করে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতের পুনর্গঠনে তিনি নিরলসভাবে তার শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেছেন। এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে আসাদ তার মৃত্যুর পরে জীবৎকালের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়, কেননা পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে হলে, মুসলিম বুদ্ধিবাদের জগতে সচলতা আনা চাই ; আসাদ অন্তত সে পথটা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এ কালের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হবে আসাদ যেখানে শেষ করেছেন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করা। আসাদ আজীবন এই ধারাবাহিকতাটা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তার চেষ্টা করে গেছেন। কারণ জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা না থাকলে জাতির জীবনে জড়ত্ব আসবেই। মুসলিম সমাজ কি তার বড় প্রমাণ নয়। খ্রিস্টান ধর্মীয় জগতে একটি আদর্শবাদী ধারার প্রচলন আছে। এর নাম Ora et Labora। প্রার্থনা ও কর্ম। ইসলামে এর সমতুল্য চিন্তার নাম আল-ইনসান-আল-কামিল। ধর্ম ও কর্মের সাধনার মধ্যে পরিপূর্ণতায় পৌছানোর সংগ্রাম।

ইসলামের ইতিহাসে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে তাইমিয়া, ইকবাল ছিলেন এরকম ব্যক্তিত্ব। মোহাম্মদ আসাদকেও নির্দ্বিধায় আজ আমরা এদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Muhammad Asad, The Road to Mecca, Delhi : Adam Publishers and Distributers, 1992.

www.pathagar.com

২. Ismail Ibrahim Nawwab, 'Berlin to Mekkah: Muhammad Asad's Journey in to Islam, Saudi Aramaco World, January-February (2002), 6-32.
৩. Muhammad Asad, The Road to Mecca.
৪. Murad Hofmann, 'Muhammad Asad : Europes Gift to Islam', Islamic Studies, July (2000), 233-247.
৫. Quoted in Murad Hofmann, 'Muhammad Asad : Europes Gift to Islam.'
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. Murad Hofmann, 'Muhammad Asad : Europes Gift to Islam'
১৪. মুহাম্মদ আসাদ,মক্কার পথ, অনুবাদ : শাহেদ আলী। ঢাকা ঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৪।
১৫. Muhammad Asad, The Road to Mecca,
১৬. Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam. Karachi, 1961
১৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

রুহুল্লাহ খোমেনী

এক

আধুনিককালে ইমাম রুহুল্লাহ খোমেনী হচ্ছেন একমাত্র ইসলামী ধর্মবিশারদ যিনি তার বিশিষ্ট চিন্তাকে কার্যকরভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে বাস্তবায়ন করেছেন। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লবের পর তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন এবং রাতারাতি ইসলামের বিপ্লবী আদর্শবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য মিত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভীর পতনে পুরো পাশ্চাত্যে রীতিমত হৈচৈ পড়ে যায় বিশেষ করে ইরানী মোল্লাদের হাতে এককালীন মিত্রের এই বিপর্যয় তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় মনে হয় ও তারা বেদনার সাথে এটি হজম করতে বাধ্য হয়।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বরকন্দাজ ও নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী একাদিক্রমে প্রায় ৪০ বছর ইরান শাসন করেন। পিতা রেজা শাহ পাহলভীর মত পাশ্চাত্যের কাছে তিনিও আলোকিত মিত্র (enlightened ally) ও একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। তিনি ও তার পরিবারের লোকজন ইংরেজিতে কথা বলতে, পশ্চিমা পোশাক পরতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিতে ভালবাসতেন। যেখানে তাদেরকে বলা হতো They are like us.

১৯৭১ সালে মোহাম্মদ রেজা পাহলভী দেশ-বিদেশের নেতৃবৃন্দের সামনে জাঁকজমকের সাথে পারস্যের রাজতন্ত্রের ২৫০০ বছর পূর্তি উদযাপন করেন এবং নিজেকে ইরানের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন। অয়েল বুমের টাকা দিয়ে মোহাম্মদ রেজা শাহ পাশ্চাত্যের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ইরানের আধুনিকীকরণের এক উচ্চাভিলাসী অথচ অবাস্তব পদক্ষেপ হাতে নেন। যার তিনি নাম দেন White Revolution– শ্বেত বিপ্লব। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে তার ইসলামী ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করে পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে গড়ে তোলা। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্যের সহযোগিতায় শাহ একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন ও মধ্যপ্রাচ্যে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করেন। মজার ব্যাপার হলো এই রকম ক্ষমতাধর শাহের পতন ঘটে শ্মশ্রুমন্ডিত একজন প্রবাসী ইরানী আয়াতুল্লাহর হাতে। যিনি ইসলামের নামে একটি বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেন, পাহলভী রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেন এবং পুরো ইরানী জাতির মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে দেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াটি পাশ্চাত্যের সেকুলার জড়বাদী সভ্যতা হতবাক হয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তারা বুঝে উঠতে পারে না মধ্যযুগীয় একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা দিয়ে কিভাবে একটি জাতিকে জাগিয়ে দেয়া যায়। তারা ইসলামের এই বিপ্লবী ভূমিকার পিছনের কার্যকারণটি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ না করে চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ ইমাম খোমেনীর চরিত্র হননে মেতে ওঠে, যেহেতু তার উত্থানে মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের হানি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। তারা তাকে মধ্যযুগীয়, ধর্মোন্মাদ, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জন্য হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় বিবৃতি থেকে শুরু করে জনপ্রিয় সংগীত ও বিলবোর্ডে খোমেনী এমন একজন মানুষ হয়ে ওঠেন যাকে আমেরিকানরা শুধু ঘৃণা করতেই ভালবাসে।

অন্যপক্ষে মুসলিম আমজনতার কাছে ইমাম খোমেনী চিত্রিত হন ইসলামের রক্ষাকর্তা হিসেবে। যিনি দুর্নীতি, অবক্ষয় ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের হাত থেকে একালে ইসলামের শুদ্ধতা ও গৌরবকে পুনর্বহাল করেছেন। ইরানী বিপ্লবের ফলে আমজনতার মধ্যে এই প্রত্যয় গভীর হয় সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষিত স্বৈরশাসকদের জুলুম, নিপীড়ন থেকে তাদের মুক্তির দিন অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম দুনিয়ার সেকুলার ও জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর সাম্রাজ্যবাদের পো ধরা নীতিরও অবসান হতে চলেছে। ইমাম খোমেনী এমনতর আশ্বাস ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ

The cry that comes from the heart of the believer overcomes everything, even the white House ---- This wave has already spread through out the world, and the world is now liberating itself from the oppression to which it has been sebjected.[১]

দুই

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী মধ্য ইরানের খোমেন নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৯০২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। খোমেনীরা ছিলেন মুসাভী সৈয়দ যাদের পারিবারিক ধারা সপ্তম ইমাম মুসা আল কাজেমের ভিতর দিয়ে রসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এই পরিবারের আদিপুরুষ ভারতে হিযরত করেন এবং লাক্ষ্ণৌর কাছে ছোট শহর কিনতুরে স্থায়ী হন। কিনতুর ছিল তৎকালীন অযোধ্যা রাজ্যের অংশ যার শাসক ছিলেন শিয়া বার ইমামের অনুসারী। এই কিনতুরেই খোমেনীর দাদা সাইয়েদ আহমেদ মুসাভী হিন্দী জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি বিখ্যাত শিয়া আলেম মীর হামেদ হোসেন হিন্দীর সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, যার বিখ্যাত বই 'আবাকাত আল আনওয়ার' উপমহাদেশীয় শিয়াদের মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

সাইয়েদ আহমেদ মুসাভী ১৮৩০ সালে শিয়া পবিত্র স্থান নাজাফে তীর্থ ভ্রমণে যান যেখানে তার সাথে খোমেন গ্রামের এক ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হয়। তার আমন্ত্রণে মুসাভী ভারত ছেড়ে খোমেনে এসে স্থায়ী হন এবং গ্রামবাসীর আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকান্ডের নেতৃত্ব নেন। এখানে তিনি তার মেজবানের মেয়ে সকিনাকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির চারটি সন্তান হয় যার মধ্যে খোমেনীর পিতা মোস্তফার জন্ম হয় ১৮৫৬ সালে। মোস্তফা, মির্জা হাসান সিরাজীর তত্ত্বাবধানে নাজাফে লেখাপড়া করেন এবং ১৮৯৬ সালে খোমেনে ফিরে একজন মশহুর আলেম হিসেবে পরিচিত হন। মোস্তফার ছয় সন্তানের মধ্যে রুহুল্লাহ ছিলেন কনিষ্ঠ যিনি একমাত্র নামের শেষে খোমেনী (খোমেন থেকে) ব্যবহার করেন এবং এই নামেই পরবর্তীতে জগদ্বিখ্যাত হন।

খোমেনীর জন্মের সাত মাস পর তার পিতা মোস্তফা আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এই সময় ইরানে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে উলামা, ব্যবসায়ী ও আধুনিক শিক্ষিত সংস্কারবাদীদের নেতৃত্বে ১৯০৫-০৬ সালে বিখ্যাত শাসনতান্ত্রিক

www.pathagar.com

আন্দোলন (Constitutional Movement) শুরু হয় ও শাহ বিরোধী প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে শাহ কিছুটা পাশ্চাত্য ধাচের ও সংসদীয় প্রকৃতির শাসনতন্ত্র মঞ্জুর করতে বাধ্য হন। তরুণ খোমেনীর উপর এই অস্থিরতার দিনগুলো এক ধরনের ছাপ রেখে যায়। যদিও তিনি তার ফুপু সাহেবার স্নেহছায়ায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠেন। সাহেবা ছিলেন শক্ত মনের মহিলা, যিনি তার ভাইয়ের সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। খোমেনীর জীবনে তার মা ও এই ফুপুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ষোল বছর বয়সে খোমেনী তার মা ও ফুপু উভয়কে হারান। শৈশবে খোমেনীর লেখাপড়া শুরু হয় সরকারি স্কুল ও মক্তবে। এখানে তিনি আরবী ভাষা, ফারসী কবিতা ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ে পাঠ নেন। এ সময়ে তাকে কুরআন শরীফের কয়েকটি স্তবক, হাদীসের কিছু অংশ এবং নবী ও ইমামদের উপর কিছু বাক্য মুখস্থ করতে হয়। আর একটু বড় হলে খোমেনী ধর্মীয় বিষয়গুলো আরো গভীরভাবে অধ্যয়নের চেষ্টা করেন। পনের বছর বয়সে তিনি তার ভাই মুর্তজার সাথে আরবী ব্যাকরণ শেখা শুরু করেন। এ সময় কবিতার প্রতিও তার আগ্রহ জন্মে। বিশেষ করে সাদীর নীতিমূলক ও হাফিজের আধ্যাত্মিক ভাবমন্ডিত কবিতা চর্চায় তার উৎসাহ দেখা যায়। পরবর্তীকালে তার লেখালেখিতে এসব কবিদের উদ্ধৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবিতার প্রতি তার ভালবাসা কত প্রবল ছিল তা সমকালীন ইরানের একজন কবি নাদের-এ-নাদের পুরের, খোমেনীর সাথে সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ We recited poetry for four hours. Every first line I recited from any poet, he recited the second.[২] খোমেনীর ক্যালিগ্রাফিতেও ঝোঁক ছিল। এই বিদ্যা তিনি বিখ্যাত উস্তাদ শেখ হামজা মাহাল্লাতির নিকটে বসে শিখেছিলেন এবং তার এ বিষয়ে আগ্রহ এত বেশি ছিল যে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ক্যালিগ্রাফির চর্চা করতেন।

রুহুল্লাহ খোমেনী ছিলেন মূলতঃ মধ্য ইরানের সৃষ্টি যেই স্থান কিনা শত শত বছর ধরে শিয়া ইসলামের জন্য আলেম ও ধর্মবিদদের সরবরাহ করে আসছে। খোমেনীর স্বপ্ন ছিল একজন মুজতাহিদ হওয়ার। কিন্তু খোমেনে বসে সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। নাজাফ হতে পারত এর জন্য উত্তম স্থান। কিন্তু উসমানী খেলাফতের পতনের পর ইরাক ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে চলে যাওয়ার ফলে সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। ফলে খোমেনী তার মত পরিবর্তন করেন। অন্যদিকে খোমেনের নিকটস্থ ইসপাহান ছিল শিয়া আলেমদের আর একটি কেন্দ্র। খোমেনী সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইসপাহানে অবস্থানকালে খোমেনী শুনতে পান ইরাকের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেখানকার আলেমরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা শুরু করেছে বিশেষ করে এ পরিস্থিতি পরিহার করবার জন্য বিখ্যাত আলেম শায়খ আবদুল করিম হায়েরি ইয়াজদি কারবালা ছেড়ে আরকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। যে ছাত্রের জন্য নাজাফ যাওয়া ছিল স্বপ্ন তার জন্য এ এক অভূতপূর্ব সুযোগ। সুতরাং রুহুল্লাহ খোমেনী ১৭ বছর বয়সে আরকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। আরকে হায়েরি প্রখ্যাত আলেম হাজ-আকা মোহসেন আরকী প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় বিদ্যা দান শুরু করেন। এখানে খোমেনী শুরুতে মিসরের মশহুর আলেম জালালুদ্দীন সয়ুতী কৃত আরবী ব্যকরণ অধ্যয়ন করেন। খোমেনী ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী, যে জিনিস শেখার সিদ্ধান্ত নিতেন সেখান থেকে তাকে ফেরানোর উপায় ছিল না এবং গুনের ব্যাপারে আপোসহীনতা তার আমৃত্যু অক্ষুণ্ন ছিল।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি ইরাকের শিয়া আলেমরা ব্রিটিশ শাসনে স্বস্তিতে ছিলেন না। তারা ইরানে এসে আশ্রয় নেন। কোম ছিল বহু পুরনো শিয়া ধর্মবিদদের কেন্দ্র। তাছাড়া এ শহরে অষ্টম ইমাম রেজার বোন মাসুমার কবর থাকায় এর একটি আলাদা মর্যাদা ছিল। হায়েরি ১৯২১ সালে কোম সফর করেন এবং সবাই তার শিক্ষাকেন্দ্রকে কোমে স্থানান্তর করার অনুরোধ করলে তিনি এখানে স্থায়ী হন। হায়েরির আগমনে কোমের ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এদিকে শেষ কাজার বাদশাহ আহমদ শাহ স্বয়ং কোমে এসে হায়েরির আগমনকে মোবারকবাদ জানান। হায়েরির সাথে সাথে নানা স্থান থেকে শিয়া আলেমরা কোমে এসে জড়ো হতে থাকে এবং কোম তখন একটি ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পাঁচ মাস পর খোমেনীও কোমে এসে হাজীর হন।

এখানে খোমেনীর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোহাম্মদ রেজা মাসজেদশাহী যিনি তাকে কবিতা ও তর্কবিদ্যা শেখান। মাসজেদশাহী ছিলেন ইরানের প্রথম যুগের আলেমদের একজন যিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর সমালোচনা করে বই লিখেছিলেন যার নাম ছিল The Critique of Darwin's philosophy. খোমেনী তার ওস্তাদের এই বইটি নিয়েও বেশ আগ্রহবোধ করেছিলেন। খোমেনী এখানে তার অপর ওস্তাদ আয়াতুল্লাহ আলী ইয়াসরেবি কাশানির তত্ত্বাবধানে ফিকাহ ও তার নীতিসমূহের অধ্যয়ন শেষ করেন। এরপরে তিনি হায়েরির ক্লাসে যোগ দেন। হায়েরির কাছে পাঠ নেয়ার অর্থ ছিল একজন ছাত্র তৃতীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। হায়েরি ছাত্রদের 'দারসে খারাজ' পড়াতেন। দারসে খারাজের মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট পাঠের বাইরে পড়াশুনা (Studies beyond the text) । এখানে ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট পাঠ ছিল না এবং ছাত্ররা স্বাধীনভাবে আইন বিষয়ে তাদের মতামত দিতে শিখতো। এটা ছিল খোমেনীর শেষ পর্বের পড়াশুনা। ১৯৩০ এর দশকের প্রথম দিকে তিনি একজন পুরোপুরি মুজতাহিদে পরিণত হন এবং ইজাজাহ (সনদপত্র) লাভ করেন।

তিন

খোমেনী যখন কোমে বসে ফিকাহ ও উসুলের উপর পড়াশুনা করছেন তখন তিনি কিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনেরও চেষ্টা করেছিলেন। আজকের দিনে খোমেনী এক বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লব ও গণআন্দোলনের প্রেরণাদাতা হিসেবে বন্দিত হলেও এই বিপ্লবী পুরুষের ভিতরের মানুষটিতে এক ধরনের সুফীবাদী অন্তর্লীনতা বহমান ছিল তা অনেকেরই অজ্ঞাত। এটা সত্য তিনি ছিলেন একদিকে সমকালের অন্যতম প্রধান ফকীহ, ইসলামী দর্শনে প্রবুদ্ধ এবং আধুনিককালে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারিগর অন্যদিকে মন মানসিকভাবে তিনি ছিলেন একজন খাটি সুফী এবং এই জগতে তার যথাযথ জ্ঞান ও সাধনাও ছিল। খোমেনী কোমে অবস্থানকালে 'ইরফান' ও 'হিকমার' চর্চা করেন এবং এই বিদ্যা তার জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরীতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

ইরফান হচ্ছে মানুষের অন্তর্জগতের এমন এক ধরনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা খোদার সান্নিধ্য অর্জনের সহায়ক। আর হিকমা হচ্ছে যুক্তি ও বুদ্ধির ব্যবহার করে চূড়ান্ত সত্য সম্বন্ধে ধারণা অর্জন। ইসলামের আধ্যাত্মিক জগতে হিকমার সাধনা করেছিলেন ইবনুল আরাবী বিশেষ করে এই সাধনাকে ইরানে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন মোল্লা সাদরা। অন্যদিকে ইরানে ইরফানের সাধনা করেন মরমী কবি রুমি আর হাফিজ সিরাজীর

www.pathagar.com

চবিতায় হিকমা ও ইরফানের মিশ্রণ দেখা যায়। খোমেনী সুফী সাধনার এই ঐতিহ্যকে মাত্মস্থ করেছিলেন বিশেষ করে তিনি তার এক শিক্ষক শাহবাদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শাহবাদী নিজে ছিলেন আধ্যাত্মিক রসে নিগূঢ় একজন মিস্টিক। কিন্তু তার সুফীবাদী বিশ্বাস জীবনের সক্রিয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি ছিলেন ইরানের সেই াব মোল্লাদের একজন যারা রেজা শাহর নিষ্ঠুর নীতির বিরোধিতা করতেন। শাহবাদী তার ছাত্রদেরকে বলতেন মুসলিম উম্মার মুক্তির জন্য তাদেরকে উঠে দাঁড়াতে হবে। শাহবাদী এ লক্ষ্যে একটি কর্মসূচীও তৈরি করেছিলেন। শাহবাদীর বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালে খোমেনীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে প্রভাব ফেলেছিল। কার্যতঃ তিনি ছিলেন তার ওস্তাদের ভাবশিষ্য ঃ

In a reference to shahabadi, Khomeini acknowledges his influence, stating that he was not only a perfect theologian and mystic but also a combatant (mobarez), these being the three key facets of khomeini's own personality.[৩]

খোমেনী দোয়া আল সাহার (The Dawn Supplication) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন শরীয়াহর সাথে সুফীবাদের কোন সংঘর্ষ নেই। তিনি যুক্তি দেন ইরফানের সাথে শরিয়ার অন্তর্গত কোন মতদ্বৈধতা নেই। যে ইরফানের চর্চা করবে সে একই সাথে শরীয়াহরও অনুগত থাকবে। খোমেনীর ব্যক্তিত্ব একই সাথে ইরফানের প্রশান্ত মধুর অভিব্যক্তি এবং শরীয়াহর শৃঙ্খলাবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। মোল্লা সাদরার মত খোমেনীও মনে করতেন আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন জিনিস। তাই যে কোন ধরনের সামাজিক সংস্কারের আগে দরকার আধ্যাত্মিক সংস্কার এই ছিল তার বিশ্বাস। খোমেনী তার মৃত্যুর আগে এক বক্তৃতায় তার ভক্তদের ইরফান চর্চায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন যা তার ভাষায় আজকের দিনের অনেক উলামারা অবহেলা করছে। যারা তাকে দেখতে যেত তারা তার সুফীবাদী অন্তর্লীনতা, আত্মসমাহিত চেহারা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং ধীর লয়ে তার বক্তৃতার ধরন দেখে মুগ্ধ হতো ও তাকে একজন শুদ্ধ সুফী হিসেবে শ্রদ্ধা জানাতো। আজকের দিনের সুফীদের কেউ কেউ রিপুর তাড়নায় ভেসে গিয়ে মাতাল অবস্থায় তারা তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে বিপদসংকুল করে তোলে সত্য কিন্তু শুদ্ধ সুফীরা নিজের উপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে রক্ষা করেন যাতে কোন বাড়াবাড়ির ঘটনা না ঘটে।

মোল্লা সাদরার মত ইমাম খোমেনীও মনে করতেন উম্মাহর ইমামকে কোন রাজনৈতিক মিশন হাতে নেয়ার আগে তাকে আত্মবিকাশের লক্ষ্যে এক সুফীবাদী যাত্রা শুরু করে খোদার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং নিজের আত্মস্বার্থপরতা এমনভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে যাতে তার সামনে ঐশী আলো ও জ্ঞান উন্মোচিত হয়। এই কষ্টসাধ্য শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে আত্মোন্নতি করার পর সুফী বাস্তব জগতে ফিরে আসবে, খোদার বাণীকে প্রচার করবে এবং সমাজে ঐশী আইনকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইরানী বুদ্ধিজীবী হামিদ আলগার লিখেছেন যখন খোমেনী ১৯৬৩ সাল থেকে শাহর বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছেন তার আগেই তিনি সুফীবাদী পরিভ্রমণ শেষ করে বাস্তব রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন।[৪]

www.pathagar.com

মুসলিম সুফী জগতে সম্পূর্ণ মানুষের (Perfect Man) একটা ধারণা বরাবর ছিল। সুফীরা মনে করেন রসুল (স.) হলেন এই পূর্ণ মানুষের অত্যুজ্জ্বল নমুনা। তাকে অনুকরণ করেই মানুষ আধ্যাত্ম জগতের সাধনায় কামিয়াব হতে পারবে। যদিও শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে এই সাধনার ধারায় একটু তফাৎ আছে। শিয়া সুফীরা মনে করেন একমাত্র ইমামতের ধারায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় অন্য দিকে সুন্নী সুফীরা রসুল (স.) কে আদর্শ ধরে নিজের সাধনায় উন্নততর স্তরে পৌঁছানোর কথা বলেন। সুফীদের কথা হলো রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর তার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে তারাই বহন করে নিয়ে চলেছেন এবং তারাই হচ্ছেন রসুল (স.)-এর আধ্যাত্মিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকারকে বলা হয় বেলায়েত তাকভিনি (Cosmic or Creational Guardianship)। তাদের কাছে রসুল (স.)-এর এই অন্তর্জগতের উত্তরাধিকার, তার বহির্জগতের রূপ ও চেহারা যাকে বলা হচ্ছে বেলায়েত তাশিরির (Legislating Guardianship) চেয়ে মূল্যবান। সুফিরা মনে করেন তারা হচ্ছেন রসুলুল্লাহর সত্যিকার প্রতিভূ যাদের উপর তিনি খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের (Vicegerent of God) দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাদের এই অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

আগেই বলেছি খোমেনী কোন জীবন বিচ্ছিন্ন সুফী ছিলেন না। সুফী হয়েও একালে তিনি একটি সফল গণআন্দোলনের রূপকার ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। একজন সুফী একই সাথে আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছেন অন্যদিকে সক্রিয় রাজনীতিতে, আন্দোলনে, সংগ্রামে, সামাজিক সুবিচার ও ইসলামী নীতি প্রতিষ্ঠায় বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছেন। খোমেনী তার বই মেরাজ আল সালেকিন, ওয়া সালাত আল আরেফিন এ সুফী সাধনায় বিভিন্ন স্তরের কথা আলোচনা করেছেন আবার এ কালে ইসলামকে বুনিয়াদ করে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেলও উপস্থাপন করেছেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন বেলায়েত তাকভিনি ও বেলায়েত তাশিরির অপূর্ব সমন্বয়। এই কারণেই খোমেনী ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে বেলায়েতের ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন। তার মতে ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে একই সাথে জীবন ঘনিষ্ঠ সুফী ও আলেমদের শাসন ব্যবস্থা (খোমেনীর ভাষায়, বেলায়েত ফকীহ, ইংরেজিতে The scholars are rulers over the people) যারা নাকি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

১৯৭৯ সালের ইরানী বিপ্লবের পর বৈরী পশ্চিমা মিডিয়া ইমাম খোমেনীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আক্রমণ চালায়, কিন্তু তার সাধারণ মিতচারী জীবন যাপন, সুফীবাদী অন্তর্লীনতা ও অসীম ধৈর্য তাকে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে শাহের নিষ্ঠুর শাসনের সময় তার ছেলেকে হত্যা করা হয়। তাকে দেশান্তরী হতে বাধ্য করা হয়। সর্বোপরি ইরানী জনগণের উপর জুলুমের খড়গ নেমে আসে। একমাত্র সুফীর ধৈর্য ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দিয়ে তিনি এ অন্ধকার সময়কে অতিক্রম করেন এবং জনগণকে তিমির হননের স্বপ্ন দেখান।

ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে খোমেনীর গভীর লেখালেখির পাশাপাশি তিনি কবিতায়ও হাত পাকিয়েছিলেন। তার সে সব কবিতা ইরানী কবিদের দীর্ঘ মিস্টিক ঐতিহ্যের ভাবমন্ডিত। এ সব কবিতায় খোমেনীর যে মিস্টিক মনের চেহারা ফুটে উঠেছে তা পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

।প্রচারের সামনে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদও বটে। খোমেনীর এসব মিস্টিক কবিতার
টা নমুনা দেখা যাক ঃ

'e become possessed by the beauty spot above your lip, on friend
aw your fevered eye, and fell ill
)en the wine house door to me day and night
r I am fed up with mosque and seminary.
ought help from the breath of the wine besotted drunkard
rmit me to recall the temple of idols
vas awakened by the hand of the idol of the wine house.[৫]

।

ানের ইসলামী ইতিহাসে সেখানকার শিয়া আলেমদের একটা বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে। রা বিভিন্ন সময় জুলুমবাজ শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং জনগণের তারে নেমে এসে তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরকম ন্দোলনের সাম্প্রতিক দুটো নমুনা হচ্ছে ১৮৯১-৯২ এর তামাক আন্দোলন এবং ০৫-১১ সালে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তামাক আন্দোলন ছিল সির উদ্দীন শাহ্ কর্তৃক একটি ব্রিটিশ কোম্পানীকে একচ্ছত্র তামাক ব্যবসায়ের সুবিধা ারার প্রতিবাদ। উলামারা ফতোয়া জারি করে দেশব্যাপী ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট ও ব্যবসা নের ডাক দেন। শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় ধর্মীয় পতীক ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে হার করে এক রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল শাহের ঙ্কুশ ক্ষমতাকে শাসনতান্ত্রিকভাবে খর্ব করা।

হলভী জামানায় (১৯২৫-৭৮) ইরানে ইসলামের সামাজিক ভূমিকা ও উলামাদের াবকে দুর্বল করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। রেজা শাহ্ পাহলভী (১৯২৫-৪১) ও র পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভীর (১৯৪১-৭৮) নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে উলামারা দের দীর্ঘ ঐতিহ্যের পথ ধরে আবার ঘুরে দাঁড়ান। এ পর্যায়ে ইমাম খোমেনী তার ধ্যাত্মিকতার আবরণকে, যাকে শিয়া পরিভাষায় বলে তাকিয়া ছুড়ে ফেলেন। তাকিয়া ন হচ্ছে যখন মুসলমানরা প্রতিরোধের শক্তি না থাকায় নিরুপায় হয়ে নিষ্ক্রিয়তা লম্বন করে এবং নিজ বিশ্বাসকে রক্ষা করে। খোমেনী ইরানের এই দুঃসময়কে তার তিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখেন এবং বলেন ঃ .... the people were fish, feeble and sluggish, so that they were unable to resist the :tatorship of Reza Shah. People locked the necessary moral fibre to mbat this decay, and Iran as a nation thus lay dormant.[৬]

মেনী এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন এবং কোমের বিখ্যাত ফয়জিয়া রাসায় ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধ ভিত্তিক নিয়মিত বক্তৃতা শুরু করেন। তার নীতি মিশ্রিত বক্তৃতা শুনবার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতে থাকে এবং তার াব ধর্মীয় বৃত্তের বাইরে সাধারণ জনগণের মধ্যেও অনুভূত হতে থাকে। ইরানের ারণ মোল্লারা যেভাবে তাদের শ্রোতাদের দোজখের শাস্তি ও বেহেশতের পুরস্কারের া বলে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করতেন খোমেনী তারধারে কাছেও ছিলেন না।

www.pathagar.com

খোমেনী তার বক্তৃতায় ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার কথা যেমন বলতেন তেমনি ধর্মীয় সচেতনতা, আত্মজাগরণের বিষয়গুলো ও ইসলামের অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোকপাত করতেন। কর্তৃপক্ষ খোমেনীর এই জনপ্রিয় বক্তৃতাকে রীতিমত হুমকি হিসেবে মনে করতে থাকে এবং তাকে বক্তৃতা দেয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

খোমেনী তখন নিভৃতে চলে যান ও নীরবে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। তার বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আয়াতুল্লাহ মোর্তজা মোতাহহারী, আয়াতুল্লাহ্ হুসেন আল মুনতাজেরী, আয়াতুল্লাহ জাভেদ আমুলি ও ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমি রাফসানজানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রেজা শাহ্ পাহলভীকে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সরিয়ে দিয়ে তার পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহ্লভীকে ক্ষমতায় আনে। এই সময় খোমেনী তার পরিকল্পনাকে পুনরায় চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন। ১৯৪৪ সালে ইয়াজদের একটি মসজিদের পরিদর্শক বইতে তার প্রথম লিখিত রাজনৈতিক বিবৃতিটি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লিখছেন ঃ

It is our selfishness and the abandoning of an uprising for God that has led to our present dark days and subjected us to world domination. It is selfishness that has undermined the Muslim world.[৭]

তার স্বধর্মীদের নিষ্ঠাহীনতা ও অকার্যকর ভূমিকায় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে খোমেনী এমন কথাও বলেছেন মুসলমানের এখন উচিত বাহাইদের ত্যাগ ও প্রতিজ্ঞা থেকে শিক্ষা নেয়া, যদিও তিনি তাদেরকে মুরতাদ হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি এ সময় তার প্রথম রাজনীতি নির্ভর গ্রন্থ কাশফআল আসরার (The Discovery of Secrets) লেখেন যা ১৯৪২ সালে সম্পূর্ণ হয়। কাশফ আল আসরারে তিনি রেজা শাহর স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেমন লিখেছেন তেমনি একশ্রেণীর উলামা ও আত্মস্বার্থপর রাজনীতির স্বরূপও তিনি উন্মোচন করেছেন। রেজা শাহ্ সম্পর্কে এখানে তার তির্যক উক্তি খেয়াল করার মতো ঃ

.... that illeterate soldier who knew that if he did not suffocate them (the ulama) and silence them with the force of bayonets, they would oppose what he was doing to the country and religion.[৮]

অন্যদিকে এই বইতেই প্রথম ইমাম খোমেনীর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু মতামত দেখা যায়। বিশেষ করে খোমেনী তার পাঠক ও উলামাদের এই বইয়ের সরকার পদ্ধতির উপর অধ্যায়টি দেখার অনুরোধ করেছেন। তার মতে সরকার হচ্ছে ঃ

Government can only be legitimate when it accepts the rule of God and the rule of God means the implementation of the Sharia. All laws that are contrary to the Sharia must be dropped because only the law of God will stay valid and immutable in the face of changing times.[৯]

পাঁচ

পিতা পুত্র দুই শাহের আধুনিকীকরণ বিশেষ করে পুত্রের শ্বেত বিপ্লবের ধাক্কা সামলানো ইরানীদের জন্য একসময় কঠিন হয়ে পড়ে। মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহলভীর শ্বেত বিপ্লব

www.pathagar.com

ছিল মূলতঃ পশ্চিমীদের পরিকল্পিত এবং তাদেরই স্বার্থে পাহলভী এটা কার্যকরী করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্বেত বিপ্লবের লক্ষ্য সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন এর ফলে ইরানে একটি ক্ষুদ্র পশ্চিমীকৃত ধনবাদী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। শহরের বিরাট গরীব জনসাধারণ ও গ্রামের সাধারণ মানুষ আধুনিকীকৃত শহরগুলোর চাকচিক্যের তলায় হারিয়ে যায়। শাহের কার্যক্রমের ফলে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উপকার হলেও একসময়কার কৃষিভিত্তিক স্বনির্ভর দেশটি আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ে। গ্রাম থেকে শহরে আসা ভাগ্য পরিবর্তনেচ্ছুক মানুষদের ঠাঁই হয় শেষ পর্যন্ত বস্তিগুলোতে। একজন লেখকের ভাষায় ঃ

For these millions, most of whom had been forced out of the villages in to new shanty towns, the oil boom did not end poverty, it merely modernized it.[১০]

এই আধুনিকীকরনের ফলে মোল্লা ও ব্যবসায়ীরা উভয়ই আক্রান্ত হয় এবং তাদের পোশাক, শিক্ষা, ব্যবসা, আইন কানুন প্রত্যেকটি বিপন্ন হয়ে পড়ে। মোল্লা ও ব্যবসায়ীরা দেখে ইরান পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং ক্রমে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে যার ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক স্বার্থ, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বিশ ও ত্রিশের দশকে রেজা শাহর পোশাক আইনের ফলে ছেলেদের জন্য পশ্চিমী পোশাক নির্ধারিত হয়, হিজাবকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং মোল্লাদের পোশাক স্থান বিশেষে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। পুত্রের শ্বেত বিপ্লবের কালে এই প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলে। ব্যবসায়ীরা দেখে তাদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা বিদেশী ব্যাংক, লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের আগমনের ফলে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আগেই বলেছি বিদেশী নির্ভরশীলতা ও হস্তক্ষেপ ইরানে একবার তামাক বিদ্রোহের মত ঘটনা ঘটিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে এসে এটি আরো স্পষ্ট হয়। ইরানের জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের আন্দোলনের ফলে শাহ বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। মোসাদ্দেক পশ্চিমী তেল কোম্পানীগুলোকে জাতীয়করণ করায় সাম্রাজ্যবাদীদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা তখন মরিয়া হয়ে শাহকে রোম থেকে মার্কিন সামরিক বিমানে সিআইএ প্রধানের পাশে বসিয়ে তেহরানে এনে হাজীর করে ও জনপ্রিয় মোসাদ্দেককে উৎখাত করে নিজেদের তেল স্বার্থ নিশ্চিত করে। এই ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে ইরানীরা দেখে, হজম করে এবং ঘটনার গভীরতা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তাও তারা আন্দাজ করতে পারে। বাছ-বিচার নির্বিশেষে ইরানের অবাধ পশ্চিমীকরণ, পশ্চিম নির্ভরশীলতা এবং পশ্চিমী অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ ইরানী মানসকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। ইরানীদের কাছে পরিচিত দুনিয়া এখন অপরিচিত হয়ে ওঠে এবং নিজ দেশে তাদেরকে পরবাসী মনে হয়। ১৯৫৩ সালের ঘটনা অনেক ইরানীর মনেই দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে অপমান ও পরাজয়ের দগদগে স্মৃতি হয়ে থাকে। এমনকি পশ্চিমা শিক্ষিত ইরানীরাও বিচ্ছিন্নতায় ভুগতে থাকে, তাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কাছে যেন তারা অপরিচিত হয়ে ওঠে এবং দুই পৃথিবীর মাঝে তারা যেন দুলতে থাকে। বুদ্ধিজীবীরা ইরানী জনমানসের এই দ্বিধা, বিচ্ছিন্নতা, খন্ডীকরণকে বলেছেন West-Toxication। এর মানে হচ্ছে ইরানী জনগণ পশ্চিমের বিষক্রিয়ায় দূষিত ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

শাহ তার শ্বেত বিপ্লব শুরু করার পর মজলিস স্থগিত করে দেন। ১৯৫৩ সালের ঘটনার

www.pathagar.com

পর শাহ্ এতই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে তার মনে হয়েছিল তিনি তার সংস্কার কার্যক্রম সহজে এগিয়ে নিতে পারবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই তার গুপ্ত পুলিশ সাভাক, যা কিনা সিআইএ ও ইসরাইলী মোসাদের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল তাকে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

শাহ্র বিতর্কিত কার্যক্রমে পুরো ইরান ফুঁসে ওঠে। বিশেষ করে ভূমি সংস্কার আইন, পশ্চিমী ধাচের নারী অধিকার, কুরআন শরীফকে সর্বোচ্চ আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি বাতিল প্রভৃতি ইরানী জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। কোমের ফয়জিয়া মাদরাসায় বিদ্যাদানরত ইমাম খোমেনী তখন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। শিয়া আলেমরা অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অথবা অনেকেই তাকিয়ার ধারণা নিয়ে বসে আছেন। জনগণ অপেক্ষা করতে থাকে কখন তাদের পক্ষে একজন নেতা উঠে আসবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

ইমাম খোমেনী আবার তার নীরবতাকে ভেঙ্গে ফেলেন। ১৯৬৩ সালে কোমে তিনি শাহ্র কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাকে ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। এমন একটা সময় যখন শাহ্র বিরুদ্ধে টু শব্দ করার সাহস কারো ছিল না। খোমেনী তখন তার জুলুম ও অবিচারমূলক শাসনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন এবং শাহ্ কর্তৃক অবৈধভাবে মজলিস বাতিল, বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন দালালী ও ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার অপহরণকারী ইসরাইলকে সমর্থনের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। বিশেষ করে খোমেনী ইরানের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে বিচলিত ছিলেন। তিনি শাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন তার উচিত হবে প্রাসাদ থেকে নেমে এসে দক্ষিণ তেহরানের বস্তিগুলো ঘুরে দেখা। আর এক ঘটনায় তিনি একহাতে কুরআন শরীফ, অন্য হাতে ১৯০৬ সালের সংবিধান নিয়ে শাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন তিনি এটি হেফাজত করার শপথ ভঙ্গ করেছেন। এই ঘটনার দ্রুত প্রতিক্রিয়া হয়। শাহ্র অনুগত সাভাক বাহিনী কোমের ফয়জিয়া মাদারাসা ঘিরে ফেলে, আক্রমণ চালায়, প্রচুর ছাত্রকে হত্যা করে এবং শেষমেষ খোমেনীকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। দিনটি ছিল ১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ, শিয়াদের ষষ্ঠ ইমামের শাহাদৎবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে শাহের দুষ্কৃতি তার জন্য আত্মঘাতী হয় এবং খোমেনীর সাথে তার দীর্ঘ সংগ্রামে এইভাবে তিনি ইসলাম ও ইমামদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকেন। কয়েকদিন পর খোমেনীকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু তিনি আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। সাভাকের আক্রমণের ৪০ দিন পর ফয়জিয়া মাদরাসার ছাত্ররা শহীদদের স্মরণে এক শোক মিছিল বের করে। খোমেনী সেখানে বক্তৃতা দেন এবং এই আক্রমণকে বর্তমান শাহ্র পিতা রেজা শাহ্ কর্তৃক ১৯৩৫ সালে মাশাদের শিয়া পবিত্র স্থান আক্রমণের সাথে তুলনা করেন যেখানে শত শত প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছিল। পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে তিনি শাহ্র সমালোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইমাম হোসাইনের শাহাদৎবার্ষিকী আশুরার দিনে এক শোক দীপ্ত বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শুনে রাওদার দিনের মতো জনগণ কাঁদে, অশ্রুবর্ষণ করে। খোমেনী শাহকে কারবালার কুচক্রী ইয়াজিদের সাথে তুলনা করেন এবং ঘোষণা দেন সে ধর্মকে, জাতিকে, বিশ্বাসকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। সুতরাং খোমেনীর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ হচ্ছে ঃ

Our country, our Islam are in danger. What is happening, and what is

www.pathagar.com

about to happen worries and saddens us. We are worried and saddened by the situation of this ruined country. We hope to God it can be reformed.[১১]

পরবর্তী সকালে খোমেনীকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং এই ঘটনার ভিতর দিয়ে শাহ্ শুধু আগুনেই ঘি ঢালেন। এই ঘটনা জানার পর হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় প্রতিবাদ জানাতে নেমে আসে এবং তেহরান, মাশাদ, সিরাজ, কাশান, ভারামিন প্রভৃতি বড় বড় শহরে প্রতিবাদকারী জনতার সাথে সাভাকের রীতিমত সংঘর্ষ হয়। সাভাক জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে, ট্যাংক চালিয়ে দেয় ও জনতাকে জুম্মাহর নামাজ পড়তে বাধা দেয়। তেহরান, কোম, সিরাজে, উলামারা প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন। কেউ কেউ কাফনের কাপড়ে আবৃত হয়ে জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বের হয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার ছাত্র, সাধারণ মানুষ ও মোল্লাহ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। এই গণজাগরণ ঠেকাতে সাভাককে বেশ কাঠখড় পোহাতে হয়। কিন্তু এই ঘটনা শাহের শাসনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয় এবং তিনি যে বৃথাই আগুন নিয়ে খেলছেন তাও কারো বুঝতে বাকি থাকে না। এই ঘটনায় শত শত ইরানী শহীদ হয়।

খোমেনী সামান্যর জন্য ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা পান। প্রবীণ মুজতাহিদ আয়াতুল্লাহ কাজিম শরিয়ত মাদারি খোমেনীকে গ্রান্ড আয়াতুল্লাহ হিসেবে অভিষিক্ত করে তাকে শাহর হাত থেকে নিরাপদ রাখেন। কেননা এ অবস্থায় শাহর জন্য তাকে হত্যা করা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠত। মুক্তির পর খোমেনী ইরানী জনতার স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তার ছবি বিভিন্ন স্থানে শোভা পেতে থাকে। কারণ তিনি ইরানী জনগণের অব্যক্ত ভাষাকে মুখর করে তুলেছেন। তিনি তার বক্তৃতায় বারবার ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদী ও খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কথা বলতেন। জনগণও তা বিশ্বাস করতো, কেননা তারা সাভাকের সাথে সিআইএ ও মোশাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা দেখতে পেত। এখানে বোঝা দরকার খোমেনী ইরানী জনগণের কষ্টকে এমনভাবে প্রকাশ করতেন যাতে তারা বুঝতে পারে। যেখানে একজন শাহের মার্ক্সবাদী বা উদারনৈতিক সমালোচক ইরানী জনগণকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে খোমেনী কারবালার প্রতীককে ব্যবহার করে তাদের কষ্টকে ভাষা দিয়েছেন। কারবালায় ইয়াজিদের সৈন্যদের হাতে ইমাম হোসাইন ও তার সহযোগীদের পরাজয় ও শাহাদতের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের ধারাকেই পাল্টে দিয়েছে এবং সেই ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা আধুনিককালের ইরানী বিপ্লবের পিছনে প্রধান প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

ইমাম হোসাইনের শাহাদৎ ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রতিবাদের প্রতিক হয়ে আছে, যেখানে নাকি একটি ক্ষুদ্র আল্লাহ ভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ দল একটি বিপুল ক্ষমতাবান শয়তানী শক্তির সাথে মোকাবিলা করেছিল। এটি এমন একটি যুদ্ধ যা ন্যায় ও অন্যায়, জালিম ও মজলুম, খোদায়ী ও শয়তানী শক্তির ভিতরকার লড়াই ও বঞ্চিতের বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে আছে। একালের ইরানী শিয়াদের কাছে শাহ ও তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছিল ইয়াজিদ ও তার সেনাবাহিনীর মত এবং এটি ছিল সবরকমের শয়তানী, দুর্নীতি ও সামাজিক অবিচারের প্রতীক। সুতরাং হুসাইন ও তার ন্যায়নিষ্ঠ দলটির মত আজকের

www.pathagar.com

দিনের ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জরুরী এবং খোদায়ী আইন ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় জেহাদেরও প্রয়োজন। ইমাম খোমেনী কিন্তু অন্যান্য আয়াতুল্লাহদের মত দূরবর্তী কোন একাডেমিক ভাষা ব্যবহার করেননি। তার ভাষা ছিল সহজ সরল ও জনগণের প্রতি সরাসরি নিবেদিত। পাশ্চাত্যের সমালোচকরা খোমেনীর এই কৌশলকে মধ্যযুগীয় বলতে পারেন কিন্তু তার বাণী ও মতাদর্শ ছিল একান্তভাবেই আধুনিক। তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি সমর্থন, গরীব জনগণের প্রতি মমতা সমকালের তৃতীয় বিশ্বের অনেক আন্দোলনের মতই প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার সমার্থক ছিল। সুতরাং তাই তার আহ্বানও জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।

খোমেনীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও পাহলভী বিরোধী সংগ্রাম জনগণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৬৪ সালের ২৭ অক্টোবর খোমেনী ইরান সরকারের মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা ও উপদেষ্টাদের কূটনৈতিক ছাড় দেয়ার এবং শাহ কর্তৃক ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন অস্ত্র কেনার তীব্র সমালোচনা করেন। খোমেনী বলেন ইরান আজ এক শ্রেফ মার্কিন উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তিনি জনগণের কাছে প্রশ্ন রাখেন এই অপমান ও অমর্যাদার ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিরা কি করতো? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে আজ একজন মার্কিন পরিচারিকা ইরানের মাটিতে শক্ত অপরাধ করলেও পার পেয়ে যায় অথচ একজন ইরানী নাগরিককে, অসতর্কতাবশতঃ মার্কিন কোন কুকুরের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলেও শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। বছরের পর বছর ধরে বিদেশী কোম্পানীগুলো ইরানী তেল সম্পদ লুটে নিচ্ছে। অন্যদিকে গরীব আরো গরীব হচ্ছে। তারপর খোমেনী এভাবে শেষ করেন ঃ

There is no redress for the Iranian people. I am deeply concerned about the condition of the poor next winter, as I expect many to die, God for bid, from cold and starvation. The people should think of the poor and take action now to prevent the atrocities of last winter. The Ulema should appeal for contributions for this purpose.[১২]

এই জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর শাহ খোমেনীকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। প্রথমে তিনি টার্কিতে যান, তারপর সেখান থেকে ইরাকের নাজাফে আশ্রয় নেন, শেষ পর্যায়ে তাকে ফ্রান্সেও যেতে হয়। এইভাবে শাহ তার কথিত সংস্কার কার্যক্রমের শক্ত বাধাকে অপসারণ করার চেষ্টা করেন। তাতে অবশ্য খোমেনীর প্রভাবকে মুছে দেয়া সম্ভব হয় না, শুধু কিছু সময়ের জন্য সুপ্ত থাকে। প্রবাসে থাকাকালে খোমেনী বিরতিহীনভাবে শাহের সমালোচনা করেন। যদিও ইরানের সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব ছিল না তবুও টেপ, ক্যাসেট ও লিফলেটের আকারে তার বক্তৃতা ও লেখালেখি পুরো ইরানে নিয়মিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাসে অবস্থানকালে তিনি বিদেশে অধ্যয়নরত ইরানী ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাসান বনি সদর, ইব্রাহীম ইয়াজদি ও সাদেক কুতুবজাদেহ যারা ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। খোমেনী নাজাফে থাকতে তাহরির আল ওয়াসিলা বলে ধর্মতত্ত্বের উপর একটি বিশ্লেষণমূলক বই লেখেন। এখানে তিনি সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিশেষ করে জিহাদ, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধের মত বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন, যার সম্পর্কে তার সময়ের আলেমরা মোটের উপর

www.pathagar.com

নীরবতাই পছন্দ করতেন। ইতিমধ্যে নাজাফের শিয়া আলেমদের মধ্যে তিনি নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করে ফেলেন এবং ১৯৭০ সালে The hopelessness and impotence of the Islamic World - শীর্ষক সিরিজ বক্তৃতা দেন এবং বলেন ইহুদী খ্রিস্টান সমর্থিত, দুর্নীতিগ্রস্ত, কপট দুঃশাসকরাই হচ্ছে মুসলিম দুনিয়ার দুর্গতির জন্য দায়ী। তিনি মোল্লাদেরকেও সমালোচনা করেন এই বলে যে তারা উম্মার প্রতি জরুরী দায়িত্ব পালন না করে শ্রেফ পন্ডিতী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি ছাত্র, শিক্ষক, মোল্লা ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবীর কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এটা সত্য ষাট ও সত্তর দশকের প্রায় পুরোটাই শাহ দোর্দন্ড প্রতাপে ইরান শাসন করেন। এ সময় খোমেনী বাইরে বসে খুব বেশি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। অবশ্য ১৯৭৭ সালের দিকে এসে ইরানের রাজনৈতিক অবস্থা ঘুরতে শুরু করে এবং শাহের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসে শাহর গুপ্ত বাহিনী খোমেনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুস্তফাকে হত্যা করে। এই ঘটনা খোমেনীকে আবার শীর্ষ সংবাদে পরিণত করে। খোমেনীর বাড়িতেও জনতার ঢল নামে ও তারা শোক প্রকাশ করে। খোমেনী এই পরিস্থিতিকে পাহলভীবিরোধী সংগ্রামে পরিণত করেন ও পুত্রের শোকাবহ ঘটনাকে সাধারণীকরণ করে ফেলেন।

১৯৭৮ সালে সরকারি ইন্ধনে ইরানের একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে খোমেনীকে কটূক্তি করলে কোমে প্রতিবাদ মিছিল নেমে আসে ও সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে ৬ জন শহীদ হয়। শহীদদের চল্লিশার দিনে তাবরিজে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং এই বিদ্রোহ দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একই সাথে সমান তালে সংঘর্ষ ও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। বিদ্রোহের আগুন যত দ্রুত ছড়ায়, শাহর অবস্থানও ততই টলমল করে ওঠে।

ইরানের মানুষের মনের অবস্থার প্রতিধ্বনি করে খোমেনী এ সময় বিখ্যাত Le Monde পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা দেন পাহলভী বংশের দিন ফুরিয়ে এসেছে। একে উৎখাত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি ইরানের সেনাবাহিনীকে জনগণের কাতারে নেমে আসারও আহ্বান জানান। তিনি প্যারিসে বসে এক প্রগতিশীল ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দেন, যেখানে ন্যায় বিচার, সমতা প্রতিষ্ঠা হবে। এ রাষ্ট্রে প্রয়োজনে মেয়েরাও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে এবং সমাজে ইসলামী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলামী ফৌজদারী ব্যবস্থার প্রয়োগ হবে না। তখন পর্যন্ত খোমেনী তার বেলায়েতে ফকীহর ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। তিনি শুধু সরকারি ব্যবস্থাপনায় আলেমদের তত্ত্বাবধানের উপর জোর দিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে খোমেনীর শিবিরে দুটি উদ্দেশ্য অর্জন করা বাকি ছিল। একটি শাহের প্রস্থান, অন্যটি খোমেনীর আগমন। প্রথম উদ্দেশ্য সফল হওয়ার লক্ষন দৃষ্টিগোচর হতে থাকলো। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে আশুরার মিছিলে লক্ষ লক্ষ ইরানী তেহরানের রাস্তায় শাহর উৎখাতের দাবি জানায় এবং আশুরার এই মিছিল মুহূর্তে বিপ্লবের, প্রতিবাদের প্রতিক হয়ে ওঠে। খোমেনী তার বিপ্লবী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং এই ঘোষণা ইরানে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি শাহ তার নড়বড়ে অবস্থা আঁচ করে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেন এবং চিরতরে ইরান ত্যাগ করেন। এর দু সপ্তাহ পর বিপ্লবের নায়ক বিজয়ী খোমেনী দেশে ফেরেন।

www.pathagar.com

ছয়

কোনো সন্দেহ নেই ইমাম খোমেনী ছিলেন ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত স্থপতি। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিদের পাশে অনেকেই যুদ্ধ করে। কিন্তু সেনাপতির দিকনির্দেশনায় যুদ্ধ চলে। তেমনি ইমাম খোমেনী ছিলেন ইরানী জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বিপ্লবী রাহবার। যদিও তিনি সমকালের ইরানী আয়াতুল্লাহদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে অনেক ছোট ছিলেন, তবু তার রাজনৈতিক কৌশল, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও ঘটনা প্রবাহ তাকে বিপ্লবী নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে আসে। চরিত্রগতভাবে ইরানের আলেমরা অরাজনৈতিক থাকতেই পছন্দ করেন। বিশেষ করে দ্বাদশ ইমামের পুনরাবির্ভাব ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া যাবে না এই বিশ্বাস থেকে বহুদিন ধরে শিয়া আলেমরা তাকিয়ার নীতি অনুসরণ করতেন। কিন্তু ইমামের পুনরাবির্ভাবের আগের অন্তর্বর্তী সময় সম্পর্কে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল না। ইমাম খোমেনী এ পর্যায়ে মুজতাহিদ-সংস্কারকের ভূমিকায় নেমে আসেন ও তার বিখ্যাত বেলায়েতে ফকীহর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যা তার সমকালের অনেক আলেমরাই পছন্দ করেননি। তার কথা হলো দ্বাদশ ইমামের পুনরাবির্ভাব ছাড়া কি ইসলামী আইনের কার্যকারিতা থাকবে না। খোমেনীর চিন্তাধারা অনুসারে ইমাম গায়েব থাকাকালেও মুসলিমদের পক্ষে শরিয়তি আইন পালন করতে হবে। সেক্ষেত্রে ফকীহদের নেতৃত্বে শরিয়তি আইন প্রয়োগ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইমাম খোমেনী মতাদর্শিক চিন্তার দিক দিয়ে মওলানা মওদুদী ও হাসানুল বান্নার থেকে খুব দূরে ছিলেন না। বরং তাদের মত তিনিও ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে বিবেচনা করতেন ঃ

Islam has a system and program for all the different affairs of society; the form of government and administration, the regulation of peoples dealing with each other, the relations of state and people, relations with foreign states and all of the political and economic matters .... The mosque has always been a center of leadership and command, of examination and analysis of social problems.[১৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে খোমেনী যা বলেছেন তা কিন্তু সুন্নী আলেমদের চিন্তাভাবনা থেকে ভিন্ন নয়। খোমেনীর বিলায়েতে ফকীহর ধারনার সাথে রশিদ রিদার প্রধান মুজতাহিদের পরিচালনায় খেলাফতের (Caliplate of the Chief Mujtahid) ধারণার যথেষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। রিদার খলিফা নিজেই মুজতাহিদের দায়িত্ব পালন করবেন এবং আলেমদের সহযোগিতায় অবস্থা ও প্রয়োজন সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করবেন। অন্যদিকে খোমেনীর বেলায়েতে ফকীহর তত্ত্ব অনুসারে উলামারা পার্থিব শাসকদের দিকনির্দেশনা দেবেন, প্রয়োজনে তিনি সরাসরি ধর্মবিদদের দ্বারা রাষ্ট্র শাসনের কথাও বলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে রিদা ও খোমেনী উভয়ে সুন্নী ও শিয়া প্রেক্ষাপট থেকে কথা বললেও আধুনিককালে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কাছাকাছি চলে এসেছেন।[১৪]

খোমেনী তার বিপ্লবী চিন্তার বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন দুনিয়া এখন এই মুহূর্তে জালিম (যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী) ও মজলুম (মুসলিম ও

www.pathagar.com

তৃতীয় দুনিয়া) বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে মুসলিম ও তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ সরকারগুলো পশ্চিমের তাবেদারে পরিণত হয়েছে। তাই তিনি শ্লোগান তোলেন ঃ Neither East nor West, only Islam.

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে তিনি মুসলিম দুনিয়ার প্রধান সমস্যা হিসেবেও চিহ্নিত করেন ঃ

... the foul claws of imperialism have clutched at the heart of the lands of the people of the Quran, with our national wealth and resources being deavoured by imperialism .... with the poisonous culture of imperialism penetrating to the depths of towns and villages through out the Muslim world, displacing the culture of the Quran.[১৫]

খোমেনী ইসলামকে আধুনিককালের উপযোগী একটি মতাদর্শ হিসেবেই বিবেচনা করতেন কিন্তু তার মত ছিল ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা দূষিত ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মুসলিম দুনিয়ায় কেউ কেউ পশ্চিমের অনুকরণে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের কথা বলছে কিন্তু খোমেনীর ভাষায় এটি ইসলামকে বিকৃত করছে। তিনি আক্ষেপ করেছেন ঃ

Islam lives among the people as if it were a stranger. If some body were to present Islam as it truly is, he would find it difficult to make people believe him.[১৬]

খোমেনী আরো বলেছেন ইরানীরা এক আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে পড়েছে ঃ

We have completely forgotten our identity, and have replaced it with a Western identity. Iranians had sold themselves and do not know themselves, becoming enslaved to alien ideals.[১৭]

সুতরাং খোমেনীর কথা হচ্ছে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইরানীদেরকে ইসলামী নীতি ও কানুনের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠন করতে হবে। সত্তরের দশকে খোমেনী যখন তার বিপ্লবী কার্যক্রমের জন্য জিহাদের ডাক দেন তখনই তিনি সবধরনের রাজতন্ত্রকে অবৈধ ও অনৈসলামী বলে ঘোষণা দেন এবং ধর্মবিদদের নির্দেশনায় পরিচালিত সরকারের (বেলায়েতে ফকীহ্) উপর জোর দেন। নাজাফে থাকাকালে তিনি ইসলামী সরকার ব্যবস্থার উপর ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা ইসলামী সরকার (Islamic Government) বলে পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি এখানে রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে শরীয়াহর আইন দ্বারা পরিচালিত ইসলামী সরকারের উপর জোর দেন এবং মানুষের তৈরি বিদেশী আইনের বদলে ইরানে শরিয়া আইনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

একজন পশ্চিমার কাছে খোমেনীর এই তত্ত্ব বিশেষ করে বেলায়েতে ফকীহর ধারণা অদ্ভুত ও বিসদৃশ মনে হতে পারে কিন্তু ইরানীরা শাহের সময় আধুনিক সরকারের যে অভিজ্ঞতা পেয়েছে তাতে ইউরোপ ও আমেরিকার সরকারগুলোর দেয় স্বাধীনতার কিছুই তারা পায়নি। খোমেনী ধীরে ধীরে নিজেকে পাহলভী রাজতন্ত্রের বিপরীতে শিয়া আদর্শের প্রতিকে পরিণত করেছিলেন। তিনি একজন সুফী ছিলেন এবং মনে হতো ইমাম না হলেও তিনি তাদের মত করে স্বর্গীয় জ্ঞানকে ধারণ করছেন। হুসাইনের মত তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত অত্যাচারী শাসককে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ইমামদের মত তিনিও

www.pathagar.com

বন্দিত্ববরণ করেছেন, দুঃশাসক কর্তৃক মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন বারবার। কোন কোন ইমামদের মত তাকে দেশান্তরীও করা হয়েছে। নাজাফে ইমাম আলীর মাজারের পাশে খোমেনীকে অনেকের কাছেই মনে হতো তিনি বোধ হয় সংগুপ্ত ইমাম (Hidden Imam)। শারীরিকভাবে দৃশ্যমান নয় অথচ দূরে থেকেও তিনি জনগণকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন এবং একদিন তিনি ফিরে আসবেন। জনশ্রুতি ছিল খোমেনী স্বপ্ন দেখেছেন তার বর্তমান নির্বাসন সত্ত্বেও তিনি কোমেই ইন্তেকাল করবেন। পশ্চিমী নীতি নির্ধারকরা বুঝে উঠতে পারতেন না কি করে খোমেনী যার মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে সব গুণাবলী তারা আশা করতেন সেগুলো না থাকা সত্ত্বেও ইরানী জনগণকে এতখানি উজ্জীবিত করতেন। পশ্চিমারা যদি শিয়াদের গূঢ় তত্ত্ব বুঝতো তাহলে তারা এ রহস্যের কিছুটা হলেও উন্মোচন করতে পারতো। যখন খোমেনী 'ইসলামী সরকার' শীর্ষক বক্তৃতাগুলো দেন তখন হয়তো তিনি ধারনা করেননি বিপ্লব আসন্ন এবং তার বেলায়েতে ফকীহর ধারণা এত সহজে বাস্তবায়ন হবে। খোমেনী সে সময় তার তত্ত্বের ধর্মীয় দিকগুলো নিয়েই বেশী নাড়া চাড়া করেছিলেন, এর প্রয়োগিক ব্যাপারগুলো নিয়ে অতবেশি নয়। খোমেনী ১৯৭২ সালে বৃহত্তর জিহাদ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তিনি তার বেলায়েতে ফকীহ তত্ত্বের পক্ষে এক আধ্যাত্মিক কার্যকারণ দেখানোর চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রসুল (স.) এর একটি হাদীসেরও উদ্ধৃতি দেন ঃ আমরা ছোট জিহাদ থেকে বৃহৎ জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় রাজনৈতিক সংগ্রামকে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। ইরানী বিপ্লবের অন্যতম আধ্যাত্মিক পথিকৃৎ আলী শরিয়তির মত খোমেনীও বিশ্বাস করতেন ইরানের গভীর থেকে উঠে আসা কোন ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ছাড়া রাজনৈতিক সমাধান সম্পূর্ণ হবে না।

সাত

এখন আমরা খোমেনীর কৃতির মূল্যায়ন করতে পারি। একালে একটি সফল গণবিপ্লবের রূপকার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে তার প্রগতিশীল ভূমিকা লেনিন কিংবা মাওজেদং-এর চেয়ে কম নয়। তার ধর্মীয় আদর্শ ও আবরন এক্ষেত্রে তার বিপ্লবী ভূমিকা পালনে কোন বাধা হয়ে ওঠেনি এবং যে কোন বিপ্লবী আদর্শের মতই ইসলাম যে আজকের দিনের মানুষের মনেও বিপ্লবী ভাবান্তর সৃষ্টি করতে পারে তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে আজকের দিনে ইসলামকে ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ সম্ভব এবং পশ্চিমী নীতি নির্ধারকদের ধারণামত এটা যে একটা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নয় তা প্রমাণ করেছেন।

একই সাথে রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী, ফকীহ ও সুফী, তার ব্যক্তিত্বের এই বিচিত্র গুণের কারণেই তিনি ব্যক্তিগত বিপর্যয় থেকে জাতীয় বিপর্যয় সকল কিছুই তিনি সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। পাহলভীবিরোধী সংগ্রামের সময় তার মিস্টিক অন্তর্লীনতা ছিল জনগণের প্রেরণা, বিপ্লবের পর এটি হয় সম্পদ।

অনেকেই বলেন তার ইসলাম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও উত্তেজক। তিনি যে ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন একদিকে তা ছিল অসহিষ্ণু, অন্যদিকে আপোসহীন। কিন্তু রাজনীতির বাস্তবতাই তাকে আপোসহীন করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদ পোষিত

www.pathagar.com

একটি নিষ্ঠুর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হয়েছিল। বিপ্লবের পরে এটিকে নষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধনে ইরানের উপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকেও তাকে দীর্ঘদিন মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এছাড়া বিপ্লবোত্তর ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের শ্রমসাধ্য কাজও তাকে হাতে নিতে হয়েছিল। পরিস্থিতির প্রয়োজনেই তাকে লড়াকু ভূমিকায় চলে যেতে হয়। অন্যথায় তার অস্তিত্বই বিপন্ন হতো। যেহেতু খোমেনী ইরানে পশ্চিমী বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন তাই তার বিরুদ্ধে পশ্চিমীদের প্রপাগান্ডার শেষ ছিল না এবং নানা রকম খিস্তি খেউড়ে তার ভাবমূর্তিকে ডুবানোর তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। ইমাম খোমেনীর মত একালে তৃতীয় বিশ্বে পশ্চিমীদের ত্রাসনীতির কঠোর সমালোচক আর একজনও পাওয়া যাবে না।

অন্যান্য শিয়া আলেমদের মত তিনি শুধু শিয়াদের কথা বলেননি, তিনি বলেছেন ইসলামের কথা। আজকের বৈশ্বিক ইসলামের জগতে তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তিনি শিয়া-সুন্নীদের মধ্যকার কোন মৌলিক মতপার্থক্য আছে বলে মনে করতেন না। উভয়কেই তিনি মুসলমান মনে করতেন। ইসলামকে তিনি একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা মনে করতেন, যার কোন সীমান্ত নেই। যদিও এটা সত্য ইরানী জনগণকে উজ্জীবিত করতে তিনি ইরানীদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাহায্য নিয়েছিলেন। এটাও সত্য ইসলাম বলতে তিনি ইসনা আশারী বা বার ইমামের মতকেই শ্রদ্ধা করতেন এবং এই বিশিষ্ট মত দিয়েই তিনি শিয়াদের আবেগকে উজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু এটি আবার শিয়া সুন্নীদের ভিতরকার বেড়াকে দূর করেনি, ফলে তার পক্ষে পুরো মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর নেতৃত্ব দেয়ার পথে কিছুটা বাধা থেকে গেছে।

তারপরেও বলতে হবে শিয়া-সুন্নী উভয়কে এক ঘোষণা করে তিনি তাদের আবেগকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। মুসলিম দুনিয়ায় তিনি জনগণের বিপুল সম্মান অর্জন করেছিলেন। তার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধের ঘোষণা, ইসলামের স্বার্থে তার আত্মত্যাগ বিপুলভাবে নন্দিত হয়েছিল। তিনি ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালে খোমেনী সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ফতোয়া দিয়ে বিশ্ব মুসলমানের ভাবজগতকে আলোড়িত করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি তার সংগ্রাম থেকে কখনো পিছিয়ে আসেননি। রুশদী ছিল সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি ও প্রতীক। সেই প্রতীককে আঘাত করে তিনি সাম্রাজ্যবাদকেই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। মুসলিম ও অপরাপর তৃতীয় দুনিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদের গর্জন ও দাঁত খিচুনি আজও শেষ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত নিপীড়িত, শোষিত, মুক্তিকামী মানুষের কাছে ইমাম খোমেনীর অভয়মন্ত্র আজও তাই প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution : Writings and Declarations of Imam Khomeini. Berkeley : Mizan Press, 1981.

২. Baqer Moin, 'Khomeinis Search for Perfection : Theory and Reality' In Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival. London : Zed Books Ltd., 1974.

www.pathagar.com

৩. প্রাগুক্ত।
৪. Hamid Algar, "The Fusion of the Mystical and Political in the personality and life of Imam Khomeini." lecture delivered at the School of Orienteal and African Studies, London, June 9, 1998.
৫. Akbar S. Ahmed, Islam Today : A Short Introduction to the Muslim World. London : I.B. Tauris Publishers, 1999.
৬. Baqer Moin 'Khomeinis Search for perfection : Theory and Reality'.
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. Ervand Abrahamian, Iran : Between Two Revolutions. Princetion, N.J : Princeton University Press, 1982.
১১. Michael J. Fischer, "Imam Khomeini : Four levels of Understanding" in Esposito, ed., Voices of Resurgent Islam. New York : Oxford University Press, 1991.
১২. Willem M. Floor, "The Revolutionary character of the Ulama : Wish ful thinking or Reality?" in Nikki R. Keddie, ed., Religion and Politics in Iran. Shism from Quietism to Revolution. Berkeley, 1983
১৩. Khomeini, Islam and Revolution.
১৪. Edward Mortimer, Faith and Power : The Politics of Islam. London : Faber and Faber, 1982.
১৫. Khomeini, Islam and Revolution.
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

এক

সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম দুনিয়া জুড়ে যে পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছে এবং ইসলামকেন্দ্রিক রাজনীতির মধ্যে যে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে তার মূলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর চিন্তা, দর্শন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি মিন্দানাও থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমকালের পুনর্জাগরণকামী মুসলিম চিন্তাবিদ ও রাজনীতিকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছেন। মার্কিন পন্ডিত ও ইসলামবিদ জন. এল. এসপোসিটো একালের মুসলিম ভাবজগতের এই নতুন ধারা ও মওদুদীর অসাধারণ প্রভাবের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

From Sayyid Qutb of Egypt to Algerian, Iranian, Malaysian or Sudanese revivalist activists, Islamic revivalism has evolved around Mawdudis' prolegomenon.[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়। একই সাথে এশিয়া আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অবস্থা এমন হয় বিশ্ব শক্তির পাল্লা পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে মুসলমানরা এক রাজনৈতিক স্থবিরতা, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তার মধ্যে আপতিত হয়। যুদ্ধের আগে মুসলমানরা ছিল বিশ্বশক্তি। যুদ্ধের পর মুসলমানরা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এবং ইসলামের শত্রুরা বলতে থাকে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইসলামের ভূমিকা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কয়েক দশক না যেতেই শত্রুদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে। ইসলাম তার অন্তর্গত শক্তির জোরেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্পষ্টতই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এই ভাবে প্রতিরোধ আজ পরিণত হয়েছে পুনর্জাগরণে। এটা সত্য ইসলামী দুনিয়ার দৃশ্যমান অনেক সীমাবদ্ধতা (নেতৃত্ব, প্রাযুক্তিক অনগ্রসরতা) সত্ত্বেও আশাবাদী একটি চিত্রও এখন আমাদের সামনে ভেসে উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আজ পশ্চিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। কোথাও কোথাও তারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমী ভাবুকদের মানবতন্ত্রী দর্শন, যা এতকাল মুসলমানদের অনেকক্ষেত্রেই চোখ ঝলসে দিয়েছে তার প্রতি অনুরাগ কমে যেতে শুরু করেছে। কেননা এটি তাদের সমস্যা দূর করতে পারছে না। এরকম অবস্থায় ইসলামের অন্তঃসম্পদকে বুনিয়াদ করে নতুন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রতি মুসলমানরা আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের পিছনে ইসলামকে এ কালের জন্য প্রাসঙ্গিক একটি মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

প্রত্যয় লক্ষ্যণীয়। এ কালের মুসলমানরা ইসলামের মধ্যে তাদের হারানো আত্মপরিচয়কে খুঁজে পেয়েছে এবং এটিকে ভিত্তি করেই তারা তাদের হারানো গৌরবকেও ফিরে পেতে চায়। এই নতুন করে পাওয়া আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘঠেছে এ কালের মুসলমানদের পুনর্জাগরণবাদী প্রচেষ্টার মধ্যে। মুসলমানের ভাবজগতের এই নবনির্মাতাদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর স্থান অগ্রগণ্য। ইসলামী জ্ঞানজগতে তার মৌলিক অবদানের পাশাপাশি এ কালে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে তিনি একটি প্রজন্মকে উজ্জীবিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে তার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকাও গুরুত্বপুর্ণ। আধুনিক ইতিহাসের কোন ছাত্রই এ কালের মুসলিম পুনর্জাগরণে মওদুদীর এই অবদানকে উপেক্ষা করতে পারবে না।

দুই

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর জন্ম ১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ শহরে যা একসময় বিখ্যাত নিযামের হায়দারাবাদ রাজ্যের অংশ ছিল এবং বর্তমানে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। তার পূর্ব পুরুষদের অনেকে ছিলেন চিশতিয়া সুফী তরিকার আধ্যাত্মিক পুরুষ, যারা ভারতে নবম শতকে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। মওদুদীর পরিবারের সদস্যরা অনেকে মোগল রাজদরবারে কাজ করতেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর মোগলদের সাথে তার পরিবারেরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তারা হায়দারাবাদে চলে আসেন ও এখানকার নিযাম সরকারে চাকরি নেন। ভারতে মুসলিম শাসনের সাথে মওদুদী পরিবারের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং তাদের চোখের সামনে দিয়ে মুসলিম শাসনের বিপর্যয় পরবর্তীকালে মওদুদীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রত্যয় নির্মাণে বড় ভূমিকা রাখে। তার জীবনীকার লিখেছেন ঃ

The family's close identification with the heritage of Muslim rule over India, its aristocratic pretensions, and its dislike of the British played a central role in shaping Mawdudi's world view in later years.[২]

মওদুদীর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান ছিলেন একজন আইনজীবী, যিনি সৈয়দ আহমদ খানের মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে প্রথম দিককার ছাত্র ছিলেন এবং এখানকার ইসলামী আধুনিকতার পরীক্ষা নিরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি আলীগড় ত্যাগ করে এলাহাবাদে এসে আইন পড়া শেষ করেন এবং শেষমেষ নিজামের আওরঙ্গাবাদে স্থায়ী হন ও সুফী সাধনায় ডুব দেন। তার এই সুফিবাদী সংযম ও শুদ্ধতা পারিবারিক পরিবেশেও প্রভাব ফেলে। তিনি তার সন্তানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। মওদুদী খুব দ্রুত আরবী ভাষার উপর এতখানি অধিকার অর্জন করেন যে তিনি কাসিম আমিনের বই আল মিরাত আল জাদিদাহ (আধুনিক নারী) আরবী থেকে উর্দুতে তর্জমা করেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৪।

মওদুদী ১১ বছর বয়সে আওরঙ্গাবাদের একটি স্কুলে ভর্তি হন যেখানে আধুনিক বিষয়াদির সাথে তার পরিচয় ঘটে। যদিও পাঁচ বছর পর তার পিতার আকস্মিক ইন্তেকালের ফলে তিনি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন। এরপরে মওদুদীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না

www.pathagar.com

ঘটলেও নিজের চেষ্টায় তিনি তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটিয়ে চলেন ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বলা চলে মওদুদী একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি যিনি স্বসাধনায় একালের মুসলিম জ্ঞান জগতে অসাধারণ প্রভাব রাখতে সমর্থ হন। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর মওদুদী জীবিকার প্রয়োজনে সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তখন ভারতের আজাদী আন্দোলন তুঙ্গে। একদিকে আলী ভাইদের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যৌথভাবে তখন পুরো ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী গণজোয়ার সৃষ্টি করেছে। মওদুদী সাংবাদিকতার ভিতর দিয়ে আজাদীর ডাকে সাড়া দেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯১৯ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহর থেকে প্রকাশিত কংগ্রেসপন্থী সাপ্তাহিক তাজের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও আজাদীর পক্ষে ধারালো লেখালেখির কারণে সরকার পত্রিকাটির প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর মওদুদী দিল্লী পাড়ি জমান এবং সেখানে খেলাফত নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীকে তার হামর্দদ পত্রিকা প্রকাশে কিছুটা সহযোগিতা করেন। এসময় তিনি তাহরিক-ই-হিজরত (হিজরত আন্দোলন, ইংরেজিতে- Migration Movement) আন্দোলনে স্বল্প সময়ের জন্য শরিক হন। এ দলটির নেতারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদে মুসলমানদের ভারত (দার-উল-হরব) ছেড়ে মুসলিম শাসিত আফগানিস্তানে (দার-উল-ইসলাম) হিজরত করতে উৎসাহিত করে। অচিরেই দলটির নেতৃত্বের অপরিকল্পিত ও বাস্তবতা বর্জিত কৌশলে বিরক্ত হয়ে তিনি এদের পরিত্যাগ করেন।

১৯২১ সালে মওদুদী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা মুফতী কেফায়েতউল্লাহ ও আহমদ সাঈদের সাথে পরিচিত হন। এরা মওদুদীর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাদের দলীয় পত্রিকা মুসলিম ও পরবর্তীকালে আল জমিয়তের সম্পাদনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন। তার সম্পাদনার গুনে এ পত্রিকা দুটি অচিরেই মুসলিম ভারতের জনপ্রিয় মুখপত্রে পরিণত হয়। জমিয়তের সাথে কাজ করার সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে তিনি অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারের বিষয়গুলো, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে তুর্কীদের দুর্দশা ও ভারতে মুসলিম শাসনের গৌরবজনক দিকগুলো নিয়ে অবিরাম লেখালেখি করেন। যদিও এসব লেখালেখি একান্তই মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, তবু তখন পর্যন্ত তার লেখায় ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে আবির্ভূত হয়নি।

১৯২৪ সালে খেলাফত আন্দোলনের বিপর্যয়ের পর মওদুদীর চিন্তাভাবনা ভিন্ন বাক নেয়। তিনি জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হন। তার মনে হয় এটি তুর্কী ও মিসরীয়দের বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা উসমানী খেলাফতকে ধ্বংস করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পিঠে ছুরি মেরেছে। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও আস্থা হারান এবং কংগ্রেসকে জাতীয়তাবাদের আড়ালে হিন্দু স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কাছে প্রতীয়মান হয়। এইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তার মুসলিম মিত্রদের থেকে তিনি একটু একটু করে সরে যেতে থাকেন। এ সময় কংগ্রেস মিত্র জমিয়তের চিন্তাভাবনার সাথেও তার বনিবনা ভাল যায় না। মওদুদী জমিয়ত ত্যাগ করেন ও তার দেওবন্দী গুরুদের বাইরে ভিন্নপথে হাঁটতে শুরু করেন। জমিয়ত ও কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতার অর্থ এই নয় তিনি ব্রিটিশের সাথে আপোস করেছিলেন। তিনি বরং মুসলমানদের

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্লাটফরম ছেড়ে ইসলামী ও একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন যা কিনা একই সাথে মুসলমানের আজাদীর পাশাপাশি তাদের স্বার্থও রক্ষা করবে। তার জীবনীকার লিখেছেন ঃ

He put forward a platform which was articulated in religious language. Taken to its conclusion it soon gave place to a revivalist discourse. The course of events, moreover, soon imbued Mawdudi's persona with a sense of mission, permitting him to clarify his views and produce a new religious and political platform.[৩]

১৯২৫ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে একজন হিন্দু ধর্মগুরু ও পুনর্জাগরণবাদী নেতা নিম্নশ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার ডাক দেন এবং প্রকাশ্যে ইসলামের নিন্দাসূচক মন্তব্য করেন যা মুসলমানদের স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ করে। এই প্রেক্ষিতে একজন মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে বসে। তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হিন্দু পরিচালিত পত্র পত্রিকাগুলো শোরগোল শুরু করে ও প্রচার চালায় ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাসের ধর্ম। মওদুদী এই প্রচারণার জওয়াব দিতে উদ্যোগী হন। বিশেষ করে মওলানা মোহাম্মদ আলী যখন মুসলমানদের এই অপপ্রচারকে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান তখন তিনি আরো উজ্জীবিত হন। এই প্রেক্ষিতেই মওদুদী তার বিখ্যাত বই 'আল জিহাদ ফি আল ইসলাম' (ইসলামে জিহাদ) রচনা করেন যা ধারাবাহিকভাবে আল জমিয়ত পত্রিকায় ছাপা হয় এবং পুস্তকা কারে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তকে যুদ্ধ ও শান্তির অবস্থায় ইসলামের নীতিসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে পাশাপাশি ইসলামের জিহাদের সমালোচনাকারীদের নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ জওয়াব দেয়া হয়েছে। বইটিতে দেখবার বিষয় হচ্ছে ইসলামের নীতি বিশ্লেষণের সময় মওদুদী কোন আপোস করেননি, কোন ছাড় দেননি এবং ইসলামের নীতি থেকে একচুলও সরে আসেননি। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার লেখালেখিতে কোন হীনমন্যতার নাম গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামের জিহাদ নীতি বিবৃত করবার সময় অনেক মুসলমান পন্ডিত পাশ্চাত্যের সামনে ইসলামকে একটি সুশীল ও শান্তির ধর্ম প্রমাণ করতে গিয়ে ইসলামের অনেক নীতিকে কাটছাঁট করার চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অহেতুক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। মনে রাখা দরকার ইসলাম শান্তির ধর্ম অবশ্যই কিন্তু সেই শান্তির ব্যাঘাত ঘটলে ইসলাম জেহাদেরও ডাক দেয়। ইসলাম একগালে চড় খেলে আর এক গাল বাড়িয়ে দেয়ার ধর্ম নয়।

মওদুদীর সমালোচকরা বলে থাকেন তিনি জেহাদকে ইসলামী ধর্মতত্ত্বের মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি তার বইয়ে এরকম দাবি কোথাও করেননি কিংবা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সমতূল্য হিসেবেও এটিকে মর্যাদা দেননি। কিন্তু জেহাদকে ইসলামী ধর্মতত্ত্বে একটি গৌরবজনক বিষয় হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কুরআন ও সুন্নাহতেও এটির মর্যাদার কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। মওদুদী জিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এই কারনে যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র, আগ্রাসন ও হামলার মুখে মুসলমানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিনাশের

www.pathagar.com

হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি শক্তির জোরে তাদের চাপিয়ে দেয়া লা দিনি (Secular) রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম সমাজ জীবনকে মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন এই বিপর্যয় রুখতে এখন মুসলমানের সামনে জিহাদ ছাড়া বিকল্প আছে কি? মওদুদীর সমালোচকরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু মুসলিম দুনিয়া নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের হঠকারী পরিকল্পনা ও চন্ডনীতিকে তারা বিবেচনায় নেননি। এ কারণেই মওদুদীর প্রতি তারা সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মওদুদী জিহাদের কথা বলেছেন ঠিক, প্রয়োজনে তিনি হাতিয়ার তুলে নেয়ারও ডাক দিয়েছেন। কিন্তু তার দৃষ্টিতে সমকালীন পৃথিবীতে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

মওদুদী মনে করেন বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য যে যুদ্ধ তাই জিহাদ এই পশ্চিমী ধারণা যথার্থ নয়, অন্যদিকে ইসলাম আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ করে আবদুহুর যে যুক্তি তাও ঠিক নয়। সব মানুষের মঙ্গলের জন্য, অন্যায়কে, জুলুমকে প্রতিহত করার জন্য, আগ্রাসনকে রুখে দেয়ার জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম মওদুদীর ভাষায় জিহাদের সংজ্ঞা হলো তাই।

মওদুদী তার সংগ্রামী আদর্শবাদের পরিপ্রেক্ষিত খুজে পেয়েছেন নবী মোহাম্মদের জীবনে। নবী মোহাম্মদ যেমন প্রাক ইসলামী জগতের অজ্ঞতা, বর্বরতা ও জাহিলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তেমনি মুসলমানদের যা কিছু সম্বল আছে তাই নিয়ে আজকের দিনের জাহিলিয়াকে বিশেষ করে পশ্চিমীদের নানমুখী আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে হবে। জিহাদের নানান ধরন আছে। কেউ প্রবন্ধ লিখবেন, কেউবা ভাষণ দেবেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে সকলকেই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

এই বইটি মওদুদী খুব তরুণ বয়সে রচনা করেন কিন্তু তারপরেও স্বীকার না করে উপায় নেই বিষয়বস্তুর উপর তার অসাধারণ অধিকার এটি তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বইটি পেয়ে আল্লামা ইকবাল ও মওলানা মোহাম্মদ আলী দারুণভাবে খুশি হন এবং এই তরুণ লেখককে মোবারকবাদ জানান।

১৯২৮ সালে মওদুদী আল জমিয়ত থেকে পদত্যাগ করে হায়দারাবাদ চলে যান এবং পড়াশুনা ও লেখালেখির মধ্যে ডুব দেন। এ সময় তিনি কয়েকটি আরবী গ্রন্থের তরজমা করেন, হায়দারাবাদের উপর একটি ইতিহাস বই তৈরী করেন এবং নিযাম সরকারের অনুরোধে ছাত্রদের জন্য ইসলামিক স্টাডিজের কয়েকটি পাঠ্য বই লেখেন। এর মধ্যে তার ইসলাম পরিচিতিমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ রিসালা-ই-দিনিয়াতও ছিল যা পরবর্তীকালে Towards Understanding Islam হিসেবে অনূদিত ও ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৩২ সালে তিনি মাসিক পত্রিকা তরজমানুল কুরআনের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন এবং সেই থেকে পরবর্তী ৪৭ বছর এই পত্রিকাটিই ছিল তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশের নির্ভরযোগ্য ফোরাম। প্রাথমিকভাবে তিনি ইসলামের মৌলিক নীতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে তিনি সমকালীন পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের মুখোমুখি হওয়ার পর যে সব প্রশ্নের জন্ম হয় তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এবং আধুনিক যুগের কিছু বড় বড় সমস্যাকে আলোচনা করে ইসলামের আলোকে সমাধান দেবারও প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি মুসলিম জগত ও পশ্চিমী দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সমস্যাকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করেছেন। এটি

www.pathagar.com

তার আলোচনায় সজীবতা এনেছে এবং বৃহত্তর জনসমাজের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

ত্রিশের দশকে মওদুদী ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন এবং স্বল্পস্থায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা না করে তিনি পুরো ব্যাপারটাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তিনি তার স্বধর্মীদের জাতীয়তাবাদের ধারণায় মোহাচ্ছন্ন না হওয়ার পরামর্শ দেন এবং এর আবেদন যে একান্তই শূন্যগর্ভ তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

মওদুদী জাতীয়তাবাদের বিপজ্জনক দিকগুলোকে শক্তিশালী যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরেন এবং বলেন উম্মাহর ঐক্য বলতে ইসলামের যে ধারণা, জাতীয়তাবাদের ধারণা তার ঠিক বিপরীত। মওদুদী আরো বলেন ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো মুসলমানদের ধর্মীয় সংহতি ও ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কে বিপন্ন করে তোলা।

১৯৩৮ সালে দার্শনিক কবি ইকবালের অনুরোধে মওদুদী হায়দারাবাদ ছেড়ে পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট জেলায় বাসবাস শুরু করেন এবং কবির পরামর্শে ও সহযোগিতায় সেখানে তিনি একটি শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যার নাম হয় দার-উল-ইসলাম। এটির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে তারা ইসলামের উপর উল্লেখযোগ্য কাজ করতে এবং বিশেষ করে ইসলামী আইনের পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এসময় মওদুদী শুধুমাত্র নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকান্ডে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তার মনে হচ্ছিল শুধুমাত্র লেখালেখি দিয়ে তিনি তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনাকে কার্যকর করতে পারবেন না। এই কারণে তাকে বিকল্প রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথাও ভাবতে হচ্ছিল। যদিও এই সময় তিনি চলমান পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মুসলিম মিত্রদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মওদুদী তার মতামত জানাতে চাচ্ছিলেন যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের চিন্তাভাবনা থেকে তিনি নিজের চিন্তাকে সর্বদা স্বাধীন রেখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি কংগ্রেসের মুসলিম সমর্থকদের সমালোচনা করেন এই বলে যে তারা কংগ্রেসের সাথে মিত্রতার সূত্রে ব্রিটিশবিরোধী লড়াই করছে ঠিক কিন্তু একই সাথে মুসলিম স্বার্থকেও পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সম্পর্কে তার সংশয় ছিল সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের পক্ষে হয়তো প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। একটা জিনিস বোঝা দরকার তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তাদের যুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুসলিম সংস্কৃতির পৃথক বৈশিষ্ট্যের কথা জোরেশোরে বলেছিলেন কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র বলতে আজকাল যা বুঝায় তার কথা হয়তো মুসলিম লীগ নেতারা সেদিন ঠিক সেভাবে চিন্তা করেননি। সেই বিবেচনায় এবং তাত্ত্বিকভাবে মওদুদীর আশংকা কিছুটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তৎকালীন পরিস্থিতিতে তার মতামত অনেকখানি বিতর্কিতও যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই বিশেষ করে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে ঢালাওভাবে সেকুলার বলা এখনও বিচার সাপেক্ষ। সেদিন মুসলিম লীগ নেতারা স্বসম্প্রদায়ের তাৎক্ষণিক মুক্তির তালাশ করতে গিয়ে কংগ্রেসের সাথে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মওদুদী ধীরে ধীরে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তার চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য ১৯৪১ সালে তিনি ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। তার জীবনের এই পর্যায়ের ঘটনাবলী ও চিন্তাভাবনাগুলো ফ্রেডারিক গ্রেয়ার তার 'ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক ইসলাম' নামক বইতে এভাবে লিখেছেন ঃ তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে লাহোরে ইসলামিয়া পার্কে ৭৫ জন ব্যক্তি হাজির হয়েছিলেন। যেখানে মওদুদী তার ভাষনে তার প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ঘোষণা করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন যে, অন্য সব আন্দোলন গুলো কর্তৃক স্বীকৃত ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং তাবৎ মুসলিম সমাজ মেনে চলে এমন বৈশিষ্ট্যগুলোই এতে গ্রহন করা হয়েছে। জামায়াত-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে তার সামগ্রিকতায় উন্নত করা। পয়গম্বর যে সব উপায়-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, জামায়াত তার সবকিছুই মেনে চলবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে জামায়াত তার কার্যকলাপ শুধুমাত্র ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে তার আবেদন পৌঁছে দেবে। এই ভাবেই জামায়াত-এর জন্ম হল।[8]

মওদুদী প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দলটির দায়িত্ব নেন এবং ১৯৭২ পর্যন্ত একই দায়িত্বে থাকেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হয়ে গেলে জামায়াতে ইসলামীও ভারত ও পাকিস্তানের ভিত্তিতে দুইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। মওদুদী তার ৩৮৪ জন অনুসারীকে নিয়ে পাঠানকোট থেকে পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং লাহোরে স্থায়ী হন।

নতুন পরিস্থিতিতে তিনি নতুন দেশটির রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামীকরণের লক্ষ্যে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেন। ইসলামের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষ করে এর সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোকে ব্যাখ্যা করে তিনি নিরন্তর লেখালেখি করেন। পাশাপাশি মওদুদী তার দল জামায়াতে ইসলামীর সহযোগে অন্যান্য ইসলামবাদী দল ও আলেমদের একটি মোর্চা গড়ে তোলেন ও পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উপর জোর দেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না ১৯৪৭ থেকে ৫৬ পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে আইয়ুব ও ভুট্টোর শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য আলেমদের সূচিত আন্দোলনের ফলেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বিভিন্ন সময় ইসলামীকরণের চেষ্টা হয়েছে এবং সামাজিকভাবে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও দ্রুত মাত্রা লাভ করেছে। মওদুদী ও তার দলের এসব কার্যক্রম শাসক গোষ্ঠীর কাছে প্রীতিকর মনে হয়নি এবং তার উপর বিভিন্ন সময় জেল, জুলুম ও ফাঁসির হুমকিও নেমে এসেছে। ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের কাদিয়ানীবিরোধী দাঙ্গার সূত্র ধরে সামরিক আদালতে মওদুদীকে ফাসীর আদেশ দেয়া হয়। যদিও তা পরবর্তীকালে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে মওকুফ করা হয়। এই দাঙ্গার সূত্রে পাকিস্তান সরকার বিচারপতি মুনীর ও বিচারপতি এম, আর কয়ানিকে নিয়ে দুই সদস্যের এক তদন্ত কমিশন গঠন করে। এই কমিশন মওদুদীকে হাঙ্গামার জন্য ব্যক্তিগত দায় থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু তিনি কাদিয়ানীদের নিয়ে যে মতামত দিয়েছিলেন তারা তার সমালোচনা করে। বিচারপতিরা ছিলেন পুরোপুরি সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও ইসলামপন্থীদের প্রতি তারা তাদের বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখতে পারেননি। বিচারপতিদ্বয়ের প্রতিবেদন পড়লে বোঝা যায় দাঙ্গার কার্যকারণ নির্ণয় করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না কিংবা

www.pathagar.com

দাঙ্গাকারীদের সম্পৃক্ততার ন্যায্যতা কিংবা অন্যায্যতার বিচারও তারা করেননি এবং তাদের সূক্ষ্ম সমালোচনার মধ্যে ইসলামের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস স্পষ্ট।

মওদুদী তার জীবদ্দশায় সব সময় ছিলেন সক্রিয়, প্রতিবাদী ও কর্মচঞ্চল। তার জীবনে তিনি ১২০ টির উপর বই পত্র, প্রচার পুস্তিকা লিখেছেন এবং এক হাজারের বেশি বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়েছেন। মওদুদীর কলম ছিল গতিশীল, শক্তিশালী, নিরন্তর ও বহুমুখী। তফসীর, হাদিস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সব ধরনের সমস্যাকে আলোচনা করেছেন এবং ইসলামের নিরিখে সেই সব সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তারপরেও বলতে হবে তফসীর, ইসলামী ন্যায়শাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, সীরাত এবং বিশ্বজুড়ে ইসলামী পুনর্জীবন ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি প্রধান অবদান রেখে গেছেন।

কোন সন্দেহ নেই কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর তাফহীম-উল-কুরআন হচ্ছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি-ম্যাগনাম ওপাস। এটি শেষ করতে তার ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল। এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভাষা ও শৈলী একালের নারী-পুরুষের মনকে স্পর্শ করে এবং তাদের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমস্যা সমাধানে কুরআনের প্রাসংগিতাকে তুলে ধরে। তিনি আধুনিক উর্দুভাষার শক্তিশালী ও স্পষ্ট বাগবিন্যাস ব্যবহার করে কুরআনের তরজমা করেছেন। এই কারণে তার তরজমা কুরআন শরীফের যে কোন আক্ষরিক তরজমার চেয়ে আকর্ষণীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়। তিনি কুরআন শরীফকে মানব জীবনের জন্য এক পথ প্রদর্শক গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং সেই পথ প্রদর্শনাকে মানব জীবনে কার্যকরী করবার সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি কুরআনের সুরা বা আয়াতকে কুরআনের সামগ্রিক বাণী ও তাৎপর্যের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই তফসীর সমকালীন মুসলিম চিন্তার জগতকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমা হয়েছে। শুধু তফসীর নয় মওদুদীর চিন্তাভাবনা সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলমান ইসলামী আন্দোলনের জন্য এক বিপুল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে মওদুদী ও তার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকাকে মিসরের হাসানুল বান্না ও তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলেমুনের আবিশ্ব ভূমিকার সাথেই তুলনা করা যায়।

মওলানা মওদুদী ১৯৭৯ সালের ২২ সেপটেম্বর নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তার লাশ লাহোরে এনে নিজের বাড়িতে দাফন করা হয়।

তিন

মওদুদীর মৌল চিন্তাভাবনার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের ধারণা। ইসলামের কলেমার যে ঘোষণা মওদুদী মনে করেন এর মর্মার্থ শুধু মৌখিক ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, সার্বভৌমত্বের পর্ণ অধিকারী ও আইণ প্রনেতা হিসেবে গ্রহণ করা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ মানুষের এই ধরনের পূর্ণ আনুগত্য দাবি করার ক্ষমতা রাখেন। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জীবনের সকল রকমের কার্যক্রম ও তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি যেহেতু সার্বভৌম আইন প্রণেতা, সুতরাং মানুষের নিজের জন্য আইন বানাবার কোন

www.pathagar.com

অধিকার নেই। কিংবা তার নিয়তি নির্ধারণেরও কোন সুযোগ নেই। মওদুদীর ভাষায় কলেমার বাণী হচ্ছে ঃ

The Islamic statement of faith is therefore, essentially a moral statement; a summons that man respond to Him with his whole being in exclusive service and obedience and devotion and worship.[৫]

খোদায়ী সার্বভৌমত্বের এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে চাই সেই সব নিয়ম-কানুন, প্রথা ও পদ্ধতির অপসারণ যা কিনা খোদার নির্দেশের পরিপন্থী। মওদুদীর এই চিন্তাভাবনা ইউরোপীয় রেনেসাঁ উদ্ভূত মানবীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণার পুরোপুরি উল্টোপিঠ। রেনেসাঁর সময়কার দার্শনিক লক, কান্ট, ভল্টেয়ার, দিদেরোরা মওদুদীর এই কথায় হয়তো আর একবার কবরে পাশ ফিরে শুয়েছেন। কিন্তু মওদুদী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে কারেন আর্মস্ট্রং-এর ভাষায় ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে এক নতুন 'liberation theology' উপস্থাপন করেছেন।[৬] তার কথা হলো মানুষ একমাত্র সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাধিকারী আল্লাহর দাসত্ব করবে। মানুষ অন্য মানুষের দাসত্বও করবে না, অন্য মানুষের নির্দেশও পালন করবে না। যে শাসক আল্লাহর নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য চালাতে অস্বীকৃতি জানায়, প্রজারা তাকে মানতে বাধ্য নয়। এই ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রয়োজন। যাতে এই ধরনের শাসককে সরিয়ে দেয়া যায়।

ইসলামী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র শাসকের খেয়ালখুশি মতো চলতে পারবে না। এটি মুসলমানকে মানবীয় নিয়ন্ত্রণ ও যাবতীয় অব্যবস্থা থেকে মুক্ত রাখবে। ইসলামী আইনে খলিফা শুরার (পরামর্শ সভা, Consultative body অথবা আজকের দিনের Parliament ও হতে পারে) পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় সরকার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো জনগণের কাছ থেকে বৈধতা নেবে। খলিফা কিংবা জনগণ কেউই নিজের জন্য আইন তৈরি করতে পারবে না। খলিফাকে শরীয়াহর নীতি অনুসারে, শুরার পরামর্শক্রমে এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

সুতরাং মুসলমানকে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া পশ্চিমা ধাঁচের সরকার ব্যবস্থাকে অপসারণ করা চাই যা কিনা খোদায়ী কর্তৃত্বের দখল নিয়ে খোদাদ্রোহিতার নিশান উড়িয়ে দিয়েছে। যখনই মানুষ নিজের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখনই সে হয়ে পড়ে নিজের ইচ্ছা বা রিপুর দাস। যার পরিণতিতে জন্ম হয় জুলুম, অবিচার, অপচার। কেননা মানবীয় বুদ্ধি ও চেতনা যত উন্নতই হোক না কেন তা নির্ভুল নয়। এই কারণেই আমাদের ঐশী সাহায্য দরকার।

মওদুদীর এই 'liberation theology' একজন পাকা নাস্তিক, যুক্তিবাদী, প্রগতিপন্থী বা সেকুলারিস্টের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু আদর্শ হিসেবে এর অন্তর্গত তাৎপর্য ও গভীরতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মওদুদী একালের পরিভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের গুরুত্বও বুঝতেন, কারণ এটিও দুর্নীতি ও স্বৈরাচার প্রতিরোধের একটা বিকল্প ব্যবস্থা বৈকি। এই কারণেই তিনি এসব ব্যবস্থাকে ইসলামী মডেলের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। মওদুদী আদর্শের মূল্যকে ও অস্বীকার করেননি। তাই তিনি ইসলামকে এক বৈপ্লবিক আদর্শবাদ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আদর্শ হিসেবে এটি ফ্যাসিবাদ ও মার্কসবাদের থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। ফ্যাসিবাদ ও মার্কসবাদ অন্য মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত

www.pathagar.com

করে। অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে আল্লাহ ব্যাতীত সকল রকমের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। একজন প্রকৃত আদর্শবাদীর মতো মওদুদী অন্য সব মতাদর্শকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গণতন্ত্র তার ভাষায় বিশৃঙ্খলা, লোভ, জনতার ক্ষোভ উসকে দেয়। পুঁজিবাদ শেণী বৈষম্যকে স্ফীত করে এবং দুনিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক শোষণ-শাসন, যুদ্ধ, হত্যাকে বৈধতা দেয়। কমিউনিজম সব ধরনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও মানবীয় উদ্যোগকে কেড়ে নেয়।

এখন কথা হচ্ছে মওদুদীর এই liberation theology কে কিভাবে কার্যকরী করা যাবে আর কিভাবেইবা মানুষ খোদার আহবানে সাড়া দেবে বা কোন পদ্ধতিতে খোদার নির্দেশের সাথে পরিচিতি হবে।

মওদুদী এর উত্তরে নবুয়তের কথা বলেছেন যা তার খোদায়ী সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তার ভাষায় নবুয়ত হচ্ছে God's response to man's parennial need for guidance.[৭] মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করবার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নবীদের প্রেরণ করেছেন। এরা হচ্ছেন আল্লাহর বাণী বাহক, যারা কিনা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ ধরনের জ্ঞানকে মানুষের মধ্যে প্রচার করেন, নিজেরা সেটি পালন করেন এবং মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করবার জন্য আহবান জানান। মানুষের এই ঐশী দিক নির্দেশকে প্রচার করা ছাড়া নবীরা মানুষের জীবন বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেন ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেন।

নবুয়তের এই সিলসিলার শেষতম প্রতিনিধি হচ্ছেন মোহাম্মদ (সঃ) এবং তার প্রাপ্ত ঐশী নির্দেশাবলীর নাম হচ্ছে কুরআন। এই পর্যায়ে মওদুদী মনে করেন রসুল (সঃ) এর আগমনের পর থেকে খোদার দাসত্ব মানে হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশকে যথার্থভাবে অনুসরণ করা।

মওদুদী মানব জীবনে প্রচলিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কথাও তুলে ধরেছেন। একদল খোদায়ী সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়, তাকেই একমাত্র আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করে তার আনুগত্য করার জন্য রাজি হয়। অন্য দল খোদায়ী সার্বভৌমত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয়। নবীরা এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। মওলানা মওদুদী মনে করেন যে বা যারা মানব জীবনে নবীদের প্রাপ্ত ঐশী নির্দেশের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে তারাই জাহিলিয়ার মধ্যে ডুবে আছে। জাহিলিয়ার মানে হচ্ছে অজ্ঞতা, বর্বরতা ইত্যাদি। একে জাহিলিয়া বলা হয়েছে এই কারণে যে মানব জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এরকম প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র নবীদের প্রাপ্ত ঐশী প্রত্যাদেশ থেকেই পাওয়া যায়। সুতরাং মওদুদীর কথা হচ্ছে জাহিলিয়াকে খতম করে ইসলামের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ঃ

Islam can never become a living reality unless the dominance of Jahiliyah is ended. The prophets and their true followers, therefore, engaged in a striving which also aims at putting an end to the hegemony of Jahiliyah. This lends a revolutionary character to their struggle.[৮]

মওদুদী আর একটা জরুরী কথা বলেছেন। তার কথা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনের পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক দিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম মানে মুসলমানের সাথে আল্লাহর স্রেফ ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয় কিংবা এটি কোন রীতি পদ্ধতির একটি সমষ্টি

www.pathagar.com

নয়। মুসলমান যেমন মসজিদে গিয়ে আল্লাহর সামনে নত হবে তেমনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করবে। তার ভাষায় ঃ

A Muslim is not only required to submit to God in places of worship, but in all places and at all times - in his home and on the street, on the battlefield and around the conferance table, in schools and colleges and universities, in centres of business and finance; and so on and so forth.[৯]

সাম্প্রতিককালে মানবীয় চেতনা ও বুদ্ধির বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল বিকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই মানবীয় বুদ্ধিকে যদি ঐশী নির্দেশের আয়ত্তাধীন না করা যায় তবে নানা রকম পাশবিক চাহিদা ও স্বার্থপরতা সেই চৈতন্যকে অন্ধ করে দেয় এবং মানবজাতি নানা রকম গোত্র ও জাতি চেতনায় আটকে পড়ে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, অসহযোগিতা মাথাচাড়া দেয়। পরিণতিতে বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। মওদুদী আধুনিক সভ্যতার এই পচনশীল দিকটির প্রতি আমাদের ইংগিত করেছেন এবং সভ্যতার এই অবক্ষয় রোধ করতে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থানের কথা জোরেশোরে প্রচার করেছেন। বলাবাহুল্য নতুন এই ব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইসলাম। এখন কথা হলো মানব জীবন ও সভ্যতাকে ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হলে একালে পশ্চিমী সভ্যতা ও তার অর্জনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি ধরনের হবে ? এ সূত্রে মওদুদী উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলিম সমাজের সংসর্গের ফলে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যার প্রত্যেকটিকে তিনি অসম্পূর্ণ বলেছেন। প্রথম দলের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয় একধরনের পরাজিত মনোবৃত্তি যার ফলে এরা পশ্চিমের সব কিছুকেই বাছবিচারের তোয়াক্কা না করে আধুনিকতার নামে অন্ধভাবে অনুকরণের চেষ্টা করে এবং পশ্চিমী জীবনবোধ, পশ্চিমী আইন, পশ্চিমী জীবনধারা, পশ্চিমী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করে। মওদুদী অবশ্য বলেছেন পরাজিত মনোবৃত্তি সৃষ্টি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের এই সংস্পর্শে একটি উপকার হয়। এর ফলে মুসলিম সমাজের আবদ্ধ, স্থিতিশীল, গতিহীন দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে পড়ে। কিছুটা হলেও তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হয় এবং তাদেরকে আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে। যদিও পরাজিত মনোবৃত্তির কারণে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয় এবং বল্গাহীন পশ্চিমীকরণের ধাক্কায় মুসলিম সমাজের স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং মানব জীবনের দিক-নির্দেশনা হিসেবে ইসলামের মূল্য অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে যায়।

অন্যদলের প্রতিক্রিয়া হয় আত্মরক্ষামূলক এবং বদ্ধজলার মতো। এদের ধারণা হয় পশ্চিমীকরণের ধাক্কায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ঐতিহ্যকে যদি সংরক্ষণ না করা যায় তাহলে ইসলামের অস্তিত্বই থাকবে না। এরা এই ঐতিহ্যের সুস্থ ও অসুস্থ উপাদানকে চিহ্নিত ও পৃথক করতে পারেননি এবং এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেননি কি কারণে মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয় ও পতন ঘটেছে এবং কি কারণে পশ্চিমীরা আজ তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে। এই মুসলমানেরা শুধু ঐতিহ্যের মধ্যেই ডুবে আছেন এবং যুগোপযোগী কোন রকমের পরিবর্তনের বিরোধী রয়ে গেছেন। মওদুদী এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মুসলিম সমাজের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের সবরকমের বিচার ফয়সালার মাপকাঠি এবং সেই আলোকেই আজকের যুগের সমস্যার সমাধান করতে হবে। অতীতের কোন উদাহরণ পেশ করে সমস্যার সমাধান হবে না। এমনকি অতীতে কোন সুস্থ কাজ হয়ে থাকলেও আজকের জন্য তা কোনোরকম বিচার-বিশ্লেষণ ব্যাতীত বল্গাহীনভাবে আত্মস্থ করা ঠিক হবে না। মওদুদীর এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিপন্থী ও সংরক্ষণবাদী উভয়ের থেকেই পৃথক। তার কথা হলো মুসলিম সমাজ ও ঐতিহ্যকে (যার মধ্যে সুস্থ ও অসুস্থ উপাদান উভয়ই আছে) যেমন আমাদের আজকের দিনে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে তেমনি পশ্চিমী সভ্যতা, দর্শন, তার মাপকাঠি ও ত্রুটিবিচ্যুতি সবকিছুকেই সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় মানব সভ্যতার জন্য পশ্চিমের ইতিবাচক অবদান বিশেষ করে এর প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতাকে অবহেলা করতে হবে। এই ব্যাপারে মওদুদী সম্পূর্ণ উদারনৈতিক ও খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন এবং তার মতে এই সব প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতাকে মুসলিম সভ্যতা যদি আত্মস্থ করে নেয় তবে কোন ক্ষতি নেই যদি তা হয় Value Free- মূল্যবোধ নিরপেক্ষ।

চার

মওদুদীর এইসব চিন্তাভাবনার সাথে মিসরের হাসানুল বান্নার চিন্তার মধ্যে একধরনের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এবং উভয়ের প্রতিষ্ঠিত দল জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলেমুনের কর্মধারারও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মওলানা মওদুদীর চিন্তাভাবনা বুঝতে এখন আমরা তার সাথে হাসানুল বান্নার চিন্তাকে মিলিয়ে দেখতে পারি। উভয়েই প্রায় সমসাময়িক ছিলেন এবং তারা দু'জনেই ছিলেন ধার্মিক, ইসলামী ও পশ্চিমী উভয় জ্ঞানেই প্রবুদ্ধ। তাদের দু'জনেরই চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে স্বসমাজের উপনিবেশীকৃত আবহাওয়ায়। দু'জনেই সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর চেহারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিজেদের সমাজকে দেখেছিলেন পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল, রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্যুত। প্রথম জীবনে উভয়েই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ও পরে তারা স্বসমাজের মুক্তির জন্য ইসলামী পুনর্জীবনবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাদের এই ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন ঠিক অতীতমুখীনতা ছিল না বরং ইসলামের মধ্যে থেকে একালের সমস্যাগুলোকে তারা যুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। জন এল. এসপোসিটো লিখেছেন ঃ

They did not simply retreat to the past but instead provided Islamic responses, ideological and organizational, to modern society.[১০]

মওদুদী ও বান্না উভয়েই ইসলামের অন্তর্শক্তি ও যুক্তিবাদী ধারাকে এ কালের মুসলিম সমাজের সমাধানে প্রয়োগ করেন। সত্যিকার অর্থে তারা ইসলামের পুনর্গঠন বা পুনর্ব্যাখ্যা করে ইসলামের নবীকরণ ও আধুনিকায়ন করেন যাতে তারা তাদের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে পারেন। তারা ইসলামী নীতি ও বিশ্বাসের পুনর্ব্যাখ্যা করে আধুনিক সমস্যাগুলোকে বুঝবার চেষ্টা করেন। যদিও তারা তাদের এই বিশিষ্ট পদ্ধতিকে ইসলামী আধুনিকতার থেকে পৃথক রেখেছিলেন যাকে তারা শ্রেফ ইসলামের পশ্চিমীকরণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

www.pathagar.com

যেক্ষেত্রে ইসলামী আধুনিকতাবাদীরা নির্দ্বিধায় পশ্চিমী মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ করে নিতে উন্মুখ সেক্ষেত্রে মওদুদী ও বান্না ইসলামী নীতির ভিত্তিতে জওয়াবদিহিতামূলক সরকার, আইন ও শিক্ষা সংস্কার, জনগণের অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলোর একটি ইসলামী বিকল্প হাজির করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে মওদুদী ও বান্নার অবস্থান একই রকম। তারা মনে করতেন সাম্রাজ্যবাদ শুধু মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই ভেঙ্গে চুরে দিচ্ছেনা, এটি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকেও বিপন্ন করে তুলছে। মুসলিম সমাজের বল্গাহীন পশ্চিমীকরণ মুসলমানদের আত্মপরিচয়, স্বাধীনতা ও জীবনধারা আজ কেড়ে নিচ্ছে। তারা উপলব্ধি করেছিলেন পশ্চিমের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ (শিক্ষা, আইন, প্রথা, মূল্যবোধ) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চেয়েও বিপজ্জনক, কেননা এটি মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কেই উন্মূল করে দেয়। সুতরাং পশ্চিমের অনুকরণ কিংবা পশ্চিমের উপর নির্ভরশীলতাকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে জামায়াত ও ইখওয়ান ঘোষণা দেয় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এটি হচ্ছে পশ্চিমী পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের মতাদর্শিক বিকল্প। তারা তাদের চিন্তাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করে, সংগঠন গড়ে তোলে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের পথ প্রস্তুত করে।

পশ্চিমীকরণের বিরোধী হলেও যুগোপযোগিতা অর্থে মওদুদী ও বান্না আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন না। তারা উভয়েই আধুনিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও গণযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই তারা তাদের বাণীকে প্রচার করেছেন ও জনসমর্থন যোগাড় করেছেন। তাদের বাণী যদিও ঐশী প্রত্যাদেশভিত্তিক ছিল, কিন্তু তা একালের শ্রোতাদের জন্য উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। তারা আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে যুঝেছিলেন এবং ইসলামের সাথে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, মার্কর্সবাদ, আধুনিক ব্যাংকিং, শিক্ষা, আইন, নারীর কর্মক্ষেত্র, জায়নবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারগুলো কিভাবে কাজ করবে সেগুলোকে পুনঃনিরিক্ষা করেছিলেন। মওদুদী বান্নার চেয়ে অনেক বেশি লেখালেখি করেছেন, ধারাবাহিকভাবে ইসলামের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন এবং আজকের দিনে জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের প্রাসংগিকতাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। মওদুদী ও বান্নাকৃত ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই পুনঃমূল্যায়ন সর্বসাধারণের মধ্যে একটি মতাদর্শিক ভিত্তি অর্জন করেছে এবং বিশ্বজুড়ে ইসলামবাদী নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনগুলোকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। মওদুদী ও বান্নার মতাদর্শিক চিন্তাভাবনাগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ

১. ইসলাম একই সাথে ব্যক্তি ও যৌথ জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ সকল ক্ষেত্রের জন্যই উপযোগী একটি মতাদর্শিক ব্যবস্থা।
২. কুরআন, ওহী ও নবী মোহাম্মদের সুন্নাহ হচ্ছে মুসলিম জীবনের ভিত্তি।
৩. কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আইন হচ্ছে মুসলিম জীবনের নীল-নকশা।
৪. ইসলামের কলেমার মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে আল্লাহর

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র ঘোষণা এবং এই প্রত্যয় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলে মুসলমানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা পুনর্বার নিশ্চিত হবে।

৫. মুসলমানের দুর্বলতা ও অধঃপতনের কারণ হচ্ছে সেই সব মুসলমানের বিশ্বাসহীনতা যারা খোদার দেয়া বিধি-বিধান ও কানুন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও জড়বাদী আদর্শের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।
৬. ইসলামের হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে ইসলামের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং আল্লাহর আইনকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অবশ্য পালনীয় করতে হবে।
৭. মুসলিম সমাজে ইসলামী নৈতিকতার চৌহদ্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে কিনা মুসলিম সমাজের পশ্চিমীকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রতিরোধ করা যায়।

মওদুদী ও বান্না উভয়েই তাদের উপস্থাপিত মতাদর্শকে পশ্চিমী পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের বিকল্প হিসেবে হাজীর করেছেন। এটা সত্য তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামী আধুনিকতাবাদীদের মতোই মুসলিম সমাজের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামী আধুনিকতাবাদীদের অত্যধিক পশ্চিম নির্ভরতার করণে মুসলিম সমাজের অবক্ষয়ের জন্য সমালোচনাও করেছেন। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করেছে এবং পশ্চিমকেই যাবতীয় উন্নয়নের মডেল ধরে বাছবিচার নির্বিশেষে তাকেই অনুকরণে মেতে উঠেছে। তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তারা মূলতঃ দেশজ পশ্চিমী সাংস্কৃতিক উপনিবেশকারী (Indigenous Western Cultural Colonizers)।

অন্যদিকে মওদুদী ও বান্না ইসলামী আধুনিকতাবাদীদেরও সমালোচনা করেছেন এই বলে তারা ইসলামকে আধুনিকতার সাথে মানানসই প্রমাণ করার জন্য পশ্চিমী মূল্যবোধের উপর নির্ভর করেছেন এবং এক ধরনের পশ্চিমীকৃত ইসলামকে (Westernized Islam) উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামী আধুনিকতাবাদীদের লক্ষ্য যে পশ্চিম তার বাইরে এসে মওদুদী ও বান্না বললেন ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মুসলমানদের খামোখা পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের দিকে নজর ফেরানোর দরকার নেই এবং একালে নতুন করে ইসলামকে ভিত্তি করেই রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

আগেই বলেছি পশ্চিমকে সমালোচনা করলেও মওদুদী ও বান্না কিন্তু আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তারা পশ্চিমীকরণ ও আধুনিকায়ন, পশ্চিমী মূল্যবোধ ও আধুনিক মূল্যবোধকে এক পাল্লায় মাপেননি। তারা মনে করতেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পশ্চিমের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করা যেতে পারে যদি তাকে ইসলামের গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি দিয়ে নির্বাচন করা হয় এবং তার পশ্চিমী মূল্যবোধের মোড়ককে বদলে ফেলে ইসলামী মূল্যবোধের মোড়কে ঢেকে দেয়া যায়। সবশেষে মওদুদী আজকের ইসলামের মধ্যে এক ধরনের রেনেসাঁর প্রয়োজন অনুভব করেছেন যার ভিত্তি সেকুলারিজম ও যুক্তি না হয়ে হবে ওহী। মওদুদীর ভাষ্য হচ্ছে এরকম ঃ

We aspire for Islamic renaissance on the basis of the Quran. To us the Quranic spirit and Islamic tenets are immutable; but the application of

www.pathagar.com

this spirit in the realm of practical life must always vary with the change of conditions and increase of knowledge .. .. .. Our way is quite different both from the Muslim scholar of recent past and modern Europeanized stock. On the other hand we have to imbibe exactly the Quranic spirit and identify our outlook with the Islamic tenets while, on the other, we have to assess throughly the developments in the field of knowledge and changes in conditions of life that have been brought during the last eight hundred years; and third, we have to arrange these ideas and laws of life on genuine Islamic lines so that Islam should once again become a dynamic force; the leader of the world rather than its follower.[১১]

মওদুদীর গণতন্ত্র ভাবনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম মানবকেন্দ্রিক নয়, আল্লাহকেন্দ্রিক তাই জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংসদ তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহর আইনের আওতায় সংসদীয় ব্যবস্থা বা যে কোন পরামর্শ সভা গ্রহণযোগ্য। এই জন্য মওদুদী তার ব্যবস্থাকে থিয়ক্রাসী (Theocracy) না বলে Theo Democracy (ধর্মীয় গণতন্ত্র) বলেছেন যেখানে খোদায়ী আইনের আওতায় এবং জনগণের সমর্থনে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

পাঁচ

মার্কসবাদীরা ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে ধারাবাহিক শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। মওদুদী মার্কসবাদীদের মতো ইতিহাসকে শ্রেণী সংগ্রামের ঘটনাপুঞ্জ না বলে ইসলাম ও জাহিলিয়ার দ্বন্দ্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মওদুদী জাহিলিয়াকে ইসলামের প্রতিনয় (Anti thesis) হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং জুলুম ও খোদাদ্রোহিতার সাথে একে তুলনা করেছেন। জাহিলিয়া বলতে তিনি সবরকমের বিশ্বচিন্তা, মতাদর্শ, বিশ্বাস ও কার্যক্রমকে ইংগিত করেছেন যা কিনা খোদার সার্বভৌমত্ব ও ঐশী কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। তার মতে জাহিলিয়ার বিভিন্ন ধরণ আছে। বিশুদ্ধ বা পূর্ণাঙ্গ জাহিলিয়া হচ্ছে অতিন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃতিক সবকিছুকেই অস্বীকার করে। আবার আংশিক জাহিলিয়ার উদাহরণ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসের সাথে অন্যান্য অপবিশ্বাস ও ভুলের মিশ্রণ ঘটানো। ইসলাম জাহিলিয়ার সবরকম আকার ও প্রকৃতির বিরোধী এবং এটি মানবজীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়ে ঐশী নির্দেশনার আলোকে তাকে পুনর্গঠন করতে চায়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের ভিতরে নতুন বিশ্বাস, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ, নতুন ধ্যান-ধারণা ও নৈতিক প্রত্যয়ের জন্ম হয় এবং তার উদ্যোগ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্যক্তির জীবনের এই ধারাবাহিক রূপান্তরের ফলে পরিণতিতে এইসব ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি বিশ্বাসীদের ঐক্য গড়ে ওঠে। বিশ্বাসীদের এই দলটি শেষ পর্যন্ত একটি আদর্শগত আন্দোলনে পরিণত হয় যারা প্রার্থিত সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে শরীক হয়ে পড়ে। এই প্রচেষ্টার ফলে যেমন মানব জীবনের সার্বিক চেহারা পাল্টে যায়, পুনর্গঠিত হয় তেমনি নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তনের ভিতর দিয়ে নতুন ধারা সৃষ্টির সম্ভাবনা হয়। এই নতুন ধারাকে মওদুদী তার ভাষায় বলেছেন খিলাফাহ আলা মিনহাজ

www.pathagar.com

আল নবুওয়াহ (নবুয়তের প্রেরণায় উজ্জীবিত খেলাফত, Caliphate on the Prophetic Pattern)। এটি হচ্ছে সেই আদর্শ রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা যা কিনা মুসলমানরা তাদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মওদুদী বিশ্বাসের একটি মানদন্ড খাড়া করেছেন যা দিয়ে একদিকে তিনি ইসলামী পুনর্জীবনের পক্ষে যথার্থ ইসলামী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে পারেন অন্যদিকে সেই সব প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করতে পারেন যা জাহিলিয়ার সাথে নানাভাবে আপোস করে। ইসলাম ও জাহিলিয়ার দ্বন্দ্বে এই বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাগুলো দুটি বৃত্তকে অনুসরণ করে। এর একটি প্রান্তে আছে তাজদীদ। তাজদীদ হচ্ছে সেই সব প্রচেষ্টা যা ইসলামকে তার মৌলিক শুদ্ধতায় ফিরিয়ে আনে এবং স্থান ও কালের সাপেক্ষে ইসলামী নীতির আওতায় জীবন ও সমাজের পুনর্গঠন করে। অন্য বৃত্তে আছে তাজাদ্দুদ। তাজাদ্দুদের স্বরূপ হচ্ছে ঃ ১. ইসলামের মৌলিক নীতিকে ডিঙ্গিয়ে জাগতিক ও বস্তুগত স্বার্থের বিকাশ সাধন। এর ফলে ইসলাম যে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সত্তার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করতে চায় তা ধ্বংস হয়ে যায়। ২. যুগের জাহিলিয়ার সাথে আপোস। ৩. অনৈসলামী নীতি, মূল্যবোধ ও আচরণকে আত্মস্থ করার পর তাকে একটি ইসলামী আবরণ দেয়া।

যদিও তাজদীদ ও তাজাদ্দুদ উভয় প্রক্রিয়াকেই গতিশীল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারপরেও শেষ কথা হলো তাজাদ্দুদের মাধ্যমে নয়, একমাত্র তাজদীদের মাধ্যমেই ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। তাজদীদ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা (খিলাফাহ আলা মিনহাজ আল নবুওয়াহ) প্রতিষ্ঠার পক্ষে নবীদের সূচিত মিশনের ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য মওদুদীর কর্মকৌশল হচ্ছে এরকম ঃ

১. ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধকে জনগণের বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরতে হবে পাশাপাশি চলমান জাহিলিয়ার প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। ইসলামী নীতিকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে অন্যান্য মানব রচিত মতবাদের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও যুগোপযোগিতা প্রমাণ করা যায়। এর জন্য দরকার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ও প্রস্তুতি যার ফলে তত্ত্বকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করা যায়।

২. ইসলামী নীতিকে যারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের নৈতিক চরিত্রকেও ইসলামের আলোয় পুনঃনির্মাণ করতে হবে যাতে তারা সামাজিক সংস্কার করতে পারে এবং শিক্ষাব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামী আওতার মধ্যে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারে। সমাজকে যাবতীয় ইসলামী নীতির পরিপন্থী বিদআত থেকে মুক্ত রাখাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৩. এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির জন্য দরকার ইজতিহাদ ফি আল দীন - এর মানে হচ্ছে ইসলামের নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধকে আজকের দিনের প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রয়োগ করতে হবে। ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামী নীতির অভ্যন্তরে গতিশীলতার ধারণা এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কাজকর্মকে উৎসাহিত করা। ইসলামী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে দরকার

www.pathagar.com

ইজতিহাদের চর্চা অন্যদিকে বাস্তব কর্মজীবনে জিহাদের নীতির প্রয়োগ। ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্দেশ্যের সততা স্পষ্ট হয়, অন্যদিকে জিহাদের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা যায়। তাই মুসলিম জীবনের সফলতার জন্য ইজতিহাদ ও জেহাদকে একই সাথে এগিয়ে নেয়া দরকার।

৪. এই প্রক্রিয়ার শেষ স্তর হলো নেতৃত্বের পরিবর্তন। এটার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সবগুলো পড়ে। তবে শেষতমটিই হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটা জানা কথা ইসলামী রাষ্ট্র বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যথার্থ অর্থে কার্যকরী করা যাবে না, যদি না নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, যোগ্যতা ও সততা প্রশ্নাতীত হয়। মওদুদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই নেতৃত্ব পরিবর্তনের যথার্থ মাধ্যম হিসেবে মনে করেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় ইসলামী আন্দোলন বিকশিত হবে, এর শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারবে। তার বিশ্বাস ছিল যদি সমাজের ইসলামীকরণ করা সম্ভব হয়, তবে যোগ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই উঠে আসবে।

ছয়

বর্তমান মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে মওদুদীর মত হচ্ছে এটি রসুল (সঃ) ও তার পূণ্য খলিফাদের আদর্শ ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। ইসলামের রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন হয় যখন খেলাফত রাজতন্ত্রে পরিণত হয় এবং ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে সংকুচিত করা হতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ জীবনের ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এক ধরনের ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ শুরু হয়। ফলে নেতৃত্বের মধ্যেও বিভাজন দেখা দেয় এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পৃথক হয়ে পড়ে। মওলানা মওদুদী মুসলিম সমাজের এই আত্মঘাতী বিবর্তনের কথা তার বিখ্যাত খেলাফত ও মুলুকিয়াত (খেলাফত ও রাজতন্ত্র) গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বড় পরিবর্তন হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। এর কুফল ফলতে শুরু করে মুসলিম সমাজ জীবনের ভিতরে বিভেদ বিভাজন স্ফীতির ভিতর দিয়ে।

উপরোক্ত পরিবর্তনের ফলে জনগণের নৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে এবং তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক দেখা যায় যার ফলে দেখা দেয় নৈতিক অসুস্থতা, যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা যায় মোনাফেকী। এই ব্যবস্থা সংশোধনের যে চেষ্টা হয় না এমন নয় কিন্তু ক্ষত অব্যাহত থাকে যতদিন না মুসলিম দুনিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গায়ের জোরে মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সকল ব্যবস্থাকে দূষিত, বিকৃত ও বিধ্বস্ত করে যায় এবং পশ্চিমের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়। পশ্চিমী শিক্ষার কারণে এখানকার ধর্ম ও সমাজ জীবনের মধ্যে এক ধরনের পৃথকীকরণ শুরু হয়। ফলে দেখা যায় মুসলিম দেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও এখানকার নেতৃত্বের মন-মানসিকতা, জীবন ধারায় উপনিবেশের প্রভাব ভালো মতো রয়ে যায়। ফলে এই নেতৃত্ব নতুন স্বাধীন দেশের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না। তাদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা মজবুত ছিলো না এবং কমবেশি তারা অনৈসলামী চিন্তা ও মূল্যবোধের ভিতরেই বসবাস করতো। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন মুসলিম সমাজে ইসলামের অপর্যাপ্ত জ্ঞান,

www.pathagar.com

মোনাফেকী, নৈতিক অবক্ষয়, নেতৃত্বের সাথে জনসাধারণের দূরত্ব, ইসলামভিত্তিক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবক্ষয়ের দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষ ইসলামকে ভালোবাসে, কিন্তু ইসলামের জ্ঞান তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব আজকাল এমন সব মানুষের হাতে যারা আদৌ ইসলামী ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয়, এমনকি ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাদের সামান্য ধারণা নেই। এর ফলে মুসলিম সমাজে দু'টি ধারার জন্ম হয়েছে। একদিকে আছে ইসলাম অন্যদিকে আধুনিকতা নামক একালের জাহিলিয়া যার প্রেরণার উৎস হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। এর থেকে প্রতিকারের উপায় কি ? মওদুদীর উত্তর হচ্ছে ঈমান ও জিহাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটানো।

মওদুদী তার লেখালেখিতে বিপ্লব শব্দটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন, যা তার চিন্তা ও পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে। তিনি ফরাসী, রুশ ও কামাল পাশার বিপ্লবকে নিরিক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তার মনে হয়েছে এ সমস্ত বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কার করা এবং মানুষের পার্থিব ও সামাজিক অবস্থানকে বদলে দেয়া। কিন্তু এইসব বিপ্লবীরা মানুষের ভিতরকার রূপান্তরে আগ্রহী নয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের লক্ষ্য, উদ্যোগে এসব বিপ্লব তেমন একটা পরিবর্তন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে ইসলামের বিপ্লব হচ্ছে ব্যতিক্রমী ও রেডিক্যাল। এটি মানুষের অন্তঃসত্ত্বাকেই পরিবর্তন করে দেয়। বিপ্লবের আরেক পিঠে সাধারণত আমরা দেখি ঘৃণা-বিদ্বেষ, সহিংসতা ও শক্তির প্রয়োগ। মওদুদী এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি এবং বলেছেন ইসলামী বিপ্লবের কৌশল হচ্ছে ধীর, সুচিন্তিত ও হিসেবী। চলমান ব্যবস্থার প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে এর ক্ষতিকর অংশটি নীরবে সরিয়ে ফেলার নীতিতে বিশ্বাসী তিনি। এজন্য পূর্বাহ্নেই চলমান ব্যবস্থার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে নেয়া জরুরী। এটা সত্য ইসলাম একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে পৃথক এবং যে পরিবর্তন সমাজে ইসলাম আনতে চায় সেটিও সম্পূর্ণ, আংশিক নয়। তবে এই রূপান্তরটা মানুষের সহনীয়তার মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে হওয়া চাই।

সাত

আজকের দিনে মুসলিম দুনিয়া জুড়ে যে ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ লেগেছে কোন সন্দেহ নেই মওলানা মওদুদী তার অন্যতম প্রাণপুরুষ। তার চিন্তা ও বিশ্বাস বিশ্বজুড়ে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদীদের একটি বিরাট অংশের মতাদর্শিক ভিত্তি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এবং সেই মতাদর্শকে কার্যকরী করার জন্য নানামুখী চেষ্টাও চলছে। এসব আন্দোলনগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ইসলামকে ভিত্তি করে সমাজ পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং একই সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। লক্ষ্যণীয় মুসলিম দুনিয়ায় আজ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই শুরু হয়েছে সেখানে ইসলাম পন্থীরাই প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা ইসলামের এই বৈপ্লবিক ভূমিকার পিছনে মওলানা মওদুদী ও হাসানুল বান্নার চিন্তা ও দর্শনের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। এদের বৌদ্ধিক-নৈতিক প্রচেষ্টায় মুসলিম ভাবজগতে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নীতি ও দর্শনের ব্যাপারে ব্যাপক রূপান্তর ও পুনঃমূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে সাম্রাজ্যবাদী কোন ব্যবস্থাদি দিয়েই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না।

www.pathagar.com

মুসলিম ভাবজগতের এই আলোড়ন একালের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বিপ্লবী ঘটনা এবং এই প্রক্রিয়া আজ তাদেরকে দ্রুত মুক্তির লক্ষ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. John L. Esposito, The Islamic Threat : Myth or Reality ? New York : Oxford University Press, 1998.
২. Sayyed Vali Reza Nasr, 'Mawdudi and the Jamaat-i-Islami : The Origins, Theory and Practice of Islamic Revivalism', in Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival, London; Zed Books Ltd. 1994.
৩. প্রাগুক্ত।
৪. Frederic Grare, Political Islam in the Indian Sub-continent : The Jamaat-I-Islami. New Delhi : Manohar and Centre de Sciences Humaines, 2002.
৫. Abul A'la Mawdudi, Political Theory of Islam, Lahore, 1974.
৬. Karen Armstrong, The Battle for God : A History of Fundamentalism. New York : The Random House Publishing Group, 2000.
৭. Abul A'la Mawdudi, Towards Understanding Islam. Dhaka : Ahsan Publication, 2004.
৮. Abul A'la Mawdudi, Political Theory of Islam. Lahore, 1974.
৯. Abul A'la Mawdudi, Freedom Movement in India and Muslims. Lahore, 1964.
১০. John L. Esposito, Islam and Politics. Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 1991.
১১. Muhammad Yusuf, Mawdudi : A Formative Phase. Karachi : The Universal Message, 1979.

www.pathagar.com

আবুল হাশিম

এক

আবুল হাশিম ছিলেন একাধারে রাজনীতিক ও দার্শনিক। তার রাজনীতি ও সমাজচিন্তা ছিল দার্শনিকতামন্ডিত। একই সাথে আদর্শবাদী রাজনীতিক, রাষ্ট্রচিন্তানায়ক, বুদ্ধিজীবী শুধু বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে নয়, সেকালের ভারতীয় মুসলিম সমাজেও দু একজনের বেশি জন্মাননি। এদিক দিয়ে বিচার করলে সর্বভারতীয় পর্যায়ে তৎকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষার তিনি অন্যতম ছিলেন।

১৯৪০ এর দশকে আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর একজন প্রগতিশীল ও চিন্তাবিদ লীগ নেতা হিসেবে তিনি বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রধানত তার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে মুসলিম লীগ একটি গণসংগঠনে পরিণত হয় এবং বিকাশমান বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন হয়ে ওঠে। তৎকালীন উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা মুসলিম জনঅধ্যুষিত প্রদেশ ছিল বাংলাদেশ এবং অত্র অঞ্চলের মুসলমানরাই ছিল সর্বাপেক্ষা নিপীড়িত। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে এই নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং একটি রেডিক্যাল চিন্তাভাবনা লালন করতেন। আবুল হাশিম রাজনীতিক হলেও তার রাষ্ট্রচিন্তা ছিল সার্বক্ষণিক এবং তিনি চিন্তা ও দর্শনকে বাদ দিয়ে রাজনীতি খুব একটা করেননি। তার দার্শনিক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইসলাম এবং তিনি মনে করতেন ইসলামী আদর্শ ও দর্শন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে প্রয়োগ করে মানবতার মুক্তি অর্জন সম্ভব। এ ব্যাপারে রব্বানী দর্শনের প্রবক্তা আল্লামা আজাদ সুবহানীর বন্ধুত্ব ও বুদ্ধিবাদী প্রেরণা আবুল হাশিমকে উজ্জীবিত করেছিল।

দুই

আবুল হাশিম ১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি বর্তমান ভারতের অন্তর্গত পশ্চিবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাশিয়ারা গ্রামে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী আবুল কাশেম ছিলেন সেকালের অগ্রগণ্য জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা। খেলাফত আন্দোলনেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। হাশিমের নানা নওয়াব আবদুল জব্বার ছিলেন উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজনেতাদের অন্যতম এবং বিখ্যাত নওয়াব আবদুল লতিফের সখ্য।[১] মাত্র ছয় বছর বয়সে হাশিম তার মাকে হারান। ফলে বর্ধমান শহরে খালার স্নেহচ্ছায়ায় তার স্থান হয় এবং এখানেই তিনি লালিত পালিত হন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে কুরআন শিক্ষার ভিতর দিয়ে তার লেখাপড়ায় হাতে খড়ি। পরবর্তীতে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর তিনি কিছুদিন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন কিন্তু সেখানে ভাল না লাগায় বর্ধমান ফিরে আসেন এবং এখানকার রাজ কলেজ থেকে আইএ

www.pathagar.com

ও বিএ পাস করেন। ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্র জীবনে কখনো আবুল হাশিম সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেননি। কিন্তু সতীর্থদের নিয়ে বর্ধমানে তিনি Young Men's Muslim Association নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং স্থানীয়ভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক জাগরণে একটা বড় ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৬ সালে পিতা মৌলভী আবুল কাশেমের ইন্তেকালের পর বর্ধমান জেলার মুসলমানরা তাকে আইন সভায় নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করে। মৌলভী কাশেমের জীবনব্যাপী জনকল্যাণমুখী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এলাকার মুসলমানরা তার পুত্রকে নির্বাচিত করে প্রতিদান দেয়। ১৯৩৭ সালে আবুল হাশেমের সাথে কায়েদে আজম জিন্নাহর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। লীগে যোগ দিয়ে প্রথমে তিনি বর্ধমান জেলার কৃষক ও মুসলমানদের নিয়ে এক সম্মেলন করেন। পরে পিতার গড়া বর্ধমান জেলা মোহামেডান এসোসিয়েশনকে বর্ধমান মুসলিম লীগে রূপান্তরিত করেন এবং তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলিম জাতিত্বকে ভিত্তি করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিতরে আবুল হাশিম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং বাংলায় ফিরে দ্বিজাতিতত্ত্বের মৌলবাণীকে প্রচার করতে থাকেন। ১৯৪২ সালে আসানসোলে আবুল হাশিমের সাথে বিহারের গোরখপুরের অধিবাসী বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আজাদ সুবহানীর সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ হাসিমের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ মওলানা সুবহানী তার চিন্তা ও মানসগঠনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেন। মওলানা সুবহানী মানব জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের উপর জোর দেন এবং আবুল হাশিমকে তার প্রচারিত রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত করেন। সুবহানীর মতে রব্বানিয়াৎ হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব। রব্বানিয়াৎ শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম রব থেকে উদ্ভূত যার অর্থ আল্লাহ বিশ্বের পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা ও বিবর্তক। রব হচ্ছে আল্লাহর সর্বোচ্চ গুণবাচক নাম এবং তার অন্যান্য গুণসমূহ এই প্রধান গুণের পরিপূরক ও সম্পূরক। যে ব্যক্তি তত্ত্ব ও বাস্তবে রব্বানিয়াৎকে গ্রহণ করে সেই হচ্ছে রব্বানী।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা সুবহানী বর্ধমানে আবুল হাশিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আবুল হাশিমকে মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে ইসলামের প্রয়োগিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পরামর্শ দেন। প্রথম দিকে ইতস্ততঃ করলেও আবুল হাশিম মওলানা সুবহানীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নে অটুট থাকেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইতিপূর্বে সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করায় বাংলা লীগে ঐ স্থানটি শূন্য হয়। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করে সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। প্রথম দিকে আপত্তি করলেও পরে

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী তাকে সমর্থন করেন। এর ফলে আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ইতিহাসে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নির্বাচিত হয়ে তিনিই প্রথম বঙ্গীয় মুসলিম লীগকে অভিজাত জমিদারদের হাত থেকে বের করে আনার উদ্যোগ নেন এবং এটিকে একটি গণমুখী, রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেন। তিনি মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে রব্বানী দৃষ্টিতে ইসলামের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা প্রসারের চেষ্টা করেন এবং তরুণ প্রজন্মের কর্মীদের সামনে ফারুকী খেলাফতকে মডেল হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি মনে করতেন ইসলামের ইতিহাসে ফারুকী খেলাফতই হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নমুনা যখন ইসলামী নীতি এবং মূল্যবোধের সত্যিকার বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা দেখা গিয়েছিল। তিনি মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে একটি কর্মীদল গড়ে তোলেন এবং এদের নিয়ে কুরআন ক্লাসের প্রবর্তন করেন। এসব ক্লাসের ভিতর দিয়ে তিনি তরুণদের ভিতরে তার বৈপ্লবিক আইডিয়া তুলে ধরেন।

আবুল হাশিমের এই সব তৎপরতা মুসলিম লীগের অভিজাত নেতৃবৃন্দ খুব একটা সুনজরে দেখেছেন বলে মনে হয় না। কারণ তারা ক্ষমতার রাজনীতিতেই বেশি মাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। আবুল হাশিম অবশ্য রাজনীতিকে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হিসেবে নেননি। তিনি মনে করতেন রাজনীতি হচ্ছে একটি জীবনদর্শনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চলমান হাতিয়ার। বোধ হয় এই কারণেই তিনি সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে অতবেশি সফল হতে পারেননি। যদিও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসেবে তার অবস্থান অনেক বেশি সংহত। জীবদ্দশায় ইসলামকে তিনি সামাজিক ও বিপ্লবী শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। এর কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে মার্কসবাদী তৎপরতা ও চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মুসলিম সমাজের অনেক তরুণ এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দিশাহারা এই সব তরুণদের সামনে ইসলামের সাম্যবাদী ভূমিকা ও অর্থনৈতিক শোষণের বিকল্প হিসেবে ইসলামের বিশেষ চিন্তার কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন ইসলামের সামাজিক সুবিচারের কথা। মার্কসবাদের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং মার্কসকে তিনি মনে করতেন ভ্রান্ত ও নিম্নপর্যায়ের দার্শনিক।[২] আবুল হাশিমের মত ছিল পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটলেও এটি বস্তুবাদেরই একটি ভিন্নরূপ। পুঁজিবাদে সম্পদের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে ব্যক্তি, মার্কসবাদে সম্পদের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে রাষ্ট্র। মরালিজম না থাকায় পুজিবাদের ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট শোষণ মার্কসবাদে রাষ্ট্রীয় শোষণে পরিণত হয় মাত্র।

রাজনীতি চিন্তার দিক দিয়ে আবুল হাশিম ছিলেন মোটের উপর স্বাতন্ত্র্যবাদী। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারায় হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয় তাতে তার পূর্ণ আস্থা ছিল। এ স্বাতন্ত্র্যবাদকে কায়েদে আযম দ্বিজাতিতত্ত্ব হিসেবে আদর্শায়িত করেছিলেন এবং আবুল হাশিম সাহেব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হিসেবে এ আদর্শের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে দুটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী

www.pathagar.com

ছিলেন। একটি পাকিস্তান নয়। এই কারণে তিনি ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনের চেষ্টার বিরোধিতা করেন।

সাতচল্লিশের সূচনায় যখন এটা নিশ্চিত হয়ে যায় ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেই সাথে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চল হিসেবে বাংলাও ভাগ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি বাংলাকে অখন্ড রেখে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতৃবৃন্দের সাথে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশের প্রাথমিক খসড়াও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের যে স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যাখ্যা ধরে আবুল হাশিম ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন তার সাথে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার ধারনা সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় না। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে যদি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে হয় তাহলে উপমহাদেশে অন্তত কয়েক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এরকম প্রস্তাবে সেদিনের মুসলিম লীগ এমনকি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কি রাজি হতেন? উল্টো ইতিহাস থেকে দেখা যায় বাস্তববাদী রাজনীতিক কায়েদে আযম আবুল হাশিম সাহেবের স্বাধীন বঙ্গদেশ পরিকল্পনাকে সমর্থন দেন কিন্তু সেকুলার বলে পরিচিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন বঙ্গদেশের ধারণা একপ্রকার উড়িয়ে দেন। শুধু তাই নয় কংগ্রেস হাই কমান্ড গোপনে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর মত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বকে বাংলা বিভাগের পক্ষে জনমত সংগঠনে দায়িত্ব অর্পণকরে। আরো মজার ঘটনা হলো বঙ্গীয় আইন সভার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মতো বঙ্গভাগের পক্ষে ভোট দেয়। অথচ এরাই ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবচেয়ে সোচ্চার ছিল।

আসলে আবুল হাশিম কিংবা সোহরাওয়ার্দী সাহেব উভয়ে বঙ্গবিভাগের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। নিজেদের মাতৃভূমির দুর্দশায় আবেগাক্রান্ত হয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তারা এ ধরনের আন্দোলন করেছিলেন বলে মনে হয়। অনেকের ধারণা বাংলাদেশের যে অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান হওয়ার কথা ছিল সেখানে যুগপৎ সোহরাওয়ার্দী ও হাশিমের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল দুর্বল। বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী বুঝেছিলেন নাজিমুদ্দিন সাহেবকে হঠিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়া তার জন্য সহজ নয়। তাই তার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য হাশিমকে সাথে নিয়ে যুক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা নেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কার্যকরী হওয়ার মতো ছিল না।[৩] তাছাড়া এরূপ আন্দোলন আবুল হাশিমের পক্ষে দীর্ঘদিন করা সম্ভব হতো কিনা তা বলা শক্ত। কেননা তার রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তা ছিল পুরোপুরি ইসলামনির্ভর। মূলত তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ভারত ভাগ ও সাথে সাথে বাংলা ভাগের পর সেখানেই তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন ও পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সেখানকার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সেখানকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে আবুল হাশিম থাকতে পারেননি। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা তার বর্ধমানের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় এবং পরিস্থিতি এত খারাপ হয়ে যায় যে তার প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়। তিনি বিধানচন্দ্র, পন্ডিত নেহরু ও রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে চান স্বাধীন ভারতের একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে তিনি তার

www.pathagar.com

নিরাপত্তা আশা করতে পারেন কিনা? বস্তুতঃ তিনি সেখানে কোন নিরাপত্তার আশ্বাস পাননি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিও তার একধরনের আকষণ ছিল। এসব কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে চলে আসেন এবং এখানকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন এবং তার বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য মুসলিম লীগ সরকার তাকে জেলে ঢুকায়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন মারফত তিনি কখনোই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। অন্ততঃ তার পরবর্তী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা তাই প্রমাণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন পার্টি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনে তার শর্ত ছিল যদি কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টে না নেওয়া হয় তবে তার নেতৃত্বাধীন খেলাফতে রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টে যোগ দিতে পারে। তার এই শর্ত যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ মেনে নেয়নি এবং তারও যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়া হয়নি।

১৯৫২ সাল থেকে পাকিস্তানে বিরোধী দলগুলোর একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সেসময় মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটা বৈঠকে আবুল হাশিম দুর্বল ও আদর্শ বৈচিত্রহীন ঐক্যের বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাব করেন ঃ

. . . . . they should evolve some principles which could be accepted by all as the basis for organizing a strong and homogeneous party.[8]

ঐ সভা তার পরামর্শ গ্রহণ করে একটি মেনিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র তৈরি করবার জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে এবং পরবর্তীতে কমিটির সভায় স্থির হয় ঃ

. . . . the future state and society of Pakistan should be secular in spirit and structure.[৫]

কমিটির এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হন আবুল হাশিম এবং তিনি লক্ষ্য করেন জনগণের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমে অঙ্গীকারাবদ্ধ পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম কাতারের নেতৃবৃন্দ এইভাবে ইসলামী আদর্শ উপেক্ষা করবার নজির স্থাপন করে। তিনি এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করেন এবং কমিটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছেদ করেন। সেই সময় Pakistan observer এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি তার বক্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন এবং ৭-৬-৫২ তারিখে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি এর প্রতিধ্বনি করেন। ঐ পত্রে প্রস্তাবিত পার্টির নাম কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এবং পার্টির লক্ষ্য ইসলামী আদর্শভিত্তিক করারও পরামর্শ দেন তিনি ঃ

As regards the name of the party I am of the opinion that a colourless name like Awami league or Awami Jamaat will not inspire the people. The party must bear a name which may contain in it the spirit of Islam and at the same time may give an idea of the future we propose to build. I suggest the name 'The Rabbani Party of Pakistan.'[৬]

১৯৫৬ সালে তিনি পুনরায় মুসলিম লীগে ফিরে আসেন। এই প্রত্যাবর্তনের আগে এবং ১৯৫০ সালে পশ্চিবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করার পরবর্তী অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি বিরোধী ভূমিকা পালন করেন। বিরোধিতা তার কাছে বিরোধিতার জন্য ছিল না, আদর্শ ছিল তার বিরোধিতার মাপকাঠি। একই কারণে তিনি এ সময় খেলাফতে রব্বানী পার্টিতে যোগ দেন।

www.pathagar.com

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতার অধিকারী হলে পাকিস্তানে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ক্ষমতার চাবিকাঠি চলে যায় একটি মাত্র ব্যক্তির হাতে। নতুন পরিস্থিতিতে আবুল হাশিমের সাথে আইয়ুবের সাক্ষাৎ ঘটে। আবুল হাশিমের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, প্রত্যয় ও বিশিষ্ট বাকভঙ্গিতে চমৎকৃত হন আইয়ুব এবং তিনি তাকে ঢাকায় ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত করে স্বাধীনভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতির ব্যাখ্যা এবং ইসলামের মৌলনীতিগুলির বিশ্লেষণ ও প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন। একই সাথে আইয়ুবীয় আমলে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব নেন। যদিও এই সময় সক্রিয় রাজনীতিক হিসেবে তার ভূমিকা ছিল না বললেই চলে এবং রাজনীতির অঙ্গন ছেড়ে দিয়ে ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক হিসেবে প্রজ্ঞান ও বুদ্ধিজীবিতার চর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামিক একাডেমীর অভ্যন্তরে তিনি জ্ঞানচর্চার একটি মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলেন। ইসলামকে ভিত্তি করে বিভিন্ন নীতির প্রণয়ন এবং জীবনের নানা প্রয়োজনে শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ইসলামের আদর্শবাদ কিভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার আলোচনা গবেষণায় নিমগ্ন হন তিনি। আবুল হাশিমের এই সব চিন্তা কখনো বাস্তববর্জিত ছিল না বরং জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিলায় তার চিন্তা ও অনুভব শানিত হয়ে উঠেছিল।

ইসলামের রেশনালিস্টিক এ্যাপ্রোচ ও মুক্তবুদ্ধির ধারা তিনি অনুসরণ করতেন। তাই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা ও অনুসিদ্ধান্তে স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী আবুল হাশিম মনে করতেন ভবিষ্যৎ পৃথিবী ইসলামের হাতে। কেননা তিনি জানতেন সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিউনিজমের পতন অনিবার্য এবং পুঁজিবাদের বিশৃঙ্খল তরীও দুলে উঠতে শুরু করেছে।

আবুল হাশিম দ্বিজাতিতত্ত্বে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। শুধু তাই নয় বৌদ্ধ ও জৈনদেরও তিনি একেকটি জাতি মনে করতেন। অর্থাৎ তার কাছে জাতি গঠনের ভিত্তি ছিল ধর্মীয় আদর্শবাদ। এমনকি আদর্শগত ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর কমিউনিস্টদেরও তিনি একটি ভিন্ন জাতি হিসেবে মনে করতেন। অন্যদিকে আজকের পৃথিবীতে যে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের (Nation-state) উদ্ভব হয়েছে তাকে তিনি মনে করতেন একালের যাবতীয় দুর্ভোগ ও বিবাদ বিসম্বাদের উৎস। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমন ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট শোষণের পথ সুগম হয়,ব্যক্তি কর্তৃক ব্যক্তি শোষিত হয় তেমনি জাতি রাষ্ট্রের সুবাদে দুনিয়া জুড়ে শক্তিশালী দেশ কর্তৃক দুর্বল দেশগুলোকে শোষণের পথ পরিষ্কৃত হয়েছে। আবুল হাশিম মনে করতেন পুঁজিবাদের ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট শোষন ও রাষ্ট্রীয় শোষণের মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ নেই। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ ও জাতিগত পুজিবাদ একই ঘটনার দুটি ভিন্নরূপ।

১৯৭০ সালে আবুল হাশিম ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর নেন এবং ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিন

আবুল হাশিম তার দর্শনচিন্তার মূল রূপটি বিবৃত করেছেন The Creed of Islam নামক গ্রন্থে। তিনি এর বিকল্প শিরোনাম দিয়েছেন The Revolutionary Character of Kalima। তিনি মনে করেন ইসলামের মহান বৈপ্লবিক নীতিসমূহ কলেমার মধ্যে বীজের আকারে নিহিত আছে। ইসলামের ইতিহারস যা কিছু মহৎ ঘটনা ও সৃষ্টি হয়েছে তা এই কলেমার কল্যাণে।

www.pathagar.com

আবুল হাশিম তার বইয়ের মাধ্যমে মানব জীবনে ইসলামের বৈপ্লবিক আহ্বান ঘোষণা করেছেন নতুনভাবে। তিনি বলতে চেয়েছেন এ কালে যারা প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক মতবাদ হিসেবে ইসলামের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করে এবং ইসলামী ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতি থেকে মুসলমানদেরকে নির্বাসিত করতে চায় তারা মূলতঃ হতবুদ্ধিতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করছে। তিনি এ বইতে পরিষ্কার করে বলেছেন ইসলামের যে প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক রূপ একবার মদীনায় দেখা গিয়েছিল তা শুধু নমুনা বা দৃষ্টান্তমূলক। ইসলামের প্রকৃত বিপ্লব এখনও শুরু হয়নি। এ বই ইসলামের সব অনুসারীকে তাদের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কালের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করেছে। আবুল হাশিম কলেমা সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

কলেমা বা আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহম্মদের (স.) রিসালাতে বিশ্বাসই ইসলামের মূল ভিত্তি। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল বাহ্যত তার বিকাশ ঘটেছিল আরব সভ্যতায়। আর এই বিপ্লবের সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল কলেমার মধ্যে। . . . . নিরীশ্বরতা ও বহুদেবত্ব এ উভয়কেই সমানভাবে বর্জন করে কলেমা ঘোষণা করে আল্লাহর একত্ব এবং মুহম্মদের রিসালাত। প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের একত্ব সম্বন্ধে কলেমা মানুষকে সন্ধান করে দেয় এবং অতিলৌকিক জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যাদেশ ও বোধির উপর রীতিমতো গুরুত্ব আরোপ করে। কলেমার আল্লাহ্ একটা অন্ধ জাগতিক শক্তি, অচেতন আদি কারণ বা জীবনের জড়ধর্মী উৎস নয়। তিনি হলেন বিশ্বের সচেতন স্রষ্টা এবং পালন ও বিবর্তন কর্তা।[৭]

তার মতে কলেমার এই তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে এবং কলেমার মধ্যে নিহিত ইসলামের মূল নীতিগুলো বাস্তবায়িত করতে পারলে মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত হবে। এই কলেমার তাৎপর্য ধারণ করতে পেরেছিল বলে আরব জাতির মধ্যে এক সময় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল এবং বিশ্ব সভ্যতায় তারা ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিল। মুসলিম সমাজের বর্তমান দুর্দশার জন্য তিনি মনে করেন তারা আজ কলেমার তাৎপর্যকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ না করে নিছক মৌখিক উচ্চারণের বিষয় বানিয়ে ছেড়েছে।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তার মত হচ্ছে নাস্তিকতা মানুষকে বস্তুপূজারী বানায়, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। অন্যদিকে পৌত্তলিক নানা রকম স্বত্তার কাছে অবনত হতে গিয়ে নিজেই সত্তাহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কলেমার নীতি হলো আল্লাহ্ তার রবুবিয়ৎ অর্থাৎ পালননীতির প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মে আল্লাহর পালন নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে অর্থাৎ সৃষ্টির সেবা ও আল্লাহর দাসত্ব এই হবে তার পথ চলার নিয়ামক। এর ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা ও ধ্বংসকামিতায় মেতে উঠবেনা তেমনি সত্তাহীন হয়ে সৃষ্টিশীলতাকে হারিয়ে ফেলবে না।

নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপারে কলেমার নীতি হচ্ছে নিরীশ্বরতা ও বহুদেবত্ব উভয়কে বর্জন করে আল্লাহর একত্বকে বুনিয়াদ করে নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা দরকার। আধুনিক চিন্তানায়করা যারা ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তি ও রেনেসাঁর পর থেকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যাদেশ ও বোধিকে বাদ দিয়ে মানবীয় কান্ডজ্ঞানকে চূড়ান্ত হিসেবে ধরে

www.pathagar.com

নিয়েছেন তাদের কাছে নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির এই ধরনের বিশ্লেষণ হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গিজাত পার্থক্যের কারণে তারা হয়তো মনে করতে পারেন বোধি ও প্রত্যাদেশের আওতায় থেকে মানুষ তার সৃষ্টিশীলতাকে ব্যবহার করতে পারে না। সৃষ্টিশীলতাকে ব্যবহার করতে হলে তার দরকার একচ্ছত্র স্বাধীনতা। তাই রেনেসাঁর মানুষ নিজের কান্ডজ্ঞান ও যুক্তির উপর ভর করে নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগত সৃষ্টি করতে চায়। এখানে আবুল হাশিম বলতে চান মানুষের মধ্যে অজস্র সম্ভাবনা থাকলেও সে অভ্রান্ত নয়। এই কারণে মানবীয় কান্ডজ্ঞান ও যুক্তিবিচার যদি শেষ কথা হতো তবে মানুষের মুক্তি আজও কেন সুদূরপরাহত হয়ে আছে? পশ্চিমের যুক্তিবাদী ও কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরাইতো আজকের পৃথিবীর নিয়ন্তা সেজে বসে আছে কিন্তু মানবীয় বিপর্যয় রোধ করা যাচ্ছে না। আর একই কারণে প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানের মূল্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি নৈতিকতার মানদন্ড তৈরি করা যায় এবং সেই নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির জ্ঞানকে প্রয়োগ করা চলে তবেই আধুনিকতার সংকট, অস্থিরতা ও বিপর্যয় ঠেকানো যেতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে কলেমার আদর্শকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন এটি কোন নৃতাত্ত্বিক, আঞ্চলিক অথবা ভাষাগত জাতীয়তার আদর্শ নয়, এটি হলো আন্তর্জাতিকতা, সর্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ। কলেমার তাৎপর্যের ভিমিতে বলা যায় এই চিন্তাভাবনা ধর্মনিরপেক্ষ নয় এবং এটি নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক কিংবা আঞ্চলিক জাতীয়তাকে সমর্থন করে না। এরকম আদর্শ আজকাল বিশেষ করে এই জাতি রাষ্ট্রের যুগে চলতে পারে কিনা সে প্রশ্ন যে কেউ করতে পারেন। আবুল হাশিমের অভিমত হচ্ছে ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে আদর্শ। তৌহিদকে ভিত্তি করে যে ভ্রাতৃত্ব, মানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিক বোধ তৈরি হয় তাই হচ্ছে এই জাতীয়তার সাংগঠনিক ভিত্তি। দেখতে হবে তৌহিদের এই মূল্যচেতনা জাতীয়তার থাবায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কিনা। এ কালে জাতি রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে ব্যক্তির মতই জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করা যেতে পারে। আসল কথা হচ্ছে আমরা মুসলমানরা এই ধরনের সহযোগিতা সৃষ্টিতে কতখানি আগ্রহী তা আগে বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার।

রাষ্ট্র ব্যাপারে কলেমার আরো আদর্শ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহর হাতে। মানুষ আল্লাহর রবুবিয়তের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে ও অন্যান্য প্রাণীকে শাসন ও শোষণ নয়, আল্লাহর পালন নীতি অনুসারে পালন করবে। নতুন যুগের দার্শনিকরা আল্লাহর এই পালন নীতিকে অস্বীকার করে সার্বভৌমত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে ও নিজের মত করে ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম ইত্যাদি মতবাদের জন্ম দিয়েছে। এ সব মতবাদগুলো আল্লাহর ফিতরাতের ধারাকে উপেক্ষা করে বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে মাত্র। গণতন্ত্র ব্যাপারে আবুল হাশিম বলেছেন পশ্চিমের গনতন্ত্রে শুধু লোক গণনার উপর জোর দেয়া হয়। গুণবিচার করা হয় না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ বা অধিকাংশের গুরুত্বকে তিনি মোটেই অস্বীকার করেননি। নির্বাচনের মূল্যকেও খাটো করেননি। কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হিসেবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে তাদের প্রতি দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম যুগের খলিফাদের বিশেষ করে ফারুকী খেলাফত হচ্ছে তার মডেল।

www.pathagar.com

আবুল হাশিমের এই মতবাদকে এ কালের রাজনীতিবিজ্ঞানীরা প্রতিক্রিয়াশীল হয়তো বলতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটার সংজ্ঞা একচ্ছত্রভাবে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন। এই একপেশে সংজ্ঞা আরোপ করে আবুল হাশিমের প্রতি সুবিচার সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে আবুল হাশিম বলেছেন ইসলামের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মানুষ পৃথিবীর কোন সম্পদের মালিক নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সম্পদের একচ্ছত্র মালিক ব্যক্তি, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে সম্পদের মালিক হলো রাষ্ট্র। অন্যদিকে ইসলামের ক্ষেত্রে মালিক হচ্ছে আল্লাহ। মানুষ আল্লাহর রবুবিয়তের খলিফা হিসেবে সেই সম্পদের তত্ত্বাবধানকর্তা মাত্র। মানুষ এই সম্পদ তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে- আল্লাহ এই স্বাধীনতা তাদেরকে দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যাত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আদর্শানুযায়ী বলতে হয় ব্যক্তিগত মালিকানাকে ইসলাম অস্বীকার করে না কিন্তু সেই মালিকানার সীমারেখা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামী রাষ্ট্র। কারণ কলেমার আদর্শ অনুযায়ী সম্পদের অতিরিক্ত মওজুদ করা চলবে না। আবুল হাশিম একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ঃ ইসলাম ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের মতো জাতিগত পুঁজিবাদেরও বিরোধী। পৃথিবীময় সব সম্পদের মালিকানা যেহেতু আল্লাহর তাই সেই সম্পদে ব্যক্তির মতো জাতিসমূহেরও অধিকার আছে। ইসলামের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আদর্শ যে পুরোপুরি মানবকল্যাণমুখী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই আদর্শকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সামনে তুলে ধরার মতো যে যোগ্যতা মুসলমানরা ইসলামের প্রথম যুগে অর্জন করেছিল তা ফিরিয়ে না আনা গেলে শুধু আদর্শের বড়াই করে তেমন লাভ হবে না।

চার

আবুল হাশিমের আরো দুইটি বই হচ্ছে As I See it এবং রব্বানী দৃষ্টিতে। বই দুটোর বিষয়বস্তু মোটামুটি এক। বই দুটো ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোয় দেখা চিন্তার নতুন পথ নির্দেশক বিশেষ করে রব্বানী দৃষ্টিতে বইয়ের প্রবন্ধগুলো সম্বন্ধে তিনি বলেছেন শাসন ও শোষণ নহে, আল্লাহর রবুবিয়ৎ বা পালননীতির আলোকে এর বিষয়বস্তু রচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে এই পুস্তকের আল ফাতিহা, ফারুকী খেলাফত, আতিশয্যের শেষ পরিণতি, ইজতিহাদ প্রবন্ধগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় চিন্তার বাইরে আধুনিক চিন্তার প্রেক্ষিতে বিচার করলেও ইজতিহাদ প্রবন্ধটি প্রগতিমুখী বলতে হবে। আধুনিক চিন্তাবিদরা ইউরোপে আলোকপ্রাপ্তির পর থেকে ধর্মকে স্থানু, অনড়, গতিহীন ও অসচল হিসেবে বিবেচনা করেন। ইজতিহাদ প্রবন্ধটি আমাদের আধুনিকতাবাদীদের চিন্তাভাবনার একটা বড় জওয়াব হতে পারে। নতুন নতুন যুগ সমস্যার প্রেক্ষিতে কুরআনের মূল নীতিকে অব্যাহত রেখে নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে যথার্থ ব্যবহারের নাম হলো ইজতিহাদ এবং এই প্রক্রিয়া ইসলামী ব্যবস্থারই অংশ। সুতরাং নতুন যুগের সামনে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা নেই এই ধারণা একটা মস্ত বড় প্রচারণা মাত্র। আবুল হাশিম লিখেছেন ঃ ইজতিহাদের গুরুত্ব নির্ধারণ করিয়াই বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আধি মানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের

www.pathagar.com

কর্মক্ষেত্রে আল কুরআনকে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আল কুরআন শাশ্বত এবং সর্বযুগের উপযোগী। কিন্তু ইজতিহাদ ব্যতীত যুগে যুগে তাহাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মনুষ্য প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া আল কুরআন আমাদিগকে দিয়াছেন কতকগুলি মৌলিক নীতি এবং এই মৌলিক নীতিগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া ইজতিহাদের মারফতে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব দিয়াছেন মানুষের বুদ্ধির উপর। রূপান্তরিত অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তিক এই ব্যবহারকেই ইজতিহাদ বলে। ইজতিহাদের আসল অবলম্বন আল কুরআন। আল কুরআন আল্লাহর বাণী, তাই তাহাকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করা চলে না। ইহা অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত। . . . .. ইজতিহাদের উদ্দেশ্য আল কুরআন প্রদর্শিত নীতিগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া বিশেষ অবস্থায় কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। মৌলিক নীতিগুলি পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু বিশেষ যুগের বিশেষ অবস্থায় যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহারা যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনহীন হইয়া পড়ে। কারণ নূতন অবস্থায় সেই পুরাতন মূল নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া আবার নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়। . . ...[৮]

আবুল হাশিম মুসলিম সমাজের চিন্তাধারার মধ্যে গতিশীলতা সঞ্চারের জন্য ইজতিহাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এর উপর কতকটা জোরও দিয়েছিলেন। ইসলামের সামাজিক বিবর্তন স্থবির হয়ে যাওয়ার পিছনে ইজতিহাদের গতিরুদ্ধতা ও বিদাতের ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের কথাও তিনি বলেছেন। তিনি মনে করতেন ইজতিহাদের ধারা ফিরিয়ে আনা গেলে ইসলামের সৃষ্টিশীলতার প্রভাব অনুভূত হবে।

পাঁচ

সবদিক দিয়ে বিচার করে এটা বলতে হবে আবুল হাশিম চিন্তার দিক দিয়ে সমকালের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। এদেশে রাজনীতি ও দর্শনের তিনি সমন্বয় করেছিলেন এবং এদিক দিয়ে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে তিনি আজও অদ্বিতীয়। ইসলামকে রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার না করে এর আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাজনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টিতে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং তার স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালী মুসলমানকে তার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ফিরিয়ে দেয়া। তিনি চিন্তাবিদ ছিলেন। মননশীলতা ও মৌলিকতা ছিল তার চিন্তার অন্যতম উপাদান। অবশ্যই ইসলাম সে চিন্তার রসদ যুগিয়েছে। সময়ের আবর্তনে নতুন উপযোগিতা ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও তার মৌলিক চিন্তাভাবনার মূল্য মোটেই কমেনি।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. সৈয়দ মনসুর আহমদ, 'আবুল হাশিম : বাঙ্গালি ও মুসলমান', উদ্ধৃত : আবুল হাশিম : তার জীবন ও সময়, সম্পাদনা, সৈয়দ মনসুর আহমদ। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।
২. আবদুল হক, বাঙ্গালীর জাগরণ। ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০১।

www.pathagar.com

৩. সালাহ উদ্দীন আহমদ, 'আবুল হাশিম স্মরণে', উদ্ধৃত ঃ আবুল হাশিম : তার জীবন ও সময়, সম্পাদনা, সৈয়দ মনসুর আহমদ। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।
৪. শাহেদ আলী, 'আল্লামা আবুল হাশিম'- দিব্য দৃষ্টির অধিকারী এক অনন্য মনীষী, উদ্বৃত ঃ আবুল হাশিম : তার জীবন ও সময়, সম্পাদনা, সৈয়দ মনসুর আহমদ। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন , ২০০০।
৫. পূর্বোক্ত।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মবাণী। ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী, ১৯৬২।
৮. আবুল হাশিম, রব্বানী দৃষ্টিতে। ঢাকা : আবুজর গিফারী সোসাইটি, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

মালেক বেন্নাবী

এক

আলজেরিয়ার দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও লড়াকু বুদ্ধিজীবী মালেক বেন্নাবীর নাম বাংলাদেশে আমরা তেমন একটা কেউ জানি না। ফরাসী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের এই অকুতোভয় তাত্ত্বিক পুরুষকে এ কালের আরব দুনিয়ার প্রধান দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর মর্যাদা দেয়া যায়। যদিও তার খ্যাতি ও যোগ্যতা এখনও অপরিচয়ের অন্ধকারেই ডুবে আছে। তার এই স্বল্প পরিচয়ের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে তিনি প্রধানতঃ ফরাসী ভাষায় লেখালেখি করেছেন। যার তরজমা বিশেষ করে ইংরেজি ও আরবীতে আজও অপ্রতুল রয়ে গেছে। মুসলিম চিন্তার জগতে তার যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়ার এটা একটা অন্যতম কারণ হতে পারে।

কিন্তু তারচেয়েও বড় কারণ মনে হয় ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমস্যা, নানাবিধ ঐতিহাসিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ভয়ানক শত্রুতা, সর্বোপরি মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা, কূপমন্ডুকতা ও মোহাচ্ছন্নতা এমন স্তরে পৌছেছে যে, মুসলমানরা আজ নিজেদের মঙ্গলের পথ নিজেরাই চিহ্নিত করতে পারছে না। মালেক বেন্নাবীর চিন্তা ও দর্শনকে যথাযথভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের। বিশেষ করে তার স্বভূমি আলজেরিয়ার মানুষের, সেখানকার সরকারের। কিন্তু সেই কাজটিই যথাযথভাবে হয়নি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে অনেক বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতিসেবীর ভূমিকার কথা আমরা জানি। বিশেষ করে বামধারার বুদ্ধিজীবীরা সেসময় আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলনের সপক্ষে বেশ ভূমিকা রেখেছিলেন। যেমন ফ্রানৎজ ফ্যানন, একবাল আহমদ প্রমুখ। কিন্তু এই ধারা যে ভূমিকাই পালন করুক না কেন তা ছিল অধিকতর দুর্বলতার ধারা এবং আলজেরিয়ার মূল স্রোত থেকে দূরে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন পালন করেছিল আমাদের এই উপমহাদেশে। সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার পটভূমিতেই মালেক বেন্নাবী তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দার্শনিকতার ভিত প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ট্রাজেডী হলো অন্যান্য অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের মতো ঔপনিবেশিকতার শিকল থেকে বেরিয়ে আসার পর আলজেরিয়া সেকুলার জাতিরাষ্ট্রের ধারণার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামকে অবলম্বন করে যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আলেজেরিয়ার মানুষ একদিন বিজয়ী হয়েছিল, তারাই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের ফেলে যাওয়া নীতি ও দর্শনের ফাঁদে ও ধন্ধে পড়ে যায়। সেকুলারিজম হয় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র। আজও আলজেরিয়া এই সংকট ও টানাপড়েন থেকে রেহাই পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই মালেক বেন্নাবী নতুন পরিস্থিতিতে উপেক্ষা ছাড়া তেমন কিছু পাননি।

www.pathagar.com

বেন্নাবীকে চেনা ও তার কর্মকান্ড এবং চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে মানুষটি কি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বড় হয়েছেন সেটা জানার দরকার আছে। ফিলিস্তিনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেমন এডওয়ার্ড সাঈদ ও ঈসমাইল রাজী আল ফারুকীকে পাঠ করতে হয় তেমনি বেন্নাবীকে বুঝতে হবে আলজেরিয়ার ইতিহাসের ভিতর থেকে। আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলন ও তার রক্তাক্ত অধ্যায়ের ভিতরে বেন্নাবীর মুখ লুকিয়ে আছে।

সাম্রাজ্যবাদের সাথে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই অভিজ্ঞতার দুঃখবহ স্মৃতিকে আলজেরিয়া যেমন তার ভিতরে ধারন করেছে, তেমনি এর ফলদায়ক ও আশাবাদী দিকটিও আলজেরিয়ার শিরে কখনো কখনো ঝলসে উঠেছে। মালেক বেন্নাবী মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শগতভাবে এসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তার চিন্তার বিবর্তনও ঘটেছে আলজেরিয়ার এই বৈপ্লবিক টানাপড়েনের ভিতর দিয়ে। জীবনের অভিজ্ঞতাই তাকে দার্শনিকতা ও বুদ্ধিজীবিতার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে।

দুই

মালেক বেন্নাবী তার জন্মের আর বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, সেই সাথে তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার বিবর্তনের কথা আমাদের শুনিয়েছেন তার অসাধারণ সুখপাঠ্য আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ The Memoirs of the Witness of the Century তে। তার জন্ম ১৯০৫ সালে পূর্ব আলজেরিয়ার কনস্টানটাইন শহরে। নিজের জন্মের মুহূর্তকে তিনি এক ভাবুকতার সাথে বর্ণনা করেছেন ঃ

The current of consciousness was connected to the past with its last witnessess, and to the future with its first architects.[১]

তিনি তার জন্মের শহরে বসে দেখেছিলেন এক অতীত হারিয়ে যাচ্ছে এবং আর এক ভবিষ্যৎ উদিত হতে চলেছে। বেন্নাবীর বাপ-দাদারা ছিলেন গরীব। এই গরিবিকে আরো নির্মম করে তুলেছিল ঔপনিবেশিক শাসন। বেন্নাবী তার নানীর কাছ থেকে প্রথম উপনিবেশের হৃদয়হীনতার কথা শুনেছিলেন। কিভাবে ফরাসী সৈন্যরা তাদের শহর দখল করে নেয় আর সবকিছু গুঁড়িয়ে দেয় তার রক্তাক্ত ইতিহাস। কিভাবে মুসলমানরা তাদের পরিবারকে রক্ষার জন্য শহর থেকে পালিয়ে যায় আর কিভাবে অসহায় পিতারা তাদের কুমারী কন্যাদের অসম্মান থেকে বাঁচানোর জন্য দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দেয় তার গা শিউরে ওঠা যত কাহিনী। বেন্নাবী এতে মুষড়ে পড়েননি। ফরাসী নির্মমতার দুঃখ তিনি একাকী বয়ে বেড়িয়েছেন এবং এই দুঃখই তাকে পথ দেখিয়েছে ভবিষ্যতের, শক্তি যুগিয়েছে প্রতিরোধের।

বেন্নাবী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তার পিতা ক্ষুদে সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও ছেলের মেধা আঁচ করে তাকে স্থানীয় আল জালিস স্কুলে ভর্তি করেন। এই সময় বেন্নাবীর দাদা ত্রিপোলিতে ইটালির সৈন্য ঢুকে পড়ায় কনস্টানটাইনে ফিরে আসেন এবং পৌত্রের মনের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলেন। তিনি তাকে তুর্কী খেলাফতের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন যখন নাকি এটি সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ভেঙ্গে যাচ্ছে পাশাপাশি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করেন। আলজালিস স্কুলে থাকার সময়

www.pathagar.com

বেন্নাবী বৃত্তি পান। পরে তিনি মাদরাসায় ঢোকেন। মাদরাসায় এসে তার চিন্তা ভাবনার দিগন্ত বিস্তৃত হয়। সেই তরুণ বয়সেই তিনি বিপুল পঠন পাঠন আর অধ্যয়নের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাদরাসায় একদিকে অধ্যয়ন অন্যদিকে তৎকালীন মুসলিম রাজনীতির খুঁটিনাটি আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পরিকল্পনা নিয়ে সতীর্থদের সাথে চুটিয়ে আলোচনা এভাবে বেন্নাবীর দিন কাটতে থাকে। পত্রিকার পাতায় আমীর খালেদ ও মোস্তফা কামালের রণাঙ্গনের বীরত্বের কাহিনী কিংবা জগলুল পাশার ইংরেজবিরোধী লড়াইয়ের খবর তার চিত্ত চাঞ্চল্য বাড়িয়ে দেয়।

একদিন তিনি মোহাম্মদ আবদুহু আর রশিদ রিদার লেখালেখির খবর পান। এদের লেখা তার তরুন মনে ঝড় তোলে। এই লেখা তাকে মুসলিম সংস্কৃতির অতীত গৌরব সম্বন্ধে যেমন উজ্জীবিত করে তেমনি বর্তমানের জরাজীর্ণ চেহারা ও মুসলিম মনীষার জগতের আকাল তাকে ব্যাথাচ্ছন্ন করে দেয়।

মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন তিনি দুজন নওমুসলিম ইসাবেল এবারহার্ট ও ইউজিন জুং এর খবর পান। এদের লেখা The Warm Shadow of Islam ও Islam Between the Whale and the Bear পড়ে তিনি দারুণ মুগ্ধ হন এবং ইসলাম নিয়ে তাদের নবতর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণে চমকিত হন। কিন্তু এ সময় সবচেয়ে বেশি তাকে নাড়া দেয় আবদুল রহমান কাওকাবীর উম-উল-কুরা বইটি, যা কিনা ইসলামের তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা ও রেনেসাঁসের ইংগিত দেয়।

তার মাদরাসার ফরাসী শিক্ষক একবার তাকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে দেন। এটি পড়ে তার মনে হয় সীন ও টেমস নদীর ধারেই কেবল প্রতিভা জন্মায় না, কলোনিতেও প্রতিভাধররা আবির্ভূত হতে পারে। পরাধীনতার মর্মজ্বালা কিভাবে বেন্নাবীকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়তে এগিয়ে দিয়েছে এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা তার প্রমাণ। বেন্নাবীর মাদরাসার কাছেই ছিল ক্যাফে বেন ইয়ামিনা। এখানে নিয়মিত হাজিরা দিতেন সেকালের আলজেরিয়ার প্রতিথযশা বুদ্ধিজীবী, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ শাইখ আবদুল হামিদ বেন বাদিস। ১৯৩১ সালে বেন বাদিস জমিয়তুল মুসলেমিনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেন। এই বেন বাদিসকে ঘিরে ক্যাফে ইয়ামিনাতে মাদরাসা ছাত্রদের এক চক্র গড়ে ওঠে, যারা আলজেরিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি, রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তির উপর নিয়মিত আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। এর সংস্কার-বিবর্তনের পথ ধরে বাদিসের অনুগামীরা যা চেয়েছিলেন তা হল একদিকে আজাদী, অন্যদিকে আল নাহদা-মুসলিম সমাজের রেনেসাঁ। মালেক বেন্নাবী এই আন্দোলনের সাথে কিছুটা হলেও জড়িয়ে পড়েন। মাদরাসার ফরাসী পরিচালক বেন্নাবীর মতিগতি টের পেয়ে যান। তার জীবনীকার লিখেছেন ঃ

All this did not escape the notice of the French Director of the madrasah who, as a rule, preferred the apathy of the turbans to the turbulence of the 'young turks', and Bennabi's activities and reading were put under strict surveillance.[২]

কিন্তু যে মানুষ তার নিজের দেশের মুক্তি সংগ্রামের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করবেন তাকে কি পরিচালকের হুমকি ও চোখ রাঙানি বেধে রাখতে পারে? বেন্নাবী তার লক্ষ্যের দিকে

www.pathagar.com

এগিয়ে যান। এসব সংকট, টানাপড়েন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা ভাবনা পরিণতি লাভ করতে থাকে। তিনি খেয়াল করেন সাম্রাজ্যবাদী শাসন কিভাবে তার দেশের অর্থনীতিকে ঝাঝরা করে দিচ্ছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে। দেশের ধন সম্পত্তি গচ্ছিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদী ও ইউরোপিয়ান শাইলকদের হাতে। এর সাথে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের প্রশ্রয়ে চলছে আলজেরিয়া তথা আফ্রিকায় খ্রিস্টানীকরণের মহড়া। এভাবেই তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি বিদ্রোহী সত্তা মাথা তুলে দেয়, যা কিনা সবরকমের জুলুম-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। বেন্নাবী লেখাপড়া শেষ হলে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে চাকরির কথা ভাবেন। কিন্তু তার কাছে মনে হয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছে নেটিভদের জন্য চাকরি পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। এমনকি সাহারা মরুভূমির দুর্গম কোন প্রান্তেও যদি সেটা হয়। ভাগ্য ফেরানোর জন্য তিনি ফ্রান্সে পাড়ি জমান। কিন্তু মার্সাই বন্দরে পৌঁছে সেখানকার প্রবাসী আলজেরীয়দের দুরবস্থা, নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক বর্ণবাদের কথা তাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপর তিনি যখন দেখেন একই জাহাজে আগত একজন আলজেরীয় ইহুদী ও আলজেরীয় ফরাসী তার চেয়ে যথেষ্ট কম যোগ্যতা সত্ত্বেও চাকরি পেয়ে যায় তখন বেন্নাবীর কাছে সাম্রাজ্যবাদের বর্ণবাদী চেহারা আরও ভাল করে ফুটে ওঠে। বেকার বেন্নাবীকে ফ্রান্সে তার আলজেরীয় সমব্যথীরা আশ্রয় দিয়ে এবং খাইয়ে পরিয়ে টিকিয়ে রাখে। তার কাছে তখন মনে হয় ঃ

. . . . . despite all the disgrace that had inflicted Muslim society, Islam still maintained, therein, a sense of humanity, on a level still unattained by many civilised nations.[৩]

অনন্যোপায় বেন্নাবী দেশে ফেরেন। এখানে তিনি শিক্ষকতা থেকে শুরু করে ময়দার কল ও নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায় জড়িয়ে নিজের ভাগ্য পরখ করেন। কিন্তু ভাগ্যই তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় ফ্রান্সে। সালটি ছিল ১৯৩০। সেখানে তিনি এবার অনেক চেষ্টা করে একটি যন্ত্র প্রকৌশল স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রকৌশলী হিসেবে বের হন।

এর আগে তিনি ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের পরও প্যারিসের ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজে ভর্তি হতে ব্যর্থ হন, সেখানে তিনি আইন পড়তে চেয়েছিলেন। এর কারণ একজন আলজেরীয় মুসলিম ছাত্রের ভর্তির জন্য মেধার চেয়ে রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করাই ছিল সেদিনের ফরাসী সরকারের মূল বিবেচনার বিষয়।

১৯৩১ সালে প্যারিসে ফরাসী উপনিবেশ ও তার জনগণকে নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়। বেন্নাবী লক্ষ্য করেন মুসলিম জনগণকে নিন্দা ও বদনাম করবার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রদর্শনীও এখানে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে তিনি মর্মাহত হন রসুল (স.)কেও নিন্দা ও কটূক্তির বিষয় বানানো হয়েছে। তিনি এর বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ সংগঠনের ব্যর্থ চেষ্টা করে যখন ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরে আসেন তখন তার বুক ভেঙ্গে যায়। তিনি বিছানায় শুয়ে চিৎকার করে ওঠেন ঃ

Oh God, they dare sully the name of the Prophet and yet the earth does not tremble . . . . .[৪]

www.pathagar.com

অকস্মাৎ তার বিছানা কেপে ওঠে। পরবর্তী সকালে তিনি সংবাদপত্রে দেখতে পান প্যারিসে ভূমিকম্প হয়েছে। এ সময় বেন্নাবীর আলজেরীয় মাদরাসার পুরনো বন্ধু হামুদা বিন সাই ও খালিদী এসে প্যারিসে উপস্থিত হয়। হামুদা বরাবর কুরআন শরীফের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বর্তমানকালের মুসলমানদের দুর্দশাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো। তার সাহচর্যই বেন্নাবীকে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং পরবর্তীতে মুসলিম দুনিয়ার সমস্যাকে দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে উজ্জীবিত করে। খালিদী ছিল রাজনৈতিক সংগঠক। দ্রুত সে প্যারিস প্রবাসী উত্তর আফ্রিকার ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলে এবং আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে। খালিদীর গড়া সংগঠনের একটি সভায় বেন্নাবী একবার Why We are Muslim শীর্ষক বক্তৃতা দেন, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলাফল হয় মারাত্মক। ফরাসী নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এর অব্যবহিত পর তিনি খবর পান আলজেরিয়ায় তার আব্বাকে এক দুর্গম স্থানে বদলি করে দেয়া হয়েছে।

প্রকৌশল স্কুল থেকে বের হওয়ার পর ফ্রান্সে তার চাকরি পাওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এমনকি তাকে অন্য দেশে যাওয়ার ভিসাও দেয়া হয় না। তার অন্তরের ভিতরে ঝড় চলতে থাকে। ঔপনিবেশিক নির্মমতা তাকে মানবীয় সম্পর্কের পারস্পরিক দিকগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবায়। তার কাছে মনে হয় ঃ

. . . . . human relations are not fashioned in accordance with objective laws but are born among the individuals of a society whose destiny has been demarcated by history as a 'whole'.[৫]

শেষমেষ তিনি তার এক বন্ধুর পরিচালিত প্রবাসী আলজেরীয় শ্রমিকদের একটা স্কুলে পাঠদান শুরু করেন। এই নতুন বৃত্তিতে বেন্নাবী শুধু শিক্ষকতার পেশায়ই নিজেকে সীমিত রাখেন না, আলজেরীয় শ্রমিকদের অধিকার বিশেষ করে আলজেরিয়ার আজাদীর জন্য এই সব শ্রমিকদের উজ্জীবিত করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ একদিন স্কুলটিই বন্ধ করে দেয়।

বেন্নাবী এবার নিজের জীবনের এই সংগ্রামের সাথে মিলিয়ে বিশ্বরাজনীতির উত্থান পতন, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর আয়োজন ও ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তি এবং দুর্বলতার দিকগুলো ভাল করে বোঝার চেষ্টা করেন। এর ভিতরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার দেউলিয়াপনাও তার নজর এড়ায় না। নাজী বর্বরতা তার কাছে মনে হয় ঃ

Nazi barbarism was merely an extension of the colonial spirit in the heart of colonialism itself.[৬]

আলেজেরিয়ায় ১৯৪৫ সালের সেটিফ হত্যাকান্ড (setif massacre), অন্যত্র স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর দমন-পীড়ন বিশেষ করে ফিলিস্তিনে একই শক্তির দ্বারা নরমেধযজ্ঞ, যারা নাকি মুক্ত দুনিয়ার পথিকৃৎ হিসেবে দাবিদার, তাকে সভ্যতার ফাঁকি সম্বন্ধে খুব শক্তভাবে সচেতন করে তোলে। তিনি বুঝতে পারেন সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়, আদর্শগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা দরকার। একালে সাম্রাজ্যবাদকে একহাত নিয়েছেন বা

www.pathagar.com

তাকে প্রতিরোধ করার নানা উপায়ের কথাও বলেছেন অনেক বুদ্ধিজীবী। কিন্তু একথা মনে করার সংগত কারন আছে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভেদী পর্যালোচনায় মালেক বেন্নাবীর জুড়ি আজও নেই। সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কেন সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক দেশগুলোর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কি তার দুর্বলতা, তার এক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তিনি। এটাও তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেন মুসলিম দেশগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জড়তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একই সাথে জনগণের জাগরণ ও উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধিকে অকার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছেন। অনেকে মনে করেন, সভ্যতার বিশেষ করে মুসলিম সভ্যতার উত্থান-পতনের যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বেন্নাবী করেছেন, তার মধ্যে মনস্বী সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণভঙ্গি একালে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এটাও সত্য, মুসলিম চিন্তার জগতে ইবনে খালদুনের পরে একালে মালেক বেন্নাবীকেই আমরা একমাত্র মৌলিক ও প্রতিভাধর সভ্যতা বিশ্লেষক হিসেবে পাই, যার অন্তর্বর্তী ৫০০ বছর মুসলিম চিন্তার আকাল ও নির্জীবতার সাক্ষ্য হয়ে আছে।

বেন্নাবীর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল একই সাথে দ্রষ্টা ও বৈজ্ঞানিক মননের। একই কারণে তিনি যেমন করে আজাদীর জন্য লড়াই করেছেন, তেমনি এর পথের বাধাগুলো উন্মোচন করেছেন। তিনি এর লক্ষ্যকে নির্ধারণ করার কথা ভেবেছেন এবং লক্ষ্যের পথকেও পরিশ্রুত করার চিন্তা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী কুয়াশা ভেঙ্গে তিনি দিগন্তকে সাফ সুতরো করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পরবর্তী প্রজন্মকে এমন একটা সংস্কৃতি উপহার দিয়েছেন যা একান্তই নিজের ইতিহাস ও মূল্যবোধ থেকে আহরিত।

তিন

মালেক বেন্নাবীর সভ্যতা বিশ্লেষণের নমুনা পাওয়া যায় তার দুটি বিখ্যাত বইতে। প্রথমটির নাম The Conditions of Renaissance । এখানে তিনি আলজেরিয়ার সমস্যাকে এক সামাজিক দর্শনের পটভূমিতে স্থাপন করেন। তার এই চিন্তার পরিণতি ঘটে Islam in History and society তে। মূলত বই দুটি একে অপরের পরিপূরক এবং একই চিন্তার গভীর থেকে গভীরতর বিশ্লেষণ। এ বইতে বেন্নাবী ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের অগ্রগতি ও বিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। ইবনে খালদুনের বিখ্যাত আসাবিয়া তত্ত্বকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে বেন্নাবী তার সভ্যতার বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি সভ্যতাই নানা রকম রূপান্তরের ভিতর দিয়ে এক অনিশ্চিত অভিযাত্রায় নিজেকে সংহত করে এবং এই সংহতি আসে নির্দিষ্ট মাটি, মানুষ ও সময়ের যথার্থ সমন্বয়ের মাধ্যমে। সভ্যতার এই চক্রকে সামনে রেখে মালেক বেন্নাবী মুসলিম ইতিহাস ও সভ্যতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে- কুরআনের আদর্শে উজ্জীবিত এক সমাজ, যা রসুল (স.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই জীবন্ত সমাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায় সিফফিনের যুদ্ধের ভিতর দিয়ে। যা নাকি মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। সিফফিনের যুদ্ধ, যা কিনা হযরত আলী ও হযরত মাবিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং সত্যিকার অর্থে মুসলিম সমাজের সংহতি তখন থেকেই দুর্বল হতে শুরু করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তরে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। যা তার ভাষায় আল মুয়াহিদদের পতনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আল মুয়াহিদরা স্পেনে ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। মালেক বেন্নাবী সর্বশেষ স্তরকে বলেছেন উত্তর আল মুয়াহিদ যুগ (Post Al-Muwahid Era), যে যুগ কিনা আমাদের এ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং জড়তা, অবক্ষয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক পচন যার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস বিচারের এই পর্যায়ে এসে বেন্নাবী ইউরোপীয় সভ্যতার উত্থান, বিবর্তন ও এর গাঠনিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান যে, এর নগরগুলো থেকে সংগঠিত বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছে। খ্রীস্টান ধর্ম এর একটি স্থিতিশীল মেজাজের সাথে গতিশীল আবহ তৈরি করেছে এবং আধিপত্য বিস্তারের নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে। যা কিনা ক্রুসেড ও পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যতন্ত্রকে উসকে দিয়েছে। এ সভ্যতা Cartesianism, যাকে বলা যায় গ্রীক সভ্যতার ধারা, তার স্পর্শে জ্বলে উঠেছে এবং শিল্প বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং সবশেষে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটিয়েছে।

এ পর্যায়ে বেন্নাবী ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এই দুই সভ্যতার মুখোমুখি হওয়ার কথা বলেছেন। সভ্যতার ধর্ম বিচ্যুৎ হওয়ায় মুসলিম সভ্যতা আজ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। এর জীবন্ত বিশ্বাস শুধু শুকনো কথার মরুভূমিতে রূপ নিয়েছে। অন্য সভ্যতাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এর নেই। বেন্নাবীর নিজের কথায় ঃ

. . . . . in its preoccupation with the apology of the past, the culture takes on a character of archaeology where the intellectual effort is directed not forward but backwards. This retrograde tendency imprints on the entire teaching a retrospective character, incompatible with the exigencies of the present and the future.[৭]

এরকম একটা অবস্থায় মুসলিম দুনিয়া উপনিবেশিত হওয়ার আগেই হয়ে পড়েছে Colonisable- উপনিবেশপ্রবণ। অর্থাৎ যে ভূমিতে অন্য কেউ এসে সহজেই পা দাবিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে ইউরোপ তার সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে এসেছে এবং উপনিবেশবাদ ও বিজ্ঞানবাদে (Scientism and Colonism) এসে মিলিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য আজ মুসলিম দুনিয়ার উপর জাঁকিয়ে বসেছে। মালেক বেন্নাবীর এই COLONISIBILITE (উপনিবেশ প্রবণ) এবং COLONISATION (উপনিবেশায়ন)-এর এই তত্ত্বের সাথে ইবনে খালদুনের চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। ইবনে খালদুন তার আল মুকাদ্দিমায় লিখেছেন ঃ

The conquered people adapt the forms, ideas, and the manners of the conquering people.[৮]

বিজিত জাতি বিজেতাকে অনুসরণ করে, কারণ বিজিত জাতির প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে যায়। প্রতিরোধের অস্ত্র চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এতখানি ঝাঁঝরা হয়ে যায় যে, তা দিয়ে বিজেতাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। তখন বিজেতা এসে বিজিতের ঘাড়ে চেপে বসে এবং তার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিজিতের উপর চপিয়ে দেয়। আমরা ইকবালের উক্তিকে স্মরণ করতে পারি ঃ

. . . . . . enormous rapidity with which the world of Islam was moving towards the West . . ..[৯]

www.pathagar.com

কেন এই পশ্চিমানুসরণ? কারণ ইসলামের মধ্যে অনেক দিন ধরে রিভাইভাল আসেনি। রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়নি। তাই শক্তিমানের দিকে তাকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। জামালউদ্দীন আফগানী বলেছিলেন ইসলামের মধ্যে রিফরমেশন দরকার। মালেক বেন্নাবী এই রিভাইভাল আনতে চান এক নৈতিক শক্তির উত্থানের ভিতর দিয়ে। কারণ তিনি মনে করেন মুসলিম উম্মাহর শক্তি হচ্ছে কুরআনী নৈতিকতা। এই নৈতিক শক্তি দিয়েই সে বরাবর জাহেলী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে এসেছে এবং ইতিহাসের ধারায় সব রকমের সংকট থেকে ত্রাণ পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন ঃ

. . . .. . because of what remained in it of the impulsion and living force of the Quran. It were men like Uqbah, Umar ibn Abd al-Aziz, and Imam Malik, who maintained it, not because one was a great conqueror, the other a great monarch, and the third the head of juridical school ; but because they incarnated under different titles, the simple and great virtues of Islam.[১০]

বেন্নাবী মনে করেন সভ্যতা কোন কুড়িয়ে পাওয়া বা অনুকরনের বিষয় নয়। এমনকি এটা কোন সংগ্রহশালাও নয়। এটি একটি নির্মাণের বিষয়। এটি একটি পুরোপুরি স্থাপত্য। তার ভাষায় ঃ Civilization is not an accumulation but a construction, an architecture.[১১]

সুতরাং ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ইসলামী সভ্যতার পুনঃনির্মাণ চাই। কেমন হবে সেই নির্মাণশৈলী তার একটি ধারণা তিনি আমাদের দিয়েছেন ঃ

Any attempt for the reconstruction of Muslim culture must begin with the re-establishment of pure doctrine over the political power. This reconstruction implies a return to Islam, in particular the extrication of the Quranic text from its triple matrix of theology, jurisprudence and philosophy.[১২]

মুসলিম চিন্তা জগতের উষরতা, মুসলিম সমাজের গতিহীনতা বেন্নাবীকে কিন্তু হতবিহ্বল করতে পারেনি। তিনি মুসলিম সমাজের উপর যে ঝড় ঝাপটা এগিয়ে আসছে তাকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করতেন। কারণ এই ঝড়ঝাপটাকে জয় না করতে পারলে মুসলিম সমাজ কখনো জাগবে না। ফিলিস্তিনের বিপর্যয় সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এই বিপর্যয় মুসলিম সমাজের ঘুম ভাঙ্গাবে।

বেন্নাবী আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলামী শক্তির ভরকেন্দ্র আরব দুনিয়া থেকে একদিন এশিয়ায় চলে যাবে। সেখানেই নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটবে। সেই সভ্যতার প্রতিভূ হিসেবে তিনি ইকবালকে চিহ্নিত করেছিলেন।

চার

এ সময় বেন্নাবী আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। একটি হচ্ছে The Quranic Phenomenon, অপরটির নাম In the Whirlwind of the Battle । প্রথমটিতে বেন্নাবী বলতে চেয়েছেন কুরআন অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার চিরাচরিত ও ঐতিহ্যবাহী ধারাটি সংস্কার করা দরকার। কারণ আজকের মুসলিম তরুণরা পশ্চিমী শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে

www.pathagar.com

এক ধরনের বিশ্বাসের সংকটে ভুগতে শুরু করেছে এবং ইসলামকে বোঝার জন্য পশ্চিমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের উপর ভর করছে। এই আত্মঘাতী ধারা থেকে তরুণদের ফিরিয়ে রাখতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন পদ্ধতি চালু করতে হবে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাশৈলীতে জোর দেয়া হয় কুরআনের Rhetoric ও style এর উপর। বেন্নাবী মনে করেন যদি এই ধারার সাথে Astrophysics, ও Archaeology'র প্রেক্ষাপট যুক্ত করা যায় তাহলে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং বিভ্রান্ত তরুণদের বিশ্বাসহীনতার বিরুদ্ধে লাগসই লাগাম হিসেবে কাজ করবে। ঐতিহ্যবাদী ও গতানুগতিকপন্থীরা যদিও এই বই নিয়ে কিছুটা শোরগোলের চেষ্টা করেন কিন্তু মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এ বই একটা নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে বেন্নাবীও এ বইয়ের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীর স্বীকৃতি আদায় করে নেন। In the Whirlwind of the Battle বইটি লেখা হয়েছিল আলজেরীয় বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে। এতকাল বেন্নাবী মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশেধক হিসেবে যে আইডিয়ার জাগরণের কথা বলে আসছিলেন তার বাস্তব ও প্রয়োগিক দিকটি তিনি এখানে পর্যালোচনা করেছেন এবং সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাবনাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে সমকালের কয়েকটি ঘটনা তাকে খুব আলোড়িত করেছিল। ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টাসমূহ, ১৯৫২ সালের মিসরীয় বিপ্লব এবং শেষমেষ ১৯৫৫ সালের বান্দুং-এ আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স। তার ধারণা জন্মেছিল এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আফ্রো-এশিয়ার মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারা এক নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটাবে ; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের এই উত্থানের পথ ধরে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ সভ্যতার ধর্ম মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে শিখবে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি একটি বই লেখেন Afro-Asiatism । যদিও বার বছর পর এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তার চিন্তাভাবনাকে কিছুটা পুনর্বিন্যস্ত করতে বাধ্য হন এবং স্বীকার করেন বান্দুং কনফারেন্সে যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তৃতীয় বিশ্বের নেতারা তাকে কাজে লাগাতে পারেননি। এখানকার মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদকে ব্যবহার করে পশ্চিমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্যকে ভাঙ্গতেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন।

আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি তার সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে আরো জোরদার করেন। শুধু এ কারণেই তিনি কায়রোতে এসে বসবাস শুরু করেন। আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মম দমন ও পীড়নের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি এসময় লেখেন S.O.S. Algeria । এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার, আলজেরিয়ার সমস্যাকে তিনি বিরাট মুসলিম ক্যানভাসে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তার কাছে মনে হয়েছিল আলজেরিয়ার সমস্যা মূলত মুসলিম জাতি ও সংস্কৃতির সমস্যা। এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। সেরকম ব্যাখ্যা করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদই সুযোগ নেবে মাত্র। মালেক বেন্নাবী এ সময় মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান-পতন, মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পুনরুত্থান, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও আধিপত্যের মুখে মুসলমানদের আদর্শিক সংকট ও সম্ভাবনাকে

www.pathagar.com

পুনর্মূল্যায়ন করে আরো লেখালেখি করেন ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে তার কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. The Problem of Culture
২. The Ideological Struggle in Colonised Countries
৩. The New social Edification
৪. The Idea of an Islamic Common Wealth

পাঁচ

মালেক বেন্নাবী স্বাধীনতা উত্তরকালে মুসলিম দেশগুলোর যেরকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা ছিল তা কেন হয়নি তার কারনও খুঁজেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আগে দরকার আদর্শের ভিত প্রস্তুত করা। সদ্য স্বাধীনতালব্ধ মুসলিম দেশগুলোতে এই আদর্শিক সংগ্রাম সফল হয়নি বলেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। তিনি বরাবরই কোরআনে বর্ণিত সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের নীতিকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এটা ছাড়া মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা কাটার সম্ভাবনা কম।

বেন্নাবী শেষ জীবনে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে একটি বক্তৃতা দেন। এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঃ The Role of Muslim in the last third of the 20th century। এখানে তিনি বলতে চেয়েছিলেন পরাশক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ক্ষমতার নয়, এর সাথে আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাও রয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণাম হচ্ছে যুগযুগান্তের মূল্যবোধকে অপসারিত করে নতুন মূল্যবোধ দ্রুত যায়গা করে নিচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতিতে আসছে ভয়াবহ শূন্যতা। এই শূন্যতার পটভূমিতে মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিচ্ছে। সভ্যতা হারাচ্ছে তার ধর্ম।

এইভাবে মালেক বেন্নাবী আমৃত্যু সবরকমের চেতনাগত ও বস্তুগত দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। ফলাফলের কথা চিন্তা না করে তিনি ন্যায় ও কল্যাণের পথে নিজেকে বরাবর নিয়োজিত রেখেছেন। তার বলার ও লেখার ভঙ্গি কখনোই দুর্বল হয়ে পড়েনি। এবং তার দৃঢ়প্রত্যয়ের সামনে সবরকমের মিথ্যা ও ভন্ডামি ভেঙ্গে পড়েছে। এই মনস্বী ভাবুক ১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।

বেন্নাবীর কাছে মনে হয়েছে ইতিহাস তার প্রান্তিকে আর একবার পৌঁছে গিয়েছে এবং সেখান থেকে ইতিহাস তার নতুন যাত্রা শুরু করবে। বেন্নাবী কুরআন শরীফের এ আয়াতকে পরম সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন ঃ

তিনিই তার রসুলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন।[১৩]

কিন্তু বেন্নাবী জানতেন, মুসলমানরা ইতিহাসের এ সত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে যদি তারা তাদের উপর আরোপিত শর্ত পূরণ করতে পারে। অন্যকে বাঁচাতে হলে আগে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে। তাদের নিজেদের আগে সভ্যতার ধর্মে উন্নীত করতে হবে। তারপর সেই সভ্যতাকে তুলে ধরতে হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কাছাকাছি। বেন্নাবী আমৃত্যু এই প্রতিশ্রুতি পালনের শর্ত পূরণ করে গেছেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Asma Rashid. Malek Bennabi : His life, Times and Thought. Islamabad : Islamic Research Institute, 1987.

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. Malek Bennabi, Islam in History and Society. Islamabad : Islamic Research Institute, 1987.

৮. Ibn Khaldun, The Muqaddimmah : An Introduction to History, Translated by Franz Rosenthal. Princeton : Princeton University Press, 1969.

৯. Speeches and Statements of Iqbal, edited by Shamloo, Lahore, 1948.

১০. Malek Bennabi, Islam in History and Society.

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. আল কুরআন, সূরা ৬১ঃ ৯।

www.pathagar.com

হাসান আল বান্না

এক

১৯২৮ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তরুণ স্কুল শিক্ষক হাসান আল বান্না একালের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম পুনর্জীবনবাদী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমুন (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, ইংরেজিতে (Muslim Brotherhood) প্রতিষ্ঠা করেন। তখন পর্যন্ত ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কার এবং সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে ইসলামের প্রধান ভূমিকা পালনের চিন্তাভাবনা কিছু শিক্ষিত মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করলেও এটি কখনোই গণআন্দোলনে পরিণত হয়নি। এর আগে আফগানী, আবদুহু, রশিদ রিদার মত মানুষেরা একই লক্ষ্যে লড়াই করেছিলেন, মুসলিম ভাবজগতে তারা অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিলেন এ সব কথা সত্য, কিন্তু তাদের সেসব লড়াই ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। এটি কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়নি। হাসান আল বান্নাই এই এলিটিস্ট, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতাকে জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত করেন, যা কিনা মিসর ছাড়িয়ে মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। বিশ শতকের শেষে এবং একুশ শতকের প্রথম পাদে এসে তাই আমরা দেখি বান্নার চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিষ্ঠানগুলো আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া, মিসর, জর্ডান, সুদান, ফিলিস্তিন ও মুসলিম দুনিয়ার অন্যত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে এগুচ্ছে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের ভূমিকাকে এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারছে না। আধুনিক মুসলিম চিন্তার জগতে বান্নার ভূমিকা অত বেশি না থাকলেও এইসব বিশিষ্ট চিন্তাভাবনাকে জনপ্রিয় করা, একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে তা ধারণ করা এবং আকর্ষণীয় নেতৃত্বের চমকে পুরো মিসরীয় জাতিকে জাগিয়ে দেয়া ও তার পরিকল্পনার পক্ষে একদল নিবেদিত ও আন্তরিক মানুষের নিশিদিন কাজ করে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টিতে তিনি তুলনাহীন নজির সৃষ্টি করেছেন। মার্কস এক জায়গায় লিখেছিলেন ঃ Philosophers have tried to understand the world. Our problem is to change it. মার্কসের লেখালেখির সাথে বান্নার যোগাযোগ হয়েছিল কিনা তা জানা না গেলেও মার্কস কথিত এ মন্তব্যের সার্থক ও কার্যকরী নমুনা হচ্ছেন হাসান আল বান্না। তিনি যথার্থ অর্থে বুঝতে পেরেছিলেন মিসর তথা পুরো মুসলিম দুনিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নিগড়ে আটকা পড়েছে এবং এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মুসলিম সমাজকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। বলাবাহুল্য বান্না আমাদের সেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথটিই দেখিয়েছেন। তিনি যখন তার আরাধ্য কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হন তখন মিসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলধৃত। এর রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকও তারা। এই নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মিসর তখন ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনেরও চারণক্ষেত্র। অন্যদিকে সেখানকার ধনী ও

www.pathagar.com

অভিজাত শ্রেণী ইউরোপীয় প্রথা-পদ্ধতি নির্বিচারে আত্মস্থ করতে উন্মুখ। এইরকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন স্বাভাবিকভাবেই মিসরীয় জনমানসকে আঘাত করে। ফলে সেখানে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। মিসরে বিশ শতকের প্রথম দিককার এসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন সাদ জগলুল এবং তার নেতৃত্বে মিসরের আজাদীর লড়াই শুরু হয়। বান্নার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় খুব অল্প বয়স থেকে তিনি এই সব ব্রিটিশবিরোধী মিছিল সমাবেশে সোৎসাহে অংশ নিতেন।[১] বান্নার শৈশবের মিসরীয় রাজনৈতিক পরিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদবিরোধী আজাদীর লড়াই, সবমিলিয়ে তার ভবিষ্যৎ মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে মিসরের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে ব্যাপক ধর্মনিরপেক্ষকরণ (Secularization) শুরু হয় এবং রেস্টুরেন্ট, নাইটক্লাব, সিনেমা প্রভৃতির মাধ্যমে মিসরীয় সমাজে ইউরোপীয় জীবনধারা অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলে। মিসরের সেকুলার লেখকরা সেখানকার প্রাক ইসলামী ফেরাউনের যুগের মধ্যে এক জাতীয় আত্মপরিচয় আবিষ্কার করার চেষ্টা করে এবং এই সেকুলার মিসরীয় জাতীয়তাবাদ সেখানকার সমাজ থেকে ইসলামের শক্তিশালী ভূমিকাকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে নেওয়ারও চেষ্টা চালায়। নতুন এই সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় অথচ ক্ষমতাশালী পাশ্চাত্য প্রভাবিত শহুরে শিক্ষিত শ্রেণীর মনের ক্ষুধা পূরণ করলেও মিসরীয় সাধারণ জনমানসের মধ্যে এর কোন প্রাসংগিকতা ছিল না। এই সব সেকুলার আধুনিকতাবাদীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্টত্বে বিশ্বাস করতো এবং এটিকে মিশরীয় জনসমাজে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতো। স্বাভাবিকভাবে তারা তুরস্কের মোস্তফা কামালের খেলাফত বিলোপের ঘটনায় আহ্লাদিত হয় এবং এটিকে ধর্মনিরপেক্ষকরণের পক্ষে বিরাট বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। রাজনীতির জগতের পাশাপাশি তারা যুক্তি দেখাতো মুসলমানদের উচিত এ যুগের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা। তারা ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজে মেয়েদের অবস্থানকেও বদলে ফেলতে আগ্রহী হয় ও তাদের পর্দাকে বাতিল করার জন্য ওকালতি করে। ইসলামী সংস্কৃতি প্রভাবিত মিসরীয় সমাজে সেকুলার ও আধুনিকতাবাদীদের এই সব কর্মসূচী যেমন সাধারণ জনমানসকে আহত করতে থাকে তেমনি খ্রিস্টান মিসনারীদের ইসলামবিরোধী তৎপরতা ও সমালোচনাও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই সব ঘটনা হাসান আল বান্নাকে প্রভাবিত করে বিশেষ করে পশ্চিমা সেকুলার সংস্কৃতি যেভাবে মিসরীয় ইসলামী সংস্কৃতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল তা তার শংকা বাড়িয়ে দেয়। এমনি এক আবহাওয়ায় বান্না তার কাজ শুরু করেন, কর্মকৌশল ঠিক করেন, বিকল্প উত্তরণের পথ প্রস্তুত করেন এবং তার নেতৃত্বের গুণপনায় অচিরেই চলমান মিসরীয় স্রোতের ধারা ঘুরতে শুরু করে। মিসরীয় সমাজে ইসলাম প্রান্তিক অবস্থান থেকে পুনরায় মধ্যমঞ্চে এসে হাজির হয়। অবশ্য এর আগেই জাতীয়তাবাদী সেকুলার আন্দোলনগুলো ও তার নেতৃত্ব দুর্নীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কখনো কখনো সাম্রাজ্যবাদের আচল ধরা চরিত্রের কারণে ব্যাপক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে এই শূন্যতা পূরণে ইসলাম এগিয়ে আসে এবং হাসান আল বান্না এটিকে একটি মতাদর্শিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে পশ্চিমের সেকুলার সংস্কৃতির জন্য এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

www.pathagar.com

দুই

হাসান আল বান্না ১৯০৬ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোর ৯০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাহমুদিয়া নামক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন পেশাগতভাবে একজন ঘড়ি মেরামতকারী, একই সাথে স্থানীয় মসজিদের ইমাম। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতী আবদুহুর তত্ত্বাবধানে কিছুদিন লেখাপড়া করেন এবং পরে ইসলামী ন্যায় ও আইন শাস্ত্রের উপর কিছু বইও লেখেন। বান্না তাই শৈশব থেকেই এক সংস্কারমুখী ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। পিতার মত তিনিও ঘড়ি মেরামতের কাজ শেখেন, পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় তার হাতে খড়ি হয়। বার বছর বয়সে তিনি একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় তিনি কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িয়ে পড়েন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী নীতিকে কার্যকরি করে এক সামাজিক বিশুদ্ধতা আনয়ন। তবে তের বছর বয়সে বান্নার হাসাফিয়া সুফী ধারার সাথে সংযোগ ঘটে এবং এই যোগাযোগ বান্নার জীবনে বড় রকমের প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে সংস্কার ও রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সবসময় ব্যক্তিজীবনে এক মিস্টিক অন্তর্লীনতাকে লালন করে গেছেন। মনের দিক দিয়ে তিনি সবসময় ছিলেন একজন সুফী ঃ Banna was a sufi and throughout his life the spiritual exercises and rites of sufism remained important to him।[২]

হাসাফিয়া সুফী ধারাটি ছিল শরীয়াহর অনুগত এবং বান্নার কাছে এটি পছন্দনীয় ছিল এই কারণে যে এই ধারা কখনো ইসলাম নির্ধারিত সীমানাকে অতিক্রম করেনি। বান্না এই সুফী ধারাটির একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নৈতিকতার স্থানকে রক্ষা করা এবং এতিমদের সাহায্য করে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবকে খর্ব করা। সুফীবাদী প্রবণতার কারণেই পরবর্তীকালে বান্না তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক সুসম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি তার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন কিভাবে তার এক শিক্ষক মুরশিদ ও সাগরেদের মধ্যকার আধ্যাত্মিক ও মানবিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সুফীবাদের সাথে সংযোগের ফলে তার নিজেরও সুফীদের প্রতি প্রবল দুর্বলতা ছিল। সুফীদের তিনি কখনও সমালোচনা করেননি। তিনি বরং সুফীবাদ থেকে ভ্রান্ত সুফীদের বিদআতমূলক কার্যকলাপের সংশোধনের উপর জোর দিয়েছেন।[৩]

বান্না যেমন সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি তরুণ বয়সে ইমাম গাজ্জালীর লেখা পড়েও বিমোহিত হন। গাজ্জালীর লেখা পড়ে তিনি একটা জিনিস বুঝতে পারেন শিক্ষার মানে নিজের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া নয় বরং জীবনকে কল্যাণকর পথে পরিচালনার চেষ্টা করা। ১৯২৩ সালে ১৭ বছর বয়সে বান্না মাহমুদিয়া ত্যাগ করেন এবং কায়রোর শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় দার-উল-উলুমে আরবী শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য আসেন।

রাজধানী কায়রোতে এসে স্থানীয় হাসাফিয়া সুফীদের সাথে তার যোগাযোগ ও সখ্যতা হয়। ফলে নতুন পরিবেশে তাকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয় না। কায়রো থাকাকালে বান্না রশিদ রিদার সালাফিয়া আন্দোলনের কর্মীদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে ঘন ঘন যেতেন এবং তার সম্পাদিত আল মানারের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। এ সময় তার রশিদ রিদা ও মুফতী আবদুহুর অন্যান্য ছাত্রদের খুব কাছে থেকে দেখারও সুযোগ হয়।

www.pathagar.com

কায়রোয় পাঁচ বছর অবস্থানকালে রাজধানীর কোলাহলের পাশে মিসরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর কাড়াকাড়ি ও প্রতিযোগিতার ছবিও তার নজরে আসে। বিশেষ করে মিসরীয় সমাজের পশ্চিমীকরণ যাকে তিনি অনৈতিকতা ও নাস্তির সাথে তুলনা করেছেন কায়রোয় বসে খুব কাছে থেকে তা বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক মুসলমানের মত এ সময় কামাল আতাতুর্কের খেলাফত উচ্ছেদ ও তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ করার চেষ্টাকে তিনি উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯২৫ সালে মিসরে একটি সেকুলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তিনি তুরস্কের মত ইসলাম পরিত্যাগের পূর্বলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি পত্র পত্রিকা সাময়িকীগুলোতে নিরন্তরভাবে পশ্চিমী সেকুলার মূল্যবোধ সম্পন্ন লেখালেখির বিষয়টিও শংকার সাথে দেখতে থাকেন। এই পরিস্থিতি বান্না ও তার সহগামীদের বেদনাসিক্ত করে দেয় ঃ

Banna and his friends were moved almost to tears by the political and social confusion in city.[৪]

কিন্তু বেদনা বান্নার উদ্যমকে কেড়ে নিতে পারেনি। তিনি এরি মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কায়রোয় দার-উল-উলুম, আল আজহার, আইন বিদ্যালয় ও সালাফিয়া লাইব্রেরীতে অনেক সমমনাদের সন্ধান পান যারা তারই মত কিছু একটা করার চিন্তাভাবনা করছিলেন। নতুন পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল আজহারের পন্ডিত শায়খ ইউসুফ আল দিজভী, যিনি ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য একটি সংগঠন খাড়া করেছিলেন। বান্না তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন দিজভী তার কাছে স্বীকার করেন তার সংগঠন ব্যর্থ হয়েছে এবং আল আজহারের উলামারাও পশ্চিমী সংস্কৃতির স্রোতকে আটকাতে পারেননি। তিনি বান্নাকে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে এ অবস্থায় ব্যক্তিগত মুক্তির চেষ্টার পরামর্শ দেন। তরুণ বান্না দিজভীর এই হাল ছেড়ে দেয়া মানসিকতার সমালোচনা করেন এবং দিজভীকে মুসলিম জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করার আহ্বান জানান।[৫] বান্নার কর্মোদ্যোগের প্রথম নমুনা হচ্ছে কায়রোতে বসে ইয়ং ম্যানস মুসলিম এসোসিয়েশেন (YMMA) প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় তাকে সহযোগিতা করেন সিরীয় বুদ্ধিজীবী মুহিব আল দীন আল খতিব। খতিব কায়রোয় সালাফিয়া লাইব্রেরীর পরিচালক ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে তিনি সংস্কারধর্মী 'আল ফাতহ' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯২৭ এর নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের নীতির কাছে ফিরে গেয়ে মুসলিম সমাজের ভিতরে জাগরণ সৃষ্টি করা। এই কারণে এটি ইসলামী নৈতিকতা, মুসলিম সংহতি ও আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত করার উপর বিশেষ জোর দেয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য YMMA স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম সংগঠন করে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে, সমাজে ইসলামবিরোধী নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে এবং বহু দাতব্য সংস্থা, ব্যাংক ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অচিরেই এর শাখা মিসরের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় যেমন ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরাকেও স্থাপিত হয়। স্পষ্টতঃই এই সংগঠনটি নতুন ধরনের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হয় যার উপর ভিত্তি করে কয়েক মাস পর হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলেমুন-মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।[৬]

www.pathagar.com

কায়রোয় অবস্থানের শেষ দিকে এসে বান্না একটি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তিনি স্কুল শিক্ষক ও সুফী শায়খদের সামাজিক ভূমিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তিনি সুফীদের আন্তরিকতা, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করলেও জীবনবিমুখতার জন্য তাদের সামাজিক ভূমিকা যে সীমিত হয়ে আসছে তাও তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন এবং এইভাবে শিক্ষকরা সুফীদের চেয়ে এগিয়ে আছেন, বিশেষ করে বান্নার মত হচ্ছে তারা ইচ্ছা করলে মিসরীয় যুব সমাজকে পশ্চিমী সংস্কৃতির কবল থেকে উদ্ধার করে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। বান্না ঘোষণা দেন তার লক্ষ্য হচ্ছে দিনের বেলায় ছাত্রদের পড়িয়ে এবং রাতে ক্লাস, বক্তৃতা ও প্রচার কাজ চালিয়ে মিসরীয়দের ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা।[৭]

এই প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার হয় তিনি সুফীবাদী ধারা থেকে একটু একটু করে সরে এসে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট সুফী ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের মধ্যে কিছু সুফীবাদী প্রবণতাকে প্রবেশ করিয়েছিলেন, যেমন ঃ শায়খের প্রতি আনুগত্য, খোদার স্মরণ, ধর্মীয় কর্তব্যের যথাযথ অনুসরণ। বান্না কখনোই সুফীদের খোদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটাকে অস্বীকার করেননি। তিনি বরং এই সম্পর্ককে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন।

দার-উল-উলুম থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর ১৯২৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বান্নাকে আরবী শিক্ষক হিসেবে ইসমাইলিয়ার একটি প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ দেন। এই ইসমাইলিয়াতেই সুয়েজ খাল কোম্পানীর তৎকালীন সদর দফতর অবস্থিত ছিল এবং যেখানে ব্রিটিশরা মজবুতভাবে খুঁটি গেড়ে বসেছিল। ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশীদের স্থানীয় জনগণের ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু স্থানীয় অর্থনীতি ও জনগণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর তারা নিয়ন্ত্রক বনে গিয়েছিল। বান্না বিশেষ করে বিদেশী ও মিসরীয়দের জীবন যাপনের নিদারুণ বৈষম্যে আহত হন এবং মিসরীয়দের দুরবস্থা তাকে আকুল করে দেয় ঃ He was shamed by the contrast between the luxurious homes of the British and the miserable hovels of the Egyptian workers.[৮]

বান্না তার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যা কিছু করা দরকার তা জানতেন। তিনি ভাল করে বুঝেছিলেন জাতীয়তাবাদ কিংবা ইউরোপের সাথে মিসরের সম্পর্ক বিষয়ক উচ্চমার্গের আলোচনা এই মুহূর্তে একেবারে অর্থহীন, কেননা জনগণের বিরাট অংশ সিদ্ধান্তহীনতা ও নীতিহীনতায় ভুগছে। তার দৃষ্টিতে এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহর নীতির দিকে ফিরে আসা। তিনি তার আশেপাশের নিকটজন ও বন্ধুবান্ধবদের বুঝান। তাদেরকে নিয়ে স্কুলে, মসজিদে, কফি হাউসে ছোট ছোট বৈঠক করে তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা প্রচারের চেষ্টা করেন। তিনি তার শ্রোতাদের বলেন পশ্চিমের প্রভাব এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন তাদেরকে একেবারে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে এবং তাদের ধর্ম থেকে তারা সরে এসেছে। ইসলাম ঠিক পশ্চিমের কোন আদর্শ বা ভাবধারার মত নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এটিকে যদি আবার মুসলমানরা পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে তবে বিদেশীদের দ্বারা উপনিবেশিত হওয়ার আগের গতি ও শক্তি তারা ফিরে পাবে। উম্মাহকে শক্তিশালী

www.pathagar.com

করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের মুসলিম আত্মার পুনরাবিষ্কার করতে হবে। যদিও তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ, তবুও তিনি সবার ভিতর একটা স্বপ্ন ও অনুরণন সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ মনের, ব্যক্তিত্ববান ও মানুষকে উজ্জীবিত করার শক্তিসম্পন্ন। অধ্যাপক রিচার্ড পি. মিচেল একটা ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন - ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায় ইসমাইলিয়াতে কর্মরত ৬ জন স্থানীয় ব্যক্তি তার কাছে এসে একটা কিছু করা দরকার বলে জানালেন ঃ

We know not the practical way to reach the glory of Islam and to serve the welfare of the Muslims. We are weary of this life of humiliation and restriction. So we see that the Arabs and the Muslims have no status and no dignity. They are not more than mere hirelings belonging to foreigners. We possess nothing but this blood ... and these souls .... and these few coins. We are unable to percieve the road to action as you percieve it, or to know the path to the service of the fatherland, the religion and the Ummah as you know it.[৯]

এই আবেদনে বান্না অভিভূত হয়ে যান। তিনি ও তার আগন্তুকরা একসাথে শপথ নেন যে তারা ইসলামের বাণী প্রচারের সৈনিক (জুনদ) হবেন। সেই রাতে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের জন্ম হয়। এইভাবে ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে ইখওয়ানের প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৪৯ সালে আল বান্নার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ইখওয়ান গোটা মিশর জুড়ে ২০০০ শাখা গড়ে তুলেছিল। প্রতিটি শাখায় ৩,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ পর্যন্ত সদস্য ছিল। এটি মিসরীয় সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইখওয়ান মিসরীয় রাজনৈতিক মঞ্চে সবেচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়। বান্না সাফল্যের সঙ্গে ইসলামকে একটি বৈপ্লবিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সাইয়েদ কুতুব ১৯৫৩ সালে এই দলে যোগদান করেন এবং নেতা হন।

ইখওয়ান সম্বন্ধে নেতিবাচক যাই বলা হোক না কেন বান্না সবসময় বলেছেন ক্ষমতা দখল কিংবা অভ্যুত্থানের কোন ইচ্ছা তার নেই। ইখওয়ানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার। তার কথা ছিল জনগণ যখন ইসলামের বাণী আত্মস্থ করবে এবং সেই আলোকে নিজের ও সমাজের সংস্কার করে নেবে জাতি তখন কোন রকম সশস্ত্র পদ্ধতি ছাড়াই ইসলামী রঙে রঙ্গিন হয়ে উঠবে। শুরুতে বান্না তার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৬ দফা পরিকল্পনা করেন। যার মধ্যে আফগানী, আবদুহু ও রিদার সালাফিয়া আন্দোলনের কর্মসূচীগত ঐক্য দেখা যায়। বান্না মূলতঃ ছিলেন এদের ভাবশিষ্য এবং এদের চিন্তাধারাকেই তিনি কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। তার পরিকল্পনাগুলো ছিল এ রকম ঃ

১. যুগোপযোগিতার ভিত্তিতে কুরআনের নীতিকে ব্যাখ্যা করা,
২. মুসলিম জাতি ও দেশসমূহের ঐক্য,
৩. মুসলমানদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ইনসাফভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা,
৪. অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই,

www.pathagar.com

৫. ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুসলিম দেশগুলোর আজাদী,
৬. শান্তি ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা।[১০]

বান্না কখনোই চাননি ইখওয়ান একটি রেডিকাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের মৌলিক সংস্কার যা কিনা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বিধ্বস্ত ও শিকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।[১১]

মিসরীয়রা বান্নার ভাষায় ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগছে এবং ইউরোপীয়দের চেয়ে অধঃস্তন মনে করতে শুরু করেছে। কিন্তু বান্নার কথা হলো এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ মিসরীয়দেরও চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্তমান যা কিনা আমদানিকৃত যে কোন মতাদর্শের চেয়ে উজ্জ্বল।[১২]

তাদের ফরাসী কিংবা রুশ বিপ্লবের থেকে কিছু ধার করার দরকার নেই কেননা রসুল (স.) ১৩০০ বছর আগে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ইনসাফ, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন।[১৩]

শরীয়াহ আইন যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক আবহাওয়ায় কাজ করবে, বিদেশী আইন সেভাবে কাজ করবে না। জনগণ যতক্ষণ অন্যদের অনুকরণ করতে থাকবে ততক্ষণ তারা সাংস্কৃতিকভাবে এক শংকর প্রজাতি হয়ে থাকবে।[১৪]

তিন

হাসান আল বান্না ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানের আজাদী ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কোন সহজ রাস্তা নেই। এর একটাই পথ ইসলামকে ভিত্তি করে তাদের আত্মপরিচয়কে পুনরাবিষ্কার এবং তাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এই কারণে বান্না বছরের পর বছর ধরে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ইখওয়ানকে একটি মজবুত, গতিশীল ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং এর কর্মীদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত করেন। আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বান্নার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কার্যোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলা এবং কাজের মাধ্যমে একটা মডেলকে তুলে ধরা। কায়রোর দার-উল-উলুমে ছাত্রাবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন পূর্বতন সংস্কারকদের যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তারা কোন কার্যকরী পন্থা বা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি। ইসলামী সংস্কারের লক্ষ্যে পূর্বতন পথিকৃৎদের আরব্ধ কাজকে তিনি গণসংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাধা করার চেষ্টা করেছেন।

মার্কিন পন্ডিত ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক রিচার্ড মিশেল ইখওয়ানুল মুসলেমুনের উপর প্রথম শ্রেণীবদ্ধভাবে কাজ করেছেন এবং ইখওয়ানকে নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম হচ্ছে ঃ The Society of Muslim Brothers। এখানে তিনি ইখওয়ান সম্পর্কে বলেছেন ঃ .... the first mass supported and organized, essentially urban-oriented effort to cope with the plight of Islam in the Modern world.[১৫]

অধ্যাপক মিশেল ১৯৫৩-৫৪ সালে যখন ইখওয়ানের উপর নাসের সরকারের জুলুম নেমে আসে এবং তাদের মামলাগুলোর বিচার চলে তখন তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে ইখওয়ানের সমাবেশ-প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং দেখে অবাক হন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ কিভাবে এই দলটির সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

পশ্চিমের কেতাদুরস্ত সুট-প্যান্ট পরিহিত এবং পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক থেকে শুরু করে ছাত্র, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, কেরানী, অফিসের নিম্নপদস্থ কর্মচারী, স্থপতি, প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, ব্যাংকার, সাংবাদিক সবাই ইখওয়ানের সাথে জড়িত ছিল। অধ্যাপক মিশেল দেখতে পান প্রথমদিকে ত্রিশের দশকে ইখওয়ানের সাথে গ্রামের খেটে খাওয়া এবং চল্লিশের দশকে শহুরে নিম্নবিত্ত মানুষেরা সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু সেই সব কর্মীরা যারা ইখওয়ানের রাজনৈতিক ভাগ্যকে নির্ধারণ করতেন তারা ছিলেন মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী। অধ্যাপক মিশেলের কাছে মনে হয়েছে ইখওয়ানের এই আন্দোলন হচ্ছে ঃ

An effort to reinstitutionalize religious life for those whose commitment to the tradition and religion is still great, but who at the same time are already effectively touched by the forces of Westernization; a movement which not only sought to imbue the present with some sense of the past ..... but also to redefine the past in terms meaningful for the present.[১৬]

ইখওয়ানের নেতৃত্বের মধ্যবিত্তীয় প্রেক্ষাপট দলটির নীতি ও আদর্শ নির্মাণেও বড় ভূমিকা রেখেছে। যেমন ঃ বিদেশী ও তার দেশীয় এজেন্ট (ইহুদী ও খ্রিস্টান) কর্তৃক মিসরীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা, কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক, জমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। তারপরেও ১৯৩০ ও ৪০ এর দশকে মিসরের শিল্প-কলকারখানার মালিক ছিল মূলতঃ বিদেশীরা। সেইসব জায়গায় ইখওয়ান শ্রমিকদের শোষণের বিরুদ্ধে পক্ষ নেয় এবং মিশরীয় শ্রম আন্দোলনে একটি বিরাট ভূমিকা রাখে। কোন কোন জায়গায় তারা ইউনিয়নকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

এটা সত্য প্রথম দিকে ইখওয়ান নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কথা বললেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মোকাবিলা ও তাদের জায়নবাদীদের পক্ষে ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরোধিতা করতে গিয়ে এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইখওয়ান ফিলিস্তিনকে মনে করতো The heart of the Arab World, the knot of the Muslim peoples এবং জেরুজালেমকে দেখতো ইসলামের Third of the Holy places হিসেবে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ফিলিস্তিনে আরবদের বিদ্রোহ ও ধর্মঘটের সময় ইখওয়ান তাই সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে এবং ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধের সময় মিসর সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার আগেই ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে সহযোগিতা করে। ১৯৪৩ সালে হাসান আল বান্না তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন ঃ

My Brothers, you are not a benevolent society, nor a political party, nor a local organization having limited purposes. Rather, you are a new soul in the heart of this nation to give it life by means of the Koran .... [১৭]

এটা সত্য ইখওয়ান কোন প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না বরং প্রচলিত রাজনীতির দলাদলিকে তারা মনে করতো এটা খামখা জাতিকে বিবদমান গ্রুপে বিভক্ত করছে। এর

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ শক্তি বরং ইসলামের স্বার্থে ব্যবহার করা যেতো। সাংবাদিক এডওয়ার্ড মর্টিমার এই ব্যাপারটি খেয়াল করে লিখেছেন ঃ

But Brotherhood was not the old style of political party consisting of a handful of notables- land lords or intellectuals- who got together to plan a conspiracy or put up a slate for elections. It was a mass organization, bearing some charecteristic marks of the decade in which it developed-the 1930s. It sought to organize not only the political opinions of its followers but their entire way of life .... [১৮]

১৯৩২ সালে ইসমাইলিয়া থেকে কায়রো বদলী হয়ে আসার পর বান্না পুরো মিসর জুড়ে শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কাজের সুবিধার জন্য ইখওয়ানকে তিনটি ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত করেন। একটি শ্রমিকদের, একটি ছাত্রদের অন্যটি ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। ১৯৪৩-এ এসে তিনি ব্যাটেলিয়নকে ফ্যামিলিতে (আল উসরা) বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি উসরার ১০ জন সদস্য নিয়ে আবার একটি ইউনিট তৈরি হতো। উসরা ছিল ইখওয়ানের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ও আধ্যাত্মিক ভাগ। প্রত্যেকটি উসরা ব্যাটেলিয়নের তত্ত্বাবধানে সদর দফতরের নির্দেশের অধীন পরিচালিত হতো। উসরার সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে মিলিত হতো। নামাজ, জিকর, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করতো এবং ইসলামী নীতিবিরুদ্ধ সুদ, জুয়া, মদ, ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার তাগিদ দেয়া হতো। ইখওয়ানের এই 'পরিবারের' ধারণা এমন সময় মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সাহায্য ও সংহতির উপর জোর দিয়েছিল যখন নাকি আধুনিকায়নের ধাক্কায় মিসরের ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বান্না মনে করতেন এই ইসলামী নৈতিকতার উজ্জীবনের মাধ্যমে কেবল মুসলিম জনসাধারণের কাছে আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার অর্থবহ হতে পারে।

একটি পর্যায়ে বান্না ইখওয়ানের মাধ্যমে মিসর জুড়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, রোভার স্কাউট, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের কর্মীরা অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। রোভাররা দরিদ্রদের স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইখওয়ান আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে, তাদের উপর মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে।

ইখওয়ানের শত্রুরা বান্নাকে অভিযোগ করতো তিনি রাষ্ট্রের ভিতর আরেকটি রাষ্ট্র গড়ে তুলছেন। আসলে বান্না কাজের মাধ্যমে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর ব্যর্থতাকে খুলে ধরেন এবং জনগণের মণিকোঠায় জায়গা নিয়ে নেন।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পন্ডিতেরা যাই দাবি করুন না কেন ইখওয়ান সাফল্যজনকভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল মিসরীয়রা ধার্মিক থাকতে চায় এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকেই পছন্দ করে। ইখওয়ান এটিও প্রমাণ করেছিল ইসলাম একটি প্রগতিশীল আদর্শ। তারা ইসলামের কথা বলেছিল কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে প্রত্যাবর্তন করতে চায়নি। এই কারণে তারা সৌদি আরবের ওহাবীদের কুরআন শরীফের আক্ষরিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে কুরআনের নীতির ভিত্তিতে একালের সমস্যার সাথে বুঝতে চেয়েছিল। যদিও তখন পর্যন্ত ইখওয়ান একটি সুস্পষ্ট ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেল গড়ে তুলতে পারেনি তবু তারা এটা

www.pathagar.com

মনে করতো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের ধারণা মোটেই সময়ের থেকে পিছিয়ে ছিলনা। ইসলামের প্রথম যুগের মত শাসকরা নির্বাচিত হবেন, পূণ্যবান খলিফাদের মত শাসকরা জনগণের কাছে জবাবদিহি করবেন, স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ চালাবেন না। কিন্তু বান্না অনুভব করতেন ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা এই মুহূর্তে অনর্থক। কেননা অনেক মৌলিক কাজকর্ম ও প্রস্তুতি শেষ হয়নি। তবে বান্না এ কথাটা প্রায়ই বলতেন মিসরকে ইসলামী হতে দেয়াটাই স্বাভাবিক কাজ হবে। যেমন রুশীয়রা কমিউনিজমকে এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান সেখানে জনগণ চাইলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়াটাই স্বাভাবিক।[১৯]

১৯৪০-এর দশক ছিল মিসরের জন্য ক্রান্তিকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উদারনৈতিক, সেকুলার, গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা সর্বোপরি ইসরাইলের কাছে ১৯৪৮ সালে আরবদের অপমানজনক পরাজয় সর্বত্র হতাশার গ্লানি সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরাও মিশরে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ দেশটি চরিত্রগতভাবে এই ধরণের ব্যবস্থাকে ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলনা। ওয়াফদ পার্টির মতো জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলও বারবার নির্বাচিত হয়ে ব্রিটিশ কিংবা রাজার ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা থাকতে পারত না। পরে ১৯৪২ সালে ওয়াফদ ব্রিটিশদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় যাওয়ায় তার জনপ্রিয়তাও পড়তে থাকে। এরকম অবস্থায় মিসরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ইখওয়ান মিসরের সমস্যা হিসেবে বৃটেনকে চিহ্নিত করে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই শুরু করে। কারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন এরকম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যেহেতু ইখওয়ানের আবেদন ছিল সাধারণ জনগণের কাছে তাই এটি কারো কারো কাছে হয়ে উঠেছিল anti-intellectual, defensive, self righteous.[২০] এই পরিস্থিতিতে সবার অজান্তে ইখওয়ানের ভিতর থেকে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র দল বেরিয়ে আসে যারা সম্ভবতঃ দ্রুত কিছু করে দেখাতে চাচ্ছিল। এই দলটির কথা ইখওয়ানের সাধারণ কর্মীরা আদৌ জানত না, যাদের সামনে মিসরের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারই ছিল মুখ্য। বান্না এ ধরনের উদযোগের কথা কখনো জানতে পারেননি এবং তিনি এ ধরনের কাজকেও কখনো সমর্থন জানাননি। এই সশস্ত্র দলটির কার্যকলাপ ইখওয়ানকে কলঙ্কিত করে, পরিণতিতে তার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দলটির একজন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল নূরকাশীকে হত্যা করে, যে ঘটনাকে বান্না তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহীম আবুল হাদী জনপ্রিয় ইখওয়ানকে ধ্বংসের এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি যা কিনা মিসরীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অচিরেই ইখওয়ানের সদস্যদের উপর সরকারের জুলুম, নিবর্তন, হুলিয়া নেমে আসে এবং পরিশেষে রাজা ফারুকের গুপ্ত বাহিনীর পরিকল্পনায় ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাস্তার উপর বান্নাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। সত্য কথা বলতে কি বান্নার ইন্তেকালের ফলে ইখওয়ানের নেতৃত্বের যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় এটি তা আর কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

চার

হাসান আল বান্না তার পূর্বসূরী জামাল আল দীন আল আফগানী ও মুফতী আবদুহুর মত বিশ্বাস করতেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে ইউরোপীয় আধিপত্যের সামনে মুসলমানরা নতজানু হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের এই দুরবস্থা দূর করতে হলে তাই আজ

www.pathagar.com

দরকার কুরআন ও সুন্নাহর নীতির কাছে প্রত্যাবর্তন করা যার উদাহরণ প্রথম যুগের মুসলমানরা (যাদেরকে সালাফ বলা হয়েছে) পেশ করেছিলেন। রসুলুল্লাহ (সা.) ও তার পূণ্য খলিফাদের (রাশিদুন) পর যে সব শাসকরা এসেছেন তাদের সময় নানা কারণে ইসলাম দুর্বল হয়ে যায়, যেমন ঃ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ধর্মীয় বিবাদ, জনগণের প্রতি শাসকদের দায়িত্বে অবহেলা, ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়া, প্রাযুক্তিক বিদ্যায় অনাগ্রহ এবং পূর্বতন কর্তৃত্বের অন্ধ অনুকরণ (তকলীদ)। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এই সব কার্যকারণের ফলে মুসলিম দুনিয়া মঙ্গোল ও ক্রুসেডের আগ্রাসনের শিকার হয়। যদিও পরবর্তীকালে এ অবস্থা মামলুক ও অটোম্যানরা কিছুটা ঘুরানোর চেষ্টা করে কিন্তু তারা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে উপেক্ষা করে। এই উপেক্ষোর ফলে আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে মুসলিম দুনিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে পুরোপুরি পদানত হয়। এই রাজনৈতিক পরাজয়ের পথ ধরেই মুসলিম দুনিয়ায় ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন শুরু হয়। বান্না ইউরোপের জড়বাদী সংস্কৃতিকে নাস্তিকতা ও নীতিহীনতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন সাম্রাজ্যবাদীরাই সুদ, মদ ও উলঙ্গপনার সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে এবং এর ফলে মুসলমানের ভিতরে সৃষ্টি হচ্ছে হীনম্মন্যতা। মিসরের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তারাই দায়ী। এই বিপর্যয়কে রুখতে হলে ইসলামকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে ১৩০০ বছর আগে এটা সত্য কিন্তু বান্না মনে করেন এটা এমন একটা ব্যবস্থা যার নীতিকে স্থান কাল নির্বিশেষে কার্যক্ষমভাবে ব্যবহার করা যাবে।

বান্না তার স্বল্পায়ু জীবনে ইখওয়ানের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে সময় দিয়েছিলেন বেশি। এ কারণে তার চিন্তাভাবনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করার তেমন একটা সময় তিনি পাননি। বিভিন্ন সময় দেয়া তার বক্তৃতা, বিবৃতি ও কিছু লেখালেখি থেকে আমরা তার বিশিষ্ট চিন্তা সম্বন্ধে ধারণা পাই।

বান্না কুরআন ও সুন্নাহর উপর মুসলমানদের দৃঢ় থাকার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন এই কারণে যে, তারা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল এক জীবন গড়ে তুলবে, কোন ধর্মীয় কর্তৃত্বের আনুগত্যের জন্য নয়।

বান্না মনে করতেন ইসলামের মধ্যে অনেক অনাচার, কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে, এর পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। কুরআন ও সুন্নাহর নীতি বিরুদ্ধ কোন কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না। পীরপূজা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎকাজের জন্য আমরা দোয়া করতে পারি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি কিন্তু ব্যক্তির কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে এ ধরনের বিশ্বাস ভুল। আবার এ রকম বিশ্বাস নিয়ে কবর জিয়ারত করাও ইসলাম অনুমোদন করে না।

ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তিনটি নীতির কথা বলেছেন ঃ (১) শাসককে খোদার নীতির আওতায় জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে (২) মুসলিম দেশসমূহকে একত্রে কাজ করতে হবে কেননা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ইসলামী বিশ্বাসের অংশ ও (৩) মুসলমান জনগণ শাসকের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করবে, প্রয়োজনে পরামর্শ দেবে এবং সেটি কার্যকরী হচ্ছে কিনা তাও নজর রাখবে।

এই নীতির আওতায় ইসলামী রাষ্ট্র সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা যে কোনটাই অনুসরণ করতে পারে। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হিসেবে তিনি খেলাফতের পুনর্জীবনের কথা

www.pathagar.com

বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন এই ভাবে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা, সম্প্রীতি, চুক্তি, জোট, এমনকি ইসলামী জাতিসংঘও গড়ে ওঠা অবিচিত্র কিছু নয়।[২১] তিনি এ কথাও বলেছেন সাংবিধানিক সরকারই হচ্ছে ইসলামী সরকারের নীতির সবচেয়ে কাছাকাছি। তিনি সাংবিধানিক সরকারের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সংসদীয় পরামর্শ, জনগণের প্রতি শাসকের দায়বদ্ধতার ব্যাপারগুলোর প্রশংসা করেছেন।

সংসদীয় ব্যবস্থাকে তিনি প্রশংসা করলেও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেননি। মিসরীয় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন বহুদলীয় ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যকে বিভক্ত করে ফেলে যা ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। তিনি বরং ইসলামী নীতির আওতায় বিভিন্ন ব্যক্তির মতান্তরকে সমর্থন করেন, বহুদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করার সুপারিশ করেন এবং একটি মাত্র দল তৈরি করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। নির্বাচন জনগণের মতকে প্রতিফলিত করলেও মিসরীয় অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। যোগ্য লোকেরা চলমান ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়ে আসতে পারতো না। এই কারণে তিনি নির্বাচনী আইন সংশোধনের সুপারিশ করে বলেন প্রার্থীদের যোগ্যতা পূর্বেই নির্ধারিত করে দিতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী আইন ও সামাজিক সমস্যাগুলো যুগপৎভাবে যিনি ভাল করে বোঝেন তাকেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উচিত। নির্বাচনের সময় ব্যক্তিগত আক্রমণকেও তিনি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন এটি নিরাপত্তা, জনগণের সম্পত্তি রক্ষা, আইনের শাসন, শিক্ষা বিস্তার, জনকল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, মুসলিম দেশসমূহের আত্মরক্ষা ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে (দাওয়াহ্) কাজ করবে। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা, বেকারত্ব দূর করা, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করাও এ সরকারের কাজ। বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রকে জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। বান্না বলেছেন মিসরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের আধিপত্যকে ভাঙ্গতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তিনি জাতীয়করণের কথা বলেছিলেন। যে সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তার ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। প্রয়োজনে এই রকম সরকারকে অপসারণ করতে হবে।

বান্না তার সেকুলার সমালোচকদের উত্তরে একবার বলেছিলেন জাতীয়তাবাদ যদি দেশপ্রেম হয় তাহলে ইসলামী নীতির দিক দিয়ে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য যদি হয় প্রাক ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জীবন তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

বান্না তার পূর্বসূরীদের থেকে এগিয়ে এসে তার ইসলামী সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের ব্যাপারটিও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছিলেন। তিনি মিসরীয়দের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বল্প আয়, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য, বিদেশী কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া দখলদারিত্ব ও শোষণের বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভবে চিন্তা করেছিলেন। বিশেষ করে সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে পশ্চিমী আদর্শের তরফ থেকে ইসলামের দিকে যে চ্যালেঞ্জ ছুটে আসছিল তার মোকাবিলার কথাও তিনি ভাবছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল মুসলিম দুনিয়া এখন প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক মতাদর্শগুলোর সংঘাতের ভিতরে ওঠানামা করছে এবং প্রত্যেকটির প্রবক্তরা মুসলমানদের নানা প্রলোভনে তাদের সাথে

www.pathagar.com

কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি নাজীদের শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রশংসা করলেও তাদের বর্ণবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক চেতনা ও শ্রেণীহীন সমাজের ধারণার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখান কিন্তু তাদের ধর্মহীনতা তার পছন্দ হয়নি। পুঁজিবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন এটি গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বললেও অর্থনৈতিক শোষণ ও অনৈতিকতাকে দূর করতে পারেনি। সুতরাং বান্নার কথা হলো মুসলমানদের বিদেশী কোন আদর্শের কাছে হাত পাতার দরকার নেই। কেননা ইসলামের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

সবশেষে বান্নার মত হলো ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি ইসলামী সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে হবে। সেই সংস্কৃতি পশ্চিমের নীতিহীনতাকে মুছে ফেলবে এবং কুরআনী আইনকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে। তার ভাষায় ঃ

....by converting Muslims to true Islam (Sharia-minded sufism) and reshaping their personalities, eventually a purely Muslim society would develop and then transform the state.[২২]

পাঁচ

আমাদের বোঝা দরকার একজন গভীর তাত্ত্বিক হিসেবে নয় বরং জনপ্রিয় বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে হাসান আল বান্না কাজ শুরু করেছিলেন। তাই ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। মোহাম্মদ আবদুহু ও রশিদ রিদা যেভাবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন বান্নার সহজ সরল আলোচনার মধ্যে তা পাওয়া যাবে না। কিন্তু একদিক দিয়ে এটি বলা যায় আবদুহু ও রিদার চিন্তাভাবনাগুলোকে ব্যবহার করে তিনি গণআন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। ইখওয়ানুল মুসলেমুন প্রতিষ্ঠা করে তিনি একালে মুসলিম দুনিয়ার জন্য একটি মডেল তৈরি করে গেছেন।

আবদুহু ও রিদার সাথে তার আর একটা পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। এরা দুজন মূলতঃ ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বান্না ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিষয়াদির সাথেও পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে মুসলিম সমাজের সমস্যা বিশ্লেষণে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্যের আধিপত্যের প্রেক্ষিতে পশ্চিমের পন্ডিতরা তাদের অবস্থান থেকে মুসলিম সমাজকে বরাবর অনগ্রসর হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এই অনগ্রসরতার ধারণা রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিস্তারিত হয়েছিল। বান্না মুসলিম সমাজের এই অনগ্রসরতার সামাজিক দিক নিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এবং মুসলিম সমাজতত্ত্ব খাড়া করেছেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুসলিম মুসলিম মনস্তত্ত্ব তৈরী করেছেন। আধুনিকতার সংসর্গে মুসলিম সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে বান্নার আলোচনা অত্যন্ত আধুনিক এমনকি তার সময় থেকে অগ্রগামী। এই অগ্রগামীমনস্তত্ত্ব তৈরি করে তিনি মুসলিম সমাজকে ইউরোপীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যুগিয়েছেন। সম্ভবত বান্নার সাফল্য এখানেই।

www.pathagar.com

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Hasan al-Banna, Memoirs of Hasan al-Banna Shaheed. Karachi : International Islamaic Publishers, 1981.
২. Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers. New Work : Oxford University Press, 1969.
৩. Banna, Memoirs.
৪. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
৫. Banna, Memoirs.
৬. David Commins, 'Hasan al-Banna' in Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival. London : Zed Books Ltd., 1994.
৭. Banna, Memoirs.
৮. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. Karen Armstrong, The Battle for God. New York : The Random House Publishing Group, 2000.
১১. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. Edward Mortimer, Faith and Power : The Politics of Islam. London : Faber andFaber, 1982.
১৯. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
২০. Karen Armstrong, The Battle for God.
২১. Commins, 'Hasan al-Banna'.
২২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সাইয়েদ কুতুব

এক

একালের অন্যতম প্রধান ইসলামবিদ, মুসলিম মানসের পুনর্গঠনকামী চিন্তক ও বুদ্ধিজীবী সাইয়েদ কুতুবের ভাবনার জগত বিকশিত হয়েছে মূলতঃ ইসলামকে আশ্রয় করে। পশ্চিমের মানবতন্ত্রী ও সেকুলার দর্শনের বাইরে এসে এই বুদ্ধিজীবী মানবমুক্তির বিকল্প পথের তালাশ করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন আজকের দিনেও পশ্চিমকে বাদ দিয়ে মানবমুক্তির পথগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্ভব। মুসলিম দুনিয়ায় ঔপনিবেশিকতার ধাক্কা এবং মুসলিম ভূখন্ডগুলো নিয়ে আজও বর্তমান পশ্চিমের ছলচাতুরী বিশেষ করে পশ্চিমের জায়নিজম প্রীতি এই বুদ্ধিজীবীর চিন্তাভাবনা বিকাশের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

পশ্চিমের আগ্রাসনবাদী ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি একসময় মুসলিম দুনিয়াকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত, দূষিত ও বিকৃত করে দেয়। সেই প্রেক্ষিতে মুসলিম মানস ও চেতনা বড় রকমের হোঁচট খায়। সে বুঝতে পারে শুধু পশ্চিমের সামরিক শক্তি নয়, এর দার্শনিক ও ভাবগত প্রেরণাও মুসলিম চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তার সভ্যতার নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই নব চেতনাই আজকের মুসলমানকে পশ্চিমের মূল্যবোধ ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আশায় জাগিয়ে তুলেছে। সাইয়েদ কুতুব এই নবজাগ্রত মুসলিম মানসের মুখে ভাষা তুলে দিয়েছেন এবং পশ্চিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ভাবগত শৃঙ্খল মুছে ফেলার উপায় নির্দেশ করেছেন।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর পশ্চিমের তাত্ত্বিকরা প্রচার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার নৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রেরণা এসেছে সাইয়েদ কুতুবের লেখালেখি থেকে। এই সব তাত্ত্বিকদের খোলামেলা আলোচনায় যথেষ্ট চালাকি আছে, সত্য নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টের মতই এই সব তাত্ত্বিকরা বোধ হয় দুনিয়াটাকে 'ওরা' ও 'আমরা' এই দুই প্রজাতিতে ভাগ করে ফেলতে চাইছেন। মূলতঃ ব্যাপারটা সাদা ও কালোর বিভাজনের মত এত স্পষ্ট নয়। আমাদের বোঝা দরকার সাইয়েদ কুতুবের মত বুদ্ধিজীবীদের ভাবনার জগত গড়ে উঠেছে মুসলিম দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের আগ্রাসনবাদী তৎপরতার মুখে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক ও বৌদ্ধিক আগ্রাসনের সামনে মুসলিম শিবিরের ঐক্য, সংহতি ও বিকল্প নৈতিক বিবেচনা নিয়ে সাইয়েদ কুতুবের মত বুদ্ধিজীবীদের ভাবতে হয়েছিল। কুতুব যে সমস্যার সংগে যুঝেছিলেন তা হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রয়োজনে ইসলাম কিভাবে সাড়া দেবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত ইসলামী ধ্যান ধারণা আজকের দিনে কিভাবে কাজ করবে। তিনি অবশ্য দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন এর সামগ্রিক উত্তর ইসলামে পাওয়া যাবে। স্বভাবতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ বিশ্লেষণ না

www.pathagar.com

করে সাইয়েদ কুতুবের মত বুদ্ধিজীবীদের উপর আলোচনায় মতামত দিতে গেলে তার বুদ্ধিজীবিতার প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থেকে যায়।

দুই

সাইয়েদ কুতুবের জন্ম ১৯০৬ সালে, মিসরের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ আসয়ুতের এক ধর্মভীরু পরিবারে। নিজ গ্রামের ধর্মীয় বিদ্যালয়ে তার লেখাপড়ার শুরু। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি কোরআনে হাফেজ হন। কুতুবের জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল প্রবল, যা তার আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯২০ এ তিনি কায়রো আসেন। শিক্ষকতা পেশার প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে পাশ্চাত্য ধাঁচের দার-উল-উলুম কলেজে যোগ দেন যেখানে একসময় বিখ্যাত হাসানুল বান্নাও পড়াশুনা করতেন। এখানে অধ্যয়ন করার সময় কুতুব ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ১৯৩৩ এ এই কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর কুতুব মিসরীয় শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন ও শিক্ষা পরিদর্শকের চাকরি নেন।

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের কায়রো এক অস্থিরতা ও রূপান্তরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলছিল। সাইয়েদ কুতুবের প্রথম যৌবনের দিনগুলো এমন একটা সময়ের মধ্যে কাটে যখন একদিকে মিসরের রাজতন্ত্র এবং সেই রাজতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রী নাসেরের যুগে প্রবেশের একটা ব্যাপার ছিল অন্যদিকে ব্রিটিশের খবরদারী থেকে মিসরের স্বাধীনতা ও দেশটির ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে জনগণের প্রবল উৎকণ্ঠার মতো ঘটনাও ঘটে।

এ সময় কায়রোর শিল্প সাহিত্যের জগতে কুতুব সমালোচক ও লেখক হিসেবে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেন। কায়রোর এ জগতে তখন শিল্পী ও সাহিত্যিকের নান্দনিক পরিচয়ের বাইরে সামাজিক ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছিল এবং কুতুব ছিলেন এ বিতর্কের একটি অংশ। এটা এমন একটা প্রশ্ন ছিল যার সাথে জনগণের আত্মপরিচয় ও জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়টি জড়িত ছিল। ১৮৮০ সাল থেকেই মিসরে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা বিকশিত হয় এবং মিসর কেবল মিসরীয়দের বলে শ্লোগান ওঠে। কিন্তু এই নবচেতনা কি অর্থ বহন করে এবং ভবিষ্যতের মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করবে তাই ছিল দেখবার বিষয়। অনেকের কাছে তখন প্রতীয়মান হয় এই ধরনের জাতীয় আত্মপরিচয়কে নিশ্চিত করতে হলে মিশরীয় ইতিহাস ও সমাজের ভিতর থেকে ইসলামী ঐতিহ্য খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের অবস্থানের প্রয়োগ ও পদ্ধতি নিয়ে মতান্তর ছিল। কেউ মনে করেছিলেন এটা এক ধরনের সাংস্কৃতিক বাগড়ম্বর যা আসলে রাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। অনেকের পরামর্শ ছিল যারা মিসরীয় সমাজের ইসলামী চরিত্রকে গ্রহণ করেছেন তাদের উচিত শরীয়াহর ভিত্তিতে একটি ইসলামী সমাজ কাঠামো গড়ে তোলা। অন্যদের ধারণা ছিল ইসলামী জীবনদৃষ্টির বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি ভিন্ন ধরনের কাঠামো যা কিনা দেশের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক মানসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী ঐতিহ্য থেকে কোনভাবেই গ্রহণ করা যাবে না।

এ আলোচনায় কুতুবের ভূমিকা ছিল রীতিমত প্রাণদ, উত্তেজক ও আশাবাদী। তিনি অবশ্য মনে করতেন মিসরের সমস্যা তা সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন এটা বাইরে থেকে নয়, মিসরীয়দের সমাধান করতে হবে।

www.pathagar.com

এর জন্য দরকার এক রাজনৈতিক জাগরণ অথবা বিপ্লব। জনগণের মুক্তি যে অর্জনযোগ্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় সেটি অর্জিত হবে তা নিয়েই বিতর্ক চলছিল।

সাইয়েদ কুতুব এ বিতর্কে ইসলামী নৈতিকতাকে বুনিয়াদ করে সমস্যার সমাধান খুঁজতে শুরু করেন। এই পাটাতনে দাঁড়িয়েই তিনি মুসলিম সমাজের রোগ ও তার অবক্ষয়গুলো খোঁজার চেষ্টা করেন। এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কারের ভাবনাও তিনি শুরু করেন। বিশেষ করে তিনি যত বেশি করে মুসলিম উম্মাহ ও এর নৈতিক ভিত্তিমূল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন ততই এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তিনি উদ্বেগাকুল হয়ে উঠছিলেন কেননা এর নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাকে ভাবতে হয়েছিল। একজন মিসরীয় হিসেবে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বিশেষ করে এর স্বরূপকে নিপুণভাবে চিহ্নিত করতে তার দেরি হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসকালে কুতুব পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতরের চেহারা দেখতে পান এবং তার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় পশ্চিমের ধনবাদী, জড়বাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সেকুলার সভ্যতার বহুমুখী ও ভয়াবহ ধ্বংসকামিতার একটি রূপই হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার লেখালেখির ধরনই পাল্টে যায়। ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি উম্মাহর কল্যাণ ভাবনার উপর একদিকে তিনি যেমন জোর দেন তেমনি পশ্চিমী সভ্যতার নৈতিক ভিত্তিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন।

ইতোপূর্বে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কুতুবকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে সেখানে পাঠায়। ১৯৪৮ থেকে ৫০ পর্যন্ত কুতুব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন। সেখানকার উইলসন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রথমে পড়াশুনা করেন। পরবর্তীকালে নর্দার্ণ কলারোডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিক্ষার উপর এম.এ ডিগ্রি নেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয়ের ব্যাপারে তিনি বরাবরই আশাবাদী ছিলেন। এসব কথা তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমনের পূর্বে তার বিখ্যাত বই 'আল আদালাহ আল ইজতিমাইয়াহ ফি আল ইসলাম'-'ইসলামে সামাজিক সুবিচার গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তারপরেও কোন কোন বুদ্ধিজীবী বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালেই পশ্চিমের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনায় তার মোহভঙ্গ হয়। গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ হয়েও প্রথমদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সবকিছুকেই তিনি বর্জন করতে চাননি। কিন্তু মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে পশ্চিমের সন্তানদের আগ্রাসী তৎপরতা, পরবর্তীতে নাসেরের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আড়ালে দমনমূলক ব্যবস্থা তার সামনে পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্বল ও ভঙ্গুর নৈতিক ভিত্তির মুখোশ তুলে ধরে। তিনি এর মধ্যে মানবমুক্তির আর কোন পথ থাকতে পারে বলে আশ্বস্ত হননি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর তিনি সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন The America I have Seen। এখানে তিনি সেখানকার অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জাগরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন কিন্তু এর নৈতিক দেউলিয়াপনায় তিনি মর্মাহত হন। তার ভাষায় ঃ

.... abysmally primitive in the world of the senses, feelings and behaviour।[১]

www.pathagar.com

তিনি দেখলেন শুদ্ধতা ও নৈতিকতার মূল্য এখানে পুরোপুরি বর্জিত। সাইয়েদ কুতুবের দেশে ফেরার সাথে সাথে মিসরের রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে যার পথ ধরে ১৯৫২ সালের জুলাইতে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। এ সময় থেকেই কুতুবের লেখালেখি আরো বেশি করে রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যযুক্ত হয়ে ওঠে। তিনি ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যেই মানবমুক্তির সন্ধান পেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন এবং এই নির্দিষ্ট পাটাতনে দাঁড়িয়ে তিনি যেমন মিসরীয় সমাজের ব্যাধিগুলো চিহ্নিত করেন পাশাপাশি তার প্রতিকারের উপায়গুলো নির্দেশ করেন। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য বই ইসলামে সামাজিক সুবিচার (আল আদালাহ আল ইজতিমাইয়া ফি আল ইসলাম) থেকে শুরু করে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব (মা আরাকাত আল ইসলাম ওয়াল রাসমালিয়াহ), বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম (আল সালাম আল আলমি ওয়াল ইসলাম) প্রভৃতি পুস্তকে আজকের পৃথিবীর সমস্যা নিরসনে জীবন দর্শন হিসেবে ইললামের সক্ষমতা ও যথার্থতার কথা জোরেশোরে তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন আজকের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রকৃত উত্তর হচ্ছে ইসলাম এবং এই ব্যবস্থার সাহায্যে সর্বত্র একটি ভারসাম্যমূলক ও সংহত সমাজ কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

এটা বিশ্বাস করা সংগত কুতুবের চিন্তাভাবনা ও বিপ্লবী আদর্শবাদ সহজাতভাবেই তাকে হাসানুল বান্না প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলেমুনে (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, ইংরেজিতে Muslim Brotherhood) যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর তিনি তাই করেছিলেন। তিনি এটিকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক পুনর্গঠনের চেষ্টায় নিবেদিত একটি দল হিসেবে দেখেছিলেন। বিশেষ করে দলটির কর্মীদের ফিলিস্তিন যুদ্ধের সময় ও পরবর্তীতে সুয়েজ খালে ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে তৎপরতা তার নজর কাড়ে। তার কাছে মনে হয় এটি হচ্ছে সেই ধরনের দল যার লক্ষ্য ঃ

.. .. .. a true Islamic vision, combined with an intent and a capacity to make that vision a practical reality.[২]

ইখওয়ানুল মুসলেমুনে যোগ দেয়ার পর তিনি দলটির দাওয়াহ (প্রচার ও প্রকাশনা) বিভাগের দায়িত্ব পান এবং দলের সাপ্তাহিকের সম্পাদকের দায়িত্বও নেন। কুতুবের মত বুদ্ধিজীবীর জন্য এটা ছিল যথার্থ স্থান এবং নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত তিনি দলটির প্রধান মুখপত্রে পরিণত হন।

১৯২৮ সালে ইখওয়ানুল মুসলেমুন প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসী তৎপরতার প্রেক্ষাপটেই দলটির জন্ম। দলটির প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না ও অন্যান্য নেতারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিসরে যে সমস্যা তৈরি করেছে তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। ব্রিটিশ আশীর্বাদপুষ্ট মিসরের সেকুলার রাজতন্ত্র, ইখওয়ানুল মুসলেমুনের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে পড়ে। এটিকে তারা হুমকি মনে করতে শুরু করে এবং পরিশেষে তাদের গুপ্ত বাহিনী দিয়ে হাসানুল বান্নাকে হত্যা করে। বান্নার ইন্তেকালের পর সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ানুল মুসলেমুনের প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে আবির্ভূত হন। এই সময় মিসরে সাম্রাজ্যবাদের শিখন্ডী রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের জনপ্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি জামাল আবদুল নাসেরের নেতৃত্বে আরব জাতীয়তাবাদী দলটিও রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে। ইখওয়ানুল মুসলেমুন ও নাসেরের দলের চিন্তাভাবনার পার্থক্য সত্ত্বেও কৌশলগত

www.pathagar.com

কারণে তারা রাজতন্ত্রের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এটা সত্য নাসের ও তার সহযোগীরা ইখওয়ানুল মুসলেমুনের চিন্তাভাবনা প্রসূত সামাজিক সুবিচার ও সংস্কারের ব্যাপারে অনেকখানি সহমত পোষণ করেছিলেন যদিও তারা ইসলামী নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হতে চাননি। আবার তারা ইখওয়ানুল মুসলেমুনের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সম্ভবত নাসের ও তার সহযোগীরা তাৎক্ষণিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে অন্তত তাই মনে হয়। যাই হোক এই প্রক্রিয়ায় কুতুব ইখওয়ানুল মুসলেমুন ও নাসেরের ফ্রি অফিসারদের ভিতরে অনেকখানি দূতিয়ালির কাজ করেন এবং বলার অপেক্ষা রাখে না ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সহযোগিতায় নাসের রাজতন্ত্রের উৎখাত করেন। অনেকের ধারণা হয়েছিল নাসেরের সাথে মিত্রতার সূত্রে ইখওয়ানুল মুসলেমুন নতুন সরকারে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নেবে বিশেষ করে কুতুবের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হবে। কিন্তু নাসের সেটি না করে ইখওয়ানুল মুসলেমুনকে তার নিজের ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তার পূর্বতন ইসলামী মিত্রের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ান। ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল মুসলেমুনকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং নাসেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কুতুব ও তার সহযোগীদের কারাগারে ঢুকানো হয়। এই ভাবে নাসের তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের শক্তিকে ভেঙ্গেচুরে দেয়ার চেষ্টা করেন। কুতুবকে সরকারবিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ১০ বছর তিনি জেলে বন্দী ছিলেন। বন্দীশালায় তার উপর নির্মম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলে ও তার দুর্বল শরীর আরো দুর্বলতর হয়ে পড়ে। বন্দীশালায় ইখওয়ানুল মুসলেমুনের অনেক সদস্যদের উপর নৃশংস নির্যাতন ও এদের অনেককে মেরে ফেলার ঘটনাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এরকম ব্যক্তিগত দুর্দশা ও আটক অবস্থায় বন্দীশালায় বসে কুতুব তার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো লেখেন, যার জন্য তিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এটা সত্য বন্দীদশায় তার লেখালেখির উপর কড়া নজরদারি ছিল। কিন্তু এটি তার সৃষ্টিশীলতাকে আটকাতে পারেনি। উল্টো তিনি এক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য তার লেখালেখিতে উদাত্ত আহবান জানিয়ে গেছেন। বলা চলে এই সময় ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কুতুবের চিন্তাভাবনার একটি পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায় যা তার বিখ্যাত বই 'মা আলিম ফি আল তারি'কে (মাইলফলক - ইংরেজিতে Milestones) বিশদ বিবৃত হয়েছে। বইটি আরব জগতে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই বইটির বিষয়বস্তুকেই নাসের সরকার কুতুবকে ফাঁসি দেয়ার পক্ষে অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করায়। কুতুবের 'মাইলফলক' হচ্ছে তার রাজনৈতিক দর্শনের বয়ান যার মোদ্দা কথা হচ্ছে সব রকমের পার্থিব সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাতে। বইয়ের এই আহ্বান নাসের সরকারের অস্তিত্ব ধরে টান দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুতুবকে পুনরায় ১৯৬৫ সালে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৬ সালে নাসেরের বিশেষ আগ্রহে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কুতুব মুসলিম মানসে স্থায়ী আসন করে নেন, তিনি শহীদের মর্যাদা পান। তার রচনাবলী নিয়ে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং তার চিন্তাভাবনা বিভিন্ন দেশের মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে প্রভাব ফেলে। কুতুবের রাজনৈতিক ভাবাশ্রিত দর্শনের প্রভাব এত ব্যাপক হওয়ার কারণ তিনি কয়েক দশক আগেই তখনকার দুই পরাশক্তি

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দার্শনিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মুসলিম দুনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী তৎপরতা একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে কুতুবের পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা মার্কিন হানাদারীর বিপরীতে নির্যাতিত মুসলমানদের বড় রকমের ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে।

কুতুবের মাইলফলক মূলতঃ বন্দীদশায় তিনি কুরআন শরীফের যে কালোত্তীর্ণ তফসীর - ফি জিলাল আল কুরআন (কুরআনের ছায়াতলে- ইংরোজিতে In the Shade of the Quran) রচনা করেন তার সারাৎসার।

আজকের মুসলিম দুনিয়ায় এই তফসীরের ভাগ্যে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ ঘটেছে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি এই তফসীরটি লেখেন, সংশোধন করেন এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। বন্দীদশায় তার একান্ত মনের আবেগ ও অনুভূতিগুলোও তফসীরের ভিতর দৃশ্যমান। কুতুবের অনেক সমালোচকরা বলেন দীর্ঘ ও কষ্টকর কারাবাসী জীবনে এই তফসীরের ভিতর দিয়ে তিনি একটি প্রান্তিক ও মৌলবাদী অবস্থান নিয়ে নেন। বোঝা দরকার কুতুবের এই অবস্থান একটি দার্শনিক ও ভাবগত অবস্থান। কুতুব পার্থিব জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি কিন্তু চিরায়ত ও শাশ্বত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকেও অবধারিত মনে করেছেন। কুতুব পশ্চিমের জড়বাদী, মানবতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোর সমালোচনা করেছেন কিন্তু কখনোই পশ্চিমের জনগণকে নয়। বৈদগ্ধের অধিকারী কুতুব মনে করেছিলেন পশ্চিমের দর্শন ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতিকারক ও আগ্রাসী দিকগুলোকে প্রতিহত করতে না পারলে বিশ্বজুড়ে সমতা, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ ফিরে আসবে না। সেই প্রেক্ষিতেই কুতুব বিকল্প অবস্থানের কথা ভেবেছেন। বিকল্প মুক্তির সন্ধান করা কিংবা পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা মানে প্রান্তিক অবস্থান নেয়া নয় মোটেই।

এই বিকল্প দার্শনিক অবস্থানকে সামনে রেখে কুতুব আরো কয়েকটি বই লেখেন যেখানে তিনি জীবন দর্শন হিসেবে ইসলামের স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেন এবং অন্যান্য বিশ্বাস ও মানবসৃষ্ট মতবাদ ও পথ-পদ্ধতির বিপরীতে জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলামের বলিষ্ঠ ভূমিকাকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। বইগুলো হচ্ছে ঃ হাজা আল দ্বীন (এই আমাদের ধর্ম, ইংরেজীতে This Religion), আল মুসতাকবাল লি হাজা আল দ্বীন (আগামী দিনের জীবন বিধান, ইংরেজিতে The Future Belongs to this Religion), খাসাইস আল তাসাব্বুর আল ইসলামী ওয়া মুকাওয়ামাতুহু (ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ, ইংরেজিতে The Characteristics and Values of the Islamic Vision) ও আল ইসলাম ওয়া মুশকিলাত আল হাজারাহ্ (ইসলাম ও সভ্যতার সংকট, ইংরেজিতে Islam and the Problems of Civilization)।

তিন

কুতুব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলেছেন 'জাহিলিয়া'। পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও মানবতন্ত্রী দর্শনের বিপরীতে তিনি যে ভাববাদী দর্শনের বিকল্প হাজির করেছিলেন তার মূল কেন্দ্রে আছে এই জাহিলিয়ার ধারণা। পাশ্চাত্যের মানবতন্ত্রী দর্শনের মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর কিংবা কোন দৈব শক্তি নয়, মানুষই হবে মানুষের নিয়ন্ত্রক। সে তার নিজের চিন্তা, বুদ্ধি ও

www.pathagar.com

বিবেককে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে তার সভ্যতার প্রসার ঘটাবে। অন্যদিকে কুতুব তার জাহিলিয়া তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এই মত প্রচার করলেন যারা বা যে সভ্যতা মানুষের উপর খোদায়ী কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না কিংবা খোদার দেয়া বিধি বিধান অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিচালনা করে না তারাই 'জাহিলিয়ার' সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত। সেই হিসেবে কুতুবের বিবেচনায় পাশ্চাত্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তৎকালীন নাসের সরকার বা যে কোন সরকার যারাই খোদায়ী কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এবং মানব রচিত মতবাদকে অনুসরণ করে তারাই জাহিলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কুতুবের এই জাহিলিয়া তত্ত্ব মূলতঃ ভাববাদী দর্শনের একটি প্রকল্প যার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ বারবার পথ হারিয়েছে। আল্লাহর বিধি বিধান থেকে যতবার মানুষ দূরে সরে গেছে, পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সে যতবার নিজ কর্তৃত্বে নিতে চেয়েছে, তাকে হেদায়েত করবার জন্য আল্লাহ ততবার তার নিজের বাণীসহ হেদায়েতকারী পাঠিয়েছেন। এই হেদায়েতকারীদের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শোয়েব, মুসা, ঈসার মত নবীরা। প্রত্যেক নবী তার নিজ জনগণের জন্য একটি মাত্রই পরামর্শ দিয়েছেন তা হলো খোদায়ী বিধি বিধানের আওতায় সামগ্রিক জীবনকে পরিচালনা করা। একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে কুতুব মনে করতেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ছিলেন শেষতম বাণীবাহক ও হেদায়েতকারী, যিনি মানবজাতির জন্য আল্লাহর বাণী কুরআন শরীফ নিয়ে এসেছিলেন। আজকের দিনে কুরআনের নীতির আওতায় জীবন পরিচালনাই হবে মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য। এর থেকে বিচ্যুত হলেই তারা জাহিলিয়ার খপ্পরে পড়বে। কুতুব জাহিলিয়াকে নিছক প্রাক ইসলামী ইতিহাসের ঘটনা মনে করেননি। তার ভাষায় ঃ

Jahiliyya is not a period in time, it is a condition that is repeated every time society veers from the Islamic way, whether in the past, the present, or the future.[৩]

জাহিলিয়ার ধারাবাহিকতা অতীতের মত বর্তমানেও প্রবাহিত। সেই হিসেবে আজকের দিনের জাতীয়তাবাদ (যা রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত মূল্য দেয়), কমিউনিজম (নাস্তিক্য) ও গণতন্ত্র (যেখানে জনগণ খোদার সার্বভৌমত্বের জায়গা দখল করে) জাহিলিয়ার পূজা করে। এটা নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার সমতুল্য। কুতুব মনে করেন একালের পাশ্চাত্যে বা মিসরে যে জাহিলিয়া চলছে তা রসুলের যুগের জাহিলিয়ার চেয়েও ভয়াবহ কারণ এটি 'অজ্ঞতা প্রসূত' নয়। এটি হচ্ছে খোদার বিরুদ্ধে এক নীতিগত বিদ্রোহ (Principled Rebellion)।

কুতুব এ যুগের মানুষ ছিলেন। যুক্তি ও বিজ্ঞানের মূল্য তিনি অস্বীকার করেননি কিন্তু সত্যে পৌঁছানোর জন্য এটি আবার তিনি চূড়ান্তও বিবেচনা করেননি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যতই যুক্তিশীল হোক না কেন, তিনি লিখেছেন ঃ

.. .. .. it is constantly swimming 'in the sea of the unknown'. All philosophical and scientific developments certainly constituted progress of a sort, but they were simply glimpses of permanent laws, as superficial as the waves in a vast ocean; they do not change the currents, being regulated by constant natural factors.[৪]

www.pathagar.com

আজকের যুক্তিবাদী দর্শন যেখানে পার্থিবতার উপর জোর দিয়েছে সেখানে কুতুবের চিন্তা পার্থিবতাকে এক চিরায়ত, শাশ্বত সত্যের সাথে যুক্ত করেছে এবং সময় ও পরিবর্তনের বাইরে নিয়ে গিয়ে পার্থিবতাকে এক শাশ্বত সত্যের প্রতিফলন হিসেবে দেখতে চেয়েছে। কুতুবের চিন্তার এই মৌল দিকটি না ধরতে পারলে তার জাহিলিয়া তত্ত্বের স্বরূপ বোঝা সম্ভবপর হবে না।

কুতুব তাই যুক্তি দিয়েছেন আধুনিককালের রাষ্ট্র, সরকার ব্যবস্থা, আইনসমূহ প্রভৃতি মানুষের চিন্তা প্রসূত ও তার হাতে নির্মিত যার আনুগত্য হচ্ছে জাহিলিয়া এবং ইসলামী পরিভাষায় এটি শিরকের সমতুল্য। কেননা এই নীতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিমানতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে (mockery of the omnipotence of God)। এর মানে হলো আল্লাহ্ পার্থিব জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। ধর্ম যদি জীবন ও সমাজের আংশিক মাত্র নিয়ন্ত্রণ করে, পুরোটা নয়, তাহলে এটি বিভাজিত হয়ে যাবে এবং পূর্ণ সত্যকে ধারণ করবে না। ধর্মের এই আংশিক ভূমিকা ধর্মের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না, যার লক্ষ্য কিনা কুতুবের ভাষায় ঃ A working contact between mankind and Divine reality that allows men to create harmony, not division, between belief and practice.[৫]

কুতুব তার এই ভাববাদী দর্শনকে বলেছেন মানবমুক্তি ও স্বাধীনতার দর্শন। কারণ এই দর্শন মানুষকে অন্য মানুষের শাসন-শৃঙ্খল ও অন্য মানুষের হাতে তৈরি নিয়ম থেকে তাকে মুক্ত করবে। রেনেসাঁর সময় ইউরোপে স্বাধীনতা বলতে অর্থ করা হয়েছিল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির, সৃষ্টিকর্তা বা অন্য যে কোন অপার্থিব শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভ ঘটবে। একে তখন বলা হয়েছিল মানুষের চিন্তার সেকুলারাইজেশন। কুতুব ইউরোপের এই মানবতন্ত্রী দর্শনের একটি Counter-culture বা Counter-philosophy খাঁড়া করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হবে খোদায়ী নীতি-নিয়ম, ব্যবস্থা ও আইনপদ্ধতির আনুগত্য গ্রহণের ভিতর দিয়ে। তার ভাষায় ঃ

A universal declaration of human liberation on earth from bondage to other men or to human desires .. .. .. To declare God's sovereignty means : the comprehensive revolution against human governance in all its perceptions, forms, systems and conditions and the total defiance against every condition in which human beings are sovereign.[৬]

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে কুতুব যখন তার এই জাহিলিয়া ও স্বাধীনতা তত্ত্বের রূপদান করছিলেন তখন তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন মওলানা মওদুদীর চিন্তাভাবনা দ্বারা। ৫০ এর দশকে কুতুবই মওদুদীর লেখাপত্র আরব জগতে বিশেষ করে মিসরে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। মওলানা মওদুদীর চিন্তাভাবনাও গড়ে উঠেছে আজকের অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মত আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণাকে ঘিরে যা কিনা আজকের মানবতন্ত্রী দর্শনের মূল্যবোধের বিপরীত। যেহেতু আল্লাহই মানবীয় সব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও একমাত্র আইনপ্রণয়নকারী। সুতরাং মানুষের তার নিজের জন্য আইন বানাবার কোন অধিকার নেই। এই ভাবে মওলানা মওদুদী আজকের সেকুলার

www.pathagar.com

দর্শনজাত মানবীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণাকে পুরোপুরি নাড়িয়ে দিয়েছেন। তার ভাষায় ঃ

It is neither for us to decide the aim and purpose of our existence nor to prescribe the limits of our worldly authority, nor is anyone else entitled to make these decisions for us .. .. .. Nothing can claim sovereignty, be it a human being, a family, a class, or a group of people, or even the human race in the world as a whole. God alone is the Sovereign and His Commandments the Law of Islam.[৭]

সাইয়েদ কুতুবের চিন্তার বিকাশে মওলানা মওদুদীর প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে মওদুদীর মত কুতুব খুব খোলামেলা করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে তার জাহিলিয়া তত্ত্বকে ঘিরে এই সমালোচনা একটি একাডেমিক ভিত্তি অর্জন করেছে। এই সমালোচনাগুলোকে এখন একত্র করে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

১. কুতুব ধর্মকে, সেই হিসেবে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা কিনা পাশ্চাত্য সভ্যতার চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছেন পাশ্চাত্যই একমাত্র সভ্যতা যারা কিনা ধর্ম ও সমাজ এবং বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে বিভাজনের নীতি প্রবর্তন করেছে। পাশ্চাত্যের নানামুখী প্রভাবের কারণেই পৃথিবীর বহু সমাজে আজ ধর্মকে কার্যকর ভূমিকা থেকে সরিয়ে প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিভাজন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একটি নৈতিক দেউলিয়াপনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

২. পশ্চিমের মূল্যবোধকে সাধারণতঃ উদার গণতান্ত্রিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, সুশাসন, নারী অধিকার প্রভৃতি এই মূল্যবোধের অংশ। কুতুব এই মূল্যবোধকে বলেছেন জাহিলিয়ার দর্শনের একটি বিকৃত রূপ। তার মতে পাশ্চাত্য বিশ্বাসকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে এবং খোদার নীতিকে সামাজিক ব্যবস্থার চালক হিসেবে গ্রহণ না করে পুরো সমাজকে একটি জড়বাদী জীবন ধারার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কুতুবের জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সমালোচনা ঠিক কমিউনিস্টদের পুঁজিবাদের সমালোচনার মত নয়। তিনি কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী উভয়কেই জড়বাদী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তার এই দাবির ভিত্তি হচ্ছে উভয়েই মানুষের আধ্যাত্মিক অংশকে জড়বাদী অংশের সাথে মেলাতে ব্যর্থ হয়েছে। কুতুবের যুক্তি হলো বিশ্বাস ছাড়া সমাজ পরিচালিত হয় শারীরিক ও বস্তুগত চাহিদার ভিত্তিতে। প্রকৃত অর্থে কুতুব পাশ্চাত্যের যে দার্শনিক ভিত্তিকে সমালোচনা করেছেন তার বুনিয়াদ হচ্ছে প্রকৃতিকে জড়বাদীর চোখে দেখা। পাশ্চাত্যের কথা হলো মানুষের যুক্তির বোধই তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। মানব সমাজ টিকে আছে মানুষের যুক্তিশীলতা এবং সেই যুক্তি কিভাবে তার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তার উপর। কুতুব মনে করেন ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধারণা জাহিলিয়ার সমতুল্য। তার কথা হলো মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে বলেই সে অন্য কারো মত নয়। মানুষের মধ্যে যুক্তিশীলতা আছে সত্য কিন্তু এই গুণ তার শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ মানুষকে যুক্তিশীলতা দিয়েছেন যাতে সে বিশ্বাসী হতে পারে এবং এটি দিয়ে খোদায়ী বিধি বিধানকে যথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারে। পাশ্চাত্য এই মানবীয়

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যকে খোদাদ্রোহের কাজে ব্যবহার করেছে। খোদায়ী বিধানকে বাদ দিয়ে যুক্তির উপর শুধুমাত্র নির্ভরশীলতা ইসলাম অনুমোদন করে না।

৩. পাশ্চাত্যের নৈতিক পদস্খলনের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে এর বাস্তববাদী দর্শন (Philosophical Pragmatism)। পাশ্চাত্যের ভাবুকদের মতে যে কোন কাজই সিদ্ধ হতে পারে তার বস্তুগত ফলাফলের ভিত্তিতে। নৈতিক ফলাফল এর বিবেচ্য বিষয় নয়। কুতুব যুক্তি দিয়েছেন প্রাচীন রোমানদের ঐতিহ্য আত্মস্থ করে নেয়ার পর পাশ্চাত্য এই গুণটি পেয়েছে। রোমানরা মনে করতো নিজের দেশের স্বার্থে কিংবা গৌরবের প্রয়োজনে জীবন থেকে শুরু করে ভূখন্ড, সম্পত্তি সবকিছুই দখল কিংবা শোষণ করা সিদ্ধ। এই নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন বিচার বিবেচনা আজ পাশ্চাত্যকে বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনে তাড়া করে ফিরছে ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কুতুব কিন্তু বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের বিপক্ষে নন। কিন্তু তিনি মনে করেন এই সমৃদ্ধি হতে হবে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালনের স্বার্থে এবং ইসলামী নৈতিকতার আওতার মধ্যে থেকে।

৪. কুতুব পাশ্চাত্যকে তার বস্তুবাদী চরিত্রের কারণে পাশবিক চরিত্র সম্পন্ন বলেছেন। কেননা এটি মানবীয় মর্যাদাকে পশুর স্তরের উপরে নিতে পারে নি। পশুরা যেমন নিজেদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে নির্ভর করে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে পাশ্চাত্যও তাই করে। কুতুব পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থা, যৌনতা, পুঁজিবাদ, স্বাধীনতা প্রভৃতিকেও পাশবিক মূল্যবোধের সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। বিশেষ করে তিনি পাশ্চাত্যের নারী যেভাবে ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহৃত হয় তাকে পাশবিকতার উত্তম নমুনা হিসেবে হাজির করেছেন।

৫. কুতুব পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন কেননা এটি বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে। কুতুবের পুঁজিবাদের সমালোচনা ঠিক কমিউনিস্টদের মত নয়। এটিকে দেখতে হবে ইসলামী নৈতিকতার চৌহদ্দীতে। সম্পদ নিয়ে ইসলামের ব্যাখ্যাটা হলো বিশ্বজগতের সবকিছুর মালিক যেহেতু আল্লাহ সে কারণে সম্পত্তির ব্যবহারে ব্যক্তিগত লাভালাভের চেয়ে উম্মাহর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া চাই। কুতুব অবশ্য পশ্চিমের মুক্তবাজার ও সুদী অর্থনীতির সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তার কথা হলো অন্যান্য বিষয়ের মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকেও আল্লাহর আইনের আওতায় আনতে হবে।

৬. কুতুব পাশ্চাত্যের স্বাধীনতার ধারণাকেও পাশবিকতার সাথে তুলনা করেছেন। সেখানে উদার গণতন্ত্রী ব্যবস্থাপনা ও স্বশাসনের ব্যবস্থা থাকলেও কুতুব পশ্চিমের মানুষকে মুক্ত বলতে ইচ্ছুক নন। কারণ সেখানকার মানুষ নিজের রিপুর যেমন দাস তেমনি অন্যেরও দাস। নিজের রিপুর দাস এই অর্থে স্বশাসনের মাধ্যমে নিজের জন্য ইচ্ছামতো সে আইন বানানোর দায়িত্ব নিয়েছে যা খোদায়ী আইনকে গ্রাহ্য করেনি। সে অন্যের দাস এই অর্থে সে মানুষ রচিত আইনের গোলামী করছে। সে আল্লাহর আইনের আওতায় আসতে পারছে না। আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক মানুষকে অন্য মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। মানুষের যুক্তিশীলতার যেহেতু সীমাবদ্ধতা আছে তাই এর পক্ষে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আল্লাহর আইন, যাকে শরীয়াহ বলা হচ্ছে, এমন এক ধরনের উচ্চতর আইন যা মানুষ ও তার সমাজকে এক ঐকতানের মধ্যে চালাতে পারবে ও তার প্রয়োজনের যথাযথ উত্তর দিতে পারবে।

কুতুবের মত হলো পাশ্চাত্যের জাহিলিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করে, মানুষের আধ্যাত্মিকতাকে নষ্ট করে পৃথিবীব্যাপী দুঃখ, কষ্ট, ধ্বংস, বিপর্যয় ও প্রাণের এক সংকট সৃষ্টি করেছে। এই সংকট উত্তরণে ইসলামকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থানকে তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ঃ

Islam can not accept any compromise with jahiliyyah, either in its concept or in the modes of living derived from this concept. Either Islam will remain, or jahiliyyah; Islam can not accept or agree to a situation which is half-Islam and half-jahiliyyah. In this respect Islam's stand is very clear. It says that truth is one and can not be divided; if it is not truth, then it must be falsehood .. .. .. Command belongs to Allah or else to jahiliyya. The Shariah of Allah will prevail, or else peoples desires.[৮]

চার

অনেকের ধারণা সাইয়েদ কুতুব একালের মুসলমানদের কল্পনার সামনে জিহাদের একটি গৌরবময় ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছেন এবং এটিকে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে বরাবরের মতো তিনি মওলানা মওদুদীর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কুতুবের সমালোচকরা বলেছেন এটি করতে গিয়ে তিনি ইসলামের নবীর জীবন সাধনার ধারা থেকে সরে এসেছেন। এদের কথা হলো সুন্নী দুনিয়ায় ইসলামী মৌলবাদের তিনিই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বত্র ইসলামী জঙ্গীরা তার মতবাদকে নির্ভর করে তাদের কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। প্রকৃত সত্য হলো এই ধরনের বিশ্লেষণ যারা করেছেন তারা ঘটনার গভীরে পৌঁছতে পারেননি এবং এর দ্বারা তাদের চিন্তার দৈন্যতাই ধরা পড়েছে। আজকের দিনে উদ্ভূত ইসলামী মৌলবাদ কোন মধ্যযুগীয় ঘটনা নয়, এটি আমাদের বর্তমান সমাজ-পরিবেশ উদ্ভূত একটি ঘটনা এবং বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ায় এটি হচ্ছে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ও সেকুলারবাদী তৎপরতার প্রতিক্রিয়াজাত ঘটনা। সাইয়েদ কুতুব যখন তার চিন্তাভাবনাগুলোকে বিন্যস্ত করছেন তখন তার অবচেতন মনে কাজ করেছিল কিভাবে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, যাকে তিনি বলেছেন জাহিলিয়া, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোকে দূষিত, বিকৃত ও বিধ্বস্ত করে গেছে। সাইয়েদ কুতুব জিহাদের নীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানের বিপর্যয়কে শক্তিতে পরিণত করেছেন এবং জিহাদের সাহায্যে জাহিলিয়া থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন।

আঠার-উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের কাল থেকে শুরু করে আজতক পশ্চিমের ভাবুক ও রাষ্ট্রনীতিকরা মুসলিম ভূখণ্ডে তাদের পরিচালিত 'ত্রাসনীতিকে' উদারনৈতিকতা হিসেবে জায়েজ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই 'ত্রাসনীতির' বদলা নিতে যখন প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন তাকে তড়িঘড়ি করে সন্ত্রাস বলে ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে। কুতুবের সেই সব নিষ্ঠুর সমালোচকরা যারা তাকে 'সন্ত্রাসের দার্শনিক' বলেছেন

www.pathagar.com

তারা পশ্চিমের এই দুমুখো নীতিকে বিবেচনার মধ্যে নেননি।

জিহাদ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।

আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (সুরা : ৪, আয়াত : ৭৪-৭৫)[৯]

কুতুব কুরআনে উদ্ধৃত এই জুলুম সম্পর্কে বলেছেন এটি হচ্ছে জাহিলী সমাজ কর্তৃক আরোপিত জুলুম। যেহেতু জাহিলী সমাজ খোদায়ী নীতি থেকে দূরে সরে এসেছে এবং মানবতার উপর তার ব্যবস্থাদি দ্বারা জুলুম চাপিয়ে দিয়েছে সুতরাং এটির পরিবর্তন জরুরী। কুতুবের কথা হলো জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ধরনের অবিচারমূলক ব্যবস্থাকে অপসারণ করে সেখানে খোদার নীতিকে পুনর্বহাল করা। কুতুব মনে করেন এই সমাজ খোদায়ী আইন (শরীয়াহ) এবং কুরআনের আধ্যাত্মিক নীতির আওতায় পরিচালিত হবে। কুতুবের ভাষায় জিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে জাহিলিয়ার আওতায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। কুতুবের দাবি মানুষ আল্লাহর আইনের আওতায়ই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐশী তত্ত্বাবধানে আসতে পারবে না ততক্ষণ সে নিজ রিপু ও ইচ্ছার কাছে বন্দী হয়ে থাকবে। কুতুব জিহাদের বিশ্বজনীনতাকেও তুলে ধরেছেন। কারণ তিনি মনে করেন সব মানুষই মুক্ত হতে চায় এবং সমগ্র মানব প্রজাতি জাহিলিয়াকে নির্মূল করে খোদায়ী নীতির আওতায় আসবে। মূলতঃ কুতুব জেহাদকে সর্বজনীন ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে শুধু মুসলমান নয় ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ইসলামকে বিকল্প ব্যবস্থা বা সভ্যতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

এখন কথা হলো জিহাদের এই মর্মবাণীকে, ইসলামকে সামাজিক ব্যবস্থার নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠার উপায় কি এবং মানুষ কিভাবে এবং কি পদ্ধতিতে সেই আহবানে সাড়া দেবে। কুতুবের চিন্তাভাবনা বুঝতে গিয়ে আমরা একালের আর এক প্রধান ইসলামবিদ আয়াতুল্লাহ খোমেনীর চিন্তাভাবনাকে মিলিয়ে দেখতে পারি। খোমেনী মনে করতেন জিহাদ শুরু হওয়া উচিত 'সর্বোত্তম জিহাদের' (জিহাদ-উল-আকবর) মাধ্যমে যার অর্থ হলো ব্যক্তির আত্মার পরিশুদ্ধি। একজন মুসলমানকে বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হলে প্রথমে তাকে এই দুনিয়ার প্রতি বস্তুগত আকর্ষণ বা মোহ ত্যাগ করতে হবে। তার মানে খোমেনীর মত হলো আগে ভিতরের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ চাই, তারপরে বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ সম্ভব।

অন্যদিকে কুতুব ইমাম খোমেনীর ব্যাখ্যাত জিহাদের কৌশলের পথে না গিয়ে মওলানা মওদুদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন মনে হয়। কুতুব ও মওদুদী দুজনেই মনে করেন অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য আগে বাইরের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। মানুষের মন বাইরের পরিবেশের সাথে এত গভীরভাবে যুক্ত এবং পরিবেশের দ্বারা

www.pathagar.com

প্রভাবিত যে বাইরের জগত পরিষ্কৃত না হলে অন্তরের পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। কুতুব মনে করেন সমাজ পুরোপুরি ইসলামী হয়ে উঠলে তবেই every good value becomes well established and begins to yield fruit.[১০]

এর মানে সমাজে ইসলামের প্রভাব থাকলে তবেই যাবতীয় অব্যবস্থাদি ও অপরাধ নির্মূল হয়ে যাবে এবং মুসলমানরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। জিহাদ এই পরিবেশ তৈরিতে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে বিশেষ করে কুতুব মনে করেন জিহাদ জাহিলী প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃত্বকে প্রতিরোধ করে যা কিনা মানুষকে সকল রকমের বিকৃত চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসকে লালন করতে বাধ্য করে। সুতরাং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক সকল প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে জিহাদ হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য।

কুতুব জাহিলী প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বললেও ব্যক্তির বিরূদ্ধে জিহাদের কথা বলেননি। জাহিলী প্রতিষ্ঠানের আওতায় যে মানুষগুলো বাস করছে তাদেরকে তিনি প্রতিপক্ষ বলেননি, যেমন জাহিলী প্রতিষ্ঠানকে বলেছেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় জাহিলী প্রতিষ্ঠান বলতে ঠিক তিনি কি বুঝিয়েছেন। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি) যা কিনা সামাজিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে তাকেই তিনি আঘাত করতে চেয়েছেন।

জিহাদের সূত্র ধরে কুতুব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলেছেন। কুরআনের নীতি হচ্ছে ধর্মে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কুতুবের কথা হলো ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ কুরআনের বিঘোষিত এই নীতিকে উপেক্ষা করা নয় এবং জাহিলী ব্যবস্থা উৎখাত করা মানে জোর করে কাউকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা নয়। তার নিজের কথা হচ্ছে জাহিলী ব্যবস্থার অপসারণ তাদেরকেই মুক্ত করবে যারা অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়। তিনি চিন্তার স্বাধীনতার উপরও জোর দেন যা তাৎপর্যের দিক দিয়ে ইউরোপের মানবতন্ত্রী দার্শনিকদের চেয়ে কম যায় না ঃ Freedom of belief is man's most precious right in this world .. .. .. any infringement of this right, direct or indirect, must be fought even if one has to kill for it.[১১]

কুতুব জিহাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এর নৈতিক ভিত্তি ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার উপরও জোর দিয়েছেন। তিনি এর নৈতিক ভিত্তি খুঁজেছেন কুরআনের নির্দেশ ও রসুলের জীবনের আচরিত মূল্যমানের মধ্যে।

জিহাদ বিষয়ে কুতুবের এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় তাকে নিয়ে পশ্চিমের মাথা ব্যথা কিংবা প্রচার প্রপাগান্ডা অনেকটাই অজ্ঞতা প্রসূত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যদিও কুতুব জিহাদের তাৎপর্য নিয়ে লেখালেখি করেছেন কিন্তু এর কৌশল বা কর্মপন্থা কেমন হবে তা নিয়ে তেমন একটা কিছু লেখেননি। তিনি জেহাদকে একটি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার কুতুব তার অধিকাংশ লেখাজোখা করেছিলেন মিসরীয় বন্দীশালায় বসে। তিনি নিজেকে একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতই ভেবেছেন, কখনোই কৌশল প্রণয়নকারীর মত নয়। তিনি তার Mile Stones এ আশা ব্যক্ত করেছেন এমন একদল অগ্রপথিকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তার বইকে পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে। হয়তোবা এই অগ্রসৈনিকেরাই অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে জিহাদের কৌশল গ্রহণ করবে, এই ছিল তার মনোবাঞ্ছা।

www.pathagar.com

পাঁচ

কুতুবের মতে জিহাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এটিকে তিনি আল্লাহর চিরাচরিত ব্যবস্থার পুনর্বহাল হিসেবে দেখেছেন, কোন নতুন ব্যবস্থার আবিষ্কার হিসেবে নয়। সুতরাং ইসলামী সমাজের পুনর্জীবন মানে হচ্ছে রসুল (সঃ) এর তত্ত্বাবধানে বিকশিত হওয়া, কুতুবের ভাষায় প্রথম কুরআনী প্রজন্মের (First Quranic Generation) সমতুল্য নতুন একটি প্রজন্ম সৃষ্টি করা। এই প্রজন্ম তৈরি হয়েছিল রসুল (সঃ) এর হাতে গড়া প্রথম মুসলমানদের সমন্বয়ে এবং কুতুব মনে করতেন এই রকম আদর্শ প্রজন্ম আর কখনো তৈরি হয়নি। কুতুবের কথা হলো জিহাদের মাধ্যমে এই আদর্শ প্রজন্মকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সেটি করা সম্ভব হলে আজকের দিনের মুসলমানদের সংকট দূরিভূত হবে।

কুতুব রসুলের জীবন ও নীতিকে ভর করে আজকের দিনের জন্য একটি আদর্শ উপস্থাপন করেছেন যা আধ্যাত্মিকতার অংশটুকু ব্যতীত কার্যত আধুনিক মতাদর্শের মতো। বোঝা দরকার আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে যে কোন ধর্মীয় মতাদর্শের প্রাণভোমরা এবং মানবতন্ত্রী দর্শনের সাথে তফাৎ ও বিরোধিতার এটিই প্রধান ক্ষেত্র। কুতুব তার আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই প্রতিবন্ধকতাকে যারা জয় করবে তাদের দিকেও ইংগিত দিয়েছেন। তিনি নিজের আদর্শ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রসুলের জীবনের ছক ও পরিকল্পনাকে চারটি স্তরে সাজিয়েছেন যাতে আজকের দিনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলেও মুসলমানদের এই ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়। প্রথমতঃ আল্লাহ রসুল (সঃ) এর কাছে তার নীতিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যাতে তিনি একদল ত্যাগী কর্মীকে নিয়ে একটি দল (জামা) গঠন করেন। এই দল আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মক্কার তৎকালীন জাহিলিয়াকে অপসারণ করে সেখানে একটি সমতাবাদী সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চূড়ান্ত করতে উদ্যোগী হয়। প্রাথমিক স্তরে রসুল (সঃ) তার কর্মীদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলেন যাতে তারা ভিন্ন মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন মক্কার জাহিলী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে দূরে থাকতে পারে। কুতুব এই পদ্ধতিকে বলেছেন মাফছালাহ (Dissociation, পৃথকীকরণ)। তার কথা হচ্ছে মুসলমানকে আজকের দিনের জাহিলিয়াকেও প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের মত এক সমাজ সৃষ্টি করতে হবে। এর অর্থ এই নয় মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কিংবা জাহিলিয়ার সংস্কৃতিতে ডুবে থাকা কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখবে না। স্বকীয় নীতিকে বুলন্দ রেখে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা নেই।

জাহিলিয়ার ব্যাপারে কুতুবের এই কঠোর অবস্থান পুঁজিবাদের ব্যাপারে লেনিনের অবস্থানকে মনে করিয়ে দেয়। কুতুব দাবি করেছেন আজকের দিনের ইসলামী আন্দোলনকেও জাহিলিয়া বিশেষ করে পশ্চিমী মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। জাহিলিয়ার সংস্কৃতি মুসলিম সমাজের জন্য কোন ভূমিকা রাখবে না।

দ্বিতীয় স্তরে এসে জাহিলিয়া থেকে মক্কার ক্ষুদ্র মুসলিম সমাজের দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায় যখন পৌত্তলিকরা তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে এবং শেষমেষ মক্কা থেকে বের করে দেয় ও তারা মদীনায় আশ্রয় নেয়।

তৃতীয় স্তরে রসুল (সঃ) মদীনায় এসে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়টি ছিল মুসলমানদের জন্য শক্তি, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়ার কাল এবং আসন্ন লড়াইয়ের প্রস্তুতির পর্ব।

www.pathagar.com

শেষতম স্তরে রসুল (সঃ) মক্কার জাহিলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন, যা তাকে বিজয় এনে দেয়।

রসুলের জীবনের এই নজীর উপস্থাপন করে কুতুব যুক্তি দেন আজকের মুসলিম জামা'কেও (দল) একইভাবে একালের জাহিলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কুতুব এই ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার পদ্ধতির তেমন কোন বিশদ চিত্র আমাদের দেননি, তবে তার পরিকল্পিত রাষ্ট্রের কয়েকটা মূলনীতির কথা তিনি বলেছেন।

এই রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র স্বীকৃতি থাকবে। এই ইসলামী রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ, শ্রেণী, গোত্র প্রভৃতির উপর ভর করবে না। এটা হবে বিশ্বাসীদের রাষ্ট্র যার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিকতা। রাষ্ট্রের নাগরিকদের থাকবে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা (Spiritual Freedom), যার মানে হলো মানুষ অন্য মানুষের দাসত্ব করবে না বা মানুষের তৈরি করা আইনের নিয়ন্ত্রণেও থাকবে না। মানুষ সরাসরি আল্লাহর আইনের আওতায় আসবে। এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অধীনে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের স্ব স্ব বিশ্বাস নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে পারবে যদি না তারা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হয়।

এই ইসলামী রাষ্ট্র চরিত্রের দিক দিয়ে হবে সমতাবাদী। সকল নাগরিকের সমানাধিকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয়া হবে। পশ্চিমের ভাবুকরা ইসলামে নারীর সমানাধিকার নেই এই বলে বিস্তর প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছেন। কুতুব জোর দিয়ে বলেছেন ইসলাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমানাধিকারের কথা বলেছে। যেহেতু নারী ও পুরুষের আধ্যাত্মিক উৎস এক তাই তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত কোন অসমতা নেই। তফাৎ যা হয়েছে তা তাদের শারীরিক গঠন হেতু কর্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে। কুতুব বলেছেন পশ্চিমীরা একধরনের অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে কিন্তু ইসলাম আধ্যাত্মিক সমতার কথা বলে ও লিঙ্গ ভেদে নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেয়।

ইসলাম যেমন রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সমতার কথা বলে তেমনি নাগরিকদের পারস্পরিক দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়। ব্যক্তির যেমন নিজের ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব আছে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিও দায়িত্ব আছে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশ। তাই রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যক্তিকেও ভূমিকা রাখতে হবে, তেমনি রাষ্ট্র ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এই কারণে ইসলামে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে যাকাতের কথা।

কুতুব রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসক ও জনতার মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও যোগাযোগের কথা বলেছেন। তিনি তার ইসলামে সামাজিক সুবিচার গ্রন্থে বলেছেন শাসক নির্বাচিত হবে জনগণের ভোটে। শাসকের অন্যতম কাজ হবে শরীয়াহকে বাস্তবায়ন করা অথবা প্রয়োজন অনুসারে শরীয়াহর আলোকে নতুন আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখা। কিন্তু শাসক নিজে যদি শরীয়াহকে অমান্য করে কিংবা জনগণ যদি তার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাকে অপসারণ করতে হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদের ভূমিকার কথাও বলেছেন। কিন্তু ইজতিহাদের নামে নিজ ইচ্ছাকে চাপানো চলবে না। কুতুব বলেছেন চার্চের মত কোন প্রতিষ্ঠান ইসলামে নেই যা কিনা

www.pathagar.com

ইচ্ছা মত আইন তৈরি করতে পারবে। আইন তৈরি করতে হবে শরীয়ার নীতির আলোকে। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রসঙ্গে কুতুব বলেছেন এর উদ্দেশ্য হবে দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ব্যক্তির কল্যাণ, দ্বিতীয়তঃ সামাজিকভাবে একটি সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি যার ফলে বৈষম্যহীন, ইনসাফমূলক সমতাবাদী একটি সমাজ গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের নজরদারী থাকবে অর্থের অপচয় যেন না হয় কিংবা কেউ কাউকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ না করতে পারে। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যাকাতকে নিশ্চিত করতে হবে, দানশীলতাকে উৎসাহিত করতে হবে অন্যদিকে সুদ ও জুয়ার মত অপরাধকে নির্মূল করতে হবে যা কিনা সামাজিক শোষণের হাতিয়ার। কুতুবের এই অর্থনৈতিক নীতিতে একটা সমাজতন্ত্রী চেহারা থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ইসলাম স্বীকার করেছে। যদিও এই অধিকার ঠিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত নয়। এখানে সম্পত্তির মালিকানার ধারণাটা হলো অধিকারের চেয়ে দায়িত্বের মতো। মালিক যদি এমনভাবে সম্পত্তির ব্যবহার করে যাকে অনৈসলামী বলা যায়, তবে সেই সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে। এখানে কুতুবের কথা হচ্ছে ঃ

The fundamental principle is that property belongs to the community in general; individual possession is a stewardship which carries with it conditions and limitations.[১২]

কুতুবের পরিকল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। সেই হিসেবে এটিকে একটি ধর্মবাদী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। যদিও এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের সর্বোত্তম কল্যাণ ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইউরোপের মুক্ত চিন্তার দার্শনিকরা এক সময় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। কুতুবের চিন্তার সাথে পশ্চিমের মৌলিক তফাৎটা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে মানবীয় কাণ্ডজ্ঞানের বাইরে খোদায়ী আইনের ভিত্তিতে যা ইউরোপের ভাবুকরা মানতে চাননি। এছাড়া আধুনিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য যা প্রয়োজন, কুতুবের পরিকল্পনায় তার সবকিছুই আছে।

ছয়

সাইয়েদ কুতুব একালের মুসলমানদের জন্য ইসলামকে এক পরিপূর্ণ জীবন দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কুতুব ইসলামের বিজয়ের পথ নির্দেশ করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলোর সামনে মুখ থুবড়ে পড়া বিপর্যস্ত মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। কুতুবের কথা হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার জাহিলিয়াকে পরিবর্তন করতে জিহাদের নীতিকে ব্যবহার করতে হবে। একমাত্র জেহাদই পারবে আল্লাহর নীতিকে ফিরিয়ে আনতে। সবশেষে তিনি বলেছেন এই প্রক্রিয়ায় যে ইসলামী রাষ্ট্র তৈরি হবে তাই পাশ্চাত্যের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।

কোন সন্দেহ নেই কুতুবের এই সব চিন্তাভাবনার প্রভাব আজ সারা মুসলিম দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দ্রুত একটি বৌদ্ধিক ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রের তোপের মুখে বিপন্ন ও আত্মপরিচয়হীন মুসলমানরা কুতুবের চিন্তার মধ্যে শিকড়ে ফেরার টান অনুভব করছে। একালে কুতুবের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মুসলমানের ভাবজগতে তিনি এক বিপ্লবী রূপান্তরের সূচনা করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ও দর্শনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। সমাজ

www.pathagar.com

পরিবর্তনের জন্য আগে মানুষের ভাবজগতের পরিবর্তন জরুরী এবং সেই কাজটি কুতুব অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাধা করেছেন। কুতুবের সূচিত বিপ্লবী প্রক্রিয়া আজ সারা মুসলিম দুনিয়া জুড়ে এক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং আশা করা যায় এ লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে মুসলিম দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে ও অগণিত মানুষের মুক্তি নিশ্চিত হবে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Sayyid Qutb, The America I Have Seen. New York, 2000.
২. Charles Tripp, 'Sayyid Qutb : The Political Vision', in Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival. London : Zed Books Ltd., 1994.
৩. Sayyid Qutb, Mile Stones. Beirut : The Holy Koran Publishing House, 1978.
৪. Sayyid Qutb, In the Shade of the Qur'an. (Translated and edited by Adil Salahi and Ashur Shamis). United Kingdom : The Islamic Foundation, 2002.
৫. Sayyid Qutb, Islam : The Religion of the Future, Kuwait, 1984.
৬. Sayyid Qutb, Mile Stones.
৭. Abul A'la Mawdudi, Islamic Way of Life. London, 1950.
৮. Sayyid Qutb, Mile Stones.
৯. আল কুরআন, সুরা ৪ ঃ আয়াত ৭৪-৭৫।
১০. Sayyid Qutb, In the Shade of the Qur'an.
১১. Sayyid Qutb, In the Shade of the Qur'an.
১২. Sayyid Qutb, Social Justice in Islam. (Translated by John B. Hardic and Hami Algar) New York : Islamic Publications International, 2000.

www.pathagar.com

মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ

এক

মোহাম্মদ হামিদুল্লাহকে বলা হতো স্বাধীন হায়দারাবাদের শেষ নাগরিক।[১] ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হায়দারাবাদ রাষ্ট্র গায়ের জোরে ভারত দখল করে নেয়। সেই থেকে মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ একজন রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং আমৃত্যু তিনি পাসপোর্টবিহীন অবস্থায় রাজনৈতিক মুহাজীর (Political Refugee) হিসেবে কাটিয়ে দেন। হায়দারাবাদের অবলুপ্তির পর তিনি কোন দেশের নাগরিকত্ব নেননি। এমনকি তখনকার পরিস্থিতিতে অনেক হায়দারাবাদী মুসলিম পাকিস্তানকে তাদের নতুন রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করলেও হামিদুল্লাহ তাও করেননি। নতুন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি তার ভালবাসার কমতি ছিল না। কিন্তু হায়দারাবাদ ছিল তার জন্মভূমি, তার বিশ্বাস ও স্বকীয়তার প্রতীক। তার হায়দারাবাদ সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ছিল না, ছিল তার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মতো উদার। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বহুত্ব ও সহিষ্ণুতার এক তীর্থস্থান এবং মোগল সাম্রাজ্যের পর উপমহাদেশের প্রধান মুসলিম শক্তিকেন্দ্র।

মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ তাই ভারত কর্তৃক তার প্রিয় হায়দারাবাদের জবরদখল ও আগ্রাসনকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি বিশেষ করে হায়দারাবাদের ঐশ্বর্যময় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে যে নির্মমতার সাথে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তা তার জন্য হজম করা ছিল সত্যিই কঠিন ও মর্মস্পর্শী ব্যাপার। (পাঁচ দিনের এই পরিকল্পিত দখল অভিযানে ভারতীয় বাহিনী দুই লক্ষের উপর নিরীহ হায়দারাবাদী মুসলমানকে হত্যা করে। এই অভিযানের মূল পরিকল্পক ছিলেন ভারতের তৎকালীন মুসলিম বিদ্বেষী উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল)।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হায়দারাবাদের বিপর্যয়কে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত সেদিন বলেছিলেন ঃ The march of the Indian troops on the capital of Hyderabad reminds me of the march of Italian troops towards the Abyssinian capital.[২]

যদিও সাম্রাজ্যবাদের মোড়লরা স্বাধীন হায়দারাবাদের জন্য এরপরে তেমন কিছুই করেনি। ভারতীয় আগ্রাসনের পরে নিরাপত্তা পরিষদে হায়দারাবাদকে নিয়ে যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তাও আর কখনো হয়নি। হায়দারাবাদের শেষ প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলী তার দেশের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় আগ্রাসনের পর তখনকার পরিস্থিতিতে সেই প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও পিছু হটে আসেন ও গোপনে ভারতীয় এসট্যাবলিশমেন্টের সাথে বোঝাপড়া করে ফেলেন। এই প্রতিনিধিদলের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ যার কাছে হায়দারাবাদ কোন ভুলে যাওয়ার বিষয় ছিল না। আন্তর্জাতিক আইনের ছাত্র হিসেবে

www.pathagar.com

তিনি এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, তার দেশ এক অন্যায় আগ্রাসন ও জবরদখলের শিকার। তিনি কোন সরকারের সাথে যুক্ত ছিলেন না বা তার তেমন কোন শক্তিও ছিল না। একজন বিনম্র জ্ঞানসাধক হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটক্যাচালও তিনি ভালভাবে বুঝতে পারেননি। তবুও ব্যক্তিগতভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত এই অবৈধ জবরদখলকে কখনোই স্বীকৃতি দেননি এবং তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রামও বাদ দেননি। হায়দারাবাদ দখলের পর তিনি ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রিত হিসেবে থেকে যান এবং তার ভাষায় তিনি কুফরিস্তানে (ভারত) আর কখনো ফিরে যাননি। তিনি সেখানে একটি মাসিক বুলেটিন বের করে হায়দারাবাদে ভারতের অবৈধ জবরদখল ও মুসলিম হত্যার প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কাছে বুলেটিন পাঠিয়ে হায়দারাবাদ ইস্যুকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করেন এবং হায়দারাবাদ লিবারেশন সোসাইটি তৈরি করে কিছু আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করারও চেষ্টা চালান। বলা হয়ে থাকে এর সবকিছুই তিনি করেছিলেন নিজের পকেট থেকে এবং তার টাইপরাইটারের সাহায্যে। এ কাজে হামিদুল্লাহ ছিলেন বরাবর একা। কেউ তাকে তেমন একটা সাহায্য করেনি এমনকি হায়দারাবাদের এলিটশ্রেণী যারা করাচীতে আশ্রয় নেন তারাও এটিকে বাতিল বিষয় (Lost case) হিসেবে গণ্য করেছিলেন।[৩] কিন্তু হামিদুল্লাহ কোদালকে কোদালই বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায়কে অন্যায় বলেই জেনেছেন। হামিদুল্লাহকে জানতে হলে তাই হায়দারাবাদকে জানা চাই। হায়দারাবাদ ট্রাজেডীর মধ্যে তার রক্তাক্ত আত্মা মুখ লুকিয়ে আছে। ভারতের জবরদখলের আগ পর্যন্ত হামিদুল্লাহ হায়দারাবাদের বিখ্যাত উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ততদিনে তিনি ধীমান বুদ্ধিজীবী হিসেবেও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম আইন, সিরাত ও হাদিস শাস্ত্রে তার বুদ্ধিজীবিতা ছিল ঈর্ষণীয়।

১৯০৮ সালে হায়দারাবাদ রাজ্যের শহর হায়দারাবাদের পুরনো এলাকা মোহাল্লা ফিলখানায় হামিদুল্লাহর জন্ম। তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হামিদুল্লাহর আব্বা ছিলেন ঐ রাজ্যের সহকারী রাজস্ব সচিব। যাকে হায়দারাবাদের সরকারি পরিভাষায় বলা হতো মদদগার মুতামিদ মালগুজারী। শৈশবে পারিবারিক পরিবেশে তার লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। তারপর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা তিনি পান হায়দারাবাদের বিখ্যাত দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে। এখান থেকে তিনি মৌলভী কামিল ও দরসে নিজামী ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৩০ সালে হামিদুল্লাহ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক আইনে এম এ ও এলএলবি ডিগ্রি নেন। এরপরে ১৯৩৩ সালে জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল এবং ১৯৩৫ সালে প্যারিসের সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি পান তিনি। ১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে যোগ দেন ড. হামিদুল্লাহ।

দুই

বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানচর্চার জগতে ড. হামিদুল্লাহ একালে ইসলামের সোনালী যুগের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং আল ফারাবী, আল গাজালী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহর

www.pathagar.com

চিন্তাভাবনার ধারাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। জ্ঞান সাধনায় একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বকোষসদৃশ পান্ডিত্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ অবদান এই ঐতিহ্যের কয়েকটি গুণগত বৈশিষ্ট্য। ১৬৫টি গ্রন্থের রচয়িতা এবং প্রায় ১০০০টি গবেষণাপত্রের নিবন্ধকার হিসেবে ইসলামের জ্ঞানজগতের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। আইনের ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। খুব তরুণ বয়সে আইনবিদ হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং আইন বিষয়ের উপর লেখালেখি শুরু করেন। এসব লেখায় তার যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী মনের পরিচয় স্পষ্ট, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ইসলামী উৎস থেকে পাওয়া প্রাসঙ্গিক কোন তথ্যকে তিনি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও ড. হামিদুল্লাহ জ্ঞানের ইসলামীকরণ জাতীয় অলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করেননি কিন্তু তার লেখালেখি নীরবে এই চেতনাকে সমর্থন করে গেছে। আন্তর্জাতিক আইনের উপর তার প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে International Law : Its Principles and Precedents । ২৫০ পৃষ্ঠার এ ছোট বইটি কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলিত ধারণার চর্বিত চর্বণ নয়। ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে দেখা আন্তর্জাতিক আইনের এক গভীর সমালোচনামূলক বই এটি। এর মাধ্যমে হামিদুল্লাহ সাহেব আন্তর্জাতিক আইনের একটি নতুন ভাষ্য রচনা করেন। এই বিষয়ে তার অধিকার এবং প্রাথমিক কাজকর্ম পরবর্তীকালে তাকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় সিয়ার, নিয়ে অধিকতর গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে। এক্ষেত্রে তার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Neutrality in Islamic International Law। এটি তিনি জার্মান ভাষায় লিখেছিলেন এবং ১৯৩৩ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসারটেশন (Dessertation) হিসেবে জমা দেন। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে Laws of Neutrality নিয়ে এটি হচ্ছে প্রথম সুবিন্যস্ত ও মৌলিক রচনা। বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি দিক এখানে এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যা এতকাল ইসলামী ও পশ্চিমী দুনিয়ার কোথাও জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত এ বই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের শ্রেণী বিভাজনকে ভুল প্রমাণ করেছে। তৃতীয়ত এ বইয়ে ইসলামী আইনে Concept of Neutrality'র একটি নতুন প্রত্যয় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এবং সবশেষে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে, আইনী ব্যাখ্যার সময় সমকালীন ঐতিহাসিক ধারণা ও প্রেক্ষাপটকে সামনে এনে মূল্যায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে বইটি মুসলিম আইনের উপর একালে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সিয়ার শাস্ত্রে হামিদুল্লাহ সাহেবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঃ Muslim Diplomacy in the Time of the Prophet of Islam and his Orthodox Successors. এটি তিনি ফরাসী ভাষায় লেখেন এবং সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসারটেশন হিসেবে ১৯৩৪ সালে জমা দেন।

বইটির দুটি খন্ড। প্রথম খন্ডে তিনি রসুল (স.) ও তার পুণ্য খলিফা চতুষ্টয়ের সাথে সমকালীন শাসক ও উপজাতীয় প্রধানদের সম্পর্কের কথা বলেছেন। সেদিক দিয়ে এ বইটি প্রথম যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অংশে তিনি রসুল (স.) ও তার চার খলিফার সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও কূটনৈতিক দলিলগুলো সংযোজন করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করে এই মূল্যবান ও বিরল দলিলগুলো তিনি সময়ানুক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন এবং ফরাসী ভাষায় তরজমা করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি কয়েক বছর পর ড. হামিদুল্লাহ অন্যান্য অনেক দলিলপত্র সংযোজন করে আরো বর্ধিত আকারে বৈরুত থেকে আরবীতে পৃথকভাবে আল ওয়াতায়েক আল সিয়াসাহ নামে প্রকাশ করেন এবং এর বহু সংস্করণ বাজারে আসে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম কূটনীতি সম্বন্ধে জানতে এ বইয়ের আজো বিকল্প নেই।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে হামিদুল্লাহ সাহেবের ক্লাসিক গ্রন্থ হচ্ছে The Muslim Conduct of State। মূলতঃ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর অভিসন্দর্ভ হিসেবে তিনি এটা জমা দেন এবং ১৯৪১ সালে লাহোর থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সব খুটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে নতুন বিশ্বপরিস্থিতি ও সমস্যার আলোকে বিশ শতকের প্রথম থেকেই মুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলামী আইনের পুনর্গঠনের কথা ভেবে আসছিলেন। এদিক দিয়ে ইকবাল ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু তিনি কিভাবে এটিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তা ঠিক এখন বোঝা না গেলেও, হামিদুল্লাহর The Muslim Conduct of State যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন তবে এর মধ্যে হয়তো তিনি তার স্বপ্নের কিছুটা বাস্তবায়ন দেখতে পেতেন।[৪] হামিদুল্লাহ তার Muslim Conduct of State লিখতে গিয়ে Oppenheim এর International Law কে আধুনিক মডেল হিসেবে ধরেছেন এবং এই বইয়ে আলোচিত আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ ও নানা প্রশ্নসমূহ ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ড. হামিদুল্লাহ পরিশ্রমী গবেষক। এই বইয়ের পাতায় পাতায় তার নিষ্ঠা ও শ্রমের ছাপ রয়েছে। নানা ভাষার ও দেশের নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন। তিনি শুধু ইসলামী আইন নিয়েই নাড়াচাড়া করেননি। ইতিহাস, দর্শন, নৌবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, জীবনচরিতও পর্যালোচনা করেছেন। বিশেষ করে কুরআন শরীফের বিভিন্ন তফসীর ও হাদীসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের নমুনা এ বইতে রয়েছে। ফিকাহর বিষয়বস্তু ছাড়াও ড. হামিদুল্লাহ মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে নতুন বিষয়বস্তু ঢুকিয়েছেন। বিশেষ করে যেখানে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে সেখানে তিনি গতানুগতিক তথ্য ও ধারণার পাশাপাশি ফিকাহর ভিন্ন উৎস থেকে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তিনি প্রচলিত বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এইভাবে এই বই হয়ে উঠেছে বিপুল তথ্য সমৃদ্ধ এবং ইসলামী আইন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উপর এ ধরনের বড় বড় কাজ করার পাশাপাশি তিনি অনেক বই নতুন করে সম্পাদনা করেছেন যা কিনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধকৌশল ও আন্তঃগোত্রীয় সম্পর্কের উপর আলো ফেলেছে। তিনি ইবনে ইসহাকের বিখ্যাত রসুল চরিত ও আল ওয়াকিদির কিতাব আল রিদ্দাও সম্পাদনা করেছেন। হামিদুল্লাহ সাহেব বিখ্যাত মদীনা সনদকে বলেছেন First written constitution of the world । এ শিরোনামে তিনি একটি পুস্তিকাও লেখেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অগ্রণী

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করেন। তিনি হাম্বলী আইনবিদ ইবন আল কাইয়েমের বিখ্যাত 'আহকাম আহল আল জিম্মা' বইটিরও সম্পাদনা করেন। ফিকাহ শাস্ত্রে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উপর এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ড. হামিদুল্লাহকে আধুনিককালে তাই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের নব নির্মাতা বলা যেতে পারে। যদি ইমাম মোহাম্মদ ইবন আল হাসান আল শায়বানীকে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলা হয় তবে ড. হামিদুল্লাহকে আধুনিক মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলতে হবে।

তিন

ড. হামিদুল্লাহর আর একটি প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল 'সিরাহ'। মুসলিম দুনিয়ায় হযরত রসুল (স.)-এর জীবনকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সাহিত্য রচিত হয়েছে ড. হামিদুল্লাহ আধুনিককালে তার সমৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তার আগ্রহের জন্ম যখন তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের কূটনৈতিক পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন।

'সিরাহ' বিষয়ে ড. হামিদুল্লাহর প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক বই হচ্ছে ঃ The System of Government in the Time of the Prophet । মদীনাকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তিনি তাকে বলতেন City State of Madinah । আলোচ্য বইয়ে এই নগর রাষ্ট্রের বিচার ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু চমৎকার। বিশেষ করে অতীতের সিরাহগুলোতে এই বিষয়ে কোন তথ্য না থাকার কারণে বইটির মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই বিষয়ে ড. হামিদুল্লাহর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ঃ The Political Life of Noble Messanger।

এরপরে ড. হামিদুল্লাহ লেখেন The Battle fields of Holy Prophet । বইটিতে রসুল (স.) তার জীবনের শেষ আট বছরে যে লড়াইগুলো লড়েছিলেন তার স্থানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৩০ এর দশকে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার সময় ড. হামিদুল্লাহ মক্কা, মদীনা ও তায়েফ সফর করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের স্থানগুলো প্রাথমিক যুগের ইসলামী বইপত্র ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করে সুচিহ্নিত করেন। বইটিতে যুদ্ধগুলোর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সিরাহ বিষয়ে ড. হামিদুল্লাহর সবচেয়ে মূল্যবান বইটি ফরাসী ভাষায় লেখা। এর নামে Le Prophete de L'Islam, যা 1959 সালে প্রকাশ পায়। বইটির দুটি অংশ। প্রথমটিতে রসুলের জীবন, মিশন ও তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রসুলের বাণী ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বইটিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তখনকার আরবের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নীতি ও পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং ইসলামের সাথে প্রাসঙ্গিক তখনকার দিনের আন্তঃরাষ্ট্র ও আন্তঃগোত্রীয় সম্পর্কের ধরনগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে রসুলের মিশনের সফলতার পিছনে বিভিন্ন গোত্রের ভূমিকা নিয়ে ড. হামিদুল্লাহর আলোচনা যেমন মৌলিক তেমন প্রতিভাদীপ্ত। এটা পাঠককে রসুল (স.)-এর বিভিন্ন

www.pathagar.com

সময়ে নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর যৌক্তিকতা বুঝতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে ড. হামিদুল্লাহ দেখিয়েছেন কিভাবে রসুল (স.) এক গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, অন্যটির সাথে হননি। এটা পরবর্তীকালে ইসলামের বিকাশে সাহায্য করেছে। ড. হামিদুল্লাহর আগে পৃথিবী কেবল গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে অবগত ছিল। তিনিই প্রথম বুদ্ধিজীবী যিনি মক্কা ও মদীনার নগর রাষ্ট্রের কথা সবার সামনে তুলে ধরেন।[৫] তিনি এই দুটি নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপুল পরিমান বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এ বইয়ে। বিশেষ করে মদীনা নগর রাষ্ট্রের সংবিধানের কথা বলেছেন, যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

চার

ড. হামিদুল্লাহর আগ্রহের আর একটি বিষয় ছিল কুরআন, বিশেষ করে হাদীসের ঐতিহাসিকতা। ফরাসী ভাষায় তার লিখিত রসুল চরিত এবং পরবর্তীকালে ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত তার বই Emergence of Islam এ কুরআন সম্পাদনা ও গ্রন্থনার ঐতিহাসিক যথার্থতা নিয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন।

তিনি হাদিস সংগ্রহের ঐতিহাসিকতা ও যথার্থতা নিয়ে কাজ করেছেন। বিশেষ করে উনিশশতকে ইউরোপের ওরিয়েন্টালিস্টরা হাদিস সংগ্রহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যে সন্দেহ পোষণ করেছেন তিনি তার যুক্তিসিদ্ধ জওয়াব দিয়েছেন। ওরিয়েন্টালিস্টরা সেকালে যেটা বলার চেষ্টা করেছেন তা হলো হাদিস সংগ্রহ ও সম্পাদনার ব্যাপারটা ঘটেছে তৃতীয় শতাব্দীতে এবং যেহেতু এই সম্পাদনার কাজটি মৌখিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হয়েছে তাই তাদের ধারণায় এর মধ্যে ভুল বর্ণনা, বর্ণনার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজনের মত ঘটনা ঘটেছে। ওরিয়েন্টালিস্টরা সম্পূর্ণ অসদুদ্দেশ্যে এই মৌখিক বর্ণনার তত্ত্বকে এমন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেছে যে পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক পাঠকই তাদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলেছে। ড. হামিদুল্লাহর ওস্তাদ মওলানা মানাজির আহসান গিলানী প্রথম এই বিষয়টি তার প্রতিভাধর ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে কাজ করবার কথা বলেন। মরহুম মওলানা অনেক পরিশ্রম করে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করে প্রমাণ করেছেন রসুল (স.)-এর পুণ্য সাহাবীরা লিখিতভাবে তার কথা ও দৃষ্টান্তকে হেফাজত করেছিলেন। ওস্তাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে ড. হামিদুল্লাহ এই বিষয়টি হাতে নেন এবং তার সহজাত উদ্যম, মনীষা ও পরিশ্রমী সাধনার ফল অচিরেই ফলতে থাকে। ড. হামিদুল্লাহ তুরস্ক, জার্মানী ও ফরাসী দেশের কয়েকটি লাইব্রেরী থেকে হাদীসের কিছু প্রাচীন নমুনা সংগ্রহ করেন যা কিনা রসূল (স.)-এর সাহাবীদের দ্বারাই লিখিত হয়েছিল। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে তিনি ওরিয়েন্টালিস্টদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করেন। তিনি আরো উল্লেখযোগ্য প্রমাণসহ দাবি করেন শুধুমাত্র রসুলের সাহাবীরাই হাদিস লিখিতভাবে রক্ষা করেননি, স্বয়ং রসুল (স.)-এর নির্দেশেও লিখিতভাবে হেফাজত করা হয়েছিল। এইসব হাদীসের মধ্যে ৫২টি ধারা সংবলিত মদীনা সনদ এবং বিভিন্ন শাসক ও গোত্র প্রধানদের কাছে নানা রকম নির্দেশ ও পরামর্শ সংবলিত পাঠানো রসুলের চিঠিপত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. হামিদুল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সবচেয়ে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য লিখিত হাদিস সংগ্রহগুলো হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস আবু রাফি, আনাস ইবনে মালিক,

www.pathagar.com

আমর ইবনে হাজম এবং আবু হুরায়রা কৃত। সর্বসাকুল্যে ড. হামিদুল্লাহ এ ধরনের ১৪টি প্রাচীন হাদিস গ্রন্থের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।

পাঁচ

হায়দারাবাদ দখল হয়ে যাওয়ার পর জীবনের বাকি ষাট বছর ড. হামিদুল্লাহ রিফিউজী হিসেবে প্যারিসে কাটিয়ে দেন। এখানে বসেই তিনি তার মনন ও বিশ্বাসের চর্চা করে গেছেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি তার বিশ্বাসকে কলুষিত হতে দেননি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। প্যারিসের সাধারণ একটি ফ্লাটে থাকতেন। বাজার থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত সবই নিজ হাতে করতেন। কামিজ, পায়জামা, মাথায় কারকুলি টুপি এই ছিল তার দৈনন্দিন পোশাক। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মনীষার সাথে ভদ্রতা, সৌজন্যতা ও বিনম্রতার এক অবিস্মরণীয় সমন্বয় ঘটেছিল। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবার সাথে তিনি একই রকমভাবে মিশতেন। এ সময় তার ব্যবহারে কোন তারতম্য দেখা যেত না। এতবড় পন্ডিত, দুনিয়া জোড়া যার খ্যাতি, কয়েকটি ভাষায় যিনি সমান দক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে লেখালেখি করেছেন এবং প্রায় ২০টি ভাষার উপর যার স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল তার ভিতর ঘূর্ণাক্ষরেও অহমিকার মত মানবীয় দুর্বলতা প্রশ্রয় পায়নি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন ফকীর, দায়ী ও ওয়ালিউল্লাহ। প্যারিসের বিভিন্ন মসজিদে তিনি ইসলামের উপর বক্তৃতা দিতেন এবং অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতেন। আমৃত্যু তিনি অমুসলিমদের সাথে ডায়ালগ ও সহাবস্থানের উপর জোর দিয়ে গেছেন। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী সহজবোধ্য ভাষায় পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি ফরাসী ভাষায় কুরআনের তর্জমা করেন যা Le Coran নামে প্রকাশিত হয়। এই তর্জমা এত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে প্রকাশের প্রথম বছরই ১ লাখ কপি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এটি পড়ে অসংখ্য অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে।

ড. হামিদুল্লাহ বরাবরই আরবী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতেন। কারণ তিনি মনে করতেন আরবী হচ্ছে কুরআনের ভাষা। এটি ছাড়া ইসলামকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিনম্র জ্ঞান সাধককে ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের হিজরা এ্যাডওয়ার্ড দেয়া হয়। এই পুরস্কার তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু পুরস্কারের বিপুল অর্থ তিনি ইসলামাবাদের ইসলামিক রিসার্স ইনস্টিটিউটে দান করে দেন। আর একবার তাকে বিখ্যাত ফয়সল পুরষ্কার দেয়ার কথা ওঠে। তার শুভার্থীরা তাকে সৌদি আরবের ফয়সাল ফাউন্ডেশনে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেয়ার অনুরোধ করে। এর উত্তরে তার শুভার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি যা লেখেন তা কেবল একজন ওয়ালীউল্লাহর পক্ষেই সম্ভব ঃ

I fear that if I were to accept any worldly reward for my modest work, I may not get my due in the here after and be left with only my sins in my book of deeds and, therefore, I keep telling everyone I don't want these awards.[৬]

প্যারিসে অবস্থান করলেও ড. হামিদুল্লাহর মন পড়ে ছিল মুসলিম উম্মাহর সাথেই। মুসলিম দুনিয়ার কোন আমন্ত্রণ পেলেই বা কোন সংকটে তার ডাক পড়লেই তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। ১৯৪৯ সালে তিনি করাচী যান এবং বছর খানেক অবস্থান

www.pathagar.com

করেন। এখানে তখন পাকিস্তানের সব মতের উলামা ও ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হয়ে সংবিধানের যে খসড়া তৈরি করেছিলেন তিনি তার পরামর্শক হিসেবে এসেছিলেন, যা পরবর্তীকালে Basic Principles of an Islamic State হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

তিনি কিছুদিন মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইলাহিয়াৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি দায়ী হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চলা মুসলিম স্বাধিকার আন্দোলনগুলো নিয়েও তার আগ্রহ ছিল প্রচুর। ড. হামিদুল্লাহ ছিলেন ইকবালের সেই কবিতার দরবেশের মত যাকে পূর্ব কিংবা পশ্চিমের শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি ছিলেন একালে ইসলামের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত। ২০০২ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই বিনম্র চিত্ত ফকীর ও জীবন সাধক ইন্তেকাল করেন।

ছয়

ড. হামিদুল্লাহর উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও মনীষা তার চিন্তাভাবনার একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। আজকাল অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উত্তম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেছেন। কিন্তু ড. হামিদুল্লাহ democracy কে demo(n)cracy বলে মনে করতেন।[৭] কারণ তার ধারণা ছিল গণতন্ত্রে অধিকাংশের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয় ও বাকী ৪৯% এর অধিকার অস্বীকৃত হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের নীতি প্রয়োগ করে সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পারস্পরিক সহাবস্থান সম্ভব বলে মনে করতেন। ইসলামের ইতিহাস এর বড় নজির। এক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বাদশাহ কিংবা অন্য যে কেউ এ নীতি প্রয়োগ করতে পারে। ইসলামের ক্ষেত্রে দেখার ব্যাপার হচ্ছে নীতির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা। ড. হামিদুল্লাহর এসব চিন্তার সাথে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু তার চিন্তার যথার্থতা হালকা বলে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই।

ডঃ হামিদুল্লাহ পারিবারিকভাবে শাফেঈ ধারার অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তার স্বভাবজাত উদারতা তাকে এই সব মাযহাবের উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। মাযহাব, তরীকা ও ফিরকার নীতি দ্বারা তিনি কখনোই ইসলামকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি। ইসলামের প্রয়োজনে তিনি সকল মাযহাবের আইনের উৎসগুলো ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। হানাফী, হাম্বলী, মালেকী এমনকি শিয়া আইনগুলো নিয়েও তিনি নির্বিবাদে কাজ করেছেন। এসব বিষয়ে তার মধ্যে কোন সংকীর্ণতা কাজ করেনি। তিনি মনে করতেন ইসলামের উদারতার নীতিকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সংকীর্ণতা দিয়ে ইসলামের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. "The Last Citizen of Hyderabad, M H Faruqi" In Impact International, Vol 33 : No 1, 2 and 3, January-March, 2003.

২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৩. প্রাগুক্ত।

৪. "Sirah, Hadith and Law : Almost a Century of Scholarship, Dr.Mahmood Ahmed Ghazi "In Impact International", Vol 33 : No 1, 2 and 3, January-March, 2003.

৫. প্রাগুক্ত।

৬. "Story of King Faisal Prize : In the event, escaped embarassment, Syed Faiyazuddin Ahmad" in Impact International, Vol 33 : No 1, 2 and 3, January-March, 2003.

৭. "Confessions and Conversation : Poet, Politican and Polymath, Sadida Athaullah" in Impact International, vol 33 : No 1, 2 and 3, January-March, 2003.

www.pathagar.com

মার্টিন লিংস

এক

মার্টিন লিংসকে নিয়ে মুসলিম দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক ধরনের সংবেদনা আছে। এই সংবেদনা তৈরি হয়েছে মূলতঃ তার কৃত রসুল (স.)-এর অসাধারণ জীবন চরিতটির জন্য। বইটির পুরা নাম হচ্ছে Muhammad :His life based on the earliest sources।

ইউরোপে সেই মধ্যযুগ থেকে রসুল (স.)-এর উপর লেখালেখি চলছে। সে সব লেখার অধিকাংশই রসুল (স.)-এর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। তারপর মধ্যযুগ পার হয়ে ওরিয়েন্টালিস্টদের যুগেও তাঁকে নিয়ে বিপুল সাহিত্য রচিত হয়। আসল কথা হচ্ছে এর কোনটি কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য জীবনচরিত হিসেবে যথার্থতার দাবি করতে পারেনি। কোন জীবন চরিতই বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান পায়নি। ইংরেজি ভাষায় লিংস সেই দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করেছেন।

এ বই লেখার সাথে সাথে মুসলিম মনীষার জগতে লিংসের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ বইতে একদিকে রয়েছে তার গভীর পান্ডিত্যের ছাপ, ঐতিহাসিকতার প্রতি সম্ভ্রমবোধ আর রসুল প্রেমের তুলনাহীন নিদর্শন। এ বই হচ্ছে পান্ডিত্য ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয়। লিংসের বর্ণনাশৈলী চমৎকার। এর মধ্যে এক ধরনের জাদু আছে যা পাঠককে চুম্বকের মত টানে। একবার পড়তে বসলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বই থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা যায় না। এ বই পড়তে পড়তে পাঠক যেন লিংসের হাত ধরে স্থান কাল অতিক্রম করে সেই ১৪০০ বছর আগেকার মক্কা মদীনায় পরিভ্রমণ করে আসেন যেখানে রসুল তার ঐশী মিশন নিয়ে কাজ করে গেছেন। লিংস তার পাঠককে এক ধরনের সম্মোহনের মধ্যে ইসলামের সেই প্রথম ২৩ বছরের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ও উত্তেজনার আবহে নিয়ে যান। যেখানে পাঠক পুরনো অতীতকে চোখের সামনে জীবন্ত দেখতে পায়। পাঠককে ধরে রাখার এই অপূর্ব শক্তি একজন লেখকের জন্য অবশ্যই বড় গুণ।

এ ধরনের একটি বই একদিনে তৈরি হয় না। এর জন্য প্রয়োজন লেখকের দীর্ঘ মানস প্রস্তুতি ও লেখাপড়ার পটভূমি। লিংস ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। দীর্ঘকাল তিনি ছাত্রদের শেক্সপিয়ার পড়িয়ে কাটিয়েছেন। বোঝাই যায় ইংরেজি ভাষার উপর তার ছিল প্রগাঢ় অধিকার। ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার না থাকলে কখনোই এত প্রাঞ্জল, এত অনবদ্য সাহিত্যিক গদ্যে তিনি এ বই লিখতে পারতেন না।

একই সাথে লিংসের ছিল আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর সমান অধিকার এবং আরবী লোকজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি। দীর্ঘকাল ধরে তিনি আরবীয়দের সাথে কাটিয়েছেন। আরবী সংস্কৃতির সাথে তার এই নিবিড় পরিচয় তাকে সবরকমের সংস্কার

www.pathagar.com

অতিক্রম করে রসুল চরিত্রকে বুঝতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ বোঝাবুঝিই তাকে সংস্কার মুক্তভাবে রসুল চরিত লিখতে সাহায্য করেছে যা ইউরোপের অন্যান্য চরিতকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়নি।

লিংসের এ বই নির্ভরযোগ্য হওয়ার আরও একটা কারণ আছে। দীর্ঘকাল ধরে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। এ দায়িত্বে থাকাকালে নিজের হেফাজতে থাকা দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিগুলোর তিনি যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেন। এ কারণেই তার লেখা রসুল চরিত গতানুগতিক বর্ণনা না হয়ে সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূত্র থেকে তথ্যপঞ্জী আহরণ করে এক অনবদ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে অবিসংবাদী স্বীকৃতি অর্জন করে। অগণিত ইংরেজি ভাষী পাঠকের কাছে এ বই দ্রুত বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়।

দুই

মার্টিন লিংসের জন্ম বৃটেনের ল্যাংকাশায়ারের বুর্নেগিতে, জানুয়ারি ১৯০৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে। তার শৈশবের পুরোটাই কেটে যায় পিতার সাথে তার কর্মস্থল যুক্তরাষ্ট্রে। পরে বৃটেনে ফিরে এসে তিনি বৃস্টলের ক্লিফটন কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে যান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই তিনি ইংরেজিতে বি এ পরে এম এ ডিগ্রি নেন। কিন্তু তরুণ লিংসের জন্য স্বভূমি বৃটেন কোন স্থায়ী আকর্ষণের হাতছানি দেয় না। তার অনেক পূর্বসূরী বুদ্ধিজীবী, অভিযাত্রী ও সাংবাদিকের মতো তিনি প্রাচ্যের 'রহস্যঘেরা' জীবনের টানে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি যান লিথুয়ানিয়ায়। কিছুদিন সেখানকার কাউনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। এরপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বন্ধুর আমন্ত্রণে মিসর এসে হাজির হন। এই মিসরই লিংসের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই সফরের সময় তার বন্ধু এক দুর্ঘটনায় মারা যান এবং বন্ধুর ইংরেজির লেকচারার পদটি গ্রহণ করার জন্য কাকতালীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে অনুরোধ করে। এইভাবে মিসরের সাথে তার বন্ধন তৈরি হয়। মিসর তার জন্য ভবিষ্যতের এক নতুন দরজা খুলে দেয়। তিনি মিসরের ঐশ্বর্যের ধুলোবালিতে গড়াগড়ি দেন।

কায়রোতে তার পরিচয় হয় বিখ্যাত ফরাসী অতীন্দ্রিয়বাদী সুফী দার্শনিক রঁনি গেনঁ (Rene Guenon) এর সাথে। ইসলামের সুফী সাধনার ধারা রঁনি গেনঁের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। সেই আলোড়নের প্রতিক্রিয়ায় তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং ১৯৩০ সাল থেকে কায়রোতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি সাধিলিয়া সুফী তরীকার অনুসারী হন। তার নতুন নাম হয় আবদুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া।

গেনঁ একটি বিশেষ দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন যা Traditionalist Philosophy বা সনাতনী চিন্তাধারা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এ চিন্তাকে বলা যায় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনজাত চূড়ান্ত ভোগবাদ ও বস্তুবাদ সর্বস্ব জীবনের বিরুদ্ধে একটা বড় প্রতিবাদ। গেনঁের চিন্তার মূলকথা ছিল ঐশী জ্ঞান হচ্ছে সময় নিরপেক্ষ। সময়ের জীর্ণতা অতিক্রম করে ঐশী জ্ঞান এক চিরন্তন জগতের আস্বাদ দেয় আমাদের।[১] এই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানই মানুষকে বস্তুবাদী দর্শনের উপজাত যুদ্ধ, মহামারী, সন্ত্রাস প্রভৃতি অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

www.pathagar.com

সেদিক দিয়ে গেনঁ ইউরোপীয় রেনেসাঁ উদ্ভূত যে দর্শন, তার ধারণা এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করেন শুধু মানুষের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা বস্তুগত সমৃদ্ধি এই পৃথিবীর মানুষের বহু আরাধ্য শান্তি আনতে পারে না। যদি সেটা সম্ভব হতো তাহলে আধুনিককালেই আমরা তা দেখতে পেতাম। কারণ একালের মতো বস্তুগত সমৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর কখনো হয়নি।

মিসরের বছরগুলোতে মার্টিন লিংস এই রঁনি গেনেঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবেও কাজ করেন। বলা চলে গেনেঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও দার্শনিকতার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে লিংস ইসলাম কবুল করেন। লিংসের নতুন নাম হয় আবুবকর সিরাজ আদ-দীন। তার ইসলাম কবুলের সনটি ছিল ১৯৩৮। গুরুর মত লিংসও সাধিলিয়া তরীকায় যুক্ত হন। এই তরীকায় তার বিশ্বাস আমৃত্যু অটুট ছিল। সুফী তরীকার সাধনায় তিনি অনেক উপরে উঠে আসেন এবং নিজের যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ের গুনে একপর্যায়ে সুফী জগতে তিনি শেখ বা Spiritual Guide হিসেবে পরিগণিত হন।

গেনেঁর ইন্তেকালের (১৯৫১) পর লিংস তার প্রাক্তন গুরুর সমসাময়িক জার্মান সুফী দার্শনিক থ্যুসফ স্যুনের (Fritjof Schuon) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্যুনও গেনেঁর সমসাময়িক কালেই ইসলাম কবুল করেন। তাসাউফ জগতে স্যুনের গুরু ছিলেন আলজেরিয়ার সুফী শেখ আহমদ আল আলাবী। এই আলাবীর জীবন ও চিন্তাধারা হয় লিংসের পরবর্তী সময়ে পিএইচডি অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও ভোগবাদ প্রধান সমাজে সনাতনী চিন্তাধারা এখন আর কোন ভুঁইফোঁড় বিষয় নয়। ভোগবাদের অভিশাপ থেকে বাঁচবার জন্য সেখানকার অনেক মানুষই আজ সনাতনী চিন্তাধারার অনুসারী হয়ে উঠেছেন। সুফীতত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে প্রেম। এর মধ্যে কোন স্বার্থপরতা নেই। অন্যের অধিকার অস্বীকারেরও সুযোগ নেই। সুফী পরিভাষায় একেই বলা হয় সুলহি কুল -সকলের জন্য শান্তি। সনাতনী চিন্তাধারার অনুসারীরা ইসলামী সুফীতত্ত্বের এই সর্বজনীনতা দিয়ে আজকের দুনিয়ার অসংগতি, বিপর্যয় ও হানাহানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান।

সুফী সাধনমার্গে পৌঁছানোর সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে হযরত রসুল (স.)-এর আদর্শের নৈকট্য অনুভব করা। কারণ সুফীরা মনে করেন রসুল (স.) হচ্ছেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুফী। সুতরাং তার দেখানো পথেই সুফী সাধনায় যথার্থ সাফল্য আসতে পারে। মার্টিন লিংস হয়তো এই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুফীর জীবনচরিত লিখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

পাশ্চাত্য জগতে এখন সনাতনী চিন্তাধারার বড় প্রবক্তা হচ্ছেন Islam and the Destiny of Man এর সুবিখ্যাত লেখক চার্লস লা গায় ইটন (Charles La Gai Eaton) এবং ইরানী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ হোসাইন নসর।

সনাতনপন্থীরা শুধু বস্তুবাদী ও প্রগতিমূলক দর্শনের সমালোচনা করেননি। তারা এই দর্শনজাত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারেও সন্দেহবাদী। তারা মনে করেন জনগণের নেতৃত্ব থাকা উচিত ধার্মিক লোকের হাতে। কারণ তারাই সমাজকে অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে পারে। এই ধরনের ধার্মিক নেতৃত্বাধীন শাসন ব্যবস্থার ধারণা নতুন নয়। মুসলিম জগতের অনেক দার্শনিকই এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার কথা বিভিন্ন সময় আমাদের বলেছেন এবং এদের ধারণামতে এটি হচ্ছে উত্তম শাসন ব্যবস্থা। মার্টিন লিংস

www.pathagar.com

ছিলেন এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার উৎসাহী সমর্থক। এ ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন ঃ Principled Autocracy.[২] সনাতনপন্থীদের ধারণা হচ্ছে অতীতের ব্যবস্থাগুলোই ছিল আদর্শমূলক ও বিশুদ্ধবাদী। যেমন রসুলের যুগটা হচ্ছে মুসলমানদের কাছে মডেল। এ প্রসঙ্গে লিংসের ভাষ্য শোনা যাক ঃ

The initial Islamic community in Mecca and Medina at the time of the Prophet, in its outward aspects, was the perfection of primordial simplicity.[৩]

তদুপরি সনাতনপন্থীরা মনে করেন বিশ্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে এক ধরনের বিকৃতি (aberration)। কেননা অতীতের সভ্যতাগুলো প্রত্যেকটি কমবেশি পূর্বতন ঐতিহ্য ও দর্শনকে আত্মস্থ করে এগিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা যা পুরোপুরি অতীতের সাথে যোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। মার্টিন লিংস তার বিখ্যাত বই The Eleventh Hour এ লিখেছেন ঃ

When in the past a traditional civilization collapsed,it was replaced, sooner or later, by another traditional civilization. There was no modern civilization waiting in ambush to take it over. The present state of affairs has no parallel in the history of the world.[8]

এই কারণেই জীবনের শেষ দিনগুলোতে লিংস তার সমসাময়িক সনাতনপন্থীদের সাথে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন আধুনিক সভ্যতা তার চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করছে। বিশ্বমানবতাকে এটির আর নতুন কিছু দেয়ার মত অবশিষ্ট নেই। লিংসের এসব চিন্তাভাবনার সাথে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। বিশেষ করে এ কালে যখন ইসলামের জ্ঞান জগতে এক ধরনের আলোড়ন চলছে, বুদ্ধিবৃত্তির জগতে কেউ কেউ যেমন আব্দুল করিম সুরুশ, জিয়াউদ্দীন সর্দার ও তারিক রামাদানের মত পন্ডিতরা ইসলামকে আধুনিক সভ্যতার সাথে সমতালে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এক ধরনের সংস্কারের কথা বলছেন তখন লিংসের এই অতীতচারিতাকে আমরা কেমনভাবে দেখব। বিশেষ করে লিংসের প্রস্তাবনা ও চিন্তাভাবনাগুলোকে অনেকেই মনে করেন আধুনিক সভ্যতার ভয়ংকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক ধরনের পলায়নী ভাবনা। লিংস সম্বন্ধে যে যাই ভাবুন না কেন একটা জিনিস আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার প্রত্যেক বড় ধর্মের শিকড় বিস্তৃত অতীন্দ্রিয় এক জগতের সাথে। এই জগতকে বাদ দিয়ে ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। ইসলামের পক্ষেও নয়। সুফীদের বলা যায় সেই জগতের বিশুদ্ধবাদী প্রতিনিধি। লিংসের অতীতচারিতা মানে অতীতে ফিরে যাওয়া নয় এবং সেটা এক প্রকার অসম্ভব। লিংস যা বলতে চেয়েছেন তা হলো ইসলামের এই বিশুদ্ধতা, তার নৈতিক চিন্তা, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের ধরনগুলো অবিকৃতভাবে একালে সংরক্ষণ করতে হবে। না হলে ইসলাম অনুসারীরা আধুনিক সভ্যতার ঢেউয়ে ভেসে চলে যাবে। লিংসের চিন্তাভাবনার মূল্য এখানেই।

এত বড় বুদ্ধিজীবী হওয়া সত্ত্বেও লিংস কিন্তু ছিলেন প্রচারবিমুখ। তার চিন্তাভাবনা বরাবরই তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কখনো তিনি গণমাধ্যমের জন্য লিখেননি বা বৃহত্তর জনগণের উদ্দেশ্যে নিজের কথা বলেননি। এমনকি তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি কখনো বলেননি। যেমন মোহাম্মদ আসাদ

www.pathagar.com

ও মুরাদ হফম্যানের মত পন্ডিতরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলেছেন। তার কোন প্রামাণ্য জীবনীও নেই। সম্ভবতঃ সুফীর অন্তর্লীনতা লিংসকে এমনি প্রচারবিমুখ ও আত্মসমর্পিত করে তুলেছিল।

লিংস ১৯৪৪ সালে ফিসিওথেরাপিস্ট লেসলি স্মালিকে (Lasely Smalley) বিয়ে করেন। কিন্তু কায়রোর জনজীবন ছেড়ে পিরামিডের পাদদেশে এক গ্রামে গিয়ে তিনি বসবাস শুরু করেন। সুফীর অন্তর্লীনতাই তাকে কায়রোর জনচৈতন্য থেকে টেনে নিয়ে পল্লীর নিস্তব্ধতার বুকে আশ্রয় দেয়। সুফী লিংসের কায়রোর জীবনের এক অসাধারণ স্মৃতিচারণামূলক বর্ণনা দিয়েছেন বন্ধু গায় ইটন ঃ

Among my colleagues was an English Muslim, Martin Lings, who had made his home in Egypt . .. . He was a living embodiment of what, untill then, had been no more than theories in my mind, and I knew that I had finally met some one who was all of a piece, whole and consistent. He lived in a traditional home just outside the city, and to visit him and his wife, as I did almost every week, was to step out of the noisy bustle of modern Cairo and enter a timeless refuge, in which the inward and the outward were undivided, and in which the supposed realities of the world to which I was accustomed had but a shadowy existence.[৫]

ইটন তার Islam and the Destiny of Man এ লিংসের সাথে এই সাক্ষাৎকারের মুগ্ধতার কথা বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন লিংসের প্রতি এই মুগ্ধতাই তাকে শেষমেষ নিয়ে যায় ইসলামের দিকে, তারপরে সুফীবাদের জগতে।

১৯৪০-এর দশকটা তিনি মিসরের মাটিতে অনেকটা ছাত্র পড়িয়েই কাটিয়ে দেন। শেক্সপিয়ারের উপর ছিল তার অসাধারণ অধিকার। এই সময় তিনি শেক্সপিয়ারের একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। লিংসের এই শেক্সপিয়ার প্রীতি ছাত্রদের উপরেও প্রভাব ফেলে। তার এক ছাত্র পরবর্তীকালে মিসরের ফিল্ম জগতের তারকা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে।

একদিকে লিংসের শেক্সপিয়ার প্রীতি অন্যদিকে সুফীবাদের প্রতি প্রবল ঝোঁক এই দুয়ের সমন্বয় ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে আরও ৪০ বছর পর তার লেখা শেক্সপিয়ার সম্পর্কিত বই The Secret of Shakespeare – His Greatest Plays Seen in the Light of Sacred Art-এ। শেক্সপিয়ারকে তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন তার সুফীবাদী বিশ্বাসের আলোকে। শেক্সপিয়ার তার নাটকগুলোতে মানবীয় শ্রেষ্ঠতা ও মানব চরিত্রের রহস্যাবলীর যে চিত্র এঁকেছেন, তার নাটকের রূপক, প্রতীক ও কলাকৌশলগুলোকে তিনি যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন এর সবকিছুই লিংস সুফীবাদের বিরাট ক্যানভাসে নিয়ে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। শেক্সপিয়ারের মহত্বকে এই ভাবে Sacred Art-এর আলোকে অসামান্য হিসেবে আর কেউ বিবৃত করতে পারেননি।

তিন

লিংস হয়তো বাকী জীবন মিসরের মাটিতেই কাটিয়ে দিতেন, যদি না তকদীর তার উপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে মিসরে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে

www.pathagar.com

এবং গামাল আবদুল নাসেরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটে। এই রাজনীতির সূত্রে মিসরে শুরু হয় ভয়াবহ ব্রিটিশবিরোধী দাঙ্গা। এতে লিংসের কয়েকজন সহকর্মী নিহত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটিশ কর্মচারীরা হন চাকরিচ্যুত। ঘটনাচক্রে লিংস খালি হাতে বেকারত্ব মাথায় নিয়ে বৃটেনে ফিরে আসেন। কিন্তু একজন সুফীকে, একজন বুদ্ধিজীবীকে বেকারত্ব দিয়ে কি ঠেকিয়ে রাখা যায়?

যে ডিগ্রী দিয়ে তিনি মিসরে চাকরি করে এসেছেন তা দিয়ে বৃটেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়া তার জন্য অসম্ভব ছিল। লিংস তাই নতুন করে লেখাপড়ার সিদ্ধান্ত নেন আর তার স্ত্রী লেসলি ফিসিওথেরাপিস্টের চাকরি নেন। লিংস প্রথমে আরবীতে বি এ পাস করেন এবং পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল ও আফ্রিকান স্টাডিজে নাম লেখান। এখান থেকেই ১৯৫৯ সালে তিনি তার পিএইচডি শেষ করেন। পিএইচডি'র অভিসন্দর্ভই পরবর্তীকালে তার বিখ্যাত A Sufi Saint in the Twentieth Century Shaikh Ahmad al-Alawi : His Spiritual Heritage and Legacy হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ বই সুফী সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। এর মূল বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে একালে আলজেরিয়ার একজন সুফী সাধকের জীবন ও চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে। শেখ আলাবীর চিন্তার কথা বিবৃত করতে গিয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকার সাধিলিয়া সুফী তরীকার ক্রমবিকাশের একটা চিত্রও দিয়েছেন। আবার এই তরীকার কথা বলতে গিয়ে তিনি ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের এক মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে এই দর্শন কিভাবে সাধিলিয়া তরীকাকে প্রভাবিত করেছে তারও বর্ণনা আছে এখানে। বইয়ের শেষে যুক্ত হয়েছে শেখ আলাবীর আধ্যাত্মবাদী কবিতার কিছু তরজমা। সুফীবাদ নিয়ে লিংসের আজীবন আগ্রহ তাকে সুফী দর্শন ও জ্ঞানের গভীরে নিয়ে গেছে। এই গভীরতার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন সময় সুফীবাদ নিয়ে লেখা তার বইগুলোতে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. The Book of Certainty : The Sufi Doctrine of Faith, Wisdom and Gnosis.
২. Ancient Beliefs and Modern Superstitions
৩. What is Sufism
৪. Symbol and Archetype : A Study of the Meaning of Existence

এসব বইয়ে আমরা দেখতে পাই সুফীবাদের এক অন্তর্লীন রহস্যের জগত, যেখানে লিংস অনায়াসে ঘুরে বেড়ান এবং সুফীর ভাষায় কথা বলেন। এই কথা বলার শব্দই আমরা ধ্বনিত হতে শুনি এসব বইয়ের পাতায় পাতায়। এসব বইয়ে তিনি শুধু সুফীবাদের তাত্ত্বিক আলোচনাই করেন না। তিনি সুফীবাদের সর্বজনীনতার কথা বলেন। তিনি একালে সুফীবাদের প্রাসঙ্গিতার কথাও আলোচনা করেন।

The Book of certainty তে তিনি বলতে চেয়েছেন একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় সবচেয়ে মূল্যবান কি জানতে পারে। এটি হচ্ছে সুফী সাধনমার্গে পৌছে সাধক যে জ্ঞানের সন্ধান পান তার এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।

www.pathagar.com

Ancient Beliefs and Modern Superstition এ তিনি দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক মানুষের সমস্যা। যে সমস্যা তাকে ধর্মের উপর আস্থাহীন করে তুলেছে। এই আস্থাহীনতা আধুনিক কুসংস্কারে রূপ নিয়েছে এবং আধুনিক মানুষের ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিএইচডি করার পর লিংস বিখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মচারী হিসেবে যোগ দেন এবং প্রাচ্যদেশীয় পান্ডুলিপি বিভাগের দায়িত্ব পান। এই চাকরি লিংসের বুদ্ধিজীবিতা বিকাশের স্বার্থানুকূল হয় এবং মুসলিম জ্ঞান জগতের এক বিশাল ভান্ডার তার সামনে উন্মোচিত হয়। এখানে কাজ করতে গিয়ে ক্যালিগ্রাফীর উপর তিনি দুটি ক্লাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বই দুটো হচ্ছে ঃ

১. Islamic Calligraphy and Illumination

২. The Quranic Art of Calligraphy and Illumination

জীবনের শেষ দিকে এসে লিংস পবিত্র মক্কা নগরী নিয়ে একটি বই লেখেন। তার আজীবনের স্বপ্ন ছিল রসুলের স্মৃতিবিজড়িত মক্কার খোলা হাওয়ায় তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবেন, জমজমের পবিত্র পানি পান করবেন, সেই সব ধূলিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন যেখানে নাকি রসুল হেঁটেছেন এবং সেই সব মসজিদে নামাজ পড়বেন যেখানে নাকি রসুল নামাজ পড়েছেন। তার এই স্বপ্নের ফলশ্রুতি হচ্ছে এ বই যার নাম Mecca : From Before Genesis Until Now । এ বইয়ে মক্কা নগরীর ইতিহাস যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি লিংস তার অননুকরণীয় ভাষায় কাবা ও হজ্বের কথা লিখেছেন বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে স্ত্রী লেসলির সাথে করা হজ্বের অভিজ্ঞতার কথা। মার্টিন লিংস ১২ মে ২০০৫ এ ইন্তেকাল করেন।

চার

পাশ্চাত্যের মুসলিম জ্ঞান জগতে লিংসের স্থান আজ মোহাম্মদ আসাদ, মুরাদ হফম্যান, আনমারী শিমেল প্রভৃতি দিকপালের পাশেই। তার পান্ডিত্যের সাথে যুক্ত হয়েছিল সুফীর বিণয় ও কোমলতা। ব্যক্তিগত জীবনে লিংস একজন কবিও ছিলেন। The Elements ও The Heralds নামে তার দুটি কবিতার সংগ্রহও রয়েছে। কবিত্ব, পান্ডিত্য ও দরবেশীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার জীবনে, যা শুধু একালে নয়, সবকালের জন্যই এক অসাধারন ঘটনা। মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতে আজ যে ঊষরতার পদধ্বনি শুনছি তার প্রতিরোধে এই মহান সুফী ও পন্ডিতের সাধনা ও অধ্যবসায়ের ধারা আমাদের পথ দেখাতে পারে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Harry Oldmeadow, Journeys East : Western Encounters with Eastern Religious Traditions. World Wisdom Parennial Philosophy Series, 2004.

www.pathagar.com

২. Ehsan Masood, Martin lings : A Traditional Life, Muslim News Online, Issue 194, Friday 24 June, 2005.
৩. Martin Lings, Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources. London : George Allen and Un win, 1983.
৪. Martin Lings,The Eleventh Hour : The Spiritual Crisis of Modern World in the Light of Prophecy and Tradition. Cambridge : Archetype, 2002.
৫. Charles Le Gai Eaton, Islam and the Destiny of Man. Cambridge : Islamic Texts Society, 2004.

www.pathagar.com

ইসমাইল রাজী আল ফারুকী

এক

১৯৮৬ সালের ২৪ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কৃতী অধ্যাপক ইসমাইল রাজী আল ফারুকী ও তার স্ত্রী লুইস লামিয়া আল ফারুকী আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। তার এ শাহাদতের মধ্য দিয়ে এ কালে মুসলিম চিন্তার জগতের এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসে পড়লো এবং একজন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীর কর্মষণা নীরব হয়ে গেল। ফারুকী যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশ্বব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সংলাপের তিনি একজন নিষ্ঠাবান উদ্যোগী বিশেষ করে ইসলামী সমাজের কালোপযোগী রূপান্তর প্রচেষ্টায় তিনি একজন মহান কর্মী ছিলেন।

অধ্যাপক ফারুকী তার জীবনব্যাপী সাধনায় ইসলামকে শক্তিমান ও পয়মন্ত করবার লক্ষ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে (Intellectual Struggle) নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে তার জীবনকে আল্লাহর পথে সংগ্রামরত এক যথার্থ মুজাহিদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অধ্যাপক ফারুকীর জন্য কথাটা আরো বেশি সত্য এ কারণে যে জীবনের প্রথমদিকে একজন ফিলিস্তিনী মুহাজীর হিসেবে এবং পরবর্তীকালে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সৈনিক হিসেবে তাকে লড়াই করতে হয়েছিল। তার ফিলিস্তিনী শিকড়, আরব ঐতিহ্য ও ইসলামের বিশ্বাস এ সবের সমন্বয়ে তার চিন্তা ভাবনা মানসিকতার যে ভূগোল তৈরি হয় তাই পরবর্তীকালে তার লেখালেখি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার উপাদান হয়ে এসেছিল। সন্দেহ নেই একালে আত্মপরিচয় (Identity), বিশুদ্ধতা (Authenticity), সাংস্কৃতিক চাপ ও অনুপ্রবেশ (Acculturation) এবং পশ্চিমী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ একটা বড় ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই ফারুকীর লেখালেখিতে এ সমস্ত বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যদিও তিনি তা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি জীবনের প্রথম দিকে আরববাদ (Arabism) ও ইসলামকে পুরোপুরি অভিন্ন হিসেবে দেখেছেন, পরবর্তীকালে তিনি চিন্তার এই স্তর অতিক্রম করে ভিন্ন একটি মাত্রায় অবস্থান নেন যেখানে তিনি তৌহিদকে সবকিছুর ভরকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তৌহিদকে ভিত্তি করেই বিশ্বাস, জ্ঞান ও আদর্শ সমাজের রূপরেখা নির্মানে অগ্রসর হন।

দুই

অধ্যাপক ফারুকীর জন্ম ১৯২১ সালের ১ জানুয়ারি, ফিলিস্তিনের অন্তর্গত জাফার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। তার পিতা আবদ আল-হুদা আল-ফারুকী ছিলেন একজন বিচারক এবং ফিলিস্তিনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। শৈশবে মক্তবে তার ইসলামী শিক্ষায় হাতে খড়ি

www.pathagar.com

হয়। পরে তিনি ফিলিস্তিনের ফরাসী ক্যাথলিক স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪১ সালে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি নেন। ফারুকী এ সময় আরবী, ইংরেজি ও ফরাসী এ তিনটি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধি ও মননগত সকল প্রেরণা ও কর্মসূচীর জন্য এসব উৎসের দিকে তিনি অকৃপণভাবে হাত বাড়ান। স্নাতক ডিগ্রি নেবার পর তিনি প্রাথমিকভাবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৪৫ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে ফিলিস্তিন সরকারের অধীন গ্যালিলির জেলা গভর্নর নিযুক্ত হন। এভাবে তার ভবিষ্যতের পথ রচনা হতে শুরু করে। কিন্তু তার প্রশাসক জীবনের হঠাৎই একদিন অবসান হয় যখন ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাইলী দখলদার বাহিনী প্রবেশ করে এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ফিলিস্তিনীরা নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে যায়। হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মুসলিম পরিবারের মত ফারুকীর পরিবারও ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে লেবাননে আশ্রয় নেয়। এ ছিল ফারুকীর জীবনের সন্ধিক্ষণ মুহূর্ত। একদিকে দেশান্তর, ফিলিস্তিনীদের উপর আপতিত অপরিসীম দুর্ভোগ অন্যদিকে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা, এসব মিলিয়ে ফারুকীর মনন ও চিন্তার জগতে যে এক ধরনের ঝড় বইতে শুরু করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমরা পরবর্তীতে দেখব কিভাবে এসব ঘটনাগুলো তার মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে।

প্রশাসক জীবনের ইতি ঘটলেও লেখাপড়ার উৎসাহে তার কখনো ভাটা পড়েনি। পারিবারিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার পর ১৯৫২ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারুকী দর্শনে পিএইচডি করেন। কিন্তু এই সময়গুলো তার জন্য ছিল রীতিমত উদ্বেগ ও কষ্টের। অর্থনৈতিক কারণে তাকে একসময় লেখাপড়া ত্যাগ করতে হয় এবং পারিবারিক নির্মাণ ব্যবসায় তিনি জড়িত হন। অবশ্য ফারুকীর অদম্য ইচ্ছা শক্তির সামনে এই সব বাধা বিপত্তি পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি তার এসব দিনগুলোর কথা স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে সার্ডিনের স্যান্ডউইচের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে তিনি ও তার এক চাচাতো ভাই দিনের পর দিন পার করে দিতেন।

যদিও আল ফারুকী পাশ্চাত্য দর্শনে পিএইচডি করেছিলেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তখন চাকরির বাজার ছিল মন্দা তাছাড়া প্রথমদিকে সেখানে তার চাকরি ভাগ্যও ভাল হয়নি। তাই তাকে ফিরে আসতে হয়। তিনি কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ এই চার বছর ইসলামের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে কাটান। ১৯৫৯ সালে তিনি পুনরায় পাশ্চাত্যের আমন্ত্রণ পান এবং ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এই পদে তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কাটান এবং এ সময় খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের উপর গবেষণা করেন। ১৯৬১ সালে তিনি করাচী সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই পদে কর্মরত থাকেন। পরবর্তী বছর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Religions এর ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে. যোগ দেন। একই বছর তিনি পুনরায় সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

www.pathagar.com

হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৮ সালে টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের Islamics and History of Religions এর অধ্যাপক হন। এই পদে ১৯৮৬ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সমাসীন ছিলেন।

আল ফারুকী তার বৈচিত্র্যময় পেশাগত জীবনে অন্ততপক্ষে ২৫টি বই রচনা, সম্পাদনা অথবা তরজমা করেন, একশ'র উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ তৈরি করেন, আফ্রিকা-ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য-দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রায় ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন এবং ৭টি মূল্যবান গবেষণা পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সাথে যুক্ত ছিলেন। এ তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত চিত্ততার প্রকৃষ্ট নজির।

তিন

অধ্যাপক ফারুকীর আরব ঐতিহ্য ও ফিলিস্তিনী শিকড় তার প্রথম জীবনের চিন্তাভাবনায় একটা বড় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। এ সময় তিনি আরবীয়দের শক্তি ও ঐশ্বর্যকে যা তিনি আরববাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তার সাথে ইসলামকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে দেখেছেন। তখন তার ভাবনা চিন্তার প্রধান বিষয়ই ছিল আরববাদ। আর এ সমস্ত চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে On Arabism : Urubah and Religion গ্রন্থে। এ বইতে আরববাদকে তিনি ইসলামী আদর্শ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাণ হিসেবে যেমন উল্লেখ করেন একই সাথে আরবীয় জীবনের আত্মা হিসেবে আরববাদকে দেখানোর চেষ্টাও লক্ষ্যণীয়। তার ভাষায় আরববাদ হলো ঃ ....as old as the Arab stream of being itself since it is the spirit which animates the the stream and gives the momentum.[১]

ফারুকীর ভাষায় আরববাদের সীমান্ত বহু বিস্তৃত যার মধ্যে পুরো মুসলিম উম্মাহ ও আরবী ভাষী অমুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত। আরববাদ শুধু একটি নিছক ধারণার নাম নয়, বরং এটি একটি বাস্তবতা, আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধের নাম যা সকল মুসলমান ও আরবী ভাষী অমুসলমানদের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। তিনি আরববাদকে উম্মাহর শক্তি হিসেবেও উল্লেখ করেন কেননা তিনি মনে করেন আরবী ভাষা এবং আরব সচেতনতা ও মূল্যবোধ (Arab Language, Consciousness and Values) হলো ইসলামের সাধারণ বিশ্বাসের চাবিকাঠি। এ সময় ফারুকীর আরবপ্রেম (Arabophilia) এতই প্রবল ও দৃশ্যমান যে পবিত্র কুরআন শরীফও তিনি আরবীয় চোখ দিয়ে পড়তে থাকেন। যেহেতু কুরআনের ভাষা আরবী তাই ফারুকীর অবশ্যম্ভাবী যুক্তি ঃ ওহীর মূল বক্তব্য বা বাণীও আরবীয়দের উদ্দেশ্যে প্রেরিত।[২] মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে প্রথম কুরআনের বাণীকে তিনি আরবীয়দের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বলে উল্লেখ করেন ঃ তোমরাই মানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে স্বীকৃত। ফারুকীর চিন্তার জগত জুড়ে এ সময় আরববাদই যে প্রধান স্থান দখল করে ছিল তা বোঝা যায় তার আরববাদের উপর চারটি সিরিজ বইয়ের শিরোনামের দিকে চোখ বুলালে ঃ Urubah and Religion, Urubah and Art, Urubah and Society, Urubah and Man। তিনি মনে করেন আরববাদ বা আরব সচেতনতা হচ্ছে ঐশী বাণীর বাহক এবং বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী অংশ।

www.pathagar.com

এই প্রক্রিয়ায় আরববাদ হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে আগত তিনটি ঐশী ধর্মের ইতিহাসের প্রধান নিয়ামক শক্তি। ফারুকীর ভাষায় ঃ Arabism is cointensive with the values of Islam as well as with the meaning of the Hebrew prophets and Jesus.[৩]

ফারুকী আরববাদকে আরবীভাষী অমুসলমানদের প্রকৃত আত্মপরিচয় হিসেবেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন যদিও তার কথা হলো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে এইসব অমুসলমান আরবীভাষীরা তাদের সেই পরিচয় ভুলতে বসেছে। একই কারণে তিনি মনে করেন আরবীভাষী খ্রিস্টানরা এখনও কিছুটা 'সেমিতিয় পবিত্রতা' রক্ষা করে চলেছে কিন্তু পশ্চিমী খ্রিস্টানরা যীশুর বাণী থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ফারুকী পরবর্তীকালে যখন ইসলামের দিকে ঝুকেছেন তখনও আরববাদের প্রতি মায়া তিনি পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। ইসলামের ভিতরে যে আরববাদের এক স্থান আছে সে কথা তিনি অবলীলায় বলতে ভোলেননি ঃ .....the Quran is inseparable from its Arabic form, and hence ... Islam is ipso facto inseparable from urubah.[৪]

ফারুকীর এসব চিন্তাভাবনা বিশেষ করে আরববাদকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে ফেলার ধারণা এক ধরণের অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। এটা সত্য গত শতকে যখন ফিলিস্তিনে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসী কায়দায় ইহুদীরা পরাশক্তির সহযোগিতায় তাদের অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম দেয় তখন অসংখ্য আরব গৃহহীন ও দেশান্তরী হয়। এর ফলে তাদের অবচেতন মনে এক ধরনের আরবীয় সচেতনতা দানা বেঁধে ওঠে। তারা ভাবতে থাকে আরব আবার একই সাথে মুসলমান হওয়ার জন্য তাদের উপর এ জুলুম নেমে এসেছে। এই অনুভূতিই তাদের মনে যে Counter-reaction এর জন্ম দেয় তার থেকেই আরববাদের মতো এক ধরনের অতিশয়োক্তিমূলক ধারণার উদ্ভব অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়তো ফারুকীর পক্ষেও এ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও বের হয়ে আসা সম্ভব হয়নি। যদিও ফারুকী তার আরববাদকে কিছু আরবীয় খৃষ্টান যেমন কনস্টানটাইন জুরাইক ও মাইকেল আফলাক কর্তৃক প্রচারিত আরব জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন এবং বলেছেন আরব জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ইউরোপীয় প্রভাবের ফল। অন্যদিকে তার আরববাদ হচ্ছে কুরআনের বিশ্বজনীন ধারণা প্রসূত এবং সে হিসেবে তা সকল মুসলমানের উত্তরাধিকার। পাশ্চাত্য প্রভাবিত আরব জাতীয়তাবাদকে তিনি নতুন ধরনের শুউবিয়া-গোত্রবাদের সাথে তুলনা করেছেন এবং উম্মাহর সংহতির পক্ষে যে এটি ক্ষতিকর সে কথাও তিনি বলেছেন। তবে ফারুকীর আরববাদ যে কুরআনের ধারণা প্রসূত সে কথাও পুরোপুরি বিচারোর্ধ নয় তা বলাই বাহুল্য।

ফারুকী যখন তার আরববাদের ভাবনা চিন্তা নিয়ে মেতে ছিলেন তখন তাকে বলা হতো মুসলিম আধুনিকতাবাদী। তিনি মূলতঃ পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়িয়েছেন এবং সেখানেই কাটিয়েছেন। পশ্চিমের শ্রোতাদের কাছে ইসলামকে তুলে ধরতে সেই সময় তিনি পশ্চিমী পরিভাষার সাহায্য নিয়েছেন এবং ইসলামকে তিনি যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রগতির ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই জন্য অনেকে বলেছেন তিনি আলোক প্রাপ্তি (Enlightenment) ও প্রোটেসট্যান্ট বিশ্ববিক্ষায় (Protestant work ethic) উজ্জীবিত হয়ে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

চার

গত শতকের ৫০ ও ৬০ এর দশকে অধ্যাপক ফারুকী তার ইসলাম ও বিশ্বভাবনাকে যেমন দেখেছেন আরববাদের আয়নায় তেমনি ৭০ ও ৮০'র দশকে এসে তার মধ্যে আমরা রূপান্তর লক্ষ্য করছি। তিনি একটু একটু করে তার পুরনো অবস্থান থেকে সরে আসছেন এবং তার আত্মপরিচয়কে ইসলামের মধ্যে সমাহিত করার চেষ্টা করছেন। একইভাবে ইসলামই হয়ে উঠছে তার সকল চিন্তা ভাবনার নির্ণায়ক। তার এ রূপান্তরের স্মৃতিচারণা করেছেন ফারুকী এভাবে ঃ

There was a time in my life .. .. when all I cared about was proving to myself that I could win my physical and intellectual existence from the West. But, when I won it, it became meaningless. I asked myself : who am I ? A palestinian, a philosopher, a liberal humanist? My answer was : I am a Muslim![৫]

ফারুকী তার চিন্তার কেন্দ্রস্থলকে যখন আরববাদের পরিবর্তে ইসলামের মধ্যে এনে নির্দিষ্ট করলেন তখন তার এ যাবৎকালের সব পরিকল্পনার ছকই ওলটপালট হয়ে গেল। তার আরববাদের উপর লেখা বই পত্র ও প্রবন্ধরাজির জায়গায় স্থান নিল ফারুকীর ইসলামকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ফসল। ফারুকীর লেখালেখিতেই ইসলাম শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিল না, বরং এটাই হলো সকল কিছুর নিয়ামক। তিনি ইসলামকে এবার উপস্থাপন করলেন বিশ্বজনীন আদর্শ, জগৎব্যাপী বিশ্বাসীদের সাধারণ আত্মপরিচয় এবং সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য উত্তম পরিচালক ও নীতি হিসেবে। ইসলামের বিশ্বচিন্তা এখন থেকে ফারুকীর জীবন ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে এবং একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি তার লেখালেখি, বক্তৃতা, বিবৃতি, ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় সরকারসমূহের সাথে যোগাযোগ, সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করবার লক্ষ্যে তিনি অগ্রসর হন। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ফারুকীর এসব চিন্তা ভাবনা ও কর্মকান্ডের ফল হচ্ছে তার অসাধারণ দুটি গ্রন্থ ঃ একটি Tawhid : Its Implications for Thought and Life এবং অন্যটি The Cultural Atlas of Islam। এসব বইয়ে আল ফারুকীর বিশ্বভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামী আয়নায় এবং যাবতীয় সমস্যা যেমন আত্মপরিচয়, ইতিহাস, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়মকানুন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুকেই তিনি ইসলামী নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। ইসলামী দুনিয়ার জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমানদের শক্তি ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলোকে তিনি ইসলামের ভিত্তিতেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তেমনি মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকারও তিনি খুঁজেছেন ইসলামী আদর্শের আলোয়। মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্ব, মুসলিম শিক্ষা ও সমাজের পশ্চিমীকরণ, দারিদ্র, অর্থনৈতিক নির্ভরতা, রাজনৈতিক ভেদাভেদ, অকার্যকর সামরিক সুবিধা, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এসব কিছুর সমাধান খুঁজতে পুরনো আরববাদের স্থলে তিনি তখন ইসলামের পথে হাঁটতে শুরু করেছেন।

ফারুকীর মতে ক্রুসেড, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, জায়নবাদ এবং পরাশক্তিসমূহের নব্য উপনিবেশবাদ এখনো পাশ্চাত্যের মনোভাব ও নীতি প্রণয়নে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তেমনি মুসলিম দুনিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করলেও উপরোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। উপনিবেশ আমলে শুরু হওয়া মুসলিম সমাজের পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়া আজও মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোকে বিপযস্ত করে চলেছে। জাতীয় সরকারগুলো আজও সেই 'ধ্বংসাত্মক পশ্চিমী জীবাণু' প্রচারে ব্যস্ত যা কিনা পুরনো গোত্রবাদের (tribalism) নব্য সংস্করণ এবং এটি মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল ও টুকরো টুকরো করে ফেলছে। পশ্চিমীকরণ মূলতঃ মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধি ও প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে কিন্তু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে করেছে ধূল্যবলুণ্ঠিত। একই কারণে জাতীয় সরকারগুলো ও তার বশংবদ আধুনিক এলিটশ্রেণী ধর্মকে গুরুত্বহীন করে ফেলেছে। আধুনিকায়ন পরিকল্পনার নামে কোন বিচার বিশ্লেষণ ব্যতীত চোখ বুজে পশ্চিমা মূল্যবোধকে মুসলিম সমাজের ভিতর অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। যার ফলে মুসলমানরা ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে গেছে এবং পরিশেষে তারা যা হতে পেরেছে তা হলো আধুনিক মানবের এক ব্যঙ্গচিত্র (Caricature of Modern Man)।

ফারুকী আঠার ও উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে আবির্ভূত পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলো সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করলেও তার কাছে মনে হয়েছে পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এদের যথাযথ প্রস্তুতি ছিল না এমনকি হাসান আল বান্নার মুসলিম ব্রাদারহুডও ইসলামী সমাজের পূর্ণ রূপরেখা জনগণের সামনে যথার্থ অর্থে তুলে ধরতে পারেনি বলেই তার মনে হয়েছে। এসব আন্দোলনগুলোর অর্জন যাই থাকুক না কেন মুসলিম উম্মাহ কিন্তু দিনে দিনে আরো দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্যের উপর তার অবিরাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতার কারণে। চারিদিকে ফারুকী তাই মুসলিম উম্মাহর দুঃখজনক ছবি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তার ভাষায় মুসলিম উম্মাহ এখন ঃ ....divided, depressed and dependent, an easy prey to its internal and external enemies- বিভক্ত, হতাশাগ্রস্ত এবং নির্ভরশীল, ভিতর বাইরের শত্রু কর্তৃক যে কোন সময় আক্রান্ত হওয়ার মুখোমুখি।[৬] ফারুকী তাই মনে করতেন মুসলিম সমাজের মধ্যে আজ যেমন দরকার তাজদীদ (পুনরুজ্জীবন) তেমন প্রয়োজন ইসলাহ (সংস্কার)।

ফারুকীর একজন খ্রিস্টান বন্ধু একবার বলেছিলেন ফারুকী মনে করতেন ইসলামের ভিতরে এখন একটা রিফরমেশন প্রয়োজন এবং বন্ধুটি বিশ্বাস করতেন সেই রিফরমেশনের অবশ্যম্ভাবী লুথার হবেন ফারুকী। ফারুকী হয়তো বাস্তব কারণে লুথার হতেন না, কিন্তু লুথারের কাজ তিনি করতেন। সম্ভবতঃ লুথারের পরিবর্তে তিনি একজন মুজাহিদ হওয়াই অগ্রাধিকার দিতেন কারণ মুজাহিদের কাজ হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। হয়তো সে কারণেই অতীতের ত্রুটিসমূহকে সংশোধন করে মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে শেষ জীবনে তিনি তার সবরকমের লেখালেখি ও প্রচেষ্টাসমূহকে নিবদ্ধ করেছিলেন। ইসলাম ও পাশ্চাত্য দর্শনে সমানভাবে প্রবুদ্ধ ফারুকীর বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনকে সামাল দেবার প্রস্তুতি ছিল। ফারুকীর মধ্যে একদিকে ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যাতা মোহাম্মদ আবদুহু ও ইকবালের প্রভাব যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি মোহাম্মদ ইবনে আবদ আল ওহাবের পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা ভাবনাও উঁকি দিয়েছে। আবদ আল ওহাবের মতোই ফারুকী ইসলামের উপর সুফীবাদের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া পাশাপাশি

www.pathagar.com

ইসলাম বহির্ভূত সাংস্কৃতিক প্রভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মানব জীবনের সব কিছুকে তৌহিদের শিকড়ের সাথে যুক্ত করেছেন। এর মানে ইসলামকে হতে হবে জীবনের সবকিছুর মাপকাঠি।

অন্যদিকে আল ফারুকীর মধ্যে মোহাম্মদ আবদুহুর মতো ইসলামকে যুক্তিবাদের নিরিখে যাচাই বাছাই করার একটা প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। যেমন তিনি বলেছেন ঃ Knowledge of the divine will is possible by reason, certain by revelation.[৭] ফারুকীর লেখালেখির মধ্যেও আবদ আল ওহাব ও মোহাম্মদ আবদুহু এই দুই মনীষীর প্রভাব যথেষ্ট বিশেষ করে Tawhid : Its Implications for Thought and Life এ এদের প্রভাব স্পষ্ট। ফারুকী এখানে একদিকে তৌহিদকে যেমন ইসলামের ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন তেমনি অন্যদিকে ইজতিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন পাশাপাশি আধুনিককালে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ও আরোপযোগ্যতার কথাও ভেবেছেন। তৌহিদকে তিনি উপস্থাপন করেছেন ধর্মীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সারাৎসার, ইসলামের মৌলিক বিন্দু এবং ইতিহাস, জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ, উম্মাহ, পরিবার ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি বৈশ্বিক শৃঙ্খলার নীতি সূত্র হিসেবে। তৌহিদই হলো ইসলামের বিশ্বচিন্তার হৃদয় ও ভিত্তি । ফারুকীর ভাষায় ঃ

All the diversity, wealth and history, culture and learning, wisdom and civilization of Islam is compressed in this shortest of sentences – La ilaha illa Allah (There is no God but God).[৮]

ইসলামকে এইভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ফারুকীর বড় সাফল্য হচ্ছে তিনি একই সাথে তার স্বধর্মী ও পশ্চিমী শ্রোতাদের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। পশ্চিমী সভ্যতার জ্ঞান তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর তার শক্ত অধিকার থাকায় এবং পশ্চিমী আধুনিকতা মুসলিম সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তার সজাগ দৃষ্টি থাকায় তিনি ইসলামকে নতুন যুগের আলোয় ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন বিশেষ করে পশ্চিমী চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত মুসলমানদের কাছে ইসলামকে সেইভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ফারুকীর মত হলো মুসলিম সমাজের ক্ষতকে পশ্চিমী আধুনিকতা দিয়ে সারানো যাবে না, মুসলিম সমাজের ভিতর থেকেই এই ক্ষতের উপশম বের করতে হবে। ইসলামকে তাই তিনি মানুষের জন্য এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ধর্ম হিসেবে তুলে ধরেন এবং এটিকে তিনি সত্যিকারের প্রেমশীলতা, মানবিকতা, নৈতিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে হাজীর করেন। তৌহিদকে তাই তিনি মনে করেন, এটি সৃষ্টি করে ঐক্যবোধ, ব্যক্তিত্ব এবং সত্যের উপলব্ধি যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি অবনত করে এবং পরিণতিতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নিরসন করে, ইসলামের নৈতিক ভিত্তিকে সমুন্নত করে এবং জ্ঞানের সকল শাখায় ইসলামীকরণের পথকে নিশ্চিত করে। ফারুকী স্পষ্ট করে বলেন ইসলাম মানুষকে খন্ড খন্ড করে না দেখে এক অখন্ড, অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। তার ভাষায় ঃ

The Islamic mind knows no pair of contraries such as "religious-secular", "sacred-profane", "church-state", and in Arabic, the religious language of Islam, has no words for them in its vocabulary.[৯]

www.pathagar.com

পাঁচ

জ্ঞানের ইসলামীকরণের ধারণা ফারুকীর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার বাস্তব পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে ছিল নতুন প্রজন্মের মুসলমানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে কিন্তু ইসলামী আদর্শের ছায়ায় সুশিক্ষিত করে তোলা। তিনি মনে করতেন মুসলিম দুনিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের কারণ হচ্ছে এখানকার দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতিস্বরূপ জীবনদৃষ্টির অভাব। ফারুকী সমস্যার গভীরতা বিশ্লেষণ করে বলেছেন দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে সমাজে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, ফলে মুসলিম উম্মাহর সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। এর একদিকে আছে সেকুলার এলিটসমূহ অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতৃত্ব। আল ফারুকী এই দুর্যোগের প্রতিকার হিসেবে দুটি উপায় দেখিয়েছেন ঃ প্রথমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী সংস্কৃতি ও নীতিসমূহকে বাধ্যতামূলক করা দ্বিতীয়ত আধুনিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ করা।

ফারুকীর এই প্রস্তাবনার মধ্যে তার প্রিয় বিষয় ইসলামী আধুনিকতাবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী উভয়বিধ ভাবনার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। তিনি মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে বলেছেন ইসলামের সৃষ্টিশীলতার উৎস ইজতিহাদ পরিত্যাগ, ওহী (Revelation) ও আকলের (Reason) মধ্যে বিরোধিতা, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দ্বৈততা। এ কারণেই ফারুকী চিন্তা ও কর্ম, আদর্শ ও বাস্তবায়নের মধ্যে ঐক্যের কথা ভেবেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সর্বোপরি নিজের টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুসলিম ছাত্রদেরকে নিয়ে তিনি তার 'জ্ঞানের ইসলামীকরণের' নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ইসলামী ইতিহাসের একজন নিবিড় পাঠক হিসেবে ফারুকী এটা বুঝেছিলেন আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতা নামের পশ্চিমী দানব মুসলিম সমাজকে ভেঙ্গেচুরে পুরদস্তর ওলটপালট করে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকরা মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়াকে পাশ্চাত্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল বানিয়ে ছেড়েছে এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশ্চাত্যকরণ করে মুসলমানের ঐতিহাসিক চেতনাবোধকে দুর্বল করে দিয়ে একটি হীনম্মন্য জাতিতে পরিণত করেছে। এটা বোঝা দরকার পাশ্চাত্যের সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের নিজস্ব জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার প্রতিফলন মাত্র এবং এই শিক্ষা আমাদের জীবন ও দর্শনের সাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়। প্রত্যেক শিক্ষার পিছনেই একটা দর্শন থাকে এবং সেই দর্শনই জাতির লক্ষ্যকে সমুন্নত করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন সেকুলার শিক্ষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় তখন তারা ভালো করেই জানতো এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিজাতীয় গবেষণা ও নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবে এবং এই কাজে তারা শতভাগ সফল হয়েছে। তাই ঔপনিবেশিক শাসকরা বিদায় নিলেও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজও মুসলিম মনকে উপনিবেশিত করে রেখেছে। বিগত কয়েকশ বছর ধরে সেকুলার জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। পশ্চিমীরা যে অর্থে জাতীয়তাবাদী কিংবা সেকুলার জীবন দর্শনে বিশ্বাসী সে অর্থে মুসলমানদের 'বিশ্বাসী' হওয়া সম্ভব নয়। আত্মদর্শন ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ইসলামই হচ্ছে মুসলিম সমাজের জীবন দর্শন। ইসলাম বর্জিত সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন মুসলমানরা তাই

www.pathagar.com

গত দুশ বছরে তেমন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির শুধু শুধু অনুলিপি করেছে মাত্র। এই জন্যই মুসলিম চিন্তার জগতে আজকাল যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে দাবি করছেন তারা আসলে মূলতঃ সুশিক্ষাবিহীন, তাদের না আছে সংস্কৃতি চেতনা, না আছে লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। কারণ তারা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম চৈতন্যকে ধারন করেননি। পশ্চিমী চিন্তাকে মুসলিম সমাজে প্রতিস্থাপিত করে আধুনিকতার নকলনবিস সৃষ্টি করেছেন মাত্র। যার ফলে মুসলিম সমাজের ঐক্য, সংহতি ও মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলোর উপর পাশ্চাত্যের খবরদারীও বাড়ছে। ইকবাল, মোহাম্মদ আসাদ, সাইয়েদ কুতুবের মত পন্ডিতেরা পশ্চিমের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম সমাজকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন। ইসমাইল ফারুকী মুসলিম জগতের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক de-colonization-অ-উপনিবেশীকরণের সিলসিলাকে আরো এগিয়ে নিয়েছেন এবং বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অ-উপনিবেশিকরণের লক্ষ্যে বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। তিনি জ্ঞানের বিষয় বা শাখা হিসেবে মানবিক, সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ইসলামী দর্শনের আলোকে পুনর্গঠিত করবার উপর জোর দিয়েছেন বিশেষ করে তৌহীদের মূলনীতিকে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল করবার কথা বলেছেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি ইসলামী সংস্কারের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উপায়গুলো বারবার ওলটপালট করে দেখেছেন এবং তার ব্যাখ্যাত ইসলামের অর্থের সাথে মুসলিম জীবনে তার তাৎপর্যপূর্ণ স্থানকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন। একই সাথে মুসলমানদের শিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসও চালিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন মুসলিম সমাজে তার অপাশ্চাত্যমুখী (Non-Western Model) উন্নয়নের মডেল বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তিনি তার মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাই বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেন। ফারুকী শিকাগোতে American Islamic College প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘদিন এর সভাপতি হিসেবে কাজ চালান। ১৯৮১ সালে ভার্জিনিয়াতে তিনি International Institute of Islamic Thought প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। তার স্বপ্ন ছিল আমেরিকায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু তার এ মহৎ পরিকল্পনা জীবদ্দশায় বাস্তবে রূপ পায়নি। ফারুকীর কথা হলো মুসলিম সমাজ বিশেষ করে এর বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে পশ্চিমীকৃত হয়ে উঠছে তার মোকাবিলায় জ্ঞানের ইসলামীকরণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠিত International Institute of Islamic Thought জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ইসলামীকৃত করে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও স্রোত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। এইভাবে মুসলিম সমাজ পশ্চিমীকৃত না হয়েও আধুনিক ও যুগোপযোগী চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে পারবে এবং তারা ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে থেকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে।

ছয়

ফারুকীর আর একটা আগ্রহের কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এটি হলো আন্তঃধর্মীয় আলোচনায় (Interfaith Dialogue) তার অপরিসীম আগ্রহ। ইসলাম সম্পর্কে তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা পশ্চিমের সামনে তুলে ধরবার পরেও তিনি

www.pathagar.com

মনে করতেন বিশ্বের স্থিতিশীলতা ও শান্তির স্বার্থে ইব্রাহীমের সন্তানদের (ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমান) ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক একটি সাধারণ প্লাটফরমে বোঝা পড়া প্রয়োজন। ফারুকীর এ আগ্রহের ফসল হচ্ছে তার বিখ্যাত বই Trialogue of the Abrahamic Faiths ও Historical Atlas of the Religions of the World। এছাড়া ১৯৬৭ সালে তার প্রকাশিত বই Christian Ethics খ্রিস্টান ধর্মের উপর এ কালের এক বিদগ্ধ মুসলমানের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ। একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও দাওয়া কর্মী হিসেবে তিনি আমৃত্যু ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের আলোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও একটি সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধকে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ভিত্তি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

এই সাধারণ নৈতিক ভিত্তিকে তিনি বলেছেন হানিফ যা তার ভাষায় incorporates every noble thought in the old Testament।[১০] 'হানিফ' কথাটা ফারুকীর লেখাজোখায় বিশেষ করে ধর্মগুলোর পারস্পরিক আলোচনায় বারবার ফিরে এসেছে। 'হানিফ' বলতে তিনি ইব্রাহীমের ঐতিহ্যকেও বুঝিয়েছেন যা সবরকম শিরক ও পৌত্তলিক রীতির বিরোধী এবং নৈতিকভাবে স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী। ১৯৭০'র দশক থেকেই অন্যধর্মের সাথে আলোচনায় তিনি একজন প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তার লেখা, বক্তৃতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপগুলোতে তার অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বিশেষ করে তার লেখা ও উপস্থাপনা এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপে মুসলিম অংশগ্রহণের নীতি তৈরিতে সহায়ক হয়।

ফারুকী তার বিখ্যাত বই Christian Ethics লিখেছিলেন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবার সময়। এ সময় খ্রিস্টীয় চিন্তা ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনি বিপুল অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এ সূত্রেই তিনি তার বিখ্যাত সহকর্মী উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ, চার্লস এ্যাডামস, স্ট্যানলি ব্রাইস ফ্রস্ট প্রমুখের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ পান।

Christian Ethics-এ ফারুকীর বুদ্ধিজীবিতা, চিন্তার বৈদগ্ধ্য ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের বিস্তৃতি যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে। এ বইতেই তিনি আন্তঃধর্মীয় আলোচনার একটি নীতি উপস্থাপনা করেছেন, যেটাকে তিনি বলেছেন metareligious approach এবং এই নীতি কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করবে না। ফারুকী এই ধরনের আলোচনায় হীনম্মন্যতামূলক (apologetic) ও বিতর্কিত (polemic) বিষয়কে পরিহার করার কথা বলেছেন এবং সুনির্দিষ্ট, বিষয়ভিত্তিক পান্ডিত্যমূলক আলোচনার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন অতীতের এ সমস্ত আলোচনা নানা রকম দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার স্মৃতিজাত এবং মিশনারী ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের বিকৃতির ফলে সে সমস্ত আলোচনার ফলাফল শুভ হয়নি। তাই তিনি এমন একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন যা প্রচলিত সংকীর্ণ ধর্মতত্ত্বকে অতিক্রম করে এক ধর্মতত্ত্বমূলক উচ্চতর ধর্মের (theology free metareligion) পাটাতনে বসে সব ধর্মের ভিতরকার বুঝাবুঝির ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করবে। ফারুকীর এই প্রস্তাবনা এমন এক পদ্ধতির কথা বলেছে যা পারস্পরিক আলোচনার ভিতকে এগিয়ে নিতে পারে।

www.pathagar.com

তার ভাষায় ঃ

.. .. higher principles which are to serve as the basis for the comparison of various systems of meanings, of cultural patterns, of moralities, and of religions; the principles by reference to which the meanings of such systems and patterns may be understood, conceptualized, and systematized.[১১]

সাত

গত ২০০ বছর ধরে আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতা মুসলিম সমাজকে যেভাবে ভেঙ্গেচুরে বিপযস্ত করে দিয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। এ সময়ের মধ্যে মুসলিম সমাজে যত দ্রুততার সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনগুলো এসেছে তার তুলনাও একেবারে নেই বললে চলে। মুসলিম দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, আধুনিকায়ন ও পশ্চিমায়ন, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনার প্রসার, নানা রকমের গৃহদাহ ও আঞ্চলিক যুদ্ধ এ সময়েরই ঘটনা এবং এই সব ঘটনা যুগপৎভাবে ইসলামের যে বৈশ্বিক পরিচয় তা অনেকটা বিবর্ণ করে দিয়েছে। আশার কথা হচ্ছে ইতিহাসের এই নজিরবিহীন ধাক্কাতেও মুসলিম সমাজ বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে বিশেষ করে তার ভিতরের শক্তিকে একত্রিত করে যাবতীয় বৈরী পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিককালে মুসলিম দুনিয়ায় এমন কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি দৃশ্যমান যারা একই সাথে ইসলামী ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানে প্রবুদ্ধ এবং এরা আজকের যুগের সমস্যাকে সামনে রেখে ইসলামকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। ইসমাইল ফারুকী এই ধারার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি যিনি শুধু আত্মিকভাবে ইসলামের ধারণা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরেননি ; নিজের কাজকর্ম, গবেষণা, শিক্ষকতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, পভৃতির মাধ্যমে তিনি তার যুক্তিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, বলেছেন এবং এমন স্পষ্টতা ও বিশ্বাসের সাথে কাজ করেছেন যা তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। ফারুকী মনে করতেন ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মের ধর্ম। বিশ্বাস ছাড়া যেমন কর্মের মূল্য নেই, তেমনি চর্চা ছাড়া বিশ্বাসও অকেজো হয়ে যায়। ফারুকী তার জীবনব্যাপী সাধনায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন একজন মুসলমানের জীবনে কিভাবে বিশ্বাস আর কর্ম জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এ কালের ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য এটা বড় একটা দৃষ্টান্ত বটে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Quoted in "Ismail Raji al-Faruqi" in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. New York : Oxford University Press, 2001.

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. Ismail Raji al Faruqi, Al Tawhid : Its Implications for Thought and Life. Virginia : International Institute of Islamic Thought, 1995.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. Ismail Raji al-Faruqi, Islam and Other Faiths. Virginia : International Institute of Islamic Thought, 1998.
১১. Quoted in "Ismail Raji al-Faruqi" in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. New York : Oxford University Press, 2001.

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আশরাফ

এক

সৈয়দ আলী আশরাফ হচ্ছেন আধুনিক মুসলিম শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, যার স্বপ্ন ছিল মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করে মুসলিম মানস তৈরি করা। কলোনীর চাপিয়ে দেয়া সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রে মুসলিম মানসে এক ধরনের পরাধীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংস্কৃতি মুসলিম মনোজগতকে উপনিবেশিত করে ফেলেছে এবং মুসলিম মানসে নানা বিচিত্রমুখী দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সৈয়দ আশরাফ চেয়েছিলেন আজকের দিনের মুসলমানের এই মনোজাগতিক উপনিবেশকে এক বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Faith based education) চালু করে হঠিয়ে দিতে। মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক অ-উপনিবেশীকরণের পাশাপাশি চিন্তা ও বুদ্ধির অ-উপনিবেশীকরণ আজও পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সূত্রে পশ্চিমের প্রভুরা মুসলিম দেশগুলোতে যে সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় তা ইসলামী অভিজ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে হঠিয়ে দেয় এবং এই ব্যবস্থার পথ ধরে নব জাগ্রত ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে পশ্চিমী আধুনিকতাই চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম সমাজের এই অংশের কাছে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেকুলার শিক্ষার সূত্রে এরা এমন এক মানস ভুবন গড়ে তোলে যা রুচি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেশজ ও ইসলামী না হয়ে হয় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। এই বিশিষ্ট পাশ্চাত্য মানসিকতার কারণে তারা সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় খুঁটি হিসেবে কাজ করে এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পাহারাদার হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। সৈয়দ আলী আশরাফ খেয়াল করেছিলেন মুসলিম দেশগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও চেতনার স্বাধীনতা পুরোপুরি অর্জন করেনি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রেখে একটি স্বাধীন ও প্রতিবাদী মানস গড়ে তোলা অসম্ভব। এই কারণেই মুসলিম দেশগুলোতে সৈয়দ আশরাফ জ্ঞানের সেকুলারাইজেশনের বদলে জ্ঞানের ইসলামীকরণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভিতরে এক মুসলিম মানস গড়ে তোলা যারা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষালম্বন না করে মুসলিম সমাজের স্বার্থের পাহারাদার হবে। সৈয়দ আশরাফ একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই তৎপরতাকে তিনি প্রতিহত করারও চেষ্টা করেছিলেন। তার এই বিশিষ্ট ভূমিকার পিছনে তার ঐতিহ্যচেতনা ও মানসগঠন একটা মূল্যবান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে হয়। মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান কবি এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব। তার সংস্কৃতি চেতনা ছিল স্বাতন্ত্র্যধর্মী। ভারতীয় উপমহাদেশের দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যে মুসলিম আত্মচেতনা বিকশিত হয়েছে তাকে তিনি আমাদের স্বকীয়তা ও অস্তিত্বের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় মনে

www.pathagar.com

করতেন। কবি হিসেবেও তিনি ছিলেন ঐতিহ্য ও শিকড় সন্ধানী। আধুনিকতার নাস্তি অতিক্রম করে তিনি বাংলা কবিতার জমিনে এক আধ্যাত্মিকতার জাল বুনেছেন।

দুই

সৈয়দ আলী আশরাফের জন্ম ১৯২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা গ্রামের মাতুলালয়ে। তার পিতৃনিবাস ছিল মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে। তার পিতা সৈয়দ আলী হামেদ ছিলেন আলোকদিয়ার বিখ্যাত পীর পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন ঢাকার মীরপুর মাযারে শায়িত বিখ্যাত সাধক সৈয়দ শাহ আলী বাগদাদী (রহ.), যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য পঞ্চদশ শতকে সুদূর বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন।[১] পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে সৈয়দ আশরাফের লেখাপড়ার শুরু। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা হয় আগলা গ্রামে। ১৯৩১ সালে তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে ঢাকায় চলে আসেন এবং আরমানীটোলা সরকারি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকেই সৈয়দ আশরাফ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজিতে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান এবং ১৯৪৬ সালে কৃতিত্বের সাথে এম এ পাস করেন। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে বৃটেনের কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজিতে বি এ অনার্স এবং ১৯৫৬ সালে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে English Poetry and its Audience শীর্ষক সন্দর্ভের জন্য কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সূচিত রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে সৈয়দ আশরাফ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। চল্লিশের দশকে রেনেসাঁ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকামী চিন্তাভাবনার একটা তাত্ত্বিক বুনিয়াদ তৈরি করবার চেষ্টা করে। এটি মূলতঃ কলকাতার দৈনিক আজাদকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। ঢাকায় এর ছায়া প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলিম ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা এবং নিজস্ব ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চা। রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে সৈয়দ আশরাফের সম্পৃক্তি উত্তরকালে তার চিন্তা-ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কর্মজীবনে সৈয়দ আলী আশরাফ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে তার গৌরবময় শিক্ষকতা জীবনের শুরু। তারপর একে একে রাজশাহী, করাচী, সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ ও উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজির অধ্যাপনা করেছেন। এর মধ্যে ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত তিনি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।

সৈয়দ আশরাফ তার দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবন থেকে উপলব্ধি করেন মুসলিম দেশগুলোতে চলমান সেকুলার বা ধর্মীয় মূল্যবোধহীন শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নতির সহায়ক নয়। কারণ জ্ঞানসমূহের মর্মমূলে ইসলামী ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হলে তা একটি ধর্মীয় প্রভাবিত সমাজের কোন কাজে আসবে না। উপরন্তু সেকুলার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করলেও তাদের চরিত্রের উপর

www.pathagar.com

এর কোন প্রভাব নেই। এতে মানুষের নৈতিক চরিত্রের কোন উন্নতি হয় না। তাই তিনি বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ মানবতার যে ধ্যান ধারণা ধর্ম আমাদের দিয়েছে, সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে শুধু শুধু বিকৃত করেছে। ফলে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যবোধহীন হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে নানা রকম দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। জ্ঞানের ইসলামীকরণের লক্ষ্য হলো মানুষকে এই দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করে বিশ্বাসভিত্তিক শিক্ষা নীতি প্রতিষ্ঠা করা।[২]

সৈয়দ আশরাফ তার মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সৌদি আরবের মরহুম বাদশাহ ফয়সলকে চিঠি দেন এবং সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে পশ্চিমা ধ্যান ধারণার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে তিনি সৌদি আরবসহ দুনিয়ার বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদদের নিয়ে ১৯৭৭ সালে মক্কায় প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও সচিব হিসেবে কাজ করেন। এ ব্যাপারে তাকে সৌদি সরকার ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দেন। এসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন ড. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী, ড. আবদুল হামিদ আবু সুলেমান, তাহা জাবির আল আলওয়ানী প্রমুখ। তারপর সৈয়দ আশরাফ ১৯৮০-৯৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে এ ধরনের আরো কয়েকটি বিশ্ব সম্মেলনের নেতৃত্ব দেন এবং বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার ইসলামীকরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। এ ব্যাপারে তিনি কয়েকজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের সাথেও যোগাযোগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের প্রতিশ্রুতি কাগজে কলমে সীমিত থেকেছে এবং এইসব সম্মেলনের সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু তিনি হতাশ হননি। একজন আদর্শবাদীকে কখনো কখনো একাকী লড়াই করতে হয়। সৈয়দ আলী আশরাফও সেই কাজ করেছেন এবং তিনি তার লক্ষ্য থেকে কখনো পিছিয়ে আসেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি তার ব্যক্তিগত উদযোগে তার স্বপ্নের শিক্ষার দর্শনকে বাস্তবায়ন করবার জন্য কেমব্রীজে ইসলামিক একাডেমী এবং ঢাকায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কার্যকরী অর্থে তিনি তার জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণের ধারণা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালের ৭ আগস্ট সৈয়দ আলী আশরাফ ইন্তেকাল করেন।

তিন

রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে এবং এই আন্দোলনের মর্মবাণীর সাথে গভীর সম্পর্ক রেখে সৈয়দ আলী আশরাফ তার কাব্য সাধনা শুরু করেন। সেই সূত্রে আমরা তার কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্যের অঙ্গীকার ও নবরূপায়ণ দেখতে পাই। তিনি কবিতায় স্বাতন্ত্র্য সন্ধানী ও স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী, একই সাথে তার কবিতা গভীরভাবে মিস্টিক ভাবাপন্ন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন সুফী তত্ত্বরসিক ও সাধক; পাশাপাশি সুফী পরিবারের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা তার চেতনায় সংক্রমিত হয়েছিল। এই কারণে তার কবিতার শরীরে এক ধরনের সুফীর আত্মগত অনুভূতি, গূঢ় অন্বেষা, মরমীর অনুধ্যান, মৃদু মোলায়েম উচ্চারণ, মনোলগ বা আত্মকথন ও নির্ভার নিবেদিত চিত্ততা মিশে আছে। এক্ষেত্রে সৈয়দ আশরাফের কবিতার প্রাণ রসায়ন হলো বিশ্বাস। বাংলা কবিতায় তার সমসাময়িক অনেক কবিরা যখন নাস্তিক্যকে লালন করেছেন, নাস্তিক্যকে আধুনিকতার

www.pathagar.com

চূড়ান্ত রূপ মেনে মান্য করেছেন, তিনি তখন হেঁটেছেন আধ্যাত্মিকতার পথে। সুফীরা যেমন এই পৃথিবীর আলো-আঁধার, মঙ্গল-অমঙ্গল, থিসিস-এন্টিথিসিস অতিক্রম করে এক সত্যলোকে যাত্রা করেন তেমনি সৈয়দ আশরাফ তার কবিতার ভিতর দিয়ে হেঁটেছেন এক মহাজাগতিক সত্তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। কবিতার ভিতর দিয়ে তার দিব্যদৃষ্টির উন্মোচন ঘটেছে এমনিভাবে ঃ

তাই আজ সময়ের বাঁধ
ভেঙ্গেচুরে চুরমার হল
তাই আজ স্মৃতির গোলাপ
স্বপ্নের কমলে মিশে গেল,
তাই তার গাঢ় নীল চোখে
কেয়ামৎ প্রতিভাত হল ;
এক হল- শান্তিদীপ্ত সৃজন আলোক
আর সুপ্ত অন্ধকারে বিধ্বস্ত দ্যুলোক।[৩]

আধ্যাত্মিকতার উপকূলে উপনীত হবার যে প্রচেষ্টা সৈয়দ আশরাফের কবিতায় আমরা দেখি তা একটা নতুন দিকনির্দেশনার মত এবং তা বাংলা কবিতার জন্য সুখকর ঘটনাও বটে। পশ্চিমী আধুনিকতার প্রভাবে বাংলা কবিতায় যে অস্থিরতা, চিত্তচাঞ্চল্য, সংশয় ও অনিশ্চয়তা বাসা বেঁধেছে তার উপশমে এ ধারার কবিতা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন অবশ্যই। কবিতায় নেতি, নাস্তি, পারক্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে টি.এস. এলিয়ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কারণ তার কাছে মনে হয়েছিল আধুনিক সাহিত্যে মানব জীবনের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই তিনি ইউরোপীয় জড়বাদের জয়যাত্রার যুগে তার কবিতায় এক ধর্মীয় সভ্যতার জাগরণের আভাস দিয়েছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল এক মরমী আধ্যাত্মিকতার তুলি স্পর্শ ছাড়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। এলিয়টের মত সৈয়দ আশরাফও তার কবিতায় এক আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের রূপচিত্র এঁকেছেন। তবে পার্থক্য হচ্ছে এলিয়ট যেখানে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য থেকে চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন, সেখানে সৈয়দ আশরাফ ইসলামী ঐতিহ্য থেকে চিত্রকলা ও প্রতীক নিয়ে এসেছেন। তিনি কেন নির্দিষ্ট করে ইসলামের পথ বেছে নিয়েছেন সে সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন ঃ কারণ সে পথেই নিজের মুক্তির সন্ধান পেয়েছি, মানবিকতার চরম উৎকর্ষ উপলব্ধি করেছি, এবং হৃদয় সন্দেহ-চিহ্নিত সম্ভাবনার জগত পার হয়ে স্থির দৃঢ় একীনের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই জগৎকেই, সেই অনুভূতিকেই, সেই নতুন উপলব্ধিকেই প্রকাশ করার নতুন ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক ও ছন্দের সন্ধান করেছি। বাধ্য হয়েই সম্পূর্ণ নতুন প্রতীক সৃষ্টি করেছি। উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও যেন এই অভিজ্ঞতার সত্তা দোলা জাগায় এবং সে বুঝতে সক্ষম হয় কিভাবে এক এক অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটি মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হয়।[৪]

চার

সৈয়দ আলী আশরাফের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে তিনি ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করে

www.pathagar.com

বিকল্প একটি সংস্কৃতির রেখাচিত্র নির্মাণ করার স্বপ্ন তার ছিল। এটি ছিল তার দিক দিয়ে এক হিসাবে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথা তিনি ভাবেননি। কারণ তিনি জানতেন সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে যদি মানুষের অন্তর্জগতে পরিবর্তন আনা যায়, তবে রাজনৈতিক পরিবর্তন অবধারিতভাবে আসবে। সবার অলক্ষ্যে তাই তিনি মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন সম্ভব না হয়, তবে মুসলিম দুনিয়ার আরদ্ধ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আসবে না। আর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে যেটুকু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া গেছে তাও বিপন্ন হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সৈয়দ আশরাফ শুধু প্রচলিত কলোনীর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন চাচ্ছেন না, তিনি এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা ভাবছেন যা হবে ইসলামের জীবন দর্শনভিত্তিক। মুসলিম দুনিয়ায় কি ধরনের শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন তার প্রতিবেদন ও ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে আলী আশরাফ একেবারে প্রথম কর্তব্য হিসেবে যার উল্লেখ করেছিলেন তা অন্য কিছু নয়, সেটি হচ্ছে একটি বিশ্বাসভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। আবার শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে তিনি নতুন মানুষ তৈরি করার কথাও ভাবছেন। এইভাবে সাংস্কৃতিকভাবে নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠা মানুষ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। সৈয়দ আশরাফ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার এই ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত ও উর্বর করতে চেয়েছিলেন শিক্ষার সংস্কার ও মুসলিম মানস তৈরি করার ভিতর দিয়ে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মুসলিম মানস তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন তার কাছে? কারণ কলোনীর শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার ভিতর দিয়ে যে সংস্কৃতি দেশবাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা হল পরাধীনতার। এই পরাধীনতার সংস্কৃতি একালের মুসলমানের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সৈয়দ আশরাফ চেয়েছিলেন আজকের মুসলমানের মনোজাগতিক উপনিবেশকে শিক্ষার ভিতর দিয়ে নির্মূল করতে। কলোনীর শিক্ষা মানে হচ্ছে সেকুলার শিক্ষা। পশ্চিমীরা এটিকে আদর করে নাম দিয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এ শিক্ষা কি অর্থে আধুনিক এবং আমাদের সমাজের জন্য কতখানি উপকারী তা কখনও আমরা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিনি। আলী আশরাফ সাহেবই আমাদের মধ্যে প্রথম এ রকম শিক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এই নীতি শিক্ষা দেয়া যে ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর, সেই অর্থে জাতির জন্যও শুভ নয় সে কথাটি তিনি সরাসরি বলেছেন। এরকম শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবটি নষ্ট করার জন্য পাঠ্যসূচীতে ইসলামের নীতি ও দর্শনের পাঠ নেয়া জরুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর এ ভাবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নিজের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে দিলেন। সেকুলার শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য কি? ওহী বা প্রত্যাদেশভিত্তিক যে জ্ঞান, যার উপরে সব ধর্মের বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের চেতনার মুক্তি এবং এই মুক্তিকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষকরণ বা সেকুলারাইজেশন। একালের পন্ডিতরা বলে থাকেন সমাজের, রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তিমনের এই সেকুলারাইজেশন হচ্ছে মানব ইতিহাসে আধুনিকতার সবচেয়ে বড় অবদান। আবার এইখানে এসে আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাও একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পশ্চিমের

www.pathagar.com

পন্ডিতদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া আধুনিকতা হয় না। অন্যদিকে আধুনিকতা সেকুলারাইজেশনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। ধর্মের যে আধ্যাত্মিক ভিত্তি, আধুনিকতা তা স্বীকার করে না। মানুষের সাথে তার সৃষ্টিকর্তার যে সম্পর্ক, যার ভেতর দিয়ে ধর্মের স্বরূপ উন্মোচিত হয় তা আধুনিকতার কাছে একান্তই গুরুত্বহীন। কোন মূল্যবোধই আধুনিকতার কাছে চূড়ান্ত নয়, সবই আপেক্ষিক। ধর্ম বলছে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। আধুনিকতা বলছে মানুষ এসেছে জৈব বিবর্তনের পথ ধরে। ধর্ম বলছে সুদ নির্মূলের কথা। আজকের আধুনিকতা দাঁড়িয়ে আছে সুদী অর্থনীতির উপর। ধর্ম মানুষকে খলিফাতুল্লাহর (Vicergent of God) মর্যাদা দিয়েছে। আধুনিকতা বলছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতার কথা। এই জীবন দৃষ্টির পার্থক্যের জন্যই আধুনিকতাকে ধর্ম পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ইসলামের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাকে হজম করা সম্ভব হয়নি। সৈয়দ আলী আশরাফ সাহেব লিখেছেন ঃ

It is impossible to compromise between Islam and Secularism. Where secularization means a modern scientific approach to knowledge and way of life no adjustment is acceptable. What the Quran says in a similar context is true. Muslims can not be modern in the above sense. There can not be a compromise between Kufr and iman, faithlessness and faith, secularism and Islam.[৫]

আমাদের এখানে কেউ কেউ দাবি করেন ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ঠিক ধর্মহীনতা নয়। এ কথাটা স্রেফ অজ্ঞতার নামান্তর। ধর্মনিরপেক্ষতার যে মৌলিক দর্শন, যার উদ্ভব মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ভেতর দিয়ে, তা কিন্তু ধর্ম বস্তুটাকে বরাবর পাশ কাটিয়ে যেতে আগ্রহী। এই জাতের ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের প্রতিদিনের জীবন ধারাকে অর্থ, কাম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার গহ্বরে ঠেলে দেয়। এগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই সেকুলারিজম আমাদের সুকুমারবৃত্তি ও প্রবণতাগুলোকে ভোগবাদের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে রাষ্ট্র এই সেকুলারিজমকে সারকথা বলে গ্রহণ করতে চায়, তা কিন্তু অনায়াসে হয়ে উঠতে পারে দুর্নীতির, প্রতারণাজাত কার্যসিদ্ধির, ও সমবেত চরিত্র হননের মাধ্যমে। ধর্ম না থাকলে নীতির খুঁটি মজবুত হয় না। পশ্চিমের ইঙ্গিতে আমাদের কালের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে সেকুলারিজম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরিণতি যে আমাদের কারও কাছেই আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠতে পারেনি তা তো চোখের সামনেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে আধুনিকতার শক্তির পিছনে যে প্রযুক্তির ভূমিকা রয়েছে তাকেই একালে আমরা ভেবে নিয়েছি সর্বশক্তিমান হিসেবে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহর সর্বশক্তিমানত্ব নিয়ে আমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে তৈরি করছে এক ধরনের ঔদ্ধত্য। অন্যদিকে ধর্ম বলছে, মানুষ প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার আল্লাহ প্রদত্ত। এই অনুভূতি মানুষকে নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। আজকের সেকুলার শিক্ষা তাই কতকটা ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনীত করে তোলার শিক্ষাও বটে। আধুনিকতার এই রূপের দিকে ইঙ্গিত করেই বোধ হয় ইয়েটস লিখেছিলেন। ঃ Things fall apart ; the centre can not hold. আমাদের দেশে কলোনীর সময় চালু হয়েছিল সেকুলার শিক্ষা। সেই শিক্ষার সুবাদে আমাদের এখানে অনেকেই সমাজের

www.pathagar.com

নানা স্তরে নানানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমের নীতি ও দর্শনের কবলে পড়ে তাদের মাথা একরকম ধোলাই হয়ে গেছে। তারা এখন নিজেদের ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজকেও ঐ পশ্চিমের চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই রকমভাবে দেখার ফলে সমাজের প্রকৃত ছবিটা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে তারা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই তারা পুরো সমাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। আর তখনই সমাজে শুরু হয় নানা রকমের বিশৃঙ্খলা।

অন্যদিকে আছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার অনুসারীরা। এই দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি জীবন দর্শনের প্রতীক। দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে এ দুটি ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ। তাই স্বভাবতই দুটি ভিন্ন দর্শনাশ্রিত মানুষের লক্ষ্যও অভিন্ন হতে পারে না। মুসলিম দুনিয়ায় এ দুটি পরস্পরবিরোধী মতানুসারীরা আজ রীতিমত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। আলী আশরাফ সাহেবের ভাষায় ঃ . . . .. the two systems are creating conflicting groups who have already started fighting among themselves.[৬] একালের সেকুলারিস্ট ও ইসলামপন্থীদের এই দ্বন্দ্ব কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। এ অনেকটা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতো। ইউরোপে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের লড়াই কিংবা উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের চেয়ে এর তীব্রতা আজকাল কোন অংশেই কম নয়। এই বিভেদ-বিভাজনের নীতি পুরো মুসলিম উম্মাহকে খন্ডিত ও দুর্বল করে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদের বড় সাফল্য হচ্ছে মুসলিম সমাজের এই আদর্শিক বিভাজন। যার প্রেক্ষাপটে আজ মুসলিম দেশগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মুসলিম সমাজের আদর্শিক ঐক্য ও সংহতি দরকার। সেই ঐক্য ও সংহতি আসতে পারে এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে। কলোনীর চাপিয়ে দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান চাহিদা ও আবেগকে নির্ভর করে এমন একটা ব্যবস্থার বিকাশ হওয়া দরকার যাতে যুগের প্রয়োজন যেমন মিটবে, তেমনি জনগণের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধির দিকটাও যথার্থ অর্থে প্রতিফলিত হবে। এ কারণেই আলী আশরাফ সাহেব শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রযুক্তির মানবিকীকরণের কথা বলছেন। শুধুমাত্র প্রাযুক্তিক জ্ঞান মানুষকে দুর্বিনীত করে তোলার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রযুক্তিকে মানবীয় কল্যাণের পথে পরিচালিত হওয়া চাই। আলী আশরাফ সাহেব লিখেছেন ঃ

It is an attitude which must be changed from being one which is totally technological, to one which restrains science and technology and redirects it as an instrument for moral benifit. The humanization of technology is possible only if man accepts the principle that he must worship his creator and not his own achievements, that he must live in harmony with nature and learn to control his passions and live without conflict or war or being swayed by policies of self-aggrandisement and love of power.[৭]

www.pathagar.com

এমনি প্রেক্ষাপটে জ্ঞানের ইসলামীকরণের কথাটা এসেছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণের এই আন্দোলনে সৈয়দ আলী আশরাফ একালে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে গেছেন। মুসলিম দেশগুলোতে সেকুলার শিক্ষা কাজ করছে না, আর এ শিক্ষার ফলে মুসলিম উম্মাহ পরস্পরবিরোধী দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ছে। তাই এমন একটি শিক্ষা চাই যা শিক্ষার্থীর জীবনে, মননে, কর্মে ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ইসলামের মূল্যবোধকেই চূড়ান্ত বলে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেহেতু সেকুলার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, আমাদের আংশিক প্রয়োজনই মাত্র পূরণ করে, আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির সম্ভাবনা যেহেতু এর মাধ্যমে অসম্ভব এবং সবচেয়ে বড় কথা এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক গোলামীকে একরকম কবুল করে নিচ্ছি; তাই মুসলিম দুনিয়ার জন্য এ কোন রকমই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই গোলামী থেকে মুক্তির স্পৃহার সঙ্গে যুক্ত আলী আশরাফের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি জ্ঞানের ইসলামীকরণ, যার লক্ষ্য তার ভাষায় ঃ

The aim of education, according to the Ummah in general, is to produce a good Muslim who is both cultured and expert – cultured in the sense that he knows how to use knowledge for his spiritual, intellectual and material progress, and expert in the sense that he is a useful member of the community.[৮]

সৈয়দ আলী আশরাফের এই চেষ্টা নামকাওয়াস্তা ছিল না, ছিল অনেকখানি সংহত ও ফলপ্রসূ। শিক্ষার জন্য শুধু ক্যাম্পাস, দালানকোঠা কিংবা সুযোগ সুবিধার কথা না বলে তিনি কার্যকর অর্থেই ইসলামী কারিকুলাম তৈরি, টেক্সটবুক প্রণয়ন এবং ইসলামী নীতির আলোকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর কাজ করেছিলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন এই সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক কাজগুলো সুসম্পন্ন না করা গেলে ইসলামী শিক্ষার ধারণা কার্যকরী করা কঠিন হবে। ইসলামী শিক্ষা তারাই দিতে পারবেন যাদের অন্তর ও মন একই সাথে ইসলামী নীতির আলোয় উজ্জীবিত, অন্যদিকে জ্ঞানের বিশেষ শাখায় যাদের থাকবে যথেষ্ট দখল ও কর্তৃত্ব। শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিস, জ্ঞানার্জনের উপর জোর দিয়েছে এই কারণে সব জ্ঞানই ইসলামী হয়ে উঠবে এমন ভাবা যেমন অমূলক তেমনি কোন প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারোপযোগিতা বাড়ালেই সেটি ইসলামী রং ধারণ করবে সেটিও তেমনি ভুল। আলী আশরাফ সাহেব বলেছেন আজকের মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের নানা রকম জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে হবে শুধুমাত্র তা গ্রহণ বা অন্ধ অনুকরণ করে নয় বরং তার যথাযথ সমালোচনা দরকার গ্রহণ-বর্জনের একটি সুনির্দিষ্ট ইসলামী নীতিমালার ভিতর। যখন এই বিষয়টি মাথায় রেখে কোন বিষয় নিয়ে টেক্সট রচনা করা যাবে তখনই তা কেবলমাত্র ইসলামী হয়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়া ছাড়া মুসলিম বিশ্বের শিক্ষায়তনগুলো নামসর্বস্ব ইসলামী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। এর বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্শক্তি ব্যতীত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখান থেকে সত্যিকারের মুসলিম বেরিয়ে আসবে না।

পাঁচ

ইরানী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ হোসাইন নসর সৈয়দ আলী আশরাফের এই সব কাজকে বলেছেন Intellectual Jihad- বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ।[৯] প্রকৃত অর্থেই একালের মুসলিম

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের এই জিহাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং এটি ছাড়া মুসলিম বিশ্বের ভাগ্যও ফেরানো সম্ভব নয়। আলী আশরাফ সাহেব নিজের জীবনে, কাজে ও কর্মে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য এই নমুনা সৃষ্টি করে গেছেন। তার শিক্ষা দর্শনভিত্তিক ব্যবস্থাপনাগুলো মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য এখনো উজ্বল পথের ইশারা দিয়ে চলেছে। আলী আশরাফ সাহেব মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে আধুনিক পশ্চিমী জ্ঞানের মূলে যে দার্শনিক চিন্তাধারা রয়েছে তার প্রাচীর ভাঙ্গা যাবে না। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিদ্যার কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন, ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি ও এর শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে একটি নতুন পৃথিবী নির্মাণের, যেখানে বস্তুগত অগ্রগতি, নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ ও যুক্তিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের প্রতি বাধ্যবাধকতাও থাকবে। এ ক্ষেত্রে তিনি ইমাম গাজ্জালীর পথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী ও মানুষের কল্যাণের জন্য জ্ঞানের উৎস বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জরুরী বলে মনে করেছেন।

নবজাগরণের এই বিবেকী পথিকৃৎ ও বিদ্রোহী তাই রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি, সাম্রাজ্যবাদের তোয়াক্কা করেননি। তিনি ভেবেছেন তার উম্মাহর মুক্তির কথা, স্বপ্নের কথা। সেই অর্থে তিনি একজন বিশ্বনাগরিকতাবাদীও বটে। ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি তাকে হাত ধরে নিয়ে গেছে ক্ষুদ্রতর গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার বৃত্তে। এইভাবেই তিনি বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছেন যা মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, আর এক গোলামীর শিকলে বেঁধে ফেলে। সৈয়দ আলী আশরাফ এখানেই একটি পথের নির্দেশ রেখে গেছেন একালের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. বরেণ্য : সৈয়দ আলী আশরাফ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা : মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মিয়া ও অন্যান্য। ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
২. ইশরাফ হোসেনকে দেয়া সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার। উদ্ধৃত ঃ বরেণ্য : সৈয়দ আলী আশরাফ স্মারকগ্রন্থ।
৩. সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা। ঢাকা : শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯১।
৪. সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতার ভূমিকা।
৫. Syed Ali Ashraf, New Horizons in Muslim Education. Cambridge : Hodder And Stoughton, 1985.
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. Forward, New Horizons in Muslim Education by Syed Hossein Nasr.

www.pathagar.com

আলীয়া আলী ইজেতবেগভিচ

এক

একালে বসনিয়া ট্রাজেডি আমাদেরকে চিনিয়ে দিয়েছে তার সংগ্রামী নেতা আলীয়া আলী ইজেতবেগভিচকে; একই সাথে আমরা দেখেছি ইজেতবেগভিচের ধীমান নেতৃত্বে একটি জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এক রক্তাক্ত জনযুদ্ধ। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ক্রমজাগ্রত ইউরোপীয় আন্দোলনের মুখে সেখানে তুর্কী খেলাফতের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, যার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কী খেলাফতের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। সেই থেকে আমরা প্রায় ভুলেই বসেছিলাম ইউরোপের বলকান অঞ্চলে এক বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী বাস করে, যারা আমাদের বিশ্বাসের ভাই (Brother's in Faith)।

পুরো বিশ শতক জুড়ে মুসলিম দুনিয়ার নানারকম রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে আটকে আমরা বলকান মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নীরব আয়োজনকে কখনো যথাযথ গুরুত্ব দিতে পারিনি। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসন বলকানের মুসলমানদের এক গভীর আত্মপরিচয়ের সংকটে নিপতিত করে। তারা আমাদের বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। কেবলমাত্র স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশনের দুর্বল ও নড়বড়ে অবস্থানের কারণে সেখানকার মুসলমানরা আবার খবরের শিরোনাম হয়। যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশনের সব সদস্য দেশ যখন একে একে স্বাধীনতার পথে এগুতে থাকে, তখন মুসলিম অধ্যুষিত বসনিয়াও একই পথ গ্রহণ করে। সেখানকার মুসলমানদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই হয় কাল। অন্যদের ক্ষেত্রে এক রকম নীতি গ্রহণ করা হলেও মুসলিম বসনিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি প্রযুক্ত হয়, যাকে বলে একই যাত্রায় দুই ফল। মুসলমানদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য প্রতিবেশি সার্বিয়া ও কতকাংশে ক্রোয়েশিয়া তাদের উন্নত সামরিক শক্তি নিয়ে নিরস্ত্র বসনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার পরবর্তী ইতিহাস কমবেশি সকলেরই জানা।

বসনিয়ার প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি আগ্রাসীরা অবরুদ্ধ করে ফেলে; পুরো দেশটাই হয়ে ওঠে একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এতে প্রায় নিরীহ ২ লাখ বসনীয় হত্যার শিকার হয়, অসংখ্য নারী হয় ধর্ষিত আর বিপুল সংখ্যক বসনীয় হয় দেশ ছাড়া। এ কালে ইউরোপে এ রকম গণহত্যার নজির নেই। সেকুলার ইউরোপের উদরের মধ্যে দীর্ঘ চার বছর ধরে এই জাতিগত ও ধর্মীয় নির্মূলীকরণের অভিযান চললো কিন্তু পাশ্চাত্যের বিবেকবান (?) নীতি-নির্ধারক ও সেকুলার রাজনীতিবিদরা প্রকৃতপক্ষে এতে টু শব্দটিও করেননি। শুধু যুদ্ধ বন্ধের শান্তিপূর্ণ বিবৃতি ও আহ্বানের মধ্যে তাদের কর্মকান্ড সীমিত রেখেছেন। এ রকম গণহত্যার কারবালা যদি বসনিয়ার মুসলমানদের ক্ষেত্রে না হয়ে ইউরোপের অন্যত্র খ্রিস্টানদের উপর চলতো তাহলেও কি পাশ্চাত্যের নীতি নির্ধারকরা এমনি চুপ করে বসে

www.pathagar.com

থাকতেন? বসনিয়ার ট্রাজেডি নতুন করে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের সম্পর্কের একটা ধারা তৈরি করে দিয়েছে। অন্তত এটুকু আজকে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে পাশ্চাত্য নিজেদের মধ্যে বা অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যতখানি সেকুলার থাকুক না কেন, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অসূয়া ও ধর্ম চেতনার আবেগ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারেনি। আর এ কারণেই বসনিয়ার ট্রাজেডি যা আসলে সেখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ সার্ব ও ক্রোয়াটদের এক সর্বাত্মক ক্রুসেড, পুরো পাশ্চাত্যের নীরব অনুমোদনে সম্ভবপর হতে পেরেছে। এ গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল জাতি হিসেবে বসনীয় মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া এবং ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা সূচনাতেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। যুদ্ধের সময় ইউরোপের নীতি-নির্ধারকদের কাছ থেকে এ রকম একটা ধারণা আমরা পেয়েছি।

বসনীয় মুসলমানদের এই গভীর সংকটের দিনে আমরা তাদের নেতা হিসেবে দেখেছি আলীয়া ইজেতবেগভিচকে। তার প্রবল ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার যুক্তি, অসমসাহসিকতা বসনীয় মুসলমানদের ধ্বংসের কিনার থেকে মুক্তির সম্ভাবনাকে প্রোজ্জ্বল করেছে। বসনীয়দের দুর্দিনে তিনি যেমন তার রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রচারণা চালিয়েছেন, অন্যদিকে আগ্রাসী সার্বীয়দের বিরুদ্ধে বসনীয়দের প্রতিরোধ যুদ্ধকেও সংগঠিত করেছেন। একটি দুর্বল অবস্থানে থেকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ কথা নয়। তার উপর পুরো পাশ্চাত্যের উদাসীন অবহেলা ও ভ্রুক্ষেপহীনতার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধ পরিচালনা করা কথার কথা ছিল না। এমনি অবস্থায় পাশ্চাত্যের নীতি-নির্ধারকরা আবার জাতিসংঘের মাধ্যমে বসনিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা (Arms embargo) আরোপ করে তাদের আত্মরক্ষার ন্যূনতম অধিকারটুকুও গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছিল। আমরা জানি না ইজেতবেগভিচের মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল আর সেই মানসিক চাপকে তিনি কিভাবে গভীর ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। যখন তার দেশের নারীরা ধর্ষিত হচ্ছিল, যখন সারাজেভোর বাজারে এসে ক্ষেপণাস্ত্র পড়ছিল আর নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছিল, যখন সমস্ত শহরগুলোতে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও খাদ্যের সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় পুরো বসনিয়া একটা জাহান্নামে পরিণত হয়েছিল তখন ইজেতবেগভিচ কি করে সেই দিনগুলো পার করেছেন? তাকে আমরা নিরন্তর দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটাছুটি করতে দেখেছি। একদিকে পাশ্চাত্যের নীতি-নির্ধারকদের কাছে সকাতরভাবে তার দেশের উপর আপতিত আগ্রাসনকে বন্ধ করবার জন্য তিনি বিভিন্ন ফোরামে অনুরোধ জানাচ্ছেন। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে সাহায্যের জন্য অকাতরে আহ্বান জানাতেও দ্বিধা করছেন না। নিজের কওমের জন্য আত্মত্যাগী এই রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা আবার জানবাজি রেখে শত প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিরোধ যুদ্ধের বাতিটি শেষ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি আকস্মিকভাবে সার্বীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন, তার প্রাণনাশের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বজনমতের চাপে সার্বীয়রা তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। দার্শনিকের ধৈর্য ও স্থিরতার গুণেই বোধ হয় ইজেতবেগভিচ এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তিনি এ কালের যথার্থ সালাহউদ্দীন। ইজেতবেগভিচ যে রাজনীতিবিদ সেটি

www.pathagar.com

আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তিনি দার্শনিক। সত্তর দশকে ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন ঃ যেখানে মসজিদ ও টেলিভিশন ট্রান্সমিটার থেকে বিপরীতধর্মী বাণী প্রচারিত হয় সেখানে কি ভালো আশা করা যায়?[১] দার্শনিকের পর্যবেক্ষণই বটে। তার এই পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী বলে গাল দেয়। কিন্তু গাল দিয়ে কি কোনো দার্শনিককে স্তব্ধ করা যায়? দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ব্যর্থতা ও বিশ্বব্যাপী সাম্য সাধনে অসফল পুঁজিবাদের বাইরে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে অদূর ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য তিনি ইসলামের মডেলকে হাজির করেছেন। তৃতীয় ধারার বিকল্প হিসেবে ইসলামের পুনরাবির্ভাবের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন জোরালোভাবে। জগত ও জীবনের ক্যানভাসে ধর্মের অবশ্যম্ভাবিতা যারা নির্মাণ করতে চেয়েছেন আলীয়া তাদেরই একজন। স্থূল বস্তুবাদ আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে এসেছে। আলীয়া গভীরভাবে দেখেছেন বস্তুবাদের উপজাত হিসেবে আজ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে অসাম্য, অনাচার আর রক্তক্ষরণ। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ধর্মের মৃন্ময়ী জগতে আশ্রয় নেয়া জরুরী। আলীয়া বিশ শতকের পাশ্চাত্যের মননকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের দেখিয়েছেন ইসলামই হতে পারে আমাদের আগামী দিনের সেই সমাধান সূত্র।

দুই

আলীয়ার জন্ম বিশ শতকের গোড়ার দিকে, ১৯২৫ সালে। রাষ্ট্রিকভাবে যুগোশ্লাভিয়া তখন অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অধীন। আলীয়া জন্মগতভাবে ইউরোপের সন্তান হলেও তিনি ছিলেন সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য। তার ভাষায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন এই সময় ছিল মুসলমানদের জন্য ভয়ানক দুর্দিন। তুর্কী খেলাফত তখন একটা স্মৃতি। আর মুসলিম দুনিয়া নিপতিত হয়েছে ইউরোপীয় বশ্যতার নিগড়ে। তিনি লিখেছেন ঃ

In the early 1940's the Muslim world was in a very bad way. There were only a few independent Muslim countries. We regarded this as an untenable situation, and saw Islam as a living idea that must bring itself up to date while preserving its essence. We were dissatisfied with the way things were in the Muslim world, dominated as it was by foreigners, through the presence either of their militaries or their capital.

চল্লিশ দশকের প্রথমভাগে মুসলিম দুনিয়ার অবস্থা ছিল খুব খারাপ। মাত্র কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হিসেবে টিকে ছিল। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল এটা একটা আত্মপ্রত্যয়হীন অবস্থা, যদিও আমরা ইসলামকে একটা জীবন্ত ধারণা হিসেবে লালন করতাম যা তার অন্তর্গত সারাৎসার নিয়েই আধুনিককালের উপযোগিতা অর্জন করবে। বিদেশী ফৌজ অথবা পুঁজির দ্বারা তখনকার মতো নিয়ন্ত্রিত মুসলিম বিশ্বের অবস্থাদৃষ্টে আমরা মোটেই খুশি হতে পারিনি।[২]

আলীয়া আরও লিখেছেন তার পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন বেলগ্রেড থেকে। ১৮৬৮ সালে বেলগ্রেড মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেলে সেখানকার কিছু মুসলমান সামাকে চলে

www.pathagar.com

আসেন। তুর্কী খলিফা সুলতান আব্দুল আজীজ তাদের সাভা ও বসনা নদীর ধারে কিছু জমি দেন, সেখানে নতুন মুসলিম জনপদ সামাক গড়ে ওঠে। এই সামাকেই আলীয়া ইজেতবেগভিচের জন্ম। তার পিতা ছিলেন সামাকের একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায় তিনি যথেষ্ট সফলতা দেখাতে পারেননি। আলীয়ার বয়স যখন মাত্র দুই বছর তখন তিনি সারাজেভো চলে আসেন। আলীয়ার ভাষায় ঃ That is whay I feel more like a man from Sarajevo than from Samac.

সামাকের চেয়ে সারাজেভোর লোক হিসেবে পরিচয় দিতেই আমি পছন্দ করি।[৩]

এই সারাজেভোতেই আলীয়ার শৈশব, যৌবন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিনগুলো কাটে, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে এই শহরেই তিনি সফলতা পান আবার এই শহরে বসে তিনি তার জাতির মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন।

আলীয়ার শৈশবের দিনগুলো নানা রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। সারাজেভোতে তার পিতা একটা বেসরকারি দফতরে কেরানীর কাজ করতেন। মা ছিলেন ধর্মভীরু। আলীয়া জানিয়েছেন তিনি তার ধর্মানুরাগ পেয়েছিলেন এই মায়ের কাছ থেকেই। মা-ই তাকে ফজরের নামাজের আগে ঘুম থেকে তুলে দিতেন। বসনিয়াক ভাষায় ফজরের নামাজকে বলে সাবাহ্। সাবাহ্ আদায় করতে তিনি কাছের হাজীসকা মসজিদে যেতেন। সেখানে বৃদ্ধ ইমাম মুজেনজিনোভিক কিভাবে সুললিত স্বরে নামাজের কেরাতে সূরা আল রহমান পাঠ করতেন আর সাবাহ্ আদায় শেষে ফেরবার পথে কিভাবে তাকে বসন্তের সৌরভ এসে আমোদিত করতো তার স্মৃতি আলীয়া কখনোই ভুলতে পারেননি। তার বয়স যখন ১৫ তখন তিনি প্রথমবারের মতো কমিউনিস্ট মতবাদের সাথে পরিচিত হন। আলীয়া লিখেছেন সে এক দোদুল্যমানতার যুগ। কমিউনিস্ট আদর্শ তখন যুগোশ্লাভিয়ায় হু হু করে ঢুকে পড়ছে, আর কমিউনিস্ট কর্মীরা দেশজুড়ে যেমন সক্রিয় তেমনি প্রবল হয়ে উঠছে। আসলে যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্টদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল ইউরোপ জুড়ে তখনকার ফ্যাসিজমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। আলীয়ার ভাষায় ঃ Red totalitarianism arose to confornt black totalitarianism.

লাল স্বৈরাচার কমিউনিজম এলো কৃষ্ণ স্বৈরাচার নাজীজম ঠেকাতে।[৪]

আলীয়ার স্কুলেও কমিউনিস্ট আদর্শ ঢুকে পড়েছিল। স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক রীতিমত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। এদের মাধ্যমেই আলীয়া কমিউনিস্টদের প্রচার পত্র, বই-পুস্তক পড়েন। আলীয়া মনে করেন কমিউনিস্টরা আসলে সামাজিক অসাম্যের কথা বলে এবং তারা এও বিশ্বাস করে খোদা এই অসাম্যের পক্ষে। ধর্ম হচ্ছে এই অসাম্যকে টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার এবং এটি দুর্বলদের তাদের অবস্থান পরিবর্তনে বাধা দেয়। আলীয়া এসব কথার সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি লিখেছেন ঃ

I did not accept it, however; it seemed to me, if not always quite clearly, that the chief message of religion is responsibility. Its message is the same even to kings and emperors; that they should be responsible. Even if they have no fear of the police on this earth, as the police are in their hands, religion tells them that they will have to answer for the violence they commit, that there is no escaping accountability. A universe without God seemed to me to be a universe without meaning.

www.pathagar.com

আমি এটা মেনে নেইনি। যদি আমি ঠিকমতো বুঝতে পারি, এতদসত্ত্বেও আমার কাছে মনে হয়েছিল ধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে দায়িত্ব। বাদশাহ ও সম্রাটের কাছেও এর দাবি এক রকম, তাদেরকে দায়িত্ববান হতে হবে। যদিও এই পৃথিবীতে তাদের পুলিশের কোনো ভয় নেই, কেননা পুলিশ তাদেরই হাতের মুঠোয়, এতদসত্ত্বেও ধর্মের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে তাদেরকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই বিশ্ব আমার কাছে নিতান্ত তাৎপর্যহীন মনে হয়েছিল।[৫]

আলীয়ার এই দোদুল্যমানতা ও অনিশ্চয়তা এক থেকে দুবছর চলেছিল। তারপর তিনি নিজের বিশ্বাসে স্থির হন এবং আর পিছনে ফিরে তাকাননি।

স্কুলের লেখাপড়ায় তার যত না মন ছিল তার চেয়ে তিনি বেশি সময় দিয়েছেন বাইরের পড়াশুনায়। আঠারো কি উনিশের মধ্যেই তিনি ইউরোপীয় দর্শনের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য বই পড়ে ফেলেছিলেন। এ জন্য তাকে স্কুলে মূল্য দিতে হয়েছিল। একবার তিনি ইতিহাস বিষয়ে ফেল করেন, যদিও তার ভাষায় ইতিহাস তিনি অনেক বেশি জানতেন। এ জন্য তিনি তার ইতিহাসের সার্বীয় শিক্ষককে দায়ী করেন; এর পিছনেও যুক্তি ছিল। সার্বীয়রা মুসলমানদের পছন্দ করতো না। পুরো বসনিয়া জুড়েই সার্বরা আধিপত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল যা পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট শাসনের সময় আরো বৃদ্ধি পায়। বসনীয় যুদ্ধের সময় এর চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখেছি।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে আলীয়া তার স্নাতক ডিগ্রী নেন। যদিও তখন স্ট্যালিনগ্রাড ও এল আলামীনের ভয়ংকর যুদ্ধ পর্ব শেষ হয়ে গেছে। নাজীদের হাতে যুগোশ্লাভিয়া পতনের কয়েক মাস আগে আলীয়া ইয়ং মুসলিমস এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের সাথে পরিচিত হন যা তার জীবনের পরবর্তী গতিধারাই পাল্টে দেয়। এ সংগঠনটি মূলত জাগরেব ও বেলগেড বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ ও উদ্যমী মুসলমান ছাত্রের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির কবল থেকে বসনিয়ার তরুণ মুসলমানদের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে এটি যাত্রা শুরু করে। এই সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী আলীয়াকে প্রাণিত করে, কারণ এর চিন্তাভাবনার ধরন অন্যদের থেকে ভিন্ন রকম ছিল। আলীয়ার ভাষায় ঃ

It was all very different from what we had learned in the maktabs, the religious instruction we had had at school, the lectures we had attended, the articles we read in the journals of the day. I see it as a matter of the relationship between essence and form-the hojjas (Islamic religious teachers or priests) were, in our view, more inclined to interpret the rituals or external forms of Islam, while neglecting the essence.

আমরা মক্তব, ধর্মীয় অনুজ্ঞা, স্কুল, বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে যা শিখেছিলাম তার থেকে এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার কাছে এটি মনে হয়েছিল কোনো জিনিসের নির্যাস ও অবয়বের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কের মতো একটি বিষয়। ধর্মগুরুরা, আমাদের মতে ইসলামের বাহ্যিক আচারগুলোর ব্যাখ্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, অন্যদিকে এর নির্যাসকে উপেক্ষা করতেন।[৬]

www.pathagar.com

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইয়ং মুসলিমস এসোসিয়েশন জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বসনিয়ার প্রত্যেকটি শহরে এর শাখা বিস্তৃত হয়।

১৯৪৫ সালে কমিউনিস্টরা সারাজেভোতে প্রবেশ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর মার্শাল টিটোর এই সাম্যবাদী সরকারের সূচনার মধ্য দিয়ে বসনিয়ার মুসলমানরা আর এক দীর্ঘ অনিশ্চয়তার যুগে পা দেয়। টিটোর সরকার ধর্ম চর্চা নিষিদ্ধ করে এবং শুধুমাত্র ভিন্নমতালম্বী হওয়ার কারণে অসংখ্য নিরীহ মানুষের উপর জুলুম-পীড়ন-নির্যাতন নেমে আসে।

ইয়ং মুসলিমস এসোসিয়েশন টিটোর সরকারের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে। ফল যা হবার তাই হয়। এই নবীন সংগঠনের অসংখ্য তরুণ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে পাঠানো হয় কষ্টসাধ্য লেবার ক্যাম্প ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে। নেতৃপদের অনেককেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইভাবে জেল-জুলুম-হুলিয়া আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ইয়ং মুসলিমস এসোসিয়েশনকে কার্যত নিঃশেষ করে দেয়া হয়। কমিউনিস্ট সরকার আলীয়াকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। এ সময় তাকে রাজমিস্ত্রির সহকারী এবং কাঠুরের কাজ করতে হয়। আলীয়া জানিয়েছেন এইভাবে ১৯৪৮-৪৯ এর পুরো শীতটাই তাকে কাঠ কাটতে হয়েছে। মুক্তির পর তিনি আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে আইনের উপর তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। আইনজীবী হওয়ার পরও তিনি দীর্ঘ দশ বছর একটা নির্মাণ কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এভাবেই তখনকার মতো তার জীবিকা নির্বাহ হত।

তিন

নির্মাণ ও আইন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকার পর এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিকূল রাজনৈতিক আবহাওয়ায়ও আলীয়া তার জীবনের মৌলিক লক্ষ্য থেকে এক বিন্দুসরে আসেননি। তখনকার পরিস্থিতিতে সক্রিয় রাজনীতি সম্ভব না হলেও ইসলাম, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিস্তর লেখালেখি করেন। তার এ সময়ের বিখ্যাত কাজ হচ্ছে Islamic Declaration। ১৯৬৯ সালে ৪০ পৃষ্ঠার এ ছোট বইটি তিনি লেখেন, যা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। এ বইতে তিনি সে সময় যে সব কথা বলেন তা সম্ভবত তার সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল, যখন এসব নিয়ে কেউ ভাবতেই পারতো না। মূলত মুসলিম দুনিয়াকে সামনে রেখেই Islamic Declaration লেখা হয়েছিল, যুগোশ্লাভিয়ার কথা এখানে আদৌ উল্লিখিত হয়নি। Islamic Declaration এ আলীয়া যা বলতে চেয়েছিলেন তার মূল প্রতিপাদ্য হলো একমাত্র ইসলামই মুসলিম জনগণকে উজ্জীবিত করতে পারে, তাদের কল্পলোককে নাড়া দিতে সক্ষম, এবং তাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণের সক্রিয় সংগঠক হিসেবে ইসলাম রাখতে পারে ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারা দিয়ে মুসলমানের ভাগ্য বদলানো যাবে না। সঙ্গত কারণেই আলীয়া মুসলিম জনতাকে ইসলামের মৌলিক নীতি ও বিশ্বাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আহ্বান জানান। একই সঙ্গে এ বইতে তিনি মুসলিম দুনিয়ায় বিদ্যমান স্বৈরাচারী ব্যবস্থার নিন্দা জানান, শিক্ষার হার বাড়ানোর কথা বলেন, নারীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেন, সন্ত্রাস-দুর্নীতি পরিহার ও সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠার উপরও জোর দেন। বইটি আলীয়া সম্ভবত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর আদলে লিখতে চেয়েছিলেন। মেনিফেস্টোকে

www.pathagar.com

কমিউনিস্টরা যেমন মুক্তির দলিল হিসেবে বিবেচনা করে, আলীয়ার মনেও হয়তো একই ধারণা কাজ করে থাকবে, তার Islamic Declaration হবে সব মুসলমানের মুক্তিমন্ত্র। এ বইয়ের প্রতিক্রিয়া হয় খুব দ্রুত, একে প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তীতে এ বইকে ভিত্তি করেই তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এমনকি পাশ্চাত্যেও এ বই সম্পর্কে শীতল মনোভাব প্রকাশ করা হয়, কেননা তারা হয়তো বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যেখানে ইসলামকে সমস্যা সমাধানের প্রধান সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময়েই আলীয়া তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি করেন। তার বিখ্যাত বই Islam Between East and West তিনি এ সময়েই লেখেন, যার বসনিয়াক ভাষায় নাম ছিল 'ইসলাম ইজমেদু ইসতোকা-ই-জাপাদা'। এটি একটি দর্শনমূলক গ্রন্থ, দার্শনিকের ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে সমকালীন পৃথিবীতে ইসলামের অবস্থানকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। মূলত আলীয়া বইটি লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালের কারাবাসের আগে। এরপর দীর্ঘ ২০ বছর বইয়ের পান্ডুলিপি কমিউনিস্ট প্রশাসনের ভয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়। আলীয়ার কারাবাসের সময় বোন আজরা পাণ্ডুলিপিটি বাড়ির পাটাতনের উপর রেখে দেন। তারপর পাণ্ডুলিপিটি যখন তিনি ফেরত পান তখন এটি ছিল তার ভাষায় Bundle of half decayed paper.[৭]

এই জরাজীর্ণ পাণ্ডুলিপিটি আলীয়া নতুন করে লেখেন এবং গোপনে কানাডায় এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে ১৯৮৪ সালে আমেরিকায় এটি প্রকাশিত হয়, যখন তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

এ বইতে আলীয়া ইসলামকে পূর্বীয় ও পশ্চিমী চিন্তার মাঝামাঝি একটা অবস্থানে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, যেমন নাকি ভৌগোলিকভাবেও মুসলিম দুনিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। একই সাথে তিনি এটাও বলতে চেষ্টা করেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার কতকগুলো সাধারণ মূল্যবোধ ও ধারণা কাজ করে থাকে। তার মতে বিশ্বধারণার (World-view) তিনটি ধারা রয়েছে : ধর্মীয়, বস্তুবাদী ও ইসলামিক। কুরআন আমাদের শিখিয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসই যুগল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষও তেমনি শরীর ও আত্মা এই দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব। শরীর হচ্ছে আত্মার বাহক (Carrier)। এই বাহকের উত্থান ঘটে। তার মানে এর একটা ইতিহাস থাকে। কিন্তু আত্মার কোনো ইতিহাস থাকে না। ঐশীস্পর্শে এর বিকাশ। এই মানুষের প্রথম অংশ হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অংশ ধর্ম, কলা ও নৈতিকতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ভাবে মানব জীবনে দুটি সত্য ও দুটি ঘটনা পাশাপাশি বিরাজ করে। পশ্চিমা বিশ্বে এই দ্বৈত সত্ত্বা ডারউইন ও মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মধ্যে প্রতিভূত (Represented) হয়। ডারউইনের মানুষের সাথে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মানুষের কোনো মিল নেই। তাদের সত্য দুরকম ও পৃথক কিন্তু একই সাথে পরস্পরের বসবাস। এটিই সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হচ্ছে সভ্যতার বিবেচ্য, ধর্ম ও কলা হচ্ছে সংস্কৃতির আলোচ্য বিষয়। প্রথমটি হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনের প্রকাশ (How do I live), দ্বিতীয়টি মানুষের আকাঙ্ক্ষার ধন (Why do I live)। এখানেই ড্রামা ও ইউটোপিয়ার দ্বন্দ্ব। ইউটোপিয়া ব্যক্তিকে স্বীকার করে না, ড্রামা নৈতিকতাকে অস্বীকার করে। এইভাবে অধ্যয়ন (Study) ও ধ্যান (Meditation) হচ্ছে

www.pathagar.com

দুটি বিপরীতধর্মী আধ্যাত্মিক কান্ড, প্রথমটি বহির্মুখী, যার দৃষ্টি জড়ের দিকে, দ্বিতীয়টি অন্তর্মুখী, লক্ষ্য আত্মা। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক কাণ্ডই খোদা ও মানুষের অস্বীকৃতির নীতির ভিত্তিতে রচিত। প্রতিটি কলা ধর্মের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ।
যদি আল্লাহ না থাকে তাহলে মানুষের অস্তিত্বও থাকে না। আবার মানুষ না থাকলে মানবতা, মানব মর্যাদা, মানবাধিকার প্রভৃতি শব্দবন্ধ মূল্যহীন। সভ্যতা কর্মের ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞাত, অন্যদিকে সংস্কৃতি হচ্ছে আক্রান্তের আশ্রয়। সভ্যতার লক্ষ্য হচ্ছে Earthly empire- ঐহিক সাম্রাজ্য যার লক্ষ্য Utopian equality- কল্পলোকের সমতা, অন্যদিকে ধর্ম হচ্ছে Kingdom of heaven- স্বর্গের রাজ্য।
আলীয়া মনে করেন আল্লাহ ছাড়া কোনো নৈতিক অনুশাসন সম্ভব নয়। নৈতিকতা হচ্ছে ধর্মেরই ভিন্নতর জড় অবস্থা (another physical condition) । সভ্যতা যেহেতু বিবর্তিত বিষয়; ইতিহাস, ধর্ম ও কলার প্রকৃত অর্থে কোনো বিকাশ বা প্রবৃদ্ধি নেই। প্রতিটি ধর্মই উদ্ভবের কাল থেকে পবিত্র, সময়ের ধারায় এটি দূষিত হয়েছে, একই কথা সত্য কলা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে। এভাবেই যীশু ও চার্চের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। প্রতিটি আইনই দ্বিপ্রান্তিক (Dual) এবং মেডিসিন চিকিৎসা আদতে কোনো প্রকৃত বিজ্ঞান (True science) নয়। প্রাচীন গুহা মানবের আঁকা চিত্র অথবা পলিনেশিয়ার উপজাতীয় মুখোশ হচ্ছে কার্যত শিল্পকলার নির্যাস (Essence) যা আধুনিক কোনো সৃষ্টির চেয়ে কম উত্তেজক নয়।
এইভাবে মানব জীবন দ্বিপ্রান্তিকতার ধারণা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এর নিদর্শন- Sign মানুষের প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে যুক্ত। একইভাবে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের মৌল ভাবনা ও নির্যাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন রয়েছে মুসা ও ঈসার মধ্যে। একজন জনতার নেতা, অন্যজন নৈতিকতার প্রচারক। এবং এখানেও ভিন্ন ভিন্ন বিচার ও লক্ষ্য। একজনের Promised land, অন্যজনের Kingdom of heaven.
আলীয়া বলতে চান এই দুটো বিপরীত সত্যকে সমন্বয় করা হয়েছে ইসলামে। ইসলাম হচ্ছে একটা সমন্বয়, এই দুই মেরুর মধ্যে তৃতীয় বিকল্প যা কিনা একটা মানুষের মধ্যে কার্যত প্রতিবিম্বিত হয়।
জগত ও জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তাভাবনা, মতামত এই দুটি ধারা হয় বস্তুবাদ, নয়তো আধ্যাত্মবাদ আশ্রয় করে পল্লবিত হয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানব জীবনকে বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার কারণে দুটির কোনটিই মানুষের জন্য সমাধান সূত্র নির্মাণ করতে পারেনি; কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আত্মা ও বস্তুকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যবস্থা ও চিন্তার মধ্যে আলীয়া একটা দার্শনিক সমন্বয় খুঁজেছেন এবং তার এই সমন্বয় ভাবনা মানুষকে সংশ্লিষ্ট করে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের মধ্যে যে এই প্রাথমিক দ্বৈতবাদ কাজ করছে তা কেবল ইসলামই যথার্থ অর্থে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ কারণেই তিনি মনে করেন মানব প্রকৃতি ও ইসলাম অভিন্ন। এখানে ইসলামকে তিনি একটি বিশ্বজাগতিক স্বতঃসিদ্ধতা হিসেবে নিয়েছেন এবং মানব মুক্তির একক বিকল্প ধারা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বইটি লেখা হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের কালে। সেই কালেই তিনি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিচ্যুতিগুলো দার্শনিক প্রজ্ঞার সাথে চিহ্নিত করেছেন এবং একই প্রজ্ঞার জোরে তিনি এ দুটো মতবাদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাকে অকপটে তুলে ধরেছেন। সমাজতন্ত্রের পতন ও

www.pathagar.com

পুঁজিবাদের অক্ষমতার প্রেক্ষাপটে তিনি Islam Between East and West গ্রন্থে ইসলামের ফিরে আসার আগাম ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। আজকের পরিবর্তিত বিশ্বে ইসলামের ভূমিকা তারই সাক্ষ্য দেয়। সেদিক দিয়ে এ বইটি এ কালে ইসলামী পুনর্জাগরণের দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চার

বসনিয়ায় আলীয়া ইজেতবেগভিচের জীবন কখনোই পুরোপুরি সুস্থতার মধ্যে কাটেনি। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে শুরু করে মিডিয়ার অপপ্রচার ও কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র অহর্নিশ ছায়ার মতো তার পিছু নিয়েছে। বসনিয়ার ক্রমাবনত মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসেবেও তাকে পোহাতে হয়েছে নানারকম দুর্যোগ। বসনিয়ার প্রধান সমস্যা ছিল গণতন্ত্রের। গত শতকের প্রথম অংশে বসনিয়ায় ছিল রাজতন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগে এসে কমিউনিস্টদের একনায়কত্ব। চরিত্রের দিক দিয়ে দুটিই ছিল স্বৈরাচার। এমনি প্রতিকূল পরিবেশে এই দার্শনিককে তার মননচর্চা অব্যাহত রাখতে হয়েছে, যদিও তা কখনো মসৃণ ধারায় এগুতে পারেনি। মার্শাল টিটোর তথাকথিত সাম্যবাদী শাসনের সময় বসনিয়ার মুসলমানদের উপর নেমে আসে জুলুমের স্টীম রোলার। বহির্বিশ্বে টিটোর যতই উদার ও প্রাজ্ঞ নেতা হিসেবে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি থাকুক না কেন নিজের দেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন এক আতঙ্ক বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন এক দুঃস্বপ্ন। টিটোর সময়ই সার্বীয়দের মুসলিম বিরোধিতা তীব্র আকার নেয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় সার্বীয় পণ্ডিতদের পরামর্শ অনুসারে যুগোশ্লাভীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের আনুগত্য পরীক্ষা করার জন্য শূকরের গোশত ভক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো মুসলমানকে ইসলাম ছাড়তে হতো, নয়তবা সেনাবাহিনী ছাড়তে হতো। এই সার্বীয় পণ্ডিতরাই বসনীয় যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হত্যাকে বৈধতা দেবার জন্য ইসলামকে স্বৈরতান্ত্রিক, অদ্ভুত, রক্তপিপাসু, পশ্চিমা সভ্যতায় অবাঞ্ছিত ও ক্ষেত্রবিশেষে 'Abnormal' ধর্ম হিসেবে আক্রমণ করে। বসনীয় মুসলমানদের ইউরোপীয় হওয়ার দাবিকে এই সব সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতরা 'A notorious absurdity' বলে উড়িয়ে দেয়। আশির দশকে টিটো বসনিয়ার মুসলমানদের শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দেন। এ সময়ই কমিউনিস্টরা আলীয়ার বন্ধু বসনিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম হোসেন দোজোকে গ্রেফতার করে। দোজো 'তাকভীম' নামে একটি পত্রিকা চালাতেন। এ পত্রিকায় আলীয়া বেনামীতে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও কৌশল নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এগুলো পরবর্তীকালে আলীয়ার বিখ্যাত বই 'Problems of the Islamic Renaissance' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৮০ সালে টিটোর মৃত্যুর পর বসনিয়ার অবস্থা আরো খারাব হয়ে যায়। মুসলমানদের উপর নির্যাতন, হয়রানি এক নাগাড়ে চলতে থাকে বিশেষ করে কসোভোর আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানদের দুর্দশার সীমা থাকে না।

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে এই দার্শনিককে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার করা হয় এবং আনুষ্ঠানিক বিচারের আগে দীর্ঘ ১০০ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার উপর মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। এ যাত্রায় আলীয়াসহ মোট ১১ জন মুসলিম বুদ্ধিজীবিকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। এদের সকলের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়। এবারে আলীয়াকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করবার জন্য প্রমাণস্বরূপ তার লেখা Islamic Declaration কে উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের উকিল ইসলামী পুনর্জাগরণ চিন্তার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। Islamic Declaration বইয়ের নিম্নোক্ত কয়েকটি অংশ তুলে ধরা হয় রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগের সমর্থনে ঃ

There is no known instance in history of a genuine Islamic movement that was not at the same time a political movement. This is because Islam is a religion, but also at the same time a philosophy, a morality, an atmosphere, in a word an integral way of life ...... The presence of a great many laws and of a complex legislature is, as a rule, a reliable indicator that there is something rotten in that society, which needs to stop passing laws and begin to educate its people in how to behave .... The Islamic movement is a coherent unity of religion and politics .... Muslims are brothers .... The Islamic movement should and can begin to take power as soon as it is morally and numerically strong enough not merely to replace existing un-Islamic governments, but to create a new Islamic government.

ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই, প্রকৃত অর্থেই একটি ইসলামী আন্দোলন একই সাথে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। এর কারণ ইসলাম যেমন একটি ধর্ম, একই সাথে এটি .....একটি দর্শন, একটি নৈতিক ধারণা, একটি পরিবেশ, এক কথায় জীবনের একটি সংহত রূপ। বহু রকমের আইন-কানুন ও জটিল আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি হচ্ছে কার্যত একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশক, যা প্রমাণ করে সমাজের কোথাও কিছুর পচন ধরেছে এবং এর জন্য দরকার আইনি প্রণয়ন বন্ধ রেখে জনগণকে প্রকৃত ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলা .... ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় .... মুসলমানরা পরস্পরের ভাই............. নৈতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে যথেষ্ট শক্তি সম্পন্ন হওয়া মাত্র ইসলামী আন্দোলনের উচিত হবে ক্ষমতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া যাতে শুধু প্রচলিত অনৈসলামিক সরকারকে অপসারণ নয়, তার পরিবর্তে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়।[৮]

আলীয়ার ভাষায় এই মামলার বিচারক ছিলেন অনেকটা Contractor এর মতো, যাকে একটা পারিতোষিকের বিনিময়ে কাজ করবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। বিচার প্রক্রিয়ায় যুক্ত অন্যান্য সরকারি লোকজন প্রকৃত সত্য ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। তাদের কাজ ছিল অভিযুক্ত ১১ জনকে যেভাবে হোক অপরাধী প্রমাণিত করা। তাদের কৌশল ছিল কারাবাসের ভয় দেখিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করা। যে কেউ তাদের ইচ্ছামতো সাক্ষী দিতে রাজি হতো না, তাকেই আসামী বানানোর অভিযোগে ভয় দেখানো হতো। সরকারি উকিল আদালতের কাছে আলীয়ার শাস্তির দাবি জানিয়ে তার বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগ সম্বন্ধে আরো বলেন ঃ

The Islamic Declaration is an attack upon the values of our social order. In it there lie abstract danger, written and verbal delict, the

www.pathagar.com

consciousness of counter revolutionary activites. These latter actions have some similarities to enemy propaganda. But this is a case of incessant activities and intense propaganda, which shade into counter revolutionary activities.

ইসলামী ঘোষণাপত্র হচ্ছে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের উপর বড় ধরনের আঘাত। লিখিত ও মৌখিক উভয় অর্থে এর মধ্যে এক অদৃশ্য বিপদ উঁকি দিচ্ছে, এতে এক প্রতিবিপ্লবী ঝুঁকিও রয়েছে। বিশেষ করে পরবর্তী কার্যক্রমের সাথে শত্রুর প্রচারণার সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এটি হচ্ছে একটি অবিরত কার্যক্রম ও ভয়ানক প্রচারণার অংশ যা কার্যতঃ প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ডের মধ্যেই পড়ে।[৯]

আলীয়া জানতেন তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সত্যিকার মূল্য এখানে নেই। তবু তিনি যে জবানবন্দী দেন তা স্রেফ কোনো আসামীর জবানবন্দী বলে মনে হয় না। এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে একজন স্বাধীনচেতা মুসলিম দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীর জীবনের কষ্টি পাথরে যাচাই করা উপলব্ধির নির্যাস ঃ

I love Yugoslavia, but not its government ..... I bestow all my love on freedom, and there is nothing left over for the authorities. I am not being tried for having violated the laws of this land, for I have not done so. I am being tried for having transgressed some unwritten rules by which individual power holders in our midst impose their own standards of the prohibited and the permissable, without regard for the constitution and the law. By all appearances, I have gravely transgressed those unwritten rules.

I therefore state : I am a Muslim and so shall I remain. I consider myself to be a fighter for the cause of Islam in the world, and shall so feel to the end of my days. For Islam for me has been another name for all that is fine and noble, a name for the promise or hope of a better future for the Muslim peoples of the world, for their life in dignity and freedom, in a word for everything that in my belief is worth living for.

আমি যুগোশ্লাভিয়াকে ভালোবাসি, কিন্তু এর সরকারকে নয় .... স্বাধীনতার জন্য আমার সমস্ত ভালোবাসা নিবেদন করছি, এবং কিছুই কর্তৃপক্ষের জন্য অবশিষ্ট রাখিনি। এই ভূখণ্ডের আইনি অবমাননার জন্য আমার বিচার হচ্ছে না, কারণ আমি এরকম কিছু করিনি। আমার বিচার হচ্ছে কিছু অলিখিত বিধান লঙ্ঘনের জন্য কেননা আমাদের মধ্যকার কিছু কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী লোকজন সংবিধান ও আইনের তোয়াক্কা না করে তাদের নিজেদের মতো করে নিষিদ্ধ ও পালনীয় বস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। সব দিক দিয়েই আমি ঐসব অলিখিত আইন ভঙ্গ করেছি।

সুতরাং আমি বলতে চাই, আমি একজন মুসলিম এবং মুসলিম হিসেবেই আমি থাকব। ইসলামের পক্ষে এই পৃথিবীতে আমি নিজেকে একজন যোদ্ধা হিসেবে মনে করি এবং

www.pathagar.com

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমার কাছে ইসলাম হচ্ছে, যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তার অন্য নাম, বিশ্বের তাবৎ মুসলমান জনগণের আশা ও সুন্দর ভবিষ্যতের নাম, তাদের জীবনের মর্যাদা ও স্বাধীনতার নাম, আমার বিশ্বাস এক কথায় মঙ্গলকর জীবনের নাম।[১০]

এই সাজানো মামলায় আলীয়ার ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এটিই সারাজেভো ট্রায়াল হিসেবে পরিচিতি পায়। দেশ-বিদেশের মানবাধিকার কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিস্ট সরকারের এই অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন ও যুগোশ্লাভিয়া সরকারকে এই মামলার আসামীদের বেসুর খালাসের আহ্বান জানান। কিন্তু কমিউনিস্ট সরকার তাতে কর্ণপাত করার আদৌ প্রয়োজন বোধ করেনি।

কারাবাসের দিনগুলো এই বৃদ্ধ দার্শনিকের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না, বিশেষ করে এই বয়সে তাকে দিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করানো হতো যা যুগপৎ তার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দার্শনিকের অনুভব দিয়ে এই জীবনের এই সব বাধা ও অস্বস্তিকে তিনি বোধ হয় সহজ করে নিতে পেরেছিলেন। নতুন এই জীবনেও আলীয়া মোটেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাননি। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাকে দার্শনিক তাৎপর্যে লিখে রাখতেন। তার ভাষায় ঃ

I began to make notes : reflections on life and destiny, religion and politics, on the books I had read and their authors, and all the things that come to a prisoner's mind during more than two thousand long days and nights.

আমি নোট রাখতে শুরু করি; জীবনের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম ও রাজনীতি, যে সব বই আমি পড়েছি এবং তাদের লেখক সম্বন্ধে, এবং দুই হাজার দিন ও রাত নিয়ে বিস্তৃত সময়ে যা কিছু একজন বন্দীর মনে উঁকি দেয়, সে সব কথা।[১১]

প্রতিদিনের এই নোটই অবশেষে ১৩ খন্ডে পরিণত হয় যা তিনি গোপনে জেলের বাইরে পাচার করেন। এসবই ১৯৯০ সালে My Escape to Freedom নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৭ সালে যখন তার কারাবাসের প্রায় অর্ধেক সমাপ্ত হয়, তখন তার সন্তানরা একদিন একটি গোপন খবর নিয়ে তার কাছে আসে। তাকে জানানো হয় যদি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা স্বীকার করে তিনি একটি দরখাস্ত দেন তবে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। তার মেয়েরা এই মর্মে একটি দরখাস্ত লিখেও নিয়ে এসেছিল যাতে তাদের পিতা দরখাস্তে একটা স্বাক্ষর দিয়ে দেয়। আলীয়া দরখাস্তটি পড়েন, কিন্তু স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। আলীয়া লিখেছেন ঃ

My prison sentence continued : I had another five years yet to serve.

আমার বন্দী জীবন গড়িয়ে যাচ্ছে- এমনি করে আরো পাঁচ বছর আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১২]

বিশ্বাসের জোর ছাড়া এটি কখনোই সম্ভব নয়। ঘটনা খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। তাকে আর বেশিদিন আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি আর অতিরিক্ত চার মাস কারাভোগ করেন। পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদের পতনের লগ্নে এবং সেখানে গণতন্ত্রায়নের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৮ সালে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

পাঁচ

কারামুক্তির পর আলীয়ার জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। তার ভাষায় ছয় বছর একাধারে কারাবাসের পর তিনি মাঝে এক বছর বিশ্রাম পান, তারপর এক নাগাড়ে দশ বছর বসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রেসিডেন্সির সদস্য হিসেবে কাজ করতে হয়।

দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট শাসনে বসনিয়া-হারজেগোভিনা তথা যুগোশ্লাভিয়া ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আলীয়ার মতে দুর্বল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সার্বীয় আধিপত্য যুগোশ্লাভিয়ার পতনকে ত্বরান্বিত করে। এর উপর আলীয়া মনে করতেন কমিউনিজম আদর্শ হিসেবে খুব অনমনীয় প্রকৃতির যা কোনো রকমের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না। কমিউনিজম হচ্ছে একটা All or nothing ব্যবস্থা। স্বাধীনতা ও কমিউনিজম এক সাথে চলতে পারে না। সুতরাং এ রকম মতবাদ টিকবার নয়।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট শাসনে বসনিয়ার মুসলমানদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, তারা একটা প্রান্তিক অবস্থানে চলে আসে, তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বসনিয়ার মুসলমানদের এমনি ক্রান্তিকালে তিনি Party of Democratic Action প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেন, যার প্রতি বসনিয়ার মুসলমানদের সমর্থন প্রায় একচেটিয়া হয়ে দাঁড়ায়। বসনিয়ার স্বার্থ দেখবার জন্য আলীয়াকে তখন এক বৃহত্তর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হয়।

আলীয়া তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন তিনি দলের কার্যনির্বাহী সভার বৈঠকে বিসমিল্লাহ্ বলে বক্তৃতা শুরু করেন, যা এতকালের কমিউনিস্ট শাসনে ছিল অকল্পনীয়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন ঃ

I did so for two reasons : first I was quite sencerely appealing to the Almighty for help, and second, it was a mark of religious freedom and a clear signal of disobedience to the regime.

দুটি কারণে আমি এরকম করার সিদ্ধান্ত নেই। প্রথমত আমি আন্তরিকভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। দ্বিতীয়টি এটা ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতীক এবং প্রশাসনকে অবজ্ঞা করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।[১৩]

এ ঘটনাকে তিনি বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য ফরাসী বিপ্লবের মতো তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। একই অনুষ্ঠানে তিনি কমিউনিজমকে বিদায় জানান এই ভাবে ঃ The giant attempt to create 'heaven on earth' without God and man, indeed even against God and man, has ended in total failure.

প্রভু ও মানুষ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টির মহাপরিকল্পনা, কার্যত প্রভু ও মানুষের বিরুদ্ধে চালিত পরিকল্পনা সর্বাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।[১৪]

১৯৯০ সালে তিনি বিপুল ভোটে বসনিয়া-হারজেগোভিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে বসনিয়া-হারজেগোভিনার জনগণের ইচ্ছায় বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। আর এভাবেই আলীয়াকে নিয়তির অমোঘলীলায় তার জাতির জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়ে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বিশেষ করে আগ্রাসনের হাত থেকে বসনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা, বসনিয়ার খণ্ডীকরণে সার্বীয় চক্রান্ত রোধ এবং নিরীহ বসনীয়দের হত্যা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এখন থেকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

ছয়

একালে বসনীয় যুদ্ধের নির্মমতা, পৈশাচিকতা ও ভয়াবহতার একটা ছবি বসনীয় লেখক কাসিম বেজিকের লেখায় উঠে এসেছে। আমি তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

History stepped up the pace in this part of the world. It was a time when hours were compressed into minutes, days into hours, months and years into days; is absolutely certain that never in recent history have so many unavoidable questions and quandries about the world we live in been as concentrated as here in Bosnia.

পৃথিবীর এই প্রান্তে এসে ইতিহাসের গতি নিথর হয়ে গেছে। এটা এমন একটা সময় ঘন্টাগুলো সংকুচিত হয়ে মিনিটে, দিনগুলো ঘন্টায়, মাস এবং বছরগুলো দিনে রূপান্তরিত হয়েছে। সমকালীন ইতিহাসে নজির নেই আমাদের পৃথিবীর এত সব প্রশ্ন যা এড়িয়ে যাবার মতো নয় এবং সংশয়, এখানে বসনিয়ায় এসে স্তূপীকৃত হয়েছে।[১৫]

এই ভয়াবহতার নির্মম সাক্ষী আলীয়া আলী ইজেতবেগভিচ। বসনিয়ার যুদ্ধের কথা উঠলেই মনে পড়ে যাবে আলীয়ার কথা। এ যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনার সাথে আলীয়া একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের তাণ্ডবে প্রতিটি জনপদের মানুষের দুর্দশার সাথে আলীয়া যেন মিশে গিয়েছিলেন। আলীয়া ছাড়া বসনীয় যুদ্ধের কথা চিন্তাই করা যায় না। বসনীয় মানুষের প্রতিরোধ যুদ্ধের যে অপরাজেয় কাহিনী তার নির্মাণ আলীয়ার হাতেই সম্ভব হয়েছে। আলীয়ার নেতৃত্ব ছাড়া এ প্রতিরোধ যুদ্ধের কাহিনী হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো। আলীয়ার কারণেই বসনিয়ায় আর একবার স্পেনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়নি।

১৯৯২ সালে এ যুদ্ধের শুরু। বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে সার্বীয় সেনা বসনিয়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে শুরু করে। সার্বিয়ার সেনাবাহিনী ছিল মূলত প্রাক্তন যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনীর অংশ যা কিনা স্নায়ুযুদ্ধ কালে ইউরোপের চতুর্থ সেনাবাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। এই রকম একটি বাহিনী পূর্ণ শক্তি নিয়ে বসনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন কিনা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বসনিয়ার সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিল না। এভাবেই একটি নিরস্ত্র জাতির উপর সশস্ত্র অভিযান শুরু হলো। শুরু থেকেই সার্বিয়া বসনিয়ার স্বাধীনতার অস্বীকার করে আসছিল। তারা চাইছিল Greater Serbia। এই সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে বসনিয়াকে সার্বিয়ার সাথে একীভূত করে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু সার্বীয় পরিকল্পনার প্রধান বাধা হয়ে উঠল বসনিয়ার প্রতিরোধকামী জনতা, যারা আলীয়ার নেতৃত্বে রীতিমত জনযুদ্ধ শুরু করল। বলা চলে শূন্য থেকে আলীয়া অসীম ধৈর্য ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বসনিয়ার সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। অস্ত্র আমদানির উপর জাতিসংঘের অন্যায় নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও তিনি তার দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে নিরলস নেতৃত্ব দিয়ে যান। তার ভাষায় ঃ

The arming of the Bosnian army is a moving story of human courage, determination and resourcefulness on an invisible battlefront for the survival of Bosnia.

বসনীয় সেনাদলের সশস্ত্রীকরণ মানবীয় সাহস, প্রতিজ্ঞা ও সামর্থ্যের এক সজল কাহিনী যা এক অদৃশ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে বসনীয়দের বাঁচার লড়াই হয়ে উঠেছিল।[১৬]

www.pathagar.com

পুরো যুদ্ধের সময় বসনিয়া হয়ে ওঠে একটা মৃত্যুপুরী। যুদ্ধাবস্থায় বসনিয়ার অবস্থা আলীয়া নিজেই বর্ণনা করেছেন একটি বক্তৃতায় যা তিনি হেলসিঙ্কির একটি সম্মেলনে দিয়েছিলেন ঃ

Bosnia has become the battle ground of genocide. She is now a country of concentration camps. Schools and sports stadiums have become torture chambers and sites of mass murders .... Not a single international humanitarian organization or reporter has been allowed to visit the occupied areas where, according to the deeply disturbing and moving accounts of surviving refugees, mass expulsions and murders are being carried out.

বসনিয়া কার্যত বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। এটিকে এখন একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দেশ বলা যায়। স্কুল ও খেলার মাঠগুলো নির্যাতন ও গণহত্যার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। .... অধিকৃত এলাকায় যেখানে সবচেয়ে গণউচ্ছেদ, হত্যা ও নির্মমতার ঘটনা ঘটেছে সেখানে কোনো আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা বা সাংবাদিককে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি।[১৭]

এই পৈশাচিকতা ও নরমেধযজ্ঞের মধ্যে অবরুদ্ধ বসনিয়ার খাবার পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যন্ত ব্যাহত হয়। জাতিসংঘের পাঠানো মানবিক সাহায্য ও ত্রাণ পর্যন্ত সার্বীয়রা অবরুদ্ধ করে রাখা শহরগুলোতে পৌঁছাতে দেয়নি। বসনিয়ায় নিয়োগকৃত জাতিসংঘের বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে নরমেধযজ্ঞে সার্বীয়দের সহযোগিতা করেছে বলে শোনা গেছে। যুদ্ধাবস্থায় বসনিয়ার যে সব এলাকা জাতিসংঘ বাহিনী রক্ষা করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, প্রয়োজনের সময় তা তারা করেনি। অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বাহিনী নিরাপত্তা দেবে এই অজুহাতে বসনিয়ার কোন কোন অঞ্চলকে de-militarize করা হয়েছে, অথচ সার্বীয় বাহিনী যখন সেই শহরের দিকে ছুটে এসেছে, জাতিসংঘ বাহিনী কোন টু শব্দটি করেনি। সেক্ষেত্রে নিরস্ত্র বসনীয়রা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই সার্বীয় পৈশাচিকতার শিকার হয়েছে। এর বড় উদাহরণ হচ্ছে সেব্রেনিস্কা। সেব্রেনিস্কায় জাতিসংঘ বাহিনী যা করেছে তা প্রকারান্তরে সার্বীয়দের পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকাই বলা যায়। প্যারিস ও লন্ডনের ভূমিকা ছিল রহস্যময়। পুরো যুদ্ধের সময় তারা সার্বীয়দের পক্ষ নিয়েছে, বসনিয়ার পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ ও ন্যাটোর সিদ্ধান্তগুলো রুদ্ধ করে দিয়েছে তারাই। আর রাশিয়াতো সার্বীয়দের পক্ষে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা দিয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো। প্রথম দিকে তারা টু শব্দটি করেনি। ভাবটা এমন সার্বীয়রা যদি বসনিয়া দখল করে নিতে পারে তাতে তাদের আপত্তি নেই। মোট কথা পুরো পাশ্চাত্য জগত তখন বসনিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যাতে এটি কোনভাবেই টিকতে না পারে। তাতে যত প্রাণনাশই ঘটুক। কিন্তু পাশ্চাত্য যেভাবে চেয়েছিল বসনীয়রা ঠিক সেভাবে হতে দেয়নি। বসনীয়দের অপরিসীম প্রতিরোধ ক্ষমতা, অসীম আত্মত্যাগ ও উঁচু নৈতিক মনোবল পুরো পাশ্চাত্যের নীরব সমর্থনপুষ্ট সার্ব ও কতকাংশে ক্রোয়াট বাহিনীকে অবশেষে ঠেকিয়ে দিয়েছে। সার্বদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তির সামনেও বসনীয় বাহিনী দিনে দিনে শক্তিশালী হয়েছে। হ্যাঁ, এটা সত্য এই অসম যুদ্ধে বসনীয়দের চরম মূল্য দিতে হয়েছে,

www.pathagar.com

কিন্তু তাদেরকে পরাজিত করা যায়নি.। বসনিয়া যেমন করে দুঃখ-দুর্দশার প্রতীকে পরিণত হয়েছে তেমনি প্রতিরোধের অজেয় চূড়া হিসেবেও প্রমাণিত হয়েছে। বসনিয়ার সারাজেভো হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিরোধের আর এক স্ট্যালিনগ্রাড। Juan Goytisolo লিখেছেন ঃ The tragedy of Bosnia is an unparalleled source of knowledge of the potential of the human species, the worst and the best alike.

বসনিয়ার বিয়োগান্তক ঘটনা মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থে, বিবেচনার এক অতুলনীয় উৎস।[১৮]

এমনি যখন অবস্থা তখন পাশ্চাত্য কি করছে? দিনের পর দিন বসনিয়া নিয়ে নিষ্ফল আলোচনা ও সম্মেলন করে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে যাতে সার্বরা বসনিয়ার উপর পুরো দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অন্যদিকে আগ্রাসন বন্ধ করার আদৌ কোনো চেষ্টা না করে বসনিয়ার জনগণ বিশেষ করে আলীয়ার উপর চাপ দেয়া হয়েছে সার্বদের সাথে আপোস করার জন্য। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নেমে পাশ্চাত্য এমনিভাবে বসনিয়ার নিরীহ ও আক্রান্ত মানুষকে নিয়ে কৌতুক ও তামাশা করেছে। আলীয়া লিখেছেন ঃ Now we are being asked to negotiate, as though nothing had happened. As though no cities had been ravaged, no one killed or expelled, no mistrust and hatred had been sown.

এখন আমাদেরকে আপোস করার কথা বলা হচ্ছে, যেন কোন কিছুই ঘটেনি। যেন কোন নগর বিধ্বস্ত হয়নি, কেউ মারা যায়নি বা উৎখাত হয়নি; কোন অবিশ্বাস বা ঘৃণার বীজ বপন করা হয়নি।[১৯]

এরপর পাশ্চাত্য যখন দেখল বসনিয়ার মানুষকে কোনভাবেই কাবু করা যাচ্ছে না তখন তারা নিয়ে আসে নানারকম শান্তি চুক্তির ফর্মূলা। এসব চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল বসনিয়াকে ভাগ করে একটা আপাত স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা। এর মধ্যে ভান্স-ওয়েন চুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯১ সালের শুমারী অনুযায়ী বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলিম জনসংখ্যা ৪৩.৪৭%, অথচ চুক্তিতে সারাজেভো ব্যতীত বসনীয়দের দেয়া হলো পুরো ভূখণ্ডের ২৬.৩৬% অংশ। আলীয়ার ভাষায় ঃ It was an attempt to buy peace with this unprincipled compromise at the expense of the weaker.

এটা ছিল দুর্বলকে জিম্মি রেখে, এক নীতিহীন আপোসের পথে শান্তি ক্রয়ের চেষ্টা।[২০]

বসনীয় মুসলমানদের তখনকার প্রকৃত অবস্থাটা আরো ভালো করে বলেছেন Carl Bildt : To put it simply, (the Muslims) could choose between having 30 percent authority over 100 percent of Bosnia or 100 percent influence over 30 percent of Bosnia .... The alternative of 100 percent control over 100 percent of the territory of Bosnia did not and could not exist (Peace Journey: The struggle for peace in Bosnia).

সহজ কথা হচ্ছে মুসলমানরা দুটির একটিই গ্রহণ করতে পারতো। ১০০ ভাগ বসনিয়ার উপর ৩০ ভাগ কর্তৃত্ব অথবা ৩০ ভাগ বসনিয়ার উপর ১০০ ভাগ প্রভাব। এর বিকল্প হিসেবে ১০০ ভাগ বসনিয়ার ভূখন্ডের উপর ১০০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের কখনোই দেয়া হতো না।[২১]

www.pathagar.com

এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক কেন বসনীয় মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও বসনিয়ার মাত্র ৩০% ভূখন্ডে পাবে? আলীয়ার ভাষায় ঃ
This was European justice for the Bosnian Muslims.
বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য এই ছিল ইউরোপীয় ন্যায়ের নমুনা।[২২]
জনগণের অসীম দুর্দশার কথা ভেবে আলীয়া ভান্স-ওয়েন চুক্তি যা কিনা মুসলমানদের প্রতি সীমাহীন বেঈনসাফী করেছিল, তাও মেনে নিতে সম্মত হন। কিন্তু সার্বীয়দের একগুঁয়েমীতে সেটিও ভেস্তে যায়।
যুদ্ধ যতই দীর্ঘ হতে চলছিল, বসনীয়রা ততই শক্তিশালী হচ্ছিল। একই সাথে তাদের প্রতিরোধের শক্তিও বাড়ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সার্বীয়দের হাত থেকে তাদের হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করার সফলতাও দেখিয়েছিল। এমনি সময় পাশ্চাত্য ন্যাটো হামলার প্রস্তুতি নেয় এবং ডেটন চুক্তির দিকে অগ্রসর হয়।
গুণগত দিক দিয়ে ডেটন চুক্তি ভান্স-ওয়েন চুক্তির তুলনায় কিছুটা ভালো হলেও এখানেও বসনীয় মুসলমানদের উপর বেঈনসাফী করা হয়েছিল। বসনীয় ভূখন্ডের বিরাট অংশ সার্বীয়দের হাতে তুলে দেয়া হয়। ডেটন চুক্তির সময় যদিও আলীয়া ও তার প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বসনীয় স্বার্থরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, বিশেষ করে আলীয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও তার অনমনীয়তা ও দৃঢ়চিত্ততার যে নজির রাখেন তা পাশ্চাত্যের মধ্যস্থতাকারীদেরও কপালে ভাঁজ ফেলে দেয়। যদিও ডেটন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আলীয়ার উপর পরাশক্তিগুলো প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল, তথাপি তিনি নিজের দাবি আদায়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এটা সত্য আলীয়া ডেটন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু এটা না করে তখনকার মতো তার অন্য কোন বিকল্প ছিল কি? কোনো সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া একটা দুর্বল অবস্থানে থেকে পাশ্চাত্যের বৈরিতার মুখে তিনি আর কতকাল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন? যখন তাকে অবিরত হুমকি দেয়া হচ্ছিল ডেটন চুক্তি স্বাক্ষর না করলে জাতিসংঘ বাহিনী বসনিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং কোন কিছুর জন্য আর পাশ্চাত্য দায়ী থাকবে না।
এটা অবশ্যই দুঃখজনক গত বিশ শতকে মুসলমানদের সংকটের দিনগুলোতে অধিকাংশ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় পাশ্চাত্যকে দেখা গেছে এবং মুসলিম দুনিয়া নিজের সমস্যা নিজে সমাধানে আদৌ সফল হয়নি। পাশ্চাত্য মধ্যস্থতাকারীরা উপর থেকে যা চাপিয়ে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃত্ব তাই হজম করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য মুসলিম দুনিয়ার অনৈক্য ও অনগ্রসরতার বাস্তব পটভূমিতে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে এসব চাপিয়ে দেয়া ফর্মূলা মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। যেই এ ধরনের চাপিয়ে দেয়া ফর্মূলা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন অথবা নিজের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন কিংবা পাশ্চাত্যের বাইরে নিজের সিদ্ধান্ত এগিয়ে নিতে অগ্রসর হয়েছেন তখনই তাকে বলা হয়েছে Incorrigible, incorrectable, কখনো কখনো Difficult person হিসেবে। আর এখনতো রাখ ঢাক না রেখেই বলা হচ্ছে Terrorist। আলীয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারী হলব্রুকও একই কথা লিখেছেন। এখানে তিনি আলীয়ার প্রশংসা করেননি কিন্তু যা লিখেছেন তা আলীয়ার অনমনীয়তা ও দৃঢ়চিত্ততার ইঙ্গিত দেয়। পাশ্চাত্য যখন কাউকে প্রশংসা করতে পারে না, তখন ধরে নেয়া যেতে পারে তিনি মুসলিম বিশ্বের স্বার্থই রক্ষা করছেন। হলব্রুকের ভাষ্য ঃ

www.pathagar.com

At the centre of this tangle was the remarkable figure of Alija Izetbegovic. He had kept the idea of Bosnia alive under the most difficult circumstance .... At the age of seventy, after surviving eight years in Tito's jails and four years of serb attacks, he saw politics as perpetual struggle .... His eyes had a cold and distant gaze; after so much suffering, they seemed dead to anyone else's pain. He reminded me a little of Mao Zadong and other radical chinese communist leaders good at revolution, poor at governance.

এই ত্রিভুজের কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন আলীয়া ইজেতবেগভিচ। খুব কঠিন সময়ের মধ্যেও তিনি বসনিয়ার ধারণা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন .... আট বছর টিটোর কারাভোগ এবং চার বছর ধরে সার্ব আক্রমণের পর সত্তর বছর বয়সেও তিনি রাজনীতিকে এক অবিরত সংগ্রাম হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন .... তার চোখে ছিল শীতল অথচ দূরবর্তী দৃষ্টি; অনেক কষ্ট ভোগের পর এগুলোকে মনে হতো অন্যের ব্যথার ব্যাপারে উদাসীন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে মাওসেতুং ও অন্যান্য চীনা বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতাদের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন- বিপ্লবের জন্য তারা উপকারী হলেও, সরকার পরিচালনায় ছিলেন অদক্ষ।[২৩]

একই রকম কথা বলেছিলেন মাউন্টব্যাটেন আমাদের উপমহাদেশের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পর্কে। এখানে মাউন্টব্যাটেন, ওখানে হলব্রুক। একই ছবি। একই চিত্র। একই রকম ঘটনা ঘটছে আজ ফিলিস্তিনে, ইরাকে, আফগানিস্তানে। যারাই মুসলমানদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলছে অথবা তাদের দাবির ব্যাপারে দৃঢ়চিত্ততা দেখাচ্ছে, তাদেরকেই ছাপ মেরে দেয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই অপকৌশল আর কতকাল মুসলিম দুনিয়া নীরবে হজম করবে?

পাশ্চাত্য দুনিয়ার এই মোনাফেকী ও ভন্ডামিকে (তাদের ভাষায় এটি রাজনীতি) আলীয়া বলেছেন Inescapable Question, পাশ্চাত্য যে প্রশ্নের উত্তর আজও দেয়নি। এই নামে আলীয়া নিজের আত্মজীবনীও লিখেছেন যেখানে তিনি জীবনের কষ্টি পাথরে যাচাই করে পাশ্চাত্যের এই ছবি আমাদের সামনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন, যা আমাদের দৃষ্টি খুলতে সাহায্য করতে পারে।

সাত

একালে বসনিয়ার যুদ্ধ কি আমাদের জন্য কোন শিক্ষা রেখে গেছে? যদি মুসলিম দুনিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয় তবে এটি তাদের অসীম ব্যর্থতার দলিল। শুধু মুখের কথা ছাড়া গভীর অর্থে মুসলিম দুনিয়া বসনিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই করতে পারেনি। আর যদি বসনিয়ার মুসলমানদের প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করা হয় তবে এটি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধিতার গৌরবোজ্জ্বল নমুনা হয়ে থাকবে। বসনিয়ার বীর জনতা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে শূন্য থেকে শুরু করে পরাক্রান্ত শত্রুকেও মোকাবিলা করা যায়। আজকে মুসলিম নেতৃত্ব পাশ্চাত্যের সামরিক আধিপত্যের সামনে রীতিমতো নতজানু ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন এবং মুসলিম দুনিয়ার উপর আপতিত সাম্রাজ্যবাদী হামলা ও চক্রান্ত মোকাবিলায় তাদের ভূমিকা একেবারে নেই বললে চলে। আলীয়ার

www.pathagar.com

নেতৃত্ব আমাদের দেখিয়েছে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ মোকাবিলার রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল এবং এটিকে একালের মুসলিম নেতৃত্ব তাদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

আলীয়ার দুর্ভাগ্য তিনি চার্চিল হতে পারেননি। এমনকি স্নায়ুযুদ্ধকালে বরিস পাস্তেরনাক, আলেক্সান্ডার সোলজেনিৎসিন ও আঁদ্রে শাখারভরা যে রকম পশ্চিমা মিডিয়ার নজর কেড়েছিলেন তাও তার ভাগ্যে জোটেনি। কারণ তিনি জন্মগতভাবে ইউরোপের হলেও বিশ্বাসের দিক দিয়ে ছিলেন ইসলামের অনুসারী। তাই অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া এই দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীকে সঠিকভাবে তুলে ধরেনি। তার বুদ্ধিজীবিতা ও উচ্চমানসম্পন্ন রচনাবলীর সঠিক স্বীকৃতি দিতেও পাশ্চাত্য তার সাম্প্রদায়িক ভেদ-জ্ঞান অতিক্রম করতে পারেনি। আলীয়া যদি ঘটনাক্রমে ইউরোপীয় খ্রিস্টান কিংবা ইহুদী হতেন তবে এতদিন তার ভাগ্যে কয়েক ডজন আন্তর্জাতিক পুরস্কার মিলে যেত, তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে আমরাও তাকে যথার্থ অর্থে তুলে ধরতে পারিনি।

আলীয়ার দিক থেকে আর একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। তিনি জন্মেছিলেন ইউরোপের এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে। জীবদ্দশায় তাকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছে স্বীয় সমাজের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। তার মেধা, মনন ও উচ্চমানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবিতা যদি পুরো মুসলিম দুনিয়ার সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহৃত হতো তবে মুসলমানরা আরো বেশি লাভবান হতে পারতো। তারপরে শত প্রতিকূলতার মুখেও ইসলাম ভাবনাই ছিল তার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রস্থলে। তিনি মুসলিম দুনিয়ার সমস্যা নিয়েও ভেবেছেন, এবং তার সমাধানের কৌশল নিয়েও নাড়াচাড়া করেছেন। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে তেহরানে অনুষ্ঠিত ওআইসি কনফারেন্সে তিনি যে ভাষণ দেন তা এসব ভাবনারই প্রতিফলন। এ শুধু নিছক প্রতিনিধি দলের নেতার ভাষণ নয়, এ তার মনের গভীর প্রার্থনাও বটে। আমি এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

Islam is the best - this is the truth-but we are not the best. Those two are different things and we always switch them, Instead of hating the West, we should compete with it. Did not the Qur'an order us to do just that : 'Strive to achieve the virtue of deeds .....' with the help of religion and science, we can create the power that we need. It is a long and hard road, it is the Qur'an talks about, but there is no other way.

ইসলাম শ্রেষ্ঠ, এ কথা সত্য। কিন্তু আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারিনি। দুটি পুরোপুরি ভিন্ন জিনিস অথচ এটিকে আমরা গুলিয়ে ফেলি। পাশ্চাত্যকে ঘৃণা নয়, এর সাথে আমাদের প্রতিযোগিতায় আসা উচিত। কুরআন কি আমাদের সেটা করতেই বলেনি যে ভালো কাজের জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করো। এটা একটা দীর্ঘ এবং শক্ত রাস্তা, যার কথা কুরআন বলেছে, কিন্তু এর কোন বিকল্প নেই।[২৪]

আলীয়া ইন্তেকাল করেছেন (১৯ সেপটেম্বর, ২০০৩)। কিন্তু তিনি একটি মডেল রেখে গেছেন। এ মডেল কর্মের, অর্জনের, সংগ্রামের এবং যোগ্যতার। আলীয়া নিজেই একবার বলেছেন, কাজ ছাড়া আমি বেঁচে থাকার প্রয়োজন বোধ করি না। ইসলামী দুনিয়া যদি কার্যকরভাবেই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায় তবে আলীয়ার এ মডেল গভীর

www.pathagar.com

অর্থেই অনুসরণ করা যেতে পারে। শতাব্দীর আবর্জনা মুক্ত হয়ে ইসলাম আজ আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছেছে। পতনের পথ পরিক্রমণ শেষে ইসলামের এই প্রত্যাবর্তনের লগ্নে আলীয়ার কণ্ঠস্বর আরো জোরে শুনতে পাচ্ছি।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Alija Izetbegovic, Islamic Declaration. উদ্ধৃত : আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম। তরজমা : ইফতেখার ইকবাল। ঢাকা : আমান পাবলিশার্স, ১৯৯৬।
২. Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autobiographical Notes. Leicester : The Islamic Foundation, 2003.
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. Alija Izetbegovic, Islamic Declaration. Quoted in Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autobiographical Notes.
৯. Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autobiographical Notes.
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. Quoted in Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autob iographical Notes.
১৬. Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autobiographical Notes.
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. Juan Goytisolo, Sarajevo Note books. Quoted in Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autobiographical Notes.
১৯. Alija Izetbegovic, Inescapable Questions : Autobiographical Notes.
২০. প্রাগুক্ত।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হাসান জামান

এক

হাসান জামান ছিলেন সুপন্ডিত, প্রাণবন্ত শিক্ষাবিদ ও অতিশয় সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষক। হাসান জামানের মনন ও চিন্তাভাবনা ছিল মূলতঃ ইসলামাশ্রিত। ইসলামকে ভিত্তি করে একালে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ছিল তার অভীষ্ট লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবদ্দশায় তিনি এক তুমুল বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বমুখর অবস্থানের মধ্যে তিনি এ দুটি মতাদর্শের নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন এবং তৃতীয় শক্তি হিসেবে ইসলামের অভ্যুত্থান সম্ভাবনাকে কামিয়াব করবার জন্য প্রাণবন্ত এক সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। হাসান জামান লিখেছেন, বলেছেন, বই পুস্তক ও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প রিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এসব তৎপরতার মধ্য দিয়ে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পাটাতনকে মজবুত করার চেষ্টা করেছেন।

গত শতকের ৫০ ও ৬০ এর দশকে বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম মানস পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব ও প্রক্রিয়ার সূত্রে এক দ্বন্দ্বমান পরিস্থিতির আবর্তে আটকে যায় এবং তাদের ভাবজগতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সব আধুনিক শিক্ষিত মানুষেরা ইসলামকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করেন। হাসান জামান বাঙ্গালী মুসলমানের ভাব জগতের এই বিমূঢ়তার কালে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসেবে উপস্থিত করেন এবং তাদের ভাবজগতের মৌল প্রাণশক্তি হিসেবে ইসলামকে সাব্যস্ত করেন। দৈশিক প্রেক্ষিতে হাসান জামান সমন্বয়ী ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি মনে করতেন ইসলামকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপরিচয় খন্ডিত হয়ে পড়বে এবং সমন্বয়ী সংস্কৃতির সূত্রে এই পরিচয় আরো বিবর্ণ হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষের দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাসের সূত্রে মুসলমানের যে ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় বিকশিত হয়েছে হাসান জামান সাহেব তাকে সংরক্ষণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন।

দুই

হাসান জামানের জন্ম ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার কাচেরকোল গ্রামে মাতুলালয়ে। তার পিতৃনিবাস ছিল মাগুরা জেলার তারাউজিয়াল গ্রামে। তার পিতা মোহাম্মদ মুসা ছিলেন সেকালের রেজিস্ট্রার অফ এ্যাসুরেন্সেস (Registrar of Assurances) এবং প্রপিতামহ মুন্সী গয়রাতুল্লাহ ছিলেন একজন আইনজীবী ও যশোর পৌর কমিটির একমাত্র মুসলিম সদস্য (১৮৬৪)। পিতামহ মুন্সী আবদুর রহিম ছিলেন

www.pathagar.com

ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি একাধিকবার হজ্ব করেন এবং প্রায় ২০ বছর কাল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর ইরান থেকে ভারতে আসেন। প্রথমে দিল্লীতে, পরে লাক্ষ্ণৌতে এবং পলাশীর যুদ্ধের পরপর এরা কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এরা বৃহত্তর যশোরের বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী হন। এই পরিবারের অনেকের বৃত্তি ছিল ব্যবসা, কেউ কেউ কুরআন শরীফ স্বহস্তে নকল করে বিক্রি করতেন।[১]

পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে হাসান জামানের লেখাপড়া শুরু হয়। তারপর তিনি নড়াইল হাইস্কুল, যশোর জিলা স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। ছোট বেলা থেকেই হাসান জামান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি তার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে স্টার মার্ক পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান ও কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে এ্যান্ডারসন গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি এ (অনার্স) ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। পরে দেশভাগের কারণে তৃতীয় বছরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এম এ পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলো হিসেবে (১৯৬১-৬৪) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Rise of the Muslim Middle Class as Political Factor in India and Pakistan (1858-1947) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হাসান জামান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন তমুদ্দুন মজলিসের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন এবং নিজের সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্মশক্তি ও বৈদগ্ধের জোরে অচিরেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম সংগঠকে পরিণত হন। তমুদ্দুন মজলিস প্রধানতঃ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে নবীন ও প্রতিভাবান ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিল ইসলামের ভিত্তিতে সামাজিক বিবর্তন, রূপান্তর ও নবনির্মাণ প্রচেষ্টার জন্য। তমুদ্দুন চিন্তার জগতে ইসলামকে এক বিপ্লবী আইডিয়া হিসেবে উপস্থাপন করে যা সেকালে বিশেষ করে মার্কসবাদের প্রবল স্রোতের মুখে পড়া হতবুদ্ধি বাঙ্গালী মুসলিম তরুণদের অনেকখানি আশ্বস্ত হতে সাহায্য করেছিল। ভাষা আন্দোলনের প্রধান উদযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও তমুদ্দুন মজলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সূত্রেই হাসান জামান বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তার গৌরবোজ্বল ভূমিকা পালনের দিকে অগ্রসর হন। ১৯৫৪ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে একই বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত হন।

শিক্ষক হিসেবে হাসান জামানের খ্যাতি ছিল প্রবাদপ্রতিম। অসম্ভব সুন্দর করে তিনি কথা বলতেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তাকে মহার্ঘ করে তুলেছিল। বিশেষ করে ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকুলার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ জ্বরে যখন অনেকেই

www.pathagar.com

বিকারগ্রস্ত তখন তার বিপরীতে হাসান জামানের মত একজন গভীরভাবে ইসলাম বিশ্বাসী মানুষ বলিষ্ঠতার সাথে দাঁড়িয়ে যান। ক্লাসরুম, সেমিনার, টেবিলটক, টেলিভিশনের পর্দা থেকে শুরু করে যে কোন বৃহত্তর পরিসরে হাসান জামান এমন বৈদগ্ধ ও প্রসাদগুণসম্পন্নভাবে ইসলামের বিপ্লবী ও মানবিক দিকগুলোকে তুলে ধরতেন যাতে শুধু তার শ্রোতারা বিমুগ্ধ হতো না, তার প্রতিপক্ষরাও বিমূঢ় হয়ে পড়তো। তার ভিতরকার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। একজন শরীফ, সুবক্তা, পন্ডিত ও প্রতিভান্বিত মানুষ হিসেবে তার সান্নিধ্যে যে কেউ তাজা ও সজীব হয়ে উঠতো। ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি অম্লান ভালবাসা পেয়েছেন। একজন সুশিক্ষকের যা গুণাবলী দরকার তা তার পূর্ণতরভাবেই ছিল।

শিক্ষকতার পাশাপাশি হাসান জামান ছিলেন একজন মেধাবী সাংস্কৃতিক সংগঠক। মনে ও মননে বুদ্ধিদীপ্ত ও আধুনিক এই মানুষটি ৫০ ও ৬০ এর দশকে মার্ক্সবাদ ও সেকুলার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে যাওয়া পূর্ব বাংলার তরুণ ও শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলামমুখী করবার জন্য নানারকম সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তার সৈন্যাপত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপরিচয়কে সংহত করার চেষ্টা চলে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এসময় 'সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ' 'পাকিস্তান একাডেমী' প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রকাশনার ভিতর দিয়ে তিনি তার মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যান। হাসান জামান বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথেও জড়িত ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি চিত্রা ও কথিকা নামে দুটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। দৈনিক জিন্দেগী ও মিল্লাত পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। পূবালী, সমাজ, পাকিস্তান স্টাডিজ, কারেন্ট নিউজ, ওয়ার্লড নিউজ ডাইজেস্ট পত্রিকাগুলোর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

ষাটের দশকে হাসান জামানের সবচেয়ে গৌরবজনক কাজ হচ্ছে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন-জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন। এটি পাকিস্তান সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান হলেও জনসাধারণের কাছে প্রিয়, পন্ডিত, সুবক্তা ও ইসলামী আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী হাসান জামানের অধিনায়কত্বে এ প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল বাঙ্গালী মুসলমানের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কে মজবুত ও তার সংস্কৃতির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলার উর্বর ক্ষেত্র। হাসানের উদযোগ ও প্রেরণায় পূর্ববাংলার বিপুল সংস্কৃতিসেবী, লেখক, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষেরা ব্যুরোর কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হন। এসব লেখক-বুদ্ধিজীবীরা অসংখ্য বইপুস্তক লেখেন যা ব্যুরো থেকে প্রকাশিত হয়। হাসান জামান একদিকে ছিলেন গভীরভাবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, অন্যদিকে সংস্কৃতি চিন্তার দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষে ইসলাম একটি নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ নিয়ে এসেছিল যা এখানকার মুসলমানদের ইতিহাসের ধারায় জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করেছে। এই বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলাম বিশ্বাসীরা কখনোই সমন্বয়ধর্মী জাতীয়তাবাদে আগ্রহী হয়নি। একই কারণে ভারতবর্ষের মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে লড়াই করেছে এবং শেষমেষ পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সন্দেহ নেই মুসলমানদের মুক্তি ও অস্তিত্ব রক্ষার দরকারে পাকিস্তানের উদ্ভব একসময় জরুরী হয়ে উঠেছিল। হাসান জামান মনে

www.pathagar.com

করতেন পূর্ববাংলার মুসলমানরা ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক ধারা ও আত্মপরিচয় থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিল না। ষাটের দশকে পল্লবিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে তিনি মনে করতেন পূর্ববাংলার মুসলমানদের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কে টুটোফাটা করার একটা নিছক ষড়যন্ত্র এবং সেকুলার সংস্কৃতির আড়ালে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উপর জোর করে উনিশ শতকীয় কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু সংস্কৃতি ও ভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব চাপিয়ে দেয়ার কৌশল। এই কারণেই তিনি জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর প্রধান হিসেবে বাবু সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবিলা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তার বিশ্বাস যে ভুল প্রমাণিত হয়নি তা এ অঞ্চলের পরবর্তীকালের ইতিহাস কতকটা স্পষ্ট করেছে। হয়ত এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং সেই সময় পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাসীদের সাথে এক জোট হয়ে কাজ করেছেন। তার এ ভূমিকার জন্য সেকুলারবাদীদের কাছে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। এর মানে এই নয় হাসান জামান তৎকালীন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও সামাজিক বেঈনসাফীর কারণসমূহ যথাযথ পর্যালোচনা করতে পারেননি। কিন্তু সে সব সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করাকেই তিনি উত্তম বিবেচনা করেছেন। কখনোই মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে প্রতিস্থাপিত করে নয়। হয়ত এ কারণেই তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে লড়াই করেও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি।

কোন সন্দেহ নেই তিনি ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী প্রকৃতির মানুষ। তখনকার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান বিশ্বাসেও তিনি ছিলেন সৎ। এই বিশ্বাসের জন্য সবকিছু বাজি ধরতেও তার কুণ্ঠা ছিল না। ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য তিনি এসব কিছু করেননি। হতে পারে সে বিশ্বাস অনেকের পছন্দ ছিল না কিন্তু সে বিশ্বাসে কোন খাদও ছিল না। এ বিশ্বাসের কারণে বাংলাদেশ হওয়ার পর সেকুলারবাদীরা তার উপর নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালায়। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এই বিশ্বাসী পন্ডিতকে হত্যার চেষ্টা করে এবং মৃত ভেবে গুলিস্তানের কামানের কাছে ফেলে রেখে যায়। প্রায় অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। এরপর তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং শুধুমাত্র মতাদর্শিক ভিন্নতার কারণে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। প্রচন্ড রাজনৈতিক বৈরিতা, মানসিক বিপর্যয় ও নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে তাকে এ সময় কাটাতে হয়। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর জীবিকার সন্ধানে তিনি দেশত্যাগ করেন এবং ১৯৭৪ সালে সৌদি আরব গমন করেন। সেখানে তিনি জেদ্দার বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। নতুন দায়িত্বে এসে এবার হাসান জামান দৈশিক প্রেক্ষাপট অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বলয়ে কাজ শুরু করেন এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রধানত অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং এর প্রতিকারের পথ বাৎলান।

এর মধ্যে ১৯৭৫ সালে তিনি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসোসিয়েট মনোনীত হন ও গবেষণার জন্য অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত হন। এমনি এক গবেষণার কাজে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেদ্দা প্রত্যাবর্তনের পথে হাসান জামান ১৯৮১ সালের ২৪ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। ২৯ আগস্ট তাকে মক্কা শরীফে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

হাসান জামান ছিলেন অনমনীয় আপোসহীন এক বিশ্বাসের শহীদ।[২] বিশ্বাসের যে মানদন্ড তিনি তৈরি করেছিলেন তাকে তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও টলতে দেননি। আদর্শ ও বিশ্বাসের ব্যাপারে অটল থাকার কারণে আদর্শবাদীকে অনেক সময় বড় রকমের ঝুকি নিতে হয়, যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই ঝুঁকি নিয়েই হাসান জামান প্রমাণ করেছেন তিনি ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ।

তিন

হাসান জামান তার সৃষ্টিশীলতা ও সংস্কৃতিমানতার পরিচয় রেখে গেছেন প্রধানতঃ মননশীল প্রবন্ধগুলোতে। সেখানে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির নানা দিক নিয়ে তার বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রজ্ঞার লালিত্য যেন চোখ মেলে আছে। প্রগতিশীল বলতে ঠিক আজকাল যা বোঝায়, ধর্মের প্রতি সেরকম কোন বিরাগ তার ছিল না ; কিন্তু গোঁড়ামিও তাকে স্পর্শ করেনি। প্রগতিকে তিনি বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকটা বুঝতেও পারতেন। প্রগতির নামে ধর্মবিমুখতা কিংবা ধর্মের মূল্য খাটো করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং প্রকৃত ধর্মের মধ্যে থেকেও যে প্রকৃত প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিবান হওয়া যায় তিনি তার উত্তুঙ্গ নজির স্থাপন করেছিলেন।

ধর্মকে তিনি নিছক যাজকতন্ত্র কিংবা মোল্লাতন্ত্রের সমতুল্য মনে করেননি। এটিকে তিনি বিবেচনা করেছেন জীবনদর্শন হিসেবে এবং সেই জীবন দর্শনের মাধ্যমে মানবতাবাদ বাস্তবে রূপায়িত করার ভরসা তার যথেষ্ট ছিল। বলাবাহুল্য ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের মধ্যেই সে সম্ভাবনা নিহিত আছে বলে তিনি মনে করতেন।

চলতি হাওয়ার প্রগতিপন্থীদের মত তিনি ধর্মকে কালচারের এক উপাদান হিসেবে বিবেচনা না করে পরিবর্তে কালচারকেই ধর্মের একটা অংশ হিসেবে গণ্য করার কথা বলেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ কারণ ধর্মের মধ্যে জীবনধারা, চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনদৃষ্টি রয়েছে। এক্ষেত্রে জীবন দৃষ্টি (ধর্ম) গোটা সংস্কৃতিকে কেবল প্রভাবিত করে তাই নয়, সংস্কৃতির কর্মধারা ও মূল্যায়নেও এর তাৎপর্য সমধিক। জীবন সংস্কৃতির সামাজিক রূপায়ণেই (বাস্তব ও আধ্যাত্মিকের সমন্বয়) পূর্ণতর মানুষের বিকাশ সম্ভব হয়।[৩] হাসান জামানের এ উক্তির মূল্য বোঝা কষ্টকর নয়।

ধর্ম অর্থে তিনি একটি বিকাশমান অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করেছেন, যার মাধ্যমে মানবতাবাদ ও বিশ্বজনীনতা স্ফুরিত হবে। ধর্মের বিকৃতিকে তিনি ধর্ম নামে অভিহিত করতে চাননি। তিনি মনে করতেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ জিইয়ে রাখলে ধর্মেরই অপমান হয়। যে জীবনদৃষ্টি মানুষের উপর অনুশাসনের জগদ্দল চাপায় না, সবরকমের গোঁড়ামি, অজ্ঞতা থেকে সরিয়ে সর্বজনীন মূল্যমানের দিকে মানুষের বিকাশ ও বিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত করে তাই হল প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার সমকালে প্রচলিত কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার তিনি নিন্দা করেছেন। এসব ধারণা পুষ্ট হয়েছে সে সময়ের প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা যারা মূল্যবোধ হিসেবে ধর্মের গুরুত্বকে খাটো করতে আগ্রহী ছিলেন। তারাই প্রচার করেছিলেন সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে ধর্ম বিশেষভাবে পরিপন্থী। কারণ ধর্ম মানলে সাহিত্যিকের রস কল্পনাবিশিষ্ট শ্রেণী প্রত্যয়ের উপরে উঠতে পারে না, বুদ্ধিদীপ্তির অভাব ঘটে, সাহিত্যিকের প্রতিভার স্ফুরন সম্ভব নয়, কেননা প্রতিভার নাকি বড় গুণ হচ্ছে বৈচিত্র্য ও অস্বীকার করার বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি।

www.pathagar.com

হাসান জামান এ প্রগতিমূলক মানসিকতাকেও এক ধরনের বদ্ধ মানসিকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ যারা ধর্মের বিরোধিতা করেন তারাও এক ধরনের একমার্গী ও প্রান্তিক অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে ধর্মের বিরোধিতায় নামেন। নিজেদের মতামতের বাইরে ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে তারাও এক ধরনের বৈচিত্র্য ও বহুরূপিতাকেই অস্বীকার করে বসেন।

হাসান জামান গভীরভাবেই মনে করতেন, ধর্মের সর্বজনীন মূল্যবোধ কার্যতঃই প্রয়োগ করা গেলে সাহিত্য প্রতিভার বৈচিত্র্য মৃতকল্প হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসে না বরং এর আওতায় মানুষের প্রতিভা নব নব রূপে, রসে, আকারে-প্রকারে আত্মপ্রকাশ করার ভরসা রাখে। তাই হাসান জামান যথার্থ লিখেছেন ঃ তাই ধর্মকে এখানে কেবল নীচুদরের লোকদের কালচার মনে করার প্রবৃত্তি নেই বা কালচারকে উঁচুস্তরের ধর্ম মনে করে চিন্তার কুয়াশা সৃষ্টিরও প্রয়াস নেই।[৪] বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম হিসেবে যার মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাজন নেই, পূরোহিততন্ত্র নেই, যার সংস্কৃতি বিশ্বজোড়া, বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ভাষার মাধ্যমে যে সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ তোলা এক বড় ধরনের প্রমাদ বৈ অন্য কিছু নয়।

এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার আজকালকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে সংকীর্ণ দেশ, ভাষা, কতকক্ষেত্রে গোত্রীয় ধারণার সমতুল্য কোন জিনিস। অন্যদিকে ইসলামের সংস্কৃতি ইসলামী জীবন-দর্শন ও মানবতার উপরে নির্ভর করে-আদর্শের দিক দিয়ে সারা দুনিয়ার মুসলমান একই সূত্রে গাঁথা। রক্ত, বর্ণ, ভাষার ভিত্তিতে মুসলমানের ঐক্য হতে পারে না। এ সর্বজনীনতা, উদারনীতিকতা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়ার কথা। ইসলাম শুধু বলতে চায় কতকগুলো সর্বজনীন মানবিক নীতি না মানলে বিশ্ব মানব সমাজের মধ্যে এক বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকে, অতীতে আমরা তা দেখেছি। এ নীতির ভিত্তিতেই ইসলাম চায় এক সর্বজনীন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে। হাসান জামান ইসলাম আর মানবতাবাদকে সমার্থক হিসেবেই দেখেছেন, তেমনি একজন আদর্শবাদী মুসলমানও তার কাছে হয়ে উঠেছে আগাগোড়া হিউম্যানিস্ট-মানবতাবাদী। হাসান জামানের মতামত এখানে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

খাঁটি মুসলমানের কাছে (এবং সব ধার্মিকের কাছে) তার আদর্শগত সংহতি, তাদের দেশের সীমানার চাইতে বড়। কারণ সে আদর্শ জাতিগত অন্ধতা দূর করে সব মানুষকে ভালবাসতে শেখায়।[৫] এর অর্থ এই নয় ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দেশাত্মবোধকে ছুড়ে ফেলতে চায়। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে দেশাত্মবোধ যেন গোষ্ঠীতন্ত্রে রূপ না নেয় এবং সেই গোষ্ঠী মানবতা, ইনসাফ, ইসলামকে উল্লঙ্ঘন করে যায়। হাসান জামানের লক্ষ্য ছিল নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে একালে ইসলামের এক আত্মনিরীক্ষা। তার সমকালে জীবন দর্শন হিসেবে ইসলামকে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়। সেই প্রেক্ষিতে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতিচিন্তা, দর্শনচিন্তা ও অন্যান্য চিন্তাকে নতুন আলোকে স্থাপন করেন এবং তার কৃতিত্ব এই যে মুসলিম ইতিহাসের কোন কোন গ্লানি ও চিন্তার অনগ্রসরতাকে অতিক্রম করে এ কালের মুসলিম মানসকে প্রস্তুত হবার কথা বলেন। বিশেষ করে আমাদের এ উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে এখানকার মুসলিম সমাজের নিজস্ব কতকগুলো সমস্যা সমাধানের উপায়ের কথা ভাবেন। তিনি মনে করতেন এ অঞ্চলের মুসলমানদের সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী

www.pathagar.com

সংস্কৃতি অনুগ নয়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন বহুকাল ধরে আমরা মোগল সাম্রাজ্য ও অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্যিক সংস্থাকে ইসলামের সমতুল্য হিসেবে মিলিয়ে দেখেছি। এই মিলিয়ে দেখার মধ্যে একটা বড় রকমের ফাঁক আছে। কারণ এসব সাম্রাজ্য মুসলমানরা চালালেও এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে এসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ব্যবস্থার মূলকথা যে মানবতাবাদ তা পুরোপুরি রূপায়িত হতে পারেনি। এই রূপায়িত হতে না পারার কারণে মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা ঢুকে পড়েছে এবং এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। একই কারণে আমরা ভাষিক, ভৌগোলিক ও গোষ্ঠীর পরিচয়ে নিজেদের পরিচিত করে তুলেছি, কিন্তু আমাদের যে মূল ঠিকানা ইসলাম তার থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছি। তিনি লিখেছেন ঃ মুসলিম রাজা-বাদশাহরা এদেশে শাসন না করলে ও ইসলামের সর্বজনীন ভাবধারায় পুষ্ট চিন্তাবিদদের হাতে রাজনৈতিক ও তমুদ্দুনিক আন্দোলনের ভার থাকলে, এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ যে অনেক গৌরবজনক হত ও ইসলামী জীবনবোধের রূপায়ণ অনেকখানি সহজ হয়ে যেত তাতে কোনই সন্দেহ নেই।[৬]

হাসান জামানের এ উক্তির মধ্যে তার এক ধরনের রোমান্টিক মনের পরিচয় মেলে। কিন্তু এটাও সত্য আদর্শবাদী মাত্রই কিছুটা রোমান্টিক এবং ভাবুক। তাদের এই ভাবুকতার মধ্যেই তারা আমাদের নতুন সমাজ নির্মাণের দিশা দিয়ে থাকেন।

হাসান জামান ইসলামের মৌলিক ভাবের উপর দাঁড়িয়ে যেমন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, তেমনি বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেও ইসলামী জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমার্থক হতে হবে বলে মনে করতেন। তার বিবেচনায় পৃথিবীর সব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের শুভ মূল্যমানগুলোই গ্রহণ করা যেতে পারে যদি না তা মানুষকে অমানবিক, অসামাজিক ও নীতিহীন কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ইসলামের তৌহীদবাদের ধারণা থেকে বিচ্যুৎ না করে ফেলে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সংস্কৃতির অভ্যুত্থান ঘটছে, যে সাহিত্যের নব নির্মাণের কথা শোনা যাচ্ছে তা তৌহিদের জারকরসে সঞ্জীবিত কিনা। কারণ ব্যাপক অর্থে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পে ইসলামী জীবনবোধের প্রকাশ ও মুসলিম জীবনের ছবি বর্তমান থাকতে হবে। এর মানে এই নয় অন্য সাহিত্যের রসস্বাদন করা যাবে না। এখানে হাসান জামানের নীতি হচ্ছে ঃ

তবে রসাস্বাদন করা আর কোনও একটি সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নীতিবোধ জীবন দর্শন হিসেবে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা একেবারেই পৃথক ব্যাপার।[৭]

হাসান জামান মনে করতেন, বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়তি পৃথিবীর তাবৎ মুসলিম সংস্কৃতির সাথে রূপগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একই ধারায় এগিয়ে যাবে এবং তৌহীদকে কেন্দ্র করে যে সর্বজনীন মানবতাবাদ তার প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে সর্বাত্মক করে তুলবে।

আর্ট বা শিল্পকলা নিয়ে হাসান জামানের প্রত্যয় ছিল রীতিমত গণমুখী। আর্ট থেকে মানুষের নৈতিক মূল্যমানগুলো যদি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, আর্টের সাথে যদি মানুষের সংযোগহীনতা বাড়তে থাকে, আর্ট যদি হয় দূরগজদন্তমিনারে বসে শিল্পীর সাধনার বস্তু তবে সেই আর্ট হয়ে উঠবে লক্ষ্যহীন। আর্টে যদি সমাজের অন্তর্গূঢ় সত্তার প্রতিফলন না থাকে, আর্টের উদ্দেশ্য যদি না হয় মানবকল্যাণ, আর্ট যদি হয় শুধু আর্টেরই জন্য, তবে

www.pathagar.com

সেই আর্টকে হাসান জামান গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তার নিজের ব্যাখ্যা শোনা যাক ঃ ইসলাম চায় সর্বজনীন আনন্দ। ইসলাম চায় না শিল্প গুটিকতক ধনী বা শাসকের বিলাসসামগ্রী হোক এবং এদের খেয়ালিপনা চরিতার্থ করার জন্যে জনসাধারণ শোষিত হোক কিংবা তাদের দ্বারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হোক। শিল্পকে ইসলাম অত্যন্ত উচ্চে স্থান দেয়, কিন্তু শিল্পকে বিলাসিতায় পর্যবসিত করে ধনিক বা শাসক গোষ্ঠী মশগুল থাকলে তারা রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন না। ইসলাম এই ধরনের শিল্পকেই বাধা দেয়।[৮]

শিল্পের এই প্রাণদ, গণমুখী ও মানবতন্ত্রী ব্যাখ্যার ধারণা এক অর্থে তুলনাহীন। বলাবাহুল্য শিল্পের এই রকম ব্যাখ্যায়নে হাসান জামান ইসলামের মানবতাবাদের ধারণা থেকেই প্রাণিত হয়েছিলেন। আর এরকম ব্যাখ্যায়নে তিনি উজ্জীবিত হয়েছিলেন সমকালের পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন এক সর্বজনীন জীবন দর্শনের (তার ভাষায় ইসলাম) যোগাযোগ না থাকলে শিল্পভোগ ও আনন্দভোগত দূরের কথা, মাঝপথেই মানুষের পতন হয়। মানব সমাজের সর্বজনীন কল্যাণের জন্যই ইসলামের আগমন, যার সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির ও সৌন্দর্য বোধের কোন বিরোধ নেই, বরং একটি আরেকটিকে পুষ্টি দিয়েছে। হাসান জামান ছিলেন হিউম্যানিস্ট-পুরোপুরি মানবতন্ত্রী। কিন্তু তার এই মানবতন্ত্রের ধারণা থেকে ষোড়শ শতকের পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁ প্রভাবিত ধারণার একটা বড় পার্থক্য ছিল। তিনি তার মানবিক চেতনা ও জীবনবোধের ধারনা অর্জন করেছিলেন ইসলাম আশ্রয়ী মূল্যমানের কাছে। একারণেই তিনি মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যুক্তিবাদিতার প্রয়োজন অনুভব করলেও, যুক্তিবাদিতার নামে ধর্মবিরাগ তিনি প্রশ্রয় দেননি, অন্ধ অনুবর্তিতা বর্জনের নামে ইসলাম বর্জনের ধুয়া তোলেননি, ললিতকলার চর্চার মাধ্যমে জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার কথা বললেও অন্যের সংস্কৃতির কাছে হাত বাড়াননি।

হাসান জামান মনে করতেন বাঙ্গালী মুসলমানকে তাদের নিজেদের বোধকে ইসলামের বিশ্বচেতনার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। অন্য জাতির সঙ্গে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করার স্বেদসিক্ত পদচারণা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই তাদের আসল মুক্তি আসবে। হাসান জামান ইসলামের বিশ্বচৈতন্যকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই আলোকেই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিকে সাজিয়ে তুলবার কথা ভেবেছিলেন। একই কারণে হাসান জামান কুরআনের আলোকে অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাকেও আল্লাহর এক গভীর দান হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এই ভাষাকে কেন্দ্র করে নিজেদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু এই বাংলা ভাষাকে নির্ভর করে ইসলামকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন জাতীয় চেতনা বিকাশের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। একইভাবে রাষ্ট্র চিন্তার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের অনুরাগী। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র বলতে তিনি সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই বুঝিয়েছিলেন যেখানে মানবতার অনুসারী ইসলামী নামের মূলনীতিগুলো অপরিবর্তনীয় থাকবে। কিন্তু আজকাল যেরকম কায়েমী স্বার্থবাদীরা হয় প্রগতির নামে কিংবা রাজতন্ত্রের নামে ইসলাম ইসলাম ধুয়া তুলে ইসলামের মানবিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে, হাসান জামান সেই ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র বলতে তিনি মোল্লাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিংবা তথাকথিত

www.pathagar.com

ধর্মীয় লেবেলের ইসলাম বুঝেননি। তিনি কার্যতঃই ইসলামের সমাজ নীতির সঙ্গে বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপনের কথা বলেছেন। তার এসব কথা খুবই মূল্যবান মনে হয় ঃ

মুসলিম জনগণ মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম শাসক, মুসলিম সাহিত্য চেয়ে এসেছেন যুগ যুগ ধরে, কিন্তু তারা দেখেননি যে, তাদের রাষ্ট্রে, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ সম্যকভাবে রূপায়িত হয়েছে কিনা।[৯]

তিনি এ কথাও বলেছেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়, বরং ইসলামের মূল আদর্শ ও বিচিত্র সম্ভাবনার কথা বর্তমানের প্রেক্ষিতে চিন্তা করে আগামী ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করা। হাসান জামানের বিশ্বাস ছিল ইসলামের রিভাইভাল-পুনরুজ্জীবন সে পথেই আসবে।

চার

একালে ইসলামের ভগ্নদশা হাসান জামানকে ভাবিয়েছে। ইসলামের অনুবর্তীদের দুর্দশা তার মনে সৃষ্টি করেছে গভীর ক্ষত ও বেদনা। তিনি এর পূর্বাপর কারণগুলো খুঁজে ও বুঝে দেখার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানের বেদনা তাকে হতোদ্যম করেনি, উল্টো বেদনাকে তিনি শক্তিতে পরিণত করেছেন। মুসলমানের জীবনে তাই প্রকৃত প্রগতি কেন স্তব্ধ হয়ে গেল সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

মুসলমানেরা যখন কেবলমাত্র নৈতিক অনুশাসনকেই যথাসর্বস্ব মনে করল- তার মৌলিক ভাবকে ভুলে গেল- পরিশ্রম করা ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরতে ভুলে গেল, জীবনের সঙ্গে নীতির যখন কোন বাস্তব ও সক্রিয় যোগাযোগ রইল না- তখনই হিমানী সম্পাতের মতো তার পতন ঘনিয়ে এল।[১০]

হাসান জামানের উক্তি থেকে বোঝা যায় তিনি প্রগতিবিমুখ ছিলেন না, সমস্যার গভীরতা বোঝার জন্য তার আধুনিক মন ছিল। কোন একটি ব্যবস্থার কিংবা আদর্শের যখন নতুন কিছু দেয়ার থাকে না, জীর্ণতা এসে যখন তার শরীরে বাসা বাঁধে তখন সেটি আপনিই ভেঙ্গে পড়ে। মুসলমানরা যখন তাদের ইজতেহাদী সাধনা ভুলে গেল, অতীতমুখীনতা ও জ্ঞানচর্চাবিমুখতা যখন তাদেরকে পুরোদস্তুর আশ্রয় করল তখন তাদের পতন ঠেকানো গেল না। অথচ নাম থেকে গেল ঐ এক মুসলিমই। ইসলামের প্রকৃত অনুবর্তী হতে যে প্রাণাবেগ ও সাধনার প্রয়োজন মুসলমানের মধ্যেতা আর অবশিষ্ট রইল না। অথচ দেখা গেল অন্যান্য জাতির ইসলামের এই ইজতেহাদী সাধনাকে গ্রহণ করে তাকে নানাভাবে বর্ধিষ্ণু করে তুলেছে। নানা রকম বাধা-বিপত্তি, পরীক্ষা-অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তারা এগুলো কিছু কিছু গ্রহণ করেছে। অথচ মুসলমানরা বহুদিন এদেরকে বিধর্মী বলে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, তাদের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেনি। জ্ঞান বিজ্ঞান ও বাস্তব সামাজিক অবস্থা থেকে তারা পিছিয়ে পড়েছে। তারা অতীতের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে বাস্তব সমস্যা মোকাবিলার ভয় থেকেই। ইজতেহাদ ও বাস্তব সমস্যার মোকাবিলাও যে ইসলামের শিক্ষা তার থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। হাসান জামান লিখেছেন ঃ ইজতিহাদী সাধকেরা অনেক দিক দিয়ে নীতিহীন হলেও বাস্তব সভ্যতায় তাদের দানকে খাটো করে ফায়দা নেই। আর এই দিকে অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা তো ইসলামই যুগিয়েছে।[১১]

www.pathagar.com

হাসান জামান এখানে রীতিমত বিশ্বনাগরিকতাবাদী, জ্ঞানের ক্ষেত্র তিনি সংকুচিত করে নেননি এবং বিশ্বের মানসসম্পদ আহরণ করে জীবনকে সমৃদ্ধ করায় তার কোন আপত্তি ছিল না, যদি না তা ইসলামের মৌলবিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। হাসান জামান আরো লিখেছেন ঃ

তাই মুসলমানের পতন হয়েছে- ইসলামের সামাজিক কার্যধারা, ইজতিহাদ ও নীতির বাস্তব রূপায়ণের অভাবের ফলে, ইসলামকে অনুসরণ করার ফলে নয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে পুরোপুরিভাবে জীবনে গ্রহণ না করার ফলেই।[১২]

তাহলে কি ইসলামকে এগিয়ে নিতে হলে পশ্চিমের প্রগতির কাছে ধরনা দিতে হবে। হাসান জামান মনে করেন তা অবশ্যই নয়। পশ্চিমের প্রগতি আমিত্ব ও বস্তুতান্ত্রিকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার বস্তুতান্ত্রিক সাধকেরা যে ইজতেহাদী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন তা অবশ্যই ইসলামসম্মত নয়। কারণ তারা নৈতিক পরীক্ষায় টিকতে পারেননি এবং এ কারণেই নীতি ছেড়ে শুষ্ক বস্তুবাদ গ্রহণের ফলে পৃথিবী জুড়ে লুটমার, হানাহানি ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে আমাদের উলামারা কাজ ছেড়ে শুকনো নীতির কচকচানিতে ব্যস্ত রয়েছেন। মুসলিম সমাজের নীতিকে জীবন থেকে সরিয়ে কিতাবগত করে রাখায় তাদের জীবনের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ হচ্ছে না। তাই হাসান জামান মনে করেন ইজতিহাদ ও নীতির মিলনের মধ্যেই প্রকৃত প্রগতি সম্ভব এবং এ দুটিকে একই সাথে চলা চাই।

পাঁচ

১৯৫২ সালে তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্সে হাসান জামান একটি মূল্যবান ভাষণ দেন। এটির শিরোনাম ছিল ঃ Political Science and Islam; যা পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ বক্তৃতায় তিনি তার ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা কিছুটা বিবৃত করেছেন। এখানে তিনি ইসলামকে একই সাথে বৈপ্লবিক ও বৈশ্বিক আদর্শবাদ হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তার কথায় ঃ

Islam has given a comprehensive definition of religion-comprehensive both as to the earthly life and as to the entire life-this life and the hereafter. The scope of 'Ibadat' has been widened to the actions of the whole life-both individual and social.[১৩]

তার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় ইসলামকে তিনি প্রচলিত অর্থে ধর্ম হিসেবে না দেখে একটি আদর্শ হিসেবে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। তার পাশাপাশি তিনি আজকের দিনের প্রচলিত ইউরোপীয় সেকুলার আদর্শবাদ সম্বন্ধে বলেছেন বুর্জোয়া উদার নৈতিকতা সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে অপসারণ করতে চেয়েছে এবং বলশেভিক ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু সমাজ জীবন থেকেই নয়, ব্যক্তির চিন্তা ও মনন থেকেও ধর্মকে বিতাড়ন করতে চায়। এটা করতে গিয়ে ইউরোপীয় জড়বাদীরা মানব সভ্যতাকে সবরকমের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যমান থেকে বঞ্চিত করেছে, পাশাপাশি মানব সভ্যতার আধ্যাত্মিক ঐক্যকে হত্যা করেছে। হাসান জামান বলেছেন বুর্জোয়া উদার নৈতিকতার সেকুলারিজম রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং বলশেভিক সেকুলারিজম অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বললেও আদপে রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামে জাতিতে জাতিতে হানাহানি, বিদ্বেষ এবং

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মুক্তির নামে শ্রেণী সংঘাত ও কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যবস্থা মানবতাকে শাসন করছে মাত্র। এর বিপরীতে হাসান জামান মনে করেন ইসলামী আদর্শবাদ একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা যেখানে বস্তু ও অবস্তুর জগত, কুদরত ও ফিতরতের মধ্যে কোন বিভাজন টানা হয়নি। সুতরাং হাসান জামানের ভাষায় ইসলামী রাষ্ট্র মানে হলো ঃ

A universal morality, rather than a national or class morality, will guide the action of an Islamic Government. In a genuine Islamic society, there is neither any priesthood nor any fascist integration of state and society. There is enough room for different viewpoints and community culture in an Islamic society. There is perfect moral freedom to choose any ideology one likes but when Islam is chosen, its principles must be actualized both in its individual and social aspects.[১৪]

ইসলাম তাই যুগে যুগে জালিমের বিরুদ্ধে তৌহীদের ভিত্তিতে মজলুম জনগণকে দাঁড় করিয়েছে এবং মুসলমানের জিহাদগুলো ছিল আসলে বড় বড় সামাজিক বিপ্লব। তাদের লক্ষ্য ছিল এক একটি সুষ্ঠু সমাজ। তৌহীদবাদী বিশ্বদৃষ্টির মারফত মানুষের ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক জীবনে বিপ্লব সাধন করে মানবমুক্তির পথ প্রশস্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। হাসান জামান সাহেব এই প্রেক্ষিতে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াইকেও ধর্মীয় জিহাদের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণী আধিপত্য ও শ্রেণী হিংসার মত সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূল করা।[১৫]

সমকালীন কমিউনিজম মতাদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেছেন আদর্শের জায়গা থেকে ইসলামের সাথে এর কোন সমঝোতা হতে পারে না। কারণ ঃ কমিউনিজম আল্লাহর অস্তিত্ব, ওয়াহী ও পরলোক বা আখেরাত সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ও ব্যক্তি সত্তাকে আদৌ স্বীকার করতে চায় না। কমিউনিস্টরা ব্যক্তির উন্নতির চাইতে ব্যক্তিকে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেই অধিক উৎসাহী হয়। কমিউনিজম পরিবার প্রথা ধ্বংস করে দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম ঘনীভূত করে তোলে ও মানবিক নীতির একক সত্তা অস্বীকার করে দল ও রাষ্ট্রের সুবিধামত তার ব্যাখ্যা প্রদান করে।[১৬]

ইসলামকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে বৈশ্বিক জীবনাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করলেও তিনি আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম অনুসারীদের হতোদ্যম অবস্থাকে গ্রহণ করতে রাজি নন। তিনি বলেছেন এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে ইসলাম অনুসারীদের ইজতেহাদী মন মানসিকতা থেকে সরে আসা। তার ভাষ্য শোনা যাক ঃ

At the present moment, it has been very difficult to appreciate the principles of Islam, because Islam is taken to be synonymous with monarchism, despotism, feudalism and communalism and the suppressionism of the female sex and often with ignorance. But we must remember that this is fanatistic and also this that no progressive movement which is not inspired by and based on religious conviction adapting (not compromising) itself with changing needs and situations

www.pathagar.com

will ever alter the texture of an Islamic society, although going in the name of Islam.[১৭]

সত্যিকার অর্থে এই ইজতেহাদী মানসিকতা নিয়েই হাসান জামান আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন ইসলামী ইখওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে এক নতুন সমাজ নির্মাণের।

ছয়

হাসান জামান যুগপৎভাবে স্বাপ্নিক ও ধার্মিক ছিলেন। এক ধর্মীয় আদর্শবাদের ভিতর দিয়ে তিনি মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এটা আমাদের বোঝা দরকার তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তার ধর্মবিশ্বাসে প্রবলতা ছিল কিন্তু সে প্রবলতার মধ্যে অন্ধ সংস্কার ছিল না। তিনি যুক্তিবাদে আস্থাশীল ছিলেন, কিন্তু তা ইসলামী ধারণার মৌলিক নীতির সীমারেখার মধ্যে। তার জীবনবোধ, বৈদগ্ধ, মানবিকতা, সৃজনশীলতা, যুক্তিবাদিতা, নৈতিকতা ও প্রগতির ধারণার চমৎকার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। ইসলামের শরীর থেকে যুগান্তের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও আবর্জনা ছাড়িয়ে একালের জন্য ইসলাম অনুবর্তীদের প্রস্তুতি নেয়ার কথা তিনি বলেছিলেন। ইসলাম আজ শতাব্দীর জড়তা ছিঁড়ে ভবিষ্যতের পানে চোখ তুলে তাকিয়েছে। মুসলমানের সেই অনতিদূর গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথিকৃৎ বুদ্ধিজীবী হিসেবে হাসান জামান ন্যায়সংগতভাবেই আজ আমাদের অভিবাদন পেতে পারেন।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. আবু জাফর, 'ড. হাসান জামান,' উদ্ধৃত ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদকমন্ডলী কর্তৃক গ্রন্থিত। ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯।

২. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, নিষ্ফলা মাঠের কৃষক। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬।

৩. ড. হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. Hasan Zaman, Political Science and Islam. Dacca : Tamaddun Majlish, 1952.

www.pathagar.com

১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. ড. হাসান জামান, ইসলামী অর্থনীতি। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।
১৬. ড. হাসান জামান, কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম। ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৩৭৭।
১৭. Hasan Zaman, Political Science and Islam.

www.pathagar.com

মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান

এক

একালের জার্মানভাষী নওমুসলিম, যারা মনীষা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় এক শতাব্দী আগে আর এক জার্মানভাষী অস্ট্রিয়ান লিউপোল্ড উইস ইসলাম কবুল করে রীতিমত হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মোহাম্মদ আসাদ নামে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতে তিনি যে হীরন্ময় দ্যুতি ছড়িয়েছেন তার তুলনা আজও নেই। তারও আগে জার্মান মহাকবি গ্যোয়েটে ইসলামকে নিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন প্রীতির ভাষণ, ইসলামের নবীকে নিয়ে লিখেছিলেন তার অন্যতম এক বিখ্যাত সংগীত। সবশেষে তার বিখ্যাত দিউয়ান-এ (West Eastern Divan) গ্যোয়েটে নিজের সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলেন এক নিগূঢ় ও রহস্যময় বাক্য ঃ

The poet does not deny the suspicion that he himself was a Muslim.[১]

এর থেকে অনেকে এই ধারণা করেন মুসলমান না হলেও কবি বোধ হয় অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ইসলামের জন্য এক বিশেষ স্থান করে রেখেছিলেন।

জার্মানীতে মুসলিম মনীষা, বুদ্ধিজীবিতা ও মননশীলতার চর্চা ও বিশ্লেষণ নতুন কোন ঘটনা নয়। বলা চলে অষ্টাদশ শতকে তুর্কী খলিফা ও জার্মান রাজাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর প্রক্রিয়া শুরু হয়। জার্মান প্রাচ্যবিদরা এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এসব প্রাচ্যবিদরা ইউরোপের অন্যান্য বিশেষ করে বিলাতী ও ফরাসী প্রাচ্যবিদদের মত করে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনেবিশবাদকে সহায়তা করেননি। তাদের জীবনব্যাপী সাধনা, মননশীলতা ও সৃজনসমৃদ্ধ মনীষার জোরে ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের জগত অনেকখানি সম্প্রসারিত হয়েছে। এরা প্রকৃতই ইসলাম বান্ধব। ফ্রেডারিখ রুকার্ট (Freidrich Ruckert), থিওডর নলডিকি (Theodor Noldecke), রুডি প্যারেট (Rudi Paret), আনমারী শিমেলের (Anne Marie Schimmel) নাম কে না জানে। নওমুসলিমদের মধ্যে শেখ রিনি গুইনন (Shyakh Rene Guenon), থ্যিসফ স্যুন (Frithjof Schuon), আহমদ ভন ডেনফারের (Ahmad Von Denffer) নাম করা যেতে পারে। এরা মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির দিগন্তকে নানা আঙ্গিক ও সুষমায় সাজিয়ে তুলেছেন। এই দীর্ঘ সিলসিলার সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হচ্ছেন মুরাদ হফম্যান।

দুই

পাশ্চাত্যের একাধারে বস্তুবাদী অন্যদিকে নাস্তিক্যপুষ্ট আবহাওয়ায় বড় হয়ে, জীবন ধারণ করে এক সময় সেই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ কথা নয়। যে সমাজে কিনা

www.pathagar.com

এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা কাজ করে স্রষ্টায় বিশ্বাস ও আধুনিক হওয়ার মধ্যে এক ধরনের বিরোধ আছে, যে সমাজে জড়বাদী, সংশয়ী কিংবা নাস্তিক (কিন্তু কখনোই ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়) হওয়া মানে আধুনিকতার উপযোগী হয়ে ওঠা, যে সমাজ কিনা নিয়ন্ত্রিত হয় ভোগ আর ভোগ্যপণ্যবাদের সূত্র ধরে, সেই সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে কারো পক্ষে ধ্যান-ধারণায়, বিশ্বাসে-আচরণে এমন একটা আদর্শের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যার মূল কথা হচ্ছে স্রষ্টার আনুগত্য ও পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া, তা কিন্তু রীতিমত বৈপ্লবিক ঘটনা। মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান সেই অসাধ্য সাধন করেছেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের ভিতরে থেকেই বুঝতে পেরেছেন যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, আধুনিকতা কোনটিই তার প্রতিশ্রুতি মাফিক এ দুনিয়ায় শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিরতা আনতে পারেনি। বরং ধর্মহীন ও সংস্কারমুক্ত মানুষরাই আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধ, হানাহানি ও রক্তক্ষয়ে মেতে উঠেছে বেশি করে। আগ্রাসী বস্তুবাদ একালে মানবীয় বিবেকে ধস নামিয়ে দিয়েছে এবং লোভ, লালসা, লুণ্ঠন ও পরস্পাপহরণ হয়ে উঠেছে আজকের বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি। মুরাদ হফম্যান তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার রস নিংড়ে উপলব্ধি করেছেন এই ব্যবস্থা যদি বাধাহীনভাবে চলতে থাকে তবে মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎ কোনভাবেই আশঙ্কামুক্ত হবে না। তা আজকের সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্ররা যতই ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে বলে হাঁকডাক করুক না কেন। মুরাদ হফম্যান গভীর প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না এবং ইতিহাস কারো ইংগিতে স্থবির হয়ে যায় না। যদি না আল্লাহর ইচ্ছা সেরকম হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এখন পুঁজিবাদী দর্শনের ভাটার টান শুরু হয়েছে এবং বিশ্বব্যবস্থার মূলে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করার সময় এসেছে।

মুরাদ হফম্যান তার ইসলাম কবুলের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন Journey to Makkah নামক বইয়ে। কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন আবার ইসলাম তাকে কিভাবে চুম্বকের মত কাছে টেনে নিয়েছে তারই এক মধুর বর্ণনা রয়েছে এখানে। Journey to Makkah পড়লে স্বভাবত অনেকের মনে হতে পারে হফম্যান তার গুরু মোহাম্মদ আসাদের লেখা Road to Makkah গভীরভাবে মন্থন করেছেন, যদিও তিনি গুরুর লেখনশৈলী ও বর্ণনাভঙ্গি আদৌ অনুকরণ করেননি। হফম্যান বিশেষ করে তার ইসলাম কবুলের তিনটি নির্দিষ্ট কার্যকারণের কথা লিখেছেন। ইসলামের মানবীয়, নান্দনিক ও দার্শনিক রূপ তাকে কিভাবে আলোড়িত করেছে, একটু একটু করে তার হৃদয় ইসলামের জন্য কিভাবে উন্মুখ হয়ে উঠেছে তার কথা তিনি বলেছেন।

জার্মানীর এ্যাশফেনবার্গে (Aschaffenburg) এক ক্যাথলিক পরিবারে ১৯৩১ সালের ৬ জুলাই মুরাদ হফম্যানের জন্ম। তার জন্মের শহর ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্র। নাজী জার্মানী ও পুঁজিবাদী ইউরোপের হিংস্রতা ও মারণযজ্ঞের মধ্যে তার শৈশব কাটে। তিনি লেখাপড়া করেন নিউইয়র্ক, মিউনিক এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আইনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচডি নেন। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেয়া তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল Contempt of Court by Publications under American and German Law (1957)। ১৯৬০ সালে তিনি আইনের উপর হার্ভার্ড থেকে LLM ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৬১ সালে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

www.pathagar.com

চাকরি শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৯৯৪ সালে। চাকরির শুরুতেই এই তরুণ ভাবুক ও বুদ্ধিমান কূটনীতিক পদায়ন পান আলজেরিয়ায়। মুরাদ হফম্যানের ভাষায় এই আলজেরিয়াই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চাকরি জীবনে পরবর্তীকালে তিনি আলজেরিয়া (১৯৮৭-৯০) ও মরক্কোতে (১৯৯০-৯৪) জার্মানীর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং মাঝখানে বেশকিছু সময় ন্যাটো সদর দফতরে প্রতিষ্ঠানটির তথ্য মহাপরিচালক (১৯৮৩-৮৭) হিসেবেও কাজ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরির সুবাদে তিনি প্রতিরক্ষা ও আণবিক ভীতি নিবৃত্ত করার কৌশলের বিষয়াদিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। কিন্তু তার সেই প্রথম পদায়নের স্মৃতি হফম্যানকে আজও গভীর এক নস্টালজিয়ায় ডুবিয়ে রাখে।

আলজেরিয়ার বীর জনতা তখন ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়ছে। অন্যদিকে ফরাসী সৈনিকরা আজাদী পাগল এইসব আলজেরীয়দের নির্মমভাবে দমনের পথ বেছে নিয়েছে। সেদিনের তরুণ হফম্যান নিজের চোখে দেখেছেন ফরাসীরা কি হিংস্রতার সাথে আলজেরীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নির্বিচারে নিরীহ ও বেগুনাহ মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছে। মোটকথা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা করেনি। তারপরেও হফম্যানের মনে হয়েছে তাদের ধৈর্য, সাহস, শৃঙ্খলা তাদের কষ্টকে পরাজিত করেছে এবং এটি কেবল সম্ভব হয়েছে তাদের ধর্ম ইসলামের গভীর এক মূল্যবোধের কারণেই। একই কারণে গভীর দুর্যোগ ও বেদনার মধ্যেও আলজেরীয়রা তাদের মানবিক মূল্যবোধকে কখনো হারিয়ে ফেলেনি। হফম্যানের নিজের কথা উদ্ধার করছি ঃ

Deplorable events such as these informed my first intimate encounter with living Islam. I witnessed the patience and resilience of the Algerian people in the face of extreme suffering, their overwhelming discipline during Ramadan, their confidence of victory, as well as their humanity amidst such misery, and I felt that their religion played a major role in all that.[২]

তরুণ বয়সে দেখা ইসলামের এই রূপ হফম্যান আর কখনো ভুলতে পারেননি। এটিই তার মন কেড়ে নেয় এবং হয়তো একটু একটু করে তখন থেকেই তিনি ইসলামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

তরুণ বয়সের আর একটি স্মৃতির কথা হফম্যান খুব বেশি করে মনে করেন। হফম্যান ছিলেন সৌন্দর্য রসিক যুবক। তার নিজের ভাষায় beauty freak । সৌন্দর্য (aesthetic art) নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি একবার ব্যাভারিয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি পুরস্কার পেয়ে যান। এ সময় তিনি আর্টের নানা দিগন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন এবং তার কাছে মনে হয় Static art এর চেয়ে Representational art- ই বেশি আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জক। এইভাবে তিনি ব্যালে নাচের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ বিষয়ে তার একাগ্রতা কালক্রমে তাকে একজন ব্যালে বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক ও প্রশিক্ষক হতে সাহায্য করে। ব্যালে নাচের উত্থান ও এর নান্দনিক খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি এ সময় লেখালেখিও করেন। তার লেখা Of Beauty and the Dance : Towards an aesthetics of Ballet, ব্যালে নৃত্যের উপর তার অসাধারণ অধিকারের পরিচায়ক।

www.pathagar.com

আর্ট ও সৌন্দর্যের এই জগতে বিহার করতে করতেই হফম্যান খোঁজ পেয়ে যান মুসলিম আর্টের এক নতুন দিগন্ত। তার কাছে মনে হয় ব্যালে নৃত্যের কোরিওগ্রাফীর সাথে মুসলিম আর্টের যেন কোথাও সাদৃশ্য রয়েছে। তার এই উপমার ধরনের সাথে হয়তো অনেক সৌন্দর্য রসিকই একমত হবেন না। কিন্তু তার মুসলিম আর্টকে নিয়ে এই অদ্ভুত সুন্দর সাদৃশ্যের অবতারণা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি রীতিমত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। তার কাছে মুসলিম আর্টকে মনে হয়েছে বিমূর্ততা (abstraction), মানবীয় বিস্তার (Human dimension), অন্তঃস্রোত (inner dynamics) ও অসীমতার (reach towards infinity) গুণে অনন্য যা মানবীয় মনকে এক অতীন্দ্রিয় ও অদৃশ্যমান জগতের দিকে ধেয়ে নিয়ে যায়।

মুরাদ হফম্যান যখন প্রথমবারের মতো আল হামরা ও কর্ডোভার মসজিদ দেখেন তখনই তার মনে হয় এগুলো নিছক স্থাপত্যকর্ম নয়, এক মহান সংস্কৃতির নিগূঢ় রসে ভেজা মহান শিল্পকর্ম। জার্মান মহাকবি রাইনার মারিয়া রিলকে যখন প্রথম কর্ডোভার মসজিদ দেখেন তখন তার মনেও এমনি সৌন্দর্যানুভূতির জন্ম হয়েছিল। খ্রিস্টানরা স্পেনের পুনর্দখলের (Reconquista) পর এই মসজিদকে ক্যাথেড্রালে পরিণত করে এবং এ সময় তার স্থাপত্য সৌন্দর্যের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। এই সৌন্দর্য হন্তারক খ্রিস্টানদের রিলকে কখনো ক্ষমা করেননি। তার কবিমন বিপুল ব্যথায় মুচড়ে উঠেছে। রিলকের উদ্ধৃতি দিয়ে হফম্যান তার নিজের হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথাই বলেছেন ঃ . . . .
ever since Cordoba, I am full of rabid anti-christian sentiments. I am reading the Quran, and at times it assumes a voice in which I feel, ever so powerful, like the wind in the flute of the organ.[৩]

এমনিভাবে সৌন্দর্যরসিক হফম্যানের কাছে ধীরে ধীরে মুসলিম আর্টের নিগূঢ়তা উন্মোচিত হতে থাকে। তখন আর তিনি এই আর্টের আবেদনকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তার বিশ্বাস জন্মে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের আর্টের ইতিহাস দিয়ে মুসলিম আর্টকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর রহস্য হচ্ছে মুসলিম আর্ট ও সৌন্দর্যের তলায় ইসলামের এক নীরব ও বৈশ্বিক উপস্থিতি লুকিয়ে আছে। মুসলিম আর্টকে তাই বুঝতে হলে ইসলামের অন্তর্গত সৌন্দর্যকেও বুঝতে হবে। হফম্যানের ভাষায় ঃ

Its secret seems to lie in the intimate and universal presence of Islam as a religion in all of its artistic manifestations : Calligraphy, space filling, arabesque ornaments, carpet patterns, mosque and housing architecture, as well as urban planning. I am thinking of the brightness of the mosques which banishes any mysticism, of the democratic spirit of their architectural layout ; I am also thinking of the introspective quality of Muslim palaces, their anticipation of paradise in gardens full of shade, fountains and revulets; of the intricate socially functional structure of old Islamic urban centers (madinahs), which fosters community spirit and transparency of the market, tempers heat and wind, and assures the integration of the mosque and adjacent welfare centers for the poor, schools and hostels into the market and living quarters.[৪]

www.pathagar.com

এইভাবে হফম্যান আলজেরিয়া হয়ে, মুসলিম আর্টের জগত পরিভ্রমণ করে ইসলামের কাছাকাছি চলে আসেন। ক্যাথলিক পরিবারের ছেলে ভাবুক হফম্যান এবার মুখোমুখি হন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কতকগুলো গভীর প্রশ্ন নিয়ে। এসব প্রশ্নের উত্তর তিনি কখনো দর্শনগত, কখনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খোঁজার চেষ্টা করেন। আল্লাহর অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মানুষের নশ্বরতা, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব যেমন স্যালভেশন, রিডামপশন, ইনকারনেশন, সেকরিফিসিয়াল ডেথ এবং ট্রিনিটির মত বিভিন্ন বিষয় তাকে আচ্ছন্ন করে। সভ্যতার মতই প্রাচীন এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞান ও দর্শন সবসময় হোঁচট খেয়েছে। সুতরাং হফম্যানকে ধর্মের কাছেই ফিরে আসতে হয়। তার লেখা উদ্ধার করছি ঃ

I was convinced not only of the possibility, but the necessity of divine interference, since the histories of man, science, and the law demonstrate beyond the shadow of a doubt, that the mere empirical study of a nature does not enable us to find the correct relationship to the world around us, God and ourselves. Are scientific discoveries not notoriously prone to obsolescence? Just witness the amusing history of economic theory, the law of nature, and physics.[৫]

ধর্ম তো অনেকগুলো আছে। এর মধ্যে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে একটি পেয়েছেন। হফম্যান এই বহুস্রোতের মধ্যে ইসলামকে গ্রহণ করেন। কারণ তার কাছে মনে হয় তার বাপদাদার ক্যাথলিক ধর্মে অনেক গোঁজামিল ঢুকে গেছে। যীশুর ধর্মপ্রচারের বহুদিন পর পৌত্তলিক সম্রাট কনস্টানটাইনের প্রশ্রয়ে খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারা একত্রে মিলিত হয়ে বিখ্যাত নিকিয়ান কাউন্সিলে আজকের খ্রিস্টান ধর্মের মূলতত্ত্ব Trinity ঠিক করে নেন। এই Trinity কে হফম্যান মনে করেন স্রষ্টার অবিনশ্বরতা ও অসীম ক্ষমতাকে খাটো করে দেখা। এটা ভাবতেও অবাক লাগে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির দুর্বলতার জন্য নিজে আত্মাহুতি দিয়ে সৃষ্টিকে পাপমুক্ত করবেন। ইসলাম সম্পর্কে হফম্যানের মতামত হলো ঃ

In short, I began to see Islam with its own eyes, as the unadulterated, pristine belief in the one and only, true God, Who does not beget, and was not begotten, Whom nothing and nobody resembles (Surah 112, al Ikhlas). I saw Islam as the undiluted original Abrahamic monothiesm which had succeeded in avoiding both the Jewish and the christian deviations : either to believe in an exclusive, contractual agreement between God and His chosen people, or to exalt a prophet through a subsequent process of deification.[৬]

হফম্যানের ইসলাম কবুলের তারিখটি ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

তিন

১৯৯১ সালে মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান যখন মরক্কোয় জার্মান রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করছেন, তখন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা নতুন একটি বই লেখেন। এর নাম End of History- ইতিহাসের ইতি। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের

www.pathagar.com

পর বিজয়োল্লাসে মত্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ যখন তাবৎ দুনিয়া শাসন করার মওকা খুঁজছে তখন ফুকুয়ামা সাহেব সাম্রাজ্যবাদীদের ইংগিতে এ বই লিখেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব শাসনের পক্ষে একটা নৈতিক ভিত্তি দরকার। ফুকুয়ামা সাহেব সেই ভিত প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ধরে নিয়েছিলেন কমিউনিজমের পতনের পর পুঁজিবাদী বিশ্বের সামনে আর কোন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না। স্বাভাবিকভাবে তাদের আধুনিকায়ন প্রকল্প গ্রহণ ছাড়া বাকি বিশ্বের আর কোন পথ খোলা নেই। এখন থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই হবে বিশ্বের মানুষের শেষ ঠিকানা।

ফুকুয়ামার মতো, আর এক সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিক স্যামুয়েল হান্টিংটনতো ঘোষণা করে দিলেন সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন মুসলিম বিশ্ব বলে কিছু থাকবে না। পুঁজিবাদী বিশ্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। হান্টিংটন ও ফুকুয়ামা সাহেবদের ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যে অকার্যকর হতে শুরু করেছে। ইতিহাস যে শেষ হয়নি তার প্রমাণ আজকের আফগানিস্তান ও ইরাক। পুজিবাদী ব্যবস্থা নিজেই একটা আগ্রাসী ব্যবস্থা। শোষণ, লুণ্ঠন ও আগ্রাসন হচ্ছে এই ব্যবস্থারই অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে ধরে রেখে বিশ্ব শান্তির আশা করা অনেকটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো।

পশ্চিমের সমাজপতিরা আজো বুঝতে পারেননি বস্তুবাদ ও ভোগ্যপণ্যবাদের পূজা করতে গিয়ে বিশ্বমানবতাকে তারা কোথায় এনে ঠেকিয়েছেন। হিটলারের 'হলোকস্ট', স্টালিনের 'গ্রেটপারজেস', বসনিয়ার 'এথনিক ক্লিনসিং' আর একালের যুক্তরাষ্ট্রের 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ' নামক স্বৈরাচার ও পীড়ন কোনটি তাদের আত্মম্ভরিতাকে নাড়া দিতে পারেনি। উল্টো এক অন্ধ বিশ্বাস তাদের তাড়া করে ফিরছে পুঁজিবাদই মানব সভ্যতার একমাত্র আদর্শ এবং এটি দ্বারা পুরো পৃথিবী শাসিত হতে হবে। তাদের এই ঔদ্ধত্যের কারণেই আজও পৃথিবী জুড়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি।

মুরাদ হফম্যান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভূত এই সব মতিভ্রষ্ট ও বিকৃত ধারণার প্রতিবাদ করা একটা গুরুতর দায়িত্ব বিবেচনায় এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন আক্রমণাত্মক পুঁজিবাদ নয়, একবিংশ শতাব্দীর মানুষের জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে ইসলাম। পাশ্চাত্যের ভোগ্যপণ্যবাদের মূল্যবোধহীনতার বিপরীতে ইসলামের ধর্মসংস্কৃতি হতে পারে একমাত্র রক্ষাকবচ। সকলের গ্রহণযোগ্য এই জীবন বিধান আজ সাম্রাজ্যবাদের মিডিয়ার অযৌক্তিক আক্রমণের শিকার। মুরাদ হফম্যান তার Islam : The Alternative বইয়ে ইসলামকে নিয়ে পশ্চিমের এই বিতৃষ্ণার যেমন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের কল্যাণমুখী জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের ইতিবাচকতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন এ বই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার একচোখা ও আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যুত্তর।

হফম্যান আমাদের জানিয়েছেন ফুকুয়ামার বই প্রকাশের খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ বইয়ের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ভুল বুঝাবুঝি, মিথ্যাচার ও অন্ধতার জওয়াব দেন। এ বই প্রকাশের সাথে সাথেই জার্মান মিডিয়া এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেই পুরনো ইউরোপীয় কৌশলে লেখককে মৌলবাদী, নারী বিদ্বেষী, মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সমর্থক ইত্যাদি বলে গাল দিতে শুরু করে। এমনকি জার্মান আইনসভা বুন্ডোসটার্গ-এ এটি নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয় এবং সেখানকার নারীবাদী ও

www.pathagar.com

বামপন্থী সদস্যরা হফম্যানকে রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানায়। অবশ্য জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বইয়ের মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পায়নি এবং মুরাদ হফম্যান যথারীতি তার রাষ্ট্রদূতের চাকরির মেয়াদ শেষ করতে সমর্থ হন। হফম্যান অবশ্য তখন থেকে এটাও অনুভব করতে থাকেন ইউরোপের বুকে ইসলামের স্বপক্ষে কিছু বলতে যাওয়া বিপজ্জনকই বটে। তিনি এ ঘটনাকে বলেছেন Summary execution by the media ।

এ বইতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হলো উত্তর আধুনিকতা ও যন্ত্র শিল্পোত্তর পশ্চিমাসভ্যতার পটভূমিতে ইসলামই হবে শক্তিশালী ধর্মবিশ্বাস। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন পুঁজিবাদী প্রাচুর্য ও আধুনিকতার জ্বর সেখানকার মানুষের জাগতিক সাফল্য আনলেও মানুষের মানবীয়তাকে ছুড়ে ফেলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার মানুষ আজ খুঁজছে বিকল্প পথ। জড়বাদী দর্শন আর পশ্চিমের মানুষকে তৃপ্ত করতে পারছে না। হফম্যানের ভাষায় ঃ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশেই ইদানীং প্রকট দুর্ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এসব দেশে Green সম্প্রদায়ের পরিবেশ সংরক্ষণবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে তার বাস্তব চিত্রটি ফুটে উঠেছে। যে যন্ত্রশিল্প তাদেরকে সম্পদ আর প্রাচুর্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল তা যেন আজ ক্রমেই যন্ত্রদানব-এ রূপ নিচ্ছে। এ সভ্যতা তাদেরকে সামাজিক স্বাধীনতা এনে দিলেও মুক্ত নির্মল বাতাসে শ্বাস নেবার স্বাধীনতাকে যেন ক্রমেই কোণঠাসা করে ফেলেছে। তাই তারা আজ সম্পদ, প্রাচুর্য আর স্বাধীনতার বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছে। এই সাধারণ দুর্ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের তরুণ সমাজের উপর তার বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণাগুলো চাপিয়ে দিয়েছে, তার মাঝে রয়েছে বদ্ধ মানসিকতা বা অবসন্নতা, সর্ববিস্তৃত ভীতি, স্নেহ মমতার দুর্ভিক্ষ, শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অতিযান্ত্রিকায়নের কারণে কর্মচ্যুতির নিরবচ্ছিন্ন আশঙ্কা, ভোগ্যপণ্যের বাজারে সীমাহীন অনিশ্চয়তা যার পাগলপ্রায় সংকোচন ও প্রসারণের চাপে শ্রমিক সমাজের আজ নিত্য আতংকগ্রস্ত অবস্থা। জাতীয় অর্থনীতির দাপট-ই হোক আর প্রত্যাঘাতের ভয় দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে আণবিক বোমার আক্রমণ থেকে বিরত রাখার প্রক্রিয়াই-ই হোক, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর বুদ্ধিবাদ সেখানে প্রতিনিয়তই মানবিক আদর্শবাদকে পদদলিত করে চলছে। বিবেক বর্জিত দাপটে মানুষ আজ দিশেহারা।[৭]
শেষ কথা হলো, তারা যা খুঁজছে তা কেবল একই সাথে নীতিপ্রধান ও সংস্কৃতিপ্রধান ইসলাম ধর্মের পক্ষেই দেয়া সম্ভব। হফম্যানের মতামতও সেটাই।

পশ্চিমের পরিপ্রেক্ষিততো বোঝা গেলো। কিন্তু ইসলাম যাদের ধর্ম তাদের বিচ্যুতি, অধঃপতন ও ব্যর্থতার কারণ কি। মুরাদ হফম্যান বলেছেন কর্ডোভা ও বাগদাদের পতনের পর ইসলামের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি প্রায় অচল হয়ে যায়। তার ধাক্কা ইসলাম আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ সামরিক পরাজয়ের সাথে সাথে ইসলামী বুদ্ধিজীবিতার জগতে এক ধরনের অদৃষ্টবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। যা জানার তা জানা হয়ে গেছে, জ্ঞানের মূল উৎস রসুল (স.) সুতরাং ভৌগোলিক ও সামরিক বিচারে যারা তার নিকটবর্তী ছিলেন তারাই বেশি জানবেন। এভাবে মুসলমানরাও একদিন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং তকলীদপন্থী হয়ে যায়। এরপরে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন এবং সেই শাসন থেকে বেরিয়ে আসবার পর নতুন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নানা রকম পশ্চিমা 'বাদ' ও 'তন্ত্রের' অনুসরণ এখানকার পুরো অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটায়

www.pathagar.com

না। এসব মুসলিম দেশগুলোর নিম্ন আয়, মূলধনের নিরুদ্দেশ যাত্রা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, ঋণগ্রস্থতা, মেধা পাচার উল্টো এসব দেশের ক্ষতকে আরো যাতনাময় করে তোলে।
এরই প্রেক্ষিতে এখানকার জনগণের মধ্যে সত্তর ও আশির দশক থেকে এক ধরনের পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তারা অনুধাবন করতে শুরু করে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি তাদের যাবতীয় দুর্গতির কারণ। সুতরাং তারা এক পুনঃইসলামীকরণের দিকে ধাবিত হয়। বলা বাহুল্য এই পুনঃইসলামীকরণের পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াজাত নাম হচ্ছে 'মৌলবাদ'।
আজকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ইসলামী পুনর্জাগরণের এই ধারা মূলতঃ পশ্চিমী শাসন ও দর্শন উভয়কে প্রত্যাখ্যান করার ভিতর দিয়ে শক্তি অর্জন করেছে। হফম্যান বিশ্বাস করেন এই পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়া আজকের ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনবে। তার ধর্মবিশ্বাস, ঐতিহ্যচেতনা, মূল্যবোধ পশ্চিমা সমাজের ভোগবিলাসের উন্মত্ততা থেকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং তাকে আবার বিজয়ীর আসনে বসতে সাহায্য করবে।

চার

মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যানের অন্যতম একটি বিখ্যাত বই হচ্ছে Journey to Islam : Diary of a German Diplomat (1951-2000)। নামেই বইটির পরিচয়। এটি মূলতঃ হফম্যানের একটি রোজনামচা। দীর্ঘ ৫০ বছরের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি ও অনুভূতির এটি সমাহার, যার পরিণতিতে তিনি ১৯৮০ সালে ইসলাম কবুল করেন। হফম্যান বলেছেন এ বই হচ্ছে নিজের সাথে এক ধরনের বোঝাপড়ার পরিণাম- a dialogue with himself। একজন জার্মান বুদ্ধিজীবীর মনের একান্ত বিশ্বাসের কথা, ethics, morality ও aesthetics নিয়ে তার মানবিক টানাপড়েনের কথা এবং সেই টানাপড়েন ভিতর দিয়ে তিনি কিভাবে ইসলামের দিকে এগিয়ে যান তার এক গভীর ও সুখদ বর্ণনা রয়েছে এ বইটিতে।
বইটির ভূমিকা লিখেছেন মোহাম্মদ আসাদ। এখানে তিনি বলেছেন এ কালের কারিগরী সভ্যতা ও বস্তুবাদী দর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হফম্যান মানুষের এক আধ্যাত্মিক গন্তব্যের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করেছেন। এটি করতে গিয়ে তিনি মুসলিম দুনিয়ার বহিরংগের সাথে এর জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের এক গভীর সমন্বয় খুঁজে পান। এই আবিষ্কার, তার কাছে মনে হয় মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামী বিশ্বাসের পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের ফল। অবশেষে ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে জীবনের চূড়ান্ত সত্যের তিনি অবলোকন করেন এবং তার এ যাবৎকালের যাবতীয় প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানে তিনি তৃপ্ত হন। তার নতুন নাম হয় মুরাদ। এর অর্থ উদ্দেশ্য- Purpose। হয়তো জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য তিনি এইভাবে বুঝে নেন।
মুরাদ হফম্যানের এই রোজনামচায় যে কত বিষয় আলোচিত হয়েছে, আর কত বিষয়ে যে তার অধিকার দৃশ্যমান তা ভেবে বিস্ময় জাগে। নিজের জীবনে ঘটা এক সড়ক দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে আর্ট, কালচার, দর্শন, স্থাপত্য, ক্যালিগ্রাফি, কবিতা, ধর্মতত্ত্ব, সুফীতত্ত্ব, খ্রিস্টীয় গূঢ়তত্ত্ব, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন, অ্যালকোহল, নিউমারোলজী, হজ্বের অভিজ্ঞতা, ইসলামে গণতন্ত্র, নারীর অধিকার, মার্কস, ইবনে

www.pathagar.com

খলদুন, মরিস বুকাইলি, মোহাম্মদ আসাদ ইত্যাকার কোন বিষয়ই তার অনালোচিত থাকেনি।

যেমন ১৯৮২ সালের ২৮ এপ্রিল হফম্যান তার রোজনামচার পৃষ্ঠায় ইবনে খালদুন ও মার্ক্সের তুলনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যারা আজও ইসলামকে প্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করেন তারা যেন ইবনে খালদুনের আল মুকাদ্দিমা পড়েন। কাল মার্কস ও ম্যাক্সওয়েবারের পাঁচশ বছর আগে এই মহান সমাজ বিজ্ঞানী ও ইতিহাসের দার্শনিক ইতিহাসচক্র, সভ্যতার উত্থান-পতন আর ইতিহাস লিখতে যে মৌলিক উৎসের আর অনুসন্ধানী মনের দরকার হয় সে সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন। কালমার্কসসের আগে তিনি প্রথম লিখেছেন ঃ

Profit is the value realized from human labour এবং different conditions among people are the result of different ways in which they make their living.[৮] টমাসম্যানের বহু আগে ইবনে খালদুন ঘোষণা করেছিলেন ঃ prestige lasts, at best, four generations in one lineage.[৯]

নীটশের বহু আগে তিনি বলেছেন : while a nation is savage, its royal authority extends farther. [১০]

আর ফ্রেডারিখ হেগেলের আগে ইবনে খালদুনের ভাষ্য ঃ dynasties have a natural life span like individuals.[১১]

জাঁ জাঁক রুশোর আগে তিনি আমাদের ধারণা দিয়েছেন ঃ Relationship between the governing and the governed is based on a (social) contract.[১২]

ইবনে খালদুনের এই যুক্তিবাদী ও আধুনিক ভূমিকা এমনিতেই তৈরি হয়নি। হফম্যান মনে করেন ইবনে খালদুনের মনন ও মনীষা মূলতঃ ইসলামী সভ্যতার ফসল। এমনি করে এ বইয়ে অসংখ্য হীরকখন্ড ছড়িয়ে আছে, যার দ্যুতি আমাদের মন ভিজিয়ে দেয়।

পাঁচ

মুরাদ হফম্যানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে Islam 2000 । একবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের উপর ধেয়ে আসা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে তারা কিভাবে মোকাবিলা করবে এবং এই শতাব্দীতে ইসলামকে কিভাবে যৌক্তিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এসব জ্বলন্ত ইস্যুগুলো নিয়ে তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। একই সাথে এ শতাব্দীতে ইসলামের বিচ্যুতি ও তার অনুসারীদের সফলতা ব্যর্থতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করেছেন তিনি এখানে। এ ব্যাপারে মুরাদ হফম্যানের নিজের ভাষ্য উদ্ধার করছি ঃ বর্তমানে বিরাজমান বিস্ফোনোন্মুখ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, মুসলমানদের অবশ্যই বিরাট পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি এমন অনেক ক্ষেত্র চিহ্নিত করবো, যেখানে মুসলমানদের করণীয় অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু শুরুতেই একটা কথা আমি স্পষ্টতঃই বলে দিতে চাই- আমি ইসলামী বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের ব্যাপারে- যেমন ধরুন আল্লাহর নিজের বক্তব্য, পবিত্র কুরআন বা নবী (স.)-এর সহী হাদীসের বিষয়বস্তু ইত্যাদির ব্যাপারে কোনরূপ ছাড় দেয়ার ডাক কখনোই দেব না। ইসলামকে আধুনিকতার প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা আমার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি ইসলামের এমন পুনরুজ্জীবন চাই যেন, আধুনিক মানুষজন এর কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারেন ; এমনকি সবেচেয়ে বীতশ্রদ্ধ পশ্চিমা মানুষটিও যেন বুঝতে পারেন ইসলাম কতখানি কার্যকর।[১৩]

তিনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিমে ইসলামের কতকগুলো বিষয় নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করা হয়, যেমন নারীমুক্তি, মানবাধিকার। মুরাদ হফম্যান জোরের সাথে বলেছেন এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়। ইসলাম থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে এর কারণ। মুসলিম সমাজে ইসলামের অনুপস্থিতির কারণে এরকম দুর্ঘটনা ঘটছে। মুসলিম সমাজের আজকের এই চেহারা বদলাতে হলে, নারীর সত্যিকার মর্যাদা পুনরুদ্ধারে, মানবাধিকারের অবস্থা উন্নয়নে ইসলামকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে।

মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণাটা এখনো অস্পষ্ট হয়ে আছে। এর সাথে মুসলমানরা যেন অভ্যস্ত হতে পারছে না। ইসলামের আদর্শের কথা ভাবলে আজকের জাতীয় ও সেকুলার রাষ্ট্রসমূহের অসংগতির প্রশ্ন এসে যায়। মুরাদ হফম্যান তাই মনে করেন মুসলমানদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে জাতিসমূহ বিলুপ্ত হয়ে এক অভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহর ধারণা একালে স্রেফ নামকাওয়াস্তা হয়েই রয়েছে। কার্যকর অর্থেই মুসলিম উম্মাহর অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করা চাই। তা না করা গেলে মুসলমানের জিল্লতির দিন শেষ হবে না।

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে তার মতামত হলো এটি কখনোই পশ্চিমা অর্থনীতির মতো লাভজনক হতে পারে না। কারণ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য নয়, তার লক্ষ্য মানবকল্যাণ। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কথা বলতে যেয়ে তিনি লিখেছেন ধর্মচ্যুত ও তথাকথিত সংস্কারমুক্ত কেউ মুসলিম বুদ্ধিজীবী হবার দাবি করতে পারেন না। তাকে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের ছায়ায় অবস্থান করতে হবে। একালের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তাদেরকে যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে নাস্তিকতা ও পশ্চিমের দর্শনকে মোকাবিলা করতে হবে। আর তাদেরকে একাধারে সমকালীন সমস্যার বাস্তবানুগ জওয়াব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। একই সাথে ইসলাম সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা জাকিয়ে বসেছে তাকে নির্মূল করতে হবে। ইজতেহাদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এখন আর বসে থাকার সময় নেই। তাদেরকে বর্তমান যুগকে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে হবে। মুরাদ হফম্যান জোর দিয়ে বলেছেন মিছওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা কিংবা দাড়ি কতদূর লম্বা হবে এই বিতর্ক না করে মুসলমানকে আজ ধৈর্য, দানশীলতা, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং প্রার্থনার একাগ্রতার মতো চারিত্রিক গুণাবলীর নমুনা হাজির করতে হবে। এ ছাড়া ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণের পথ প্রস্তুত হবে না।

ছয়

এটা ভাবতে অবাক লাগে একজন নওমুসলিম হয়ে মুরাদ হফম্যান আমাদের মত মানুষের চোখে যে স্বপ্ন দেখাতে পারেন মুসলমানের ঘরে জন্ম নেয়া সন্তানেরা সেই কাজটি করতে একালে বলা চলে প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছেন। সেই কারণেই বোধ হয় হফম্যান লিখেছেন ঃ

Every born Muslim must be reconverted to Islam sometime during his life ; Islam can not be inherited.[১৪]

www.pathagar.com

আমরা যারা মুসলমানের ঘরে জন্মেছি, তাদের বিশ্বাসের সাথে কাজকর্মের তুলনা করলেই প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যায়। মুসলমানের শিরে আজ বিপর্যয়ের বোঝা, তার ললাটে পরাজয় লেখা। হফম্যান মনে করেন এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মুসলমানের আজ দরকার নবজন্মের। ইসলামের আলোকস্নাত হয়ে সেই নবজন্মের ভোরের সূচনা হবে। সেই মুসলমান এগিয়ে যাবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বুদ্ধিতে, নৈতিকতায় আর মূল্যবোধের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। মুরাদ হফম্যানের একান্ত মনের এ আনত প্রার্থনা কবুল হোক।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Quoted from Murad Hofmann, Journey to Makkah. Beltsville : Amana Publications, 1998.
২. Murad Hofmann, Journey to Makkah.
৩. প্রাগুক্ত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. মুরাদ হফম্যান, ইসলাম : দি অলটারনেটিভ, তরজমা : মঈন বিন নাসির। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।
৮. Quoted from Murad Wilfried Hofmann, Journey to Islam : Diary of a German Diplomat 1951-2000. Mark field : The Islamic Foundation, 2001.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. ইসলাম ২০০০, মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০২।
১৪. Murad Hofmann, Journey to Makkah.

www.pathagar.com

খুরশীদ আহমদ

এক

আধুনিক মুসলিম পুনর্জীবনবাদী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিধর পুরুষ খুরশীদ আহমদকে বলা হয় ইসলামী অর্থনীতির জনক।[১] পুঁজিবাদী অর্থনীতির আধিপত্যের এই যুগে বিকল্প ইসলামী অর্থনীতির ধারণা পেশ করে তিনি মুসলিম সমাজের পুনর্গঠনবাদী চিন্তার এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য একালের মুসলিম পুনর্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি মুসলিম সমাজের সংস্কার এবং এর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সার্বিক পুনর্গঠন। মওলানা মওদুদীর ভাবশিষ্য, পেশাদার পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ খুরশীদ আহমদ আধুনিক ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্গঠন ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের গতিশীল সংগঠক হিসেবে ঋদ্ধি অর্জন করেছেন।

একালের ইসলামী পুনর্জীবন ভাবনার মধ্যে অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী অর্থনীতি বলতে এর চিন্তাগত ও তাত্ত্বিক বিষয় যেমন আছে তেমনি আছে বাস্তব রূপায়ণের মতো বিষয়গুলো। গত কয়েক দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা, ফাইন্যান্স হাউস প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। ইসলামী পুনর্জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মতো এখানেও তত্ত্ব ও বাস্তবের ভিতরকার সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছে এবং নীতি-নির্ধারকদের তত্ত্বের সাথে বাস্তবের মেলবন্ধন করতে হয়েছে। খুরশীদ আহমদ হচ্ছেন একই সাথে তাত্ত্বিক ও সক্রিয় কর্মী, যিনি ইসলামী অর্থনীতির বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রকে যেমন প্রস্তুত করেছেন তেমনি এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আবার তিনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে একালের অন্যতম প্রধান একটি ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। খুরশীদের বহুমাত্রিক মনীষা, অপরিসীম উদযোগ ও যোগ্যতা বিশেষ করে মুসলিম সমাজের এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের লক্ষ্যে তার কর্মষনা রীতিমত বিস্ময় তৈরি করে।

দুই

১৯৩২ সালে দিল্লীতে খুরশীদ আহমদের জন্ম। তার পিতা নাজির আহমদ ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। বিভাগ পূর্বকালে দিল্লীর মুসলিম লীগ রাজনীতির সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। নাজির আহমদের বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মওলানা মওদুদী যিনি উত্তরকালে খুরশীদের চিন্তাভাবনা ও ব্যক্তিত্বের নির্মাণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

খুরশীদের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয় ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার ভিতর দিয়ে। পরে তিনি দিল্লীর এ্যাংলো-এ্যারাবিক স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অসম্ভব মেধাবী, পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে তার উৎসাহ ছিল প্রবল। মূলত পিতার প্রভাবে তিনি বিভাগ পূর্বকালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লীস্থ কিশোর সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রনেতা হিসেবে দিল্লীতে দেশ ভাগের কয়েক মাস আগে থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে পাকিস্তানের পক্ষে সভা সমাবেশে নেতৃত্ব দেন। দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান হাসিলের পর নবতর পরিস্থিতিতে তার পিতা নাজির আহমদ পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং প্রথমে লাহোর ও পরে করাচিতে স্থায়ী হন।

খুরশীদ করাচিতে সরকারি কলেজে ভর্তি হন এবং এখানে থাকতেই তিনি অর্থনীতি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতি যুগপৎ আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন যা তার জীবনব্যাপী ভালবাসা ও সাধনার বিষয় হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে Muslim Economist পত্রিকায় পাকিস্তানী বাজেটের উপর তিনি তার প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। একই সময় তিনি মওলানা মওদুদীকে আবিষ্কার করেন। এতকাল তিনি তাকে পিতার বন্ধু হিসেবে জানতেন। ১৯৪৯-এ তিনি তাকে ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সমীহ করতে শুরু করেন; বিশেষ করে খুরশীদ তার পাশ্চাত্য ও ইসলামী চিন্তার মৌলিক তফাৎ নিয়ে আলোচনার গভীরতায় মুগ্ধ হন। পিতার উৎসাহেই খুরশীদ ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। এসময় তরুণ খুরশীদ আরো দু'জন মহান ইসলামী চিন্তাবিদের লেখালেখির সাথে পরিচিত হন যারা অত্যন্ত যুক্তিশীলতার সাথে এ কালে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছিলেন। এদের একজন হলেন মোহাম্মদ আসাদ, অন্যজন কবি ইকবাল। আসাদের Islam at the Crossroads খুরশীদকে বড় রকমের নাড়া দেয়। ইকবালের কবিতা খুরশীদ ছোটবেলায় মুখস্থ করেছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তিনি ইকবালের চিন্তা ও বুদ্ধিজীবিতাকে বুঝবার চেষ্টা করেন। ইসলামের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পুনর্জীবনের লক্ষ্যে ইকবালের ব্যাখ্যা আধুনিক ইসলামের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে তার কাছে মনে হয়।

করাচির সরকারি কলেজে থাকতেই খুরশীদ তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। বুদ্ধিজীবীতার সাথে ধর্মের সমন্বয়ে তিনি এক কর্মী-বুদ্ধিজীবীর পথ বেছে নেন। এ সময়ই তিনি জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী জমিয়তে তালাবার সাথে জড়িত হন। কলেজের তিনজন সতীর্থ তাকে তালাবার দিকে নিয়ে আসেন। একজন জাফর ইসহাক আনসারী, উত্তর কালে বুদ্ধিজীবী হিসেবে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন, আর একজন খুররম মুরাদ, যিনি জামায়াতে ইসলামীর সহ-সভাপতি ছিলেন এবং শেষের জন খুরশীদের বড় ভাই মোহাম্মদ জমীর যিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ভাইস এ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হন। তালাবার সাথে তার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা খুরশীদ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ .... determined the future course of my life.[২]

তালাবার সাহচর্যে এসে তার ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনার পরিধি বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে মওদুদীর লেখা Let Us be Muslims পড়ে তিনি আবেগাপ্লুত হন। তিনি লিখেছেন ঃ

It covers the fundamentals of Islam (faith, prayer, worship) in a manner which moves the soul and consciousness that to be a Muslim

www.pathagar.com

is something different. That is, that it is not just belief (aqida) and prayer but also to play a new role in life, to have a mission to change the world.[৩]

নিজের প্রতিভা আর সাংগঠনিক শক্তির জোরে খুরশীদ অচিরেই নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে তালাবার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৩-৫৫ পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন। সভাপতি হিসেবে তিনি তালাবার মুখপত্র The Student's Voice প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ইসলামভিত্তিক হওয়া উচিত তা নিয়ে লেখালেখি করেন। ১৯৫২ থেকে ৫৬ সালের মধ্যে তিনি ইসলাম, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, পশ্চিমী সভ্যতা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন এবং সমকালীন মুসলিম বুদ্ধিজীবী সাইয়েদ কুতুবের মত তিনি ইসলাম ভিত্তিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেন। খুরশীদ বিত্তহীন ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়ে বলেন সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং পুঁজিবাদ ও যাবতীয় সামাজিক অবক্ষয়ের ইসলামী বিকল্পও বর্তমান।

জমিয়তে তালাবার সভাপতি হিসেবে তিনি সংগঠনটির কার্যক্রমে বিপুল গতি আনেন এবং ছাত্র সমাজে এর আবেদনও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি সংসদ নির্বাচনে ভাল ফলাফল দেখায়। ১৯৫০ থেকে ৬০ এর মধ্যে খুরশীদ তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রায় শেষ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বাণিজ্যে বিএ(অনার্স), ১৯৫৫ সালে অর্থনীতিতে এমএ, ১৯৫৮ সালে এলএলবি এবং ১৯৬৪ সালে ইসলামিক স্টাডিজে এমএ পাস করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে এসব পরীক্ষায় তার ফলাফলও ছিল যথেষ্ট সন্তোষজনক। ১৯৫৫ সালে তালাবার সভাপতির দায়িত্ব শেষ হলে ১৯৫৬ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন।

The Students' Voice এর সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি জামায়াত ঘরানার আরো কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এগুলো হচ্ছে ঃ The New Era (1955-56), The Voice of Islam (1957-64) এবং চিরাগ-ই-রাহ (১৯৫৭-৬৮)। তিনি ইকবাল রিভিউ (১৯৬০-৬৪) পত্রিকার সহসম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। প্রথম জীবনে খুরশীদ পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকেই বেছে নেন। তিনি করাচির উর্দু কলেজ ও পরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অধ্যাপনা করেন। এ সময় থেকেই তিনি জামায়াতের সক্রিয় কর্মী হিসেবে একই সাথে শিক্ষকতা ও লেখনী চালিয়ে যান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের দাওয়াহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

তিন

ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে পত্রিকার সম্পাদক, অর্থনীতির অধ্যাপক এবং মওলানা মওদুদীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রচনার অনুবাদক হিসেবে খুরশীদ সর্বাবস্থায় মওদুদী ও জামায়াতের বাণীকে প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রায় ২৪টি বই ইংরেজিতে লিখেছেন বা সম্পাদনা করেছেন, ১৬টি বই উর্দুতে লিখেছেন এবং মওদুদীর ১০টি বইয়ের তিনি তরজমা ও সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, আন্তঃধর্মীয় সমাবেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের মুসলিম শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

গুরু মওলানা মওদুদীর মত খুরশীদ আহমদও বিশ্বাস করেন ইসলাম হচ্ছে ঐশী অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আবার ইসলামের এই যাবতীয় ব্যবস্থা তার তৌহীদের নীতির সাথে সম্পৃক্ত। তৌহীদ হচ্ছে ইসলামের সারকথা যার মানে হলো বিশ্বজগতের পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তার নীতিই সর্বত্র কার্যকরী হবে। খুরশীদের ভাষায় ঃ

. . . the belief that there is one omnipotent, omnipresent lord of the universe, creator and sustainer of the world, points to the supremacy of the law in the cosmos, the all pervading unity behind the manifest diversity . . . It presents a unified view of the world and offers the vision of an integrated universe . . . It is a dynamic belief and a revolutionary doctrine. It means that all men are the creatures of God - they are all equal.[৪]

খুরশীদ মনে করেন পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সাম্য ও ইনসাফভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর ইচ্ছাকে রূপদান করা। এই দায়িত্ব যেমন ব্যক্তির তেমনি সমাজের । খুরশীদ তাই মনে করেন ইসলামে ব্যক্তিগত দায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক দায়বোধের ব্যাপারটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ইসলাম বস্তু ও আত্মার ভিতরেও এক সাম্যাবস্থা আনার চেষ্টা করেছে। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মতো পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়াদিকে পৃথক করে না দেখে ইসলাম জীবনকে সর্বাত্মকভাবে দেখতে চায়। খুরশীদের কথা হচ্ছে ঃ

Islam provides guidance for all walks of life individual and social, material and moral, economic and political, legal and cultural, national and international.[৫]

খুরশীদের এই ঐকাত্মক জীবন ভাবনাই তার বহুমুখী তৎপরতাকে চালিত করেছে। এই ভাবনাই তার বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম ও সমালোচনা সত্ত্বেও তাকে পশ্চিমের সাথে আন্তঃধর্মীয় এবং আন্তঃসভ্যতার পারস্পরিক বুঝাবুঝি ও আলোচনায় উদযোগী করেছে। একালের মুসলিম পুনর্জীবনবাদী আন্দোলনগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাশ্চাত্যকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখা বা বিশ্লেষণ করা; পাশাপাশি ইসলামের মধ্যে এক আত্মনির্ভরতার সন্ধান করা। মওদুদী, যিনি নিজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বশিক্ষিত ছিলেন, সচরাচর পাশ্চাত্যের সমালোচনায় বিশেষ করে এর ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের জওয়াবে অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমী উৎস ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি পাশ্চাত্যের ব্যর্থতা ও মুসলমানের অধঃপতনের প্রতিকার হিসেবে তিনি ইসলামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। খুরশীদ মওদুদীকৃত পাশ্চাত্যের এই সমালোচনার সাথে সহমত পোষণ করলেও তিনি মূলত পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি যার রয়েছে পাশ্চাত্যের সাথে অধিক পরিচয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর অধিকার। পাশ্চাত্যের সমালোচক হলেও তিনি এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল্যকে অস্বীকার করেননি বরং তিনি এটাও বুঝতে পারেন মুসলিম সমাজ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; এক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও এটি অংশ। খুরশীদ তাই মনে করেন অতীতের জ্ঞান শুধু পশ্চিমের প্রতি অবিশ্বাস ও

www.pathagar.com

শত্রুতার কার্যকারণ বুঝবার জন্যই জরুরি নয়, এর সাথে নতুন করে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যও জরুরী। তিনি লিখেছেন ঃ

The call of our times in that, with a view to achieving world peace and international amity, mutual relationship among different nations be reconstructed ... the need for the establishment of a relationship of the people of Europe and America with the Islamic fraternity, on new foundations of good will and good cheer, stands out as of paramount significance.[৬]

খুরশীদ পশ্চিমের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্বের কার্যকারণকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে ইসলাম ও তার নবীর নিন্দাবাদ, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার সূত্রে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য, মুসলিম সমাজে পশ্চিমী শিক্ষা ও মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ, ইসলামের উপর পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের ও মিশনারীদের আক্রমণ প্রভৃতিকে তিনি পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের অবিশ্বাসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব কার্যকারণকে পাশ্চাত্যের সাথে নতুন করে সম্পর্ক সৃষ্টি করবার জন্য পুনঃমূল্যায়নের প্রয়োজন বলে তার ধারণা। মুসলিম পিউরিটানদের মতো পশ্চিমকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। তিনি নিজে পশ্চিমী জ্ঞান যেমন ইতিহাস থেকে ধর্ম, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য বিপুল সময় ব্যয় করেছেন। তিনি তাই যুক্তি দিয়েছেন পশ্চিমের সাথে ইসলামের আজকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের চরিত্রের বদলে সমকক্ষতার ভিত্তিতে হতে হবে। এই নবতর সম্পর্কের ভিত্তি পারস্পরিক সহাবস্থানকে মজবুত করবে এবং তখনই ইউরোপীয় আধিপত্যের দুঃখজনক স্মৃতি থেকে মুসলমানরা বেরিয়ে আসতে পারবে ঃ

If the only practical ground of cooperation is the assimilation of the Western culture and rejection of Islam as we understand it, then there is no ground for any meeting. But if the cooperation is to be achived on equal footing, then it is most wellcomed.[৭]

বলা চলে ১৯৬৬ থেকে খুরশীদ পশ্চিম সম্পর্কে এই খোলা নীতি অনুসরণ করে এসেছেন। জামায়াতের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৬৮ সালে বৃটেন যান এবং সেখানে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ সময় তিনি পুরো ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা জুড়ে ইসলামের দাওয়াহ কাজে জড়িয়ে পড়েন। একই সময় তিনি ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সাংগঠনিক মজবুতিতে সাহায্য করেন এবং বৃটেনের লাইচেস্টারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী বইপত্র সাময়িকী প্রকাশ ও বিতরণ করা, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ কাজ চালানো এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা।

১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং নিজে ক্ষমতাসীন হন। ফলে পাকিস্তানে এক নবতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং জিয়াউল হক নিজের ক্ষমতা সংহত করার জন্য ভুট্টোবিরোধী রাজনীতিকদের দলে টানার চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

এরকম অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীসহ আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল জিয়াউল হকের সরকারে যোগ দেয়। খুরশীদ আহমদ ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী হন এবং পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্বও নেন। জেনারেল জিয়াউল হকের ইসলামায়ন পরিকল্পনার সাথে জামায়াত প্রাথমিকভাবে সম্পৃক্ত হলেও পরে তারা বুঝতে পারে একনায়কের সাথে কাজ করে কখনো তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হবে না। তাই তারা সরকার থেকে সরে আসে। খুরশীদ সরকারি কাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ইসলামী পুনর্জীবনবাদী আন্দোলনের স্রোতের সাথেও যুক্ত থাকেন। বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতির ধারণাকে বিকশিত ও ইসলামী সংস্কার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে বিষয়টির উপর তার অধিকার ইসলামী অর্থনীতির ধারণা বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয় এবং অর্থনৈতিক সমস্যার একটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতেও কাজে আসে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুসমন্বিত ও পরিকল্পিতভাবে ইসলামী অর্থনীতির উপর কোর্স চালুতেও তার উদ্যোগ স্মরণীয় এবং একথা অস্বীকার করা যাবে না তার অন্যতম ভূমিকার কারণেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থনীতি আজ জ্ঞানের এক পৃথক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী অর্থনীতির উপর কোর্সও চালু হয়েছে। খুরশীদের এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে সভাপতিত্ব করেছেন এবং ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯০ সালে তাকে ইসলামের সেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার প্রদান করা হয়। খুরশীদ ইসলামাবাদের ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছেন এবং পাকিস্তানের চিন্তা জগতের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছেন।

চার

খুরশীদ আহমদ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো নিয়েও যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছেন। ইসলামী আন্দোলন বলতে কিছু ইসলামী দল ও রাজনীতিকের নির্বাচনে জিতে বা অন্য কোনো পন্থায় ক্ষমতায় যাওয়া এবং সরকারে থেকে কিছু ইসলামী নীতির প্রবর্তনকে তিনি ইঙ্গিত করেননি। তিনি ইসলামী আন্দোলনকে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট স্তরে নিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ব্যাপক স্তরে তিনি ইসলামী আন্দোলনকে বলেছেন : . . . the overall resurgence, reawakening, and concomitant institutional developments.[৮]

এই রিসার্জেন্ট ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনে ও সমাজে ইসলামী আদর্শের নবরূপায়ণ। আর এই রূপায়ণ সম্ভব হবে ইসলামী চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পুনর্গঠন, মুসলিম সমাজ ও রাজনীতির পুনর্গঠন এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি অর্জনের ভিতর দিয়ে।[৯] সুনির্দিষ্ট স্তরে ইসলামী আন্দোলন বলতে তিনি সেই সব ইসলামী দলের কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন যারা নাকি জাতীয়তাবাদী ও সেকুলার বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক চিন্তাভাবনা করেন। এই সব ইসলামী দলগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী চিন্তার পাশাপাশি ইসলামী আদর্শের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের পুনর্গঠন। সমকালীন সময়ের

www.pathagar.com

সাপেক্ষে খুরশীদ মনে করেন এই সব ইসলামী দলগুলো ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবান সেকুলার ও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। মোটা দাগে বলতে গেলে এসব দলগুলো হচ্ছে ইজিপ্টের মুসলিম ব্রাদারহুড, উপমহাদেশের জামায়াতে ইসলামী, টার্কির বদিউজ্জামান নুরসীর মতানুসারীরা বা রাফা পার্টি, তিউনিসিয়ার ইসলামিক টেন্ডেনসি মুভমেন্ট, আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট প্রমুখ।

খুরশীদ একালের ইসলামী আন্দোলনকে একটি আধুনিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বয়ে আনা বিশ্বায়নবাদী ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে মুসলিম দুনিয়ায় যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরী হয়েছে তারই প্রতিবাদ হিসেবে এসব আন্দোলনগুলো উপস্থিত হয়েছে। উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হওয়ার পরও মুসলিম দুনিয়ায় যে জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে সেগুলো পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবাদী আগ্রাসন ঠেকাতে পারেনি। উল্টো এসব রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকরা এক ধরনের সাংস্কৃতিক দ্বৈততার নীতি অনুসরণ করে মুসলিম দেশগুলোর পশ্চিমী নির্ভরতা গভীর করে তুলেছেন। পশ্চিমের পুঁজিবাদী এবং এর শিল্প সমাজের জটিল চরিত্র মুসলিম সমাজকে ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চাইছে। অনেকে মনে করেন এর প্রতিবাদ হিসেবে প্রধানত নিপীড়িত মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে এই ইসলামী অভ্যুত্থান ঘটছে। খুরশীদ আহমদ এই আন্দোলনকে একটি আধুনিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মেনে নিলেও এর চরিত্রকে ইসলামী সমাজের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন এবং বলেছেন এ হচ্ছে যুগ সমস্যা মোকাবিলা করবার জন্য ইসলামী সমাজের পুনঃনবীকরণ - তাজদীদের চলমান প্রক্রিয়া ঃ a parennial phenomenon in Islamic history.[১০]
এ প্রেক্ষিতে ইসলামী সমাজ তার আত্মপরিচয়কে পুনঃআবিষ্কার করতে চাচ্ছে এবং তাদের ঐতিহাসিক প্রতীকগুলো যেমন তাজদীদ (পুনর্জীবন), ইসলাহ (সংস্কার), প্রভৃতিকে নতুনভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

পাঁচ

খুরশীদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে জ্ঞানের পৃথক শাখা হিসেবে একালে ইসলামী অর্থনীতির তত্ত্বকে বিকশিত করা। বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে তিনি এটিকে ইসলামী আন্দোলনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমকালীন অনেক সক্রিয় ইসলামী চিন্তাবিদের মতো তিনি তত্ত্বের সাথে প্রয়োগের বন্ধন ঘটিয়েছেন এই কারণে যে তিনি বিশ্বাস করেন এটিই একজন মুসলিম পেশাজীবীর ভূমিকা হওয়া উচিত। একজন বিশ্বাসী, জামায়াতকর্মী, অর্থনীতিবিদ এই রকমভাবে তার বহুমাত্রিক ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে একাকার হয়ে আছে। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে মুসলিম দুনিয়ায় অর্থনৈতিক চিন্তা ও পরিকল্পনাকে তিনি এগিয়ে নিয়েছেন এবং এই চিন্তাভাবনা বিকাশের বিভিন্ন স্তরকেও তিনি খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

Initially, the emphasis was on explaining the economic teachings of Islam and offering Islamic critique of the Western contemporary theory and policy. During this phase, most of the work was done by the ulema, the leftists and Muslim social thinkers and reformers.

www.pathagar.com

Gradually, the Muslim economists and other professionals became involved in this challenging enterprise. Perhaps the First International Conferance on Islamic Economics (held in 1976) ... represents the watershed in the history of the evolution of Muslim thinking on economics, representing the transition from economic teachings of Islam to the emergence of 'Islamic Economics'.[১১]

খুরশীদের এই ভাষ্য থেকে ইসলামের বুদ্ধিবাদী জগতের পরিবর্তন সম্বন্ধে এবং সেই পরিবর্তন নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। কোনো সন্দেহ নেই এই পরিবর্তনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এবং এর জন্য তিনি মূলত লড়াই করেছেন। খুরশীদ ও তার সমকালের মুসলিম অর্থনীতিবিদরা মনে করেন ইসলামের মৌলিক বাণী ও মূল্যবোধ রসুলের যুগেও যেরকম ছিল, আজও সেরকম আছে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নতুন যুগের আলোকে কর্মকৌশল তৈরি করা। এ প্রেক্ষিতে খুরশীদ ইসলামী কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক উন্নতির কৌশল প্রণয়ন করেছেন এবং সেই কৌশল চালিত হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর মূল্যবোধের ভিত্তিতে। তার ভাষায় ঃ The first premise which we want to establish is that economic development in an Islamic framework and Islamic development economics are rooted in the value-pattern embodied in the Quran and the Sunnah.[১২]

তিনি অবশ্য ইসলামী অর্থনীতির সমকালীন কর্মকৌশল আলোচনা করতে গিয়ে কুরআনের বৃহত্তর মূল্যবোধের কথা বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট সুরা বা আয়াতের প্রেক্ষিতে নয়। এর ফলে তার জন্য ইসলামী অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার আলোচনা ব্যতিরেকে একটি সর্বাত্মক মডেল হাজির করা সম্ভব হয়েছে। খুরশীদের এই অর্থনৈতিক ভাবনা যে মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা কিন্তু পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ভাবনা থেকে পৃথক। এটি যেমন আত্মরক্ষামূলক নয়, তেমনি আত্মসমর্পণমূলকও নয়। এ হচ্ছে ইসলামী নীতির আওতার মধ্যে থেকে এক পৃথক জ্ঞান কাঠামো খাড়া করা যার কিনা প্রয়োগিক মূল্য বর্তমান। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাকে মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। ইসলাম যেহেতু মানুষের সর্বাত্মক ও ঐকাত্মসাধক ব্যবস্থা সেহেতু অর্থনীতি জীবনের এই বৃহত্তর ক্যানভাসের একটি অংশ এবং মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যার সাথে একই বন্ধনীতে বিশ্লেষণ যোগ্য। খুরশীদ মনে করেন অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের মৌল সমস্যা নয়। অনেক সমস্যার একটি। অর্থনৈতিক সমস্যা শুধু অদক্ষতা ও অযোগ্যতার ফল নয়, মানুষের নীতিহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপেরও পরিণতি। খুরশীদ তাই ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ

Islam does not admit any seperation between 'material' and 'moral', 'mundane' and 'spiritual' life, and enjoins man to devote all his energies to the reconstruction of life on healthy foundations. It teaches him that moral and material powers must be welded together and spiritual salvation can be achieved by using the material resources for the good of man, and not by living a life of asceticism.[১৩]

www.pathagar.com

এই বৃহত্তর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ইসলামী অর্থনীতির দু'টি মৌলিক ধারণাকে আলোচনা করা জরুরী হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে আল্লাহর চূড়ান্ত অধিকার ও ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়া। তার মানে তাকে ছাড়া মানুষের অন্য কারো আনুগত্য করার অধিকার নেই। রাজনৈতিকভাবে খুরশীদের মতো চিন্তাবিদের কাছে তৌহীদের মানে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সম্প্রদায় থাকবে কিন্তু রাষ্ট্র বা জাতিকতার প্রতি আনুগত্যকে অবশ্যই খোদার আনুগত্য এবং মুসলিম উম্মাহর বিবেচনার নিচে রাখতে হবে।

অর্থনৈতিকভাবে খুরশীদ তৌহীদের অর্থ করেছেন এভাবে ঃ

The development effort, in an Islamic framework is directed towards the development of a God-conscious human being, a balanced personality committed to and capable of acting as the witness of truth to mankind.[১৪]

সুনির্দিষ্টভাবে তিনি এর মানে করেছেন মানব সম্পদ উন্নয়ন যেমন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা, জীবনের গুণগত পরিবর্তন প্রভৃতি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য। এই প্রেক্ষিতে শিল্পায়নকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। কিন্তু যে নীতি শিল্পায়নকে উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ইসলামী নীতিতে শিল্পায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের নীতিতে সম্পদের অধিকারী হওয়া কিংবা বিনিয়োগ করা বিধিসম্মত। কিন্তু সেই সম্পদকে ব্যবহার করে অন্যের উপর অবৈধ সুবিধা অর্জন বা অন্যকে শোষণ করার মতলব আদৌ অনুমোদিত নয়। এইভাবে ইসলামী অর্থনীতি একটি তাকওয়াভিত্তিক (God conscious) সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য 'অর্থনৈতিক মানুষ'- Economic man তৈরি করা নয়। এর উদ্দেশ্য মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সমুন্নত করা। খুরশীদের কাছে খেলাফত হচ্ছে ঃ ... unique Islamic concept of man's trusteeship in moral, political, and economic terms. [১৫]

তিনি মনে করেন এটাই হচ্ছে মুসলিম জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা ঃ

This exalts man to the noble and dignified position of being God's deputy on earth and endows his life with a lofty purpose; to fulfill the will of God on earth. This will solve the perplexing problems of human society and establish a new order wherein equity and justice and peace and prosperity will reign supreme.[১৬]

খিলাফার ধারণা এমন একটি অর্থনৈতিক নীতি বিকাশের উপর জোর দেয় যা আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধের ভিতকে প্রস্তুত করবে। খুরশীদ তাই ব্যক্তিগত সম্পদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষের ব্যবস্থাপনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সম্পদের উপর ব্যক্তির চূড়ান্ত মালিকানাকে ইসলাম স্বীকার করেনি। খুরশীদ অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও পূর্ণাঙ্গ মনে করেননি যেখানে উৎপাদনের সব ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে ব্যক্তি উদ্যোগকে শেষ করে দেয়া হয়। খুরশীদ তাই মালিকানা বিষয়ে ইসলামের ভূমিকাকেই বৈপ্লবিক মনে করেন ঃ

Islam's most important contribution in the field of economics lies in changing the concept of ownership. No one has the right to destroy

www.pathagar.com

property. If misused it can be taken away. If it is not needed it must be passed on to others.[১৭]

সম্পদের চূড়ান্ত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ হচ্ছে সম্পদের ট্রাস্টি এবং সেই সূত্রে সম্পদ উপভোগ করার অধিকারী। ট্রাস্টিশীপের অর্থ হচ্ছে এই সম্পদকে নিজের পাশাপাশি মানবকল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির কতকগুলো আলোচিত বিষয় যেমন জাকাত ও রিবার (সুদ) নিষিদ্ধকরণের কথাও খুরশীদ বিবেচনায় নিয়েছেন। জাকাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুরু মওদুদীর মত কুরআনী মূল্যবোধের কথাই তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ

... a compulsory levy ... on accumulated wealth, trade goods, various forms of business, agricultural produce, and cattle. Its purpose is to create a fund for the support of economically depressed classes.[১৮]

অন্যদিকে রিবাকে তিনি বলেছেন এক ধরনের শোষণমূলক ব্যবস্থা। সুতরাং এই ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে আল্লাহর খেলাফতের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা যাবে না।

আজকের দিনের ইসলামী অর্থনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তত্ত্বের পাশাপাশি বাস্তব কর্মকৌশল। অতীতে ইসলামী অর্থনীতি অনেকখানি তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খুরশীদ আহমদের মত পেশাদার অর্থনীতিবিদদের ভূমিকার ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে গতিশীলতা এসেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

খুরশীদ আহমদের লেখায় ইসলামী অর্থনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে। তিনি এটিকে বলেছেন Value oriented discipline। খুরশীদ পশ্চিমের তাত্ত্বিকদের মত খণ্ডন করে বলেছেন Value neutral discipline বাস্তব অর্থে সম্ভব নয়। পশ্চিমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে Value neutral দাবী করা হলেও গভীর বিশ্লেষণে তা সংশয়াবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পশ্চিমী ব্যবস্থাকে যদি কোনো অপশ্চিমী প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা হয় তবেই এর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। খুরশীদ মনে করেন অর্থনীতি কোনো Value free discipline নয়। তিনি মনে করেন অর্থনীতিবিদদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার ও মানবকল্যাণের জন্য কাজ করা এবং এটি হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির বড় বৈশিষ্ট্য ঃ

The major contribution of Islam lies in making human life and effort purposive and value oriented. The transformation it seeks to bring about in human attitudes and pari passu is that of the social sciences is to move them from a stance of pseudo-value-neutrality towards open and manifest value commitment and value fulfillment.[১৯]

ছয়

খুরশীদ আহমদের তৎপরতা অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এক বড় ধরনের উদ্যোগ। একালের মুসলিম পণ্ডিতরা আধুনিকতার ঔপনিবেশিক চরিত্রকে হঠিয়ে দিয়ে ইসলামী অভিজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে লড়াই শুরু করেছেন খুরশীদ সেই মিছিলের অগ্রগামী সৈনিক। ইসলামী অর্থনীতি বিকাশের

www.pathagar.com

ভিতর দিয়ে পশ্চিমী জ্ঞান কাঠামো ও বুদ্ধিজীবিতার কতকগুলো মৌলিক চরিত্রকে খুরশীদ ও সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতরা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন। অর্থনীতিতে নীতিযোগ (Value commitment) থাকবে এ কথা বলে খুরশীদ পুরো পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নাড়া দিয়েছেন। অন্যদিকে একালের মুসলিম বুদ্ধিজীবীতার জগতে এই নীতি নতুন পথের দিক নির্দেশ দিয়েছে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Quoted in Khurshid Ahmad in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. NewYork : Oxford University Press, 2001.
২. Khurshid Ahmad, notes from an Interview at Islamic Foundation, June 1988.
৩. প্রাগুক্ত।
৪. Khurshid Ahmad, The Religion of Islam, Lahore : Islamic Publications, 1967.
৫. প্রাগুক্ত।
৬. Khurshid Ahmad, Islam and the West, Lahore : Islamic Publications, 1967.
৭. প্রাগুক্ত।
৮. Ibrahim M. Abu-Rabi, ed., Islamic Resurgence : A Round table with Prof. Khurshid Ahmad. Islamabad : Institute of Policy Studies, 1996.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. Khurshid Ahmad, Introduction, in Islamic Economics, Compiled by Muhammad Akram Khan, Leicester : The Islamic Foundation, 1983.
১২. Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework," in Islamic Perspectives, ed., Khurshid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari. Leicester : The Islamic Foundation, 1979.
১৩. Khurshid Ahmad, The Religion of Islam.
১৪. Khurshid Ahmad, "Economic Development, The Islamic Perspectives."
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. Khurshid Ahmad, The Religion of Islam.
১৭. Interview with Khurshid Ahmad, Arabia : The Islamic World

www.pathagar.com

Review, no 6 February 1982.
১৮. Abul Ala Mawdudi, Economic System of Islam, ed., Khurshid Ahmad. Lahore : Islamic Publications, 1984.
১৯. Khurshid Ahmad, "Economic Development, The Islamic Perspectives."

www.pathagar.com

হাসান আল তুরাবী

এক

সুদানের বিপ্লবী রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক ড. হাসান আল তুরাবীর গুরুত্ব ও মর্যাদা মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমী দুনিয়ায় তার জাতীয় পরিচিতিকে ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। তিনি সুদান সংসদের স্পিকার, সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। তার চেয়ে বড় কথা লন্ডন ও সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তুরাবী একই সঙ্গে ইসলামী ঐতিহ্য ও আইন বিশেষজ্ঞ, পশ্চিমী সভ্যতা সম্পর্কে সমসাময়িক ইসলামী ভাবনার অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার এবং ইসলামী জগতের অগ্রণী তাত্ত্বিক নেতা।

সোরবোর্নে তার পিএইচডির বিষয় ছিল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত ক্ষমতার প্রয়োগ কতটা গ্রহণযোগ্য। পিএইচডি শেষে ১৯৬৪ সালে দেশে ফেরার পর সবাই মনে করেছিল তুরাবী হবেন সুদানের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ। কিন্তু সেই পথে না গিয়ে তিনি হয়ে যান বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম দৃশ্যমান ও প্রভাবশালী মুসলিম নেতা ও তাত্ত্বিক। আজকে ইসলামী ও পশ্চিমী সভ্যতার টানাপড়েন থেকে উঠে আসা সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে তুরাবীর নজির টানা জরুরী হয়ে পড়ে। একারণেই তাকে আধুনিক ইসলামী মননের অন্যতম সংকট বিশ্লেষক হিসেবে গণ্য করা হয়।

দেশে ফেরার পর তুরাবী খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টিতে গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন পান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই আহ্বান উপেক্ষা করে তৎকালীন সুদানী সামরিক শাসক ইব্রাহীম আবুদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে এক তীব্র ও ঝাঁঝালো বক্তৃতা দেন। সেই থেকে তুরাবী সুদানী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে হাজির হন এবং আজও তিনি সেখানে অবস্থান করছেন। অনেকের ধারণা ১৯৮৯ সালে সুদানে ইসলামী শক্তির মদদে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে যে উমর আল বশিরের সরকার ক্ষমতায় আসে তার প্রধান তাত্ত্বিক ও নেপথ্যের নায়ক আসলে তিনি। তুরাবীর সবচেয়ে বড় ভূমিকা হচ্ছে তিনি তার জীবদ্দশায় কয়েক দশকের মধ্যে সুদানী সমাজ ও রাষ্ট্রের ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইসলামের অন্তর্মুখিনতা কাটিয়ে তিনি এটিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রোগ্রাম হিসেবে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন যা অনেকের কাছে চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুই

হাসান আল তুরাবী হচ্ছেন সুদানের এক দীর্ঘ ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের সদস্যরা তাদের ধার্মিকতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও সামাজিক কাজকর্মের জন্য বিখ্যাত

www.pathagar.com

ছিলেন। তুরাবীর পরিবারের পূর্ব পুরুষ ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত আলেম ও ফকীহ্ ওয়াদ আল তুরাব, খার্তুমের দক্ষিণে যার বিখ্যাত দরগাহ্ রয়েছে। হাসান আল তুরাবীর ভাষায় তিনি হলেন সুদানের প্রথম মাহ্দী, যিনি ছিলেন একই সাথে বুদ্ধিজীবী, সংস্কারপন্থী ও একজন সুফী। হাসান আল তুরাবীর জীবনে আমরা এই ত্রিগুণের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখি।

তুরাবীর পিতা ছিলেন সেকালের সুদানের ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীন শরীয়াহ্ আদালতের একজন বিচারক। তিনি ওমদুর মানের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র আল মাহাদ আল ইলমি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। তুরাবী জানিয়েছেন সরকারি চাকরির বদলির সূত্রে তার বিচারক পিতাকে সুদানের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সেই সাথে তার পরিবারকেও ঘুরতে হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ প্রশাসকদের হাত থেকে তুরাবীর পিতা তার কর্তৃত্ব রক্ষার সবসময় একটা চেষ্টা করেছেন। এ কারণেও তাকে বারংবার বদলি করা হয়েছে।

হাসান আল তুরাবীর জন্ম সুদানের কাসসালায়, ১৯৩২ সালে। তুরাবী ছিলেন ভাইবোনের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং তার জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই তার মা মারা যান। ফলে তাকে বিচারক পিতার তত্ত্বাবধানেই কাটাতে হয় এবং সুদানের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়। পিতার সাথে তুরাবীর ঘুরে বেড়ানো ও পড়াশোনা নিয়ে পরবর্তীকালে এক হৃদয়গ্রাহী মন্তব্য করেছেন তিনি ঃ I went to school in each of the local places, but I look forward after vacations to going back to school.[১]

পিতার কাছেই তুরাবীর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। বিচারক পিতা সন্ধ্যার পর এবং ছুটির সময় তুরাবীকে নিজে পড়াতেন যাতে তার পুত্র সত্যিকারের শিক্ষাটা পায়। পিতার তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সে তুরাবী ইবনে মালিকের আলফিয়া ও লামিয়াত আল আফাল পড়ে মুখস্থ করেন। এ দু'টো ব্যাকরণ বই ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার জন্য জরুরী ছিল, কারণ এটি কুরআনের ভাষা ব্যাখ্যায় সাহায্য করতো। ১৯৫০ সালের মধ্যে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি নেন। খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তিনি এখানকার ছাত্র সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের সংস্পর্শে আসেন। ব্রাদারহুড তার চিন্তাভাবনার মোড় অনেকটাই ঘুরিয়ে দেয়। তিনি সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বলেছেন ঃ

... the Islamic movement which I met at the university was quite an experience for me. All of the dead literature that I had learned by heart became alive. I saw everything in a different light.[২]

খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি বিলাত যান এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন এবং প্যারিসের সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের উপর পিএইচডি অর্জন করেন।

১৯৬৪ সালে দেশে ফিরে তিনি প্রথম কাজ করেন খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নীতি-নির্ধারণী বিতর্কে সুদানের তৎকালীন সামরিক শাসক ইব্রাহীম আবুদকে আক্রমণ করেন। এটি চলমান আবুদবিরোধী আন্দোলনে নতুন গতি দেয় এবং বিরোধী দলের এই আন্দোলনে মুসলিম ব্রাদারহুডের অবস্থানকে আরো মজবুত করে। এর ফলে ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে আবুদ সরকারের পতন ঘটে।

www.pathagar.com

এই আন্দোলনের সফলতা এবং তুরাবী ও মুসলিম ব্রাদারহুডের অভিজ্ঞতা তুরাবীর রাজনৈতিক পরিপক্বতার প্রমাণ। তুরাবীর এই সাফল্য ঠিক সরাসরি ইসলামী কোন অবস্থান থেকে আসেনি বরং একটি সামগ্রিক সমস্যার তিনি একটি ইসলামী অভিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন। তুরাবীর নেতৃত্বের এই বিশেষ কৌশলই তাকে সুদানী রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলনের মধ্যমণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হাসান আল তুরাবী রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও আলোচিত হলেও মূলত তিনি একজন বুদ্ধিজীবী। তার সমসাময়িক সুদানী রাজনীতিবিদদের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি অনেক অগ্রসর। একই সাথে সুদান মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃত্বও তিনি দিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে যেয়ে সমসাময়িক অন্যান্য রাজনীতিবিদদের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং ব্রাদারহুডের মতো একটি এলিটিস্ট প্রতিষ্ঠানকে রীতিমত জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেছেন।

তিন

হাসান আল তুরাবীর চিন্তাভাবনার মূলে আছে তার ইসলামকে বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিন্তু সেই রকম সামর্থ্য অর্জন করতে হলে তুরাবী মনে করেন আধুনিককালে ইসলামের তাজদীদ বা পুনরুজ্জীবন দরকার। এই কাজ করতে হলে প্রথমে চাই একালে মুসলিম সমাজের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সকল বিশ্বাসীকে এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া।

তুরাবীর মুসলিম ইতিহাস চিন্তার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে তাজদীদ। কারণ প্রতি যুগেই ইসলামের তাজদীদ প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত না থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ইসলাম পরিণত হয় একটি আচার সর্বস্ব জীবনীশক্তিহীন ধর্মে। অবশেষে দেখা যায় ইসলাম বিশ্বাসীরা এমন রীতিনীতি নিয়ে বসবাস করছে যাকে আর কোনভাবেই ইসলামসম্মত বলা চলে না।

তুরাবী তাই মনে করেন ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এই তাজদীদ ও তাকলীদের (অতীতের অন্ধ অনুকরণ) পারস্পরিক উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বমানতা বরাবর ছিল। তুরাবী অবশ্য এটা মনে করেন না তাজদীদ মানে হচ্ছে ইসলামের মৌলিক নীতিকে পাল্টে দেয়া কিংবা নতুন পরিস্থিতির সাপেক্ষে কুরআন শরীফের পরিবর্তন ঘটানো। তুরাবীর কাছে তাজদীদ মানে হচ্ছে ঃ

The revelation in the Quran is the comprehensive revelation of God's eternal truth. However, the implications of that Quranic message for specific peoples, times and places do change.[৩]

সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানকে যুগের রূপান্তরকে, ইতিহাসের রূপান্তরকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেই সময় নির্ধারিত রূপান্তরকে মেনে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। এর মানে হচ্ছে পরিবর্তনে সাড়া দেয়াই ইসলামের নীতি। পরিবর্তনের এই নীতিকে ইসলামের পরিভাষায় বলে ইজতিহাদ। কিন্তু তুরাবী তার সমসাময়িকদের থেকে ইজতিহাদকে মূল্যায়ন করেছেন ভিন্নভাবে।

www.pathagar.com

তার মতে ইজতিহাদ এমন কিছু নয় যা শুধু ঃ

... to go to old books to dig out bits and pieces that we hope will help us solve today's problems. What we need is to go back to the roots and create a revolution at the level of principles.[8]

তুরাবীর এই চিন্তাভাবনা তার পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ও ভাবুকদের থেকে অনেকখানি ব্যতিক্রমী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী। তিনি পূর্ববর্তীদের চিন্তা থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। যেমন মুসলমানরা রসুল (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজকে আজও মডেল মনে করে এবং সেটির আদলে নতুন একটি সমাজ তৈরির কথা ভাবে। কিন্তু তুরাবী বলেছেন আজকের যুগ ও বাস্তবতার সাপেক্ষে রসুলের নীতির সমন্বয় করতে হবে। তার ভাষায় ঃ

... although the prototype community of the Prophet offers us an ideal standard, when we use that prototype as a basis we may feel obliged to build a new model which unites the eternal principles with the changing reality.[৫]

তুরাবী পূর্ববর্তীদের থেকে সরে এসে ইজতিহাদ সম্পর্কে বলছেন এটি এতকাল ধরে একটি বিশেষ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও উলামারাই করে এসেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীতার এই সংজ্ঞার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং তাদের শ্রেণী ও পেশার মধ্যেও রূপান্তর ঘটেছে। তুরাবী উলামার সংজ্ঞাকে অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছেন ঃ

What do I mean by ulama ? The word historically has come to mean those versed in the legacy of religious (revealed) knowledge (ilm). However, ilm does not mean that alone. It means any one who knows anything well enough to relate it to God. Because all knowledge is divine and religious, a chemist, an engineer, an economist, or a jurist are all ulama. So the ulama in this broad sense, whether they are social or natural scientists, public opinion leaders or philosophers, should enlighten society.[৬]

ইজতিহাদ চর্চায় তুরাবীর এই গণতন্ত্রায়নের দাবি একালে একটি খুব উল্লেখযোগ্য বিষয়। এর মানে হচ্ছে জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় প্রবুদ্ধ মুসলমানরা ইসলামী পুনর্জীবনের লক্ষ্যে তাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও মতামতের ব্যবহার করতে পারবেন। আজকের দিনে এই ধরনের পুনর্জীবন ভাবনা হতে হবে সামগ্রিক। শুধুমাত্র অতীত চিন্তার পুনঃবীকরণ ও পারলৌকিক ভাবনার মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ করা চলবে না। এটিকে জীবনের প্রতিটি স্তরে এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোর সাথে যুক্ত করে মূল্যায়ন করতে হবে। তুরাবী মনে করেন এই প্রক্রিয়া ইসলামী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির অংশ এবং মুসলমানকেও আজ সেই প্রয়োজনের দায় মেটাতে হবে।

চার

তাজদীদের কথা বিবেচনা করলে হাসান আল তুরাবী ইসলামী আইন ব্যবস্থার পুনর্জীবনের দিকটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন বেশি। এর কারণ বোধহয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন আইনের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন

www.pathagar.com

ফ্যাকাল্টির ডীন। রাজনীতিক হিসেবে তিনি যখন সরকারে এসেছেন তখনও তিনি আইন সম্পর্কিত পদগুলোতেই অবস্থান করেছেন বেশি। প্রেসিডেন্ট নিমেরীর ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হবার পর তিনি সুদানের অ্যাটর্নি জেনারেল, পরে প্রেসিডেন্টের আইন ও পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হন। পরবর্তীতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সময় তার ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিলে তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া তিনি সরকারের অনেক আইন ও সংবিধান বিষয়ক কমিটিতে কাজ করেছেন। এসব জায়গায় কাজ করার সময় তার লেখালেখি ও রিপোর্টের মধ্যে আইনী ব্যবস্থার পুনর্জীবন ভাবনা বেশ স্পষ্ট। পরিবর্তনশীল সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি যেহেতু আইনী ব্যবস্থার পুনর্জীবন চান, তাই তিনি মনে করেন কোনো বিদেশী ব্যবস্থা থেকে ধার করে নয় ইসলামের ভিতরকার শক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করেই এটা করতে হবে। ১৯৬৫ সালে সুদান কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর সেখানকার সাংবিধানিক সংকটের প্রেক্ষাপটে গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে তুরাবী যে মতামত দেন তার মধ্যে এরকম অভিব্যক্তি দেখা যায়। সুদান কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে আবুদ সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের সংসদ নির্বাচনে বেশ কয়েকটি সীট পায়। কিন্তু ব্রাদারহুডের চাপে পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে বিল পাস হয়। এ ঘটনাকে সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক হিসেবে আখ্যায়িত করলে সেখানকার সুপ্রিম কাউন্সিল তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সার্বিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে রিপোর্ট দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়, যার সদস্য হিসেবে তুরাবী কাজ করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যের মতো তুরাবীও আইন প্রণয়নে সংসদের চূড়ান্ত ক্ষমতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং একই সাথে তিনি রিপোর্টের সাথে যোগ করে দেন ঃ The Constituent assembly is the agency entrusted with the excercise of the highest constitutional authority and it is an expression of the sovereignty which the constitutions establish for the Ummah after God.[৭]

এখানে তুরাবীর 'খোদার পরে' শব্দটার ব্যবহার লক্ষণীয়। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বকে তিনি খোদায়ী কর্তৃত্বের আয়ত্তাধীন রেখেছেন যা তার ইসলামী প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ। তুরাবী শুধু রিপোর্ট দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, এই সাংবিধানিক সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন ঃ ... the Sudanese constitution is simply a collection of limbs amputated from foreign constitutions and imposed on the Sudanese people.[৮]

সুতরাং ধার করা ব্যবস্থা নয়; কার্যক্ষম সংস্কার ও পুনর্জীবনের কাজ করতে হলে ইসলামের ভিত্তিতেই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তুরাবী পুনর্জীবনের জন্য দু'টি বিষয় চিহ্নিত করেছেন। একটি ফিকাহর পুনঃনির্মাণ, অপরটি শরীয়াহর বাস্তবায়ন। মুসলিম চিন্তার জগতে শরীয়াহ বিবেচিত হয় ইসলামী আইন হিসেবে যার উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও রসুলের (সঃ) সুন্নত। অন্যদিকে ফিকাহ হচ্ছে শরিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, বিশ্লেষণ ও তার ফলাফল। তার মানে ফিকাহ হচ্ছে মানবীয় চিন্তাপ্রসূত, শরীয়াহ ঐশী জ্ঞানলব্ধ। ফিকাহ হচ্ছে শরীয়াহর নীতিকে ভিত্তি করে মানবীয় সমস্যার সমাধান বের করার পদ্ধতি।

www.pathagar.com

তুরাবী মনে করেন প্রথম যুগের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা শরীয়াহর আলোচনার জন্য ফিকাহ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে ইসলামী জ্ঞান জগতে এক বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু তাই বলেতো এক যুগের ফিকাহ দিয়ে অন্য যুগের প্রয়োজন মিটতে পারে না। তাই আজকের যুগের প্রয়োজনে শরীয়াহকে ভিত্তি করে নতুন ফিকাহর বিকাশ ঘটাতে হবে। তাছাড়া পুরনো ফিকাহ শাস্ত্রগুলোর অনেক কিছুই সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জটিলতা ও মতবিরোধের কারণ হয়ে উঠেছে। তুরাবীর ভাষায় ঃ

... the issues of the fundamental sources in the fiqh literature were considered abstractly, so that they became sterile speculative discussions which produced absolutely no fiqh at all. Even worse, it produced never ending controversy.[৯]

সুতরাং সমকালীন ইসলামী আন্দোলনের জন্য এই ফিকাহ কোন কাজে আসবে না ঃ

It is clear to the movement that the fiqh which it has in its possession - however specialized its load of deductions and inferences, and however careful in its explorations and consultations - will never be adequate for the needs of the Islamic mission.[১০]

আজকের যুগের জন্য তুরাবী যে নতুন ফিকাহর কথা বলেছেন তা যেমন পুরনো ফিকাহর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করবে তেমনি তা হবে সমস্যার সুনির্দিষ্ট উত্তর। তুরাবীর প্রস্তাবিত নতুন ফিকাহর কর্মপদ্ধতি কেমন হবে দেখা যাক ঃ

Human knowledge has expanded greatly, while the old fiqh was based on knowledge that was restricted [by the conditions of its historical era] ... it becomes imperative for us to adopt a new position in the fiqh of Islam so that we can utilize all knowledge for the service of God. This is a new construction which unites what exists in the transmitted traditional disciplines ... with the rational sciences which are renewed every day and which are completed by experiment and observation. With that achieved and unified knowledge, we can renew our fiqh for the faith and what challenges it time after time in our contemporary life.[১১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে তুরাবী উলামার যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন তাকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা এই নতুন ও সমন্বিত ফিকাহ তৈরিতে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা করেন। এর পাশাপাশি ফিকাহ বিকাশের স্বার্থে তিনি কিয়াসের ধারণাকে সহজীকরণের কথা বলেছেন। ইসলামের প্রথম যুগেই স্বীকৃত হয়েছিল ইসলামের মৌল পুস্তক কুরআন শরীফে নীতির কথা বলা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিকে মুসলমানরা কিভাবে মোকাবিলা করবে তার সুনির্দিষ্ট উত্তর এখানে নেই। এই জন্যই ইসলামী আইন শাস্ত্রে কিয়াসের উদ্ভব হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে উলামারা কিয়াসের সীমানাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন যা তুরাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এমত পরিস্থিতিতে কিয়াসের সীমানা প্রসারিত করার কথা বলেছেন এবং এই সূত্রে আধুনিককালে ইসলামের শুরা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের কথাও বলেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের ব্যাপারগুলো নিয়ে তুরাবীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবতে হয়েছে কেননা ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে সমকালীন মুসলিম সমাজে ইসলামী আইন কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে এবং ফিকাহর কোন অংশের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃবীকরণ করা দরকার এটা তার কাছে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। যদিও উনিশ শো ষাটের দশকে তুরাবী যখন সুদানের রাজনীতিতে পা রাখেন তখন তার মুসলিম ব্রাদারহুড ও এর রাজনৈতিক শাখা ইসলামিক চার্টার ফ্রন্টকে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সংবিধানের ধারণাগুলোকে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে খাটতে হয়েছে বেশি। পরে অবশ্য তুরাবী ও তার দলের প্রচেষ্টায় ইসলামী সংবিধানের ধারণা সুদানী রাজনীতির প্রধান এজেন্ডায় পরিণত হয়। এর ফলে পার্লামেন্টের সংবিধান কমিটি ইসলামের নীতিকে সুদানী সংবিধানের মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির ফলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় এমন নয় কিন্তু সুদানের রাজনৈতিক লড়াইয়ে ইসলামের অবস্থানকে এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তুরাবী ও তার ব্রাদারহুড প্রথম দিকে ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়ার নীতি অনুসরণ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান প্রতিষ্ঠার আগে ব্যক্তি ও সমাজের ইসলামীকরণের উপর জোর দেয়। কারণ ব্যক্তি ও সমাজের ইসলামীকরণ ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক উপর থেকে চাপানো ইসলামীকরণের বুনিয়াদ দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। তুরাবী ও ব্রাদারহুডের এই 'ধীরে চলো' নীতি সুদানী রাজনীতির দু'টি ঘটনায় বড় রকমের ধাক্কা খায়। একটি হচ্ছে সামরিক শাসক নিমেরীর ইসলামীকরণ প্রোগ্রাম অন্যটি আর এক সামরিক শাসক উমর হাসান আল বশীরের ১৯৮৯ এর অভ্যুত্থান। তুরাবী, ব্রাদারহুড ও এর রাজনৈতিক শাখা ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট যেমন নিমেরীর ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেয় তেমনি পরবর্তীতে উমর আল বশীরের সরকারের সাথেও কাজ করে। সামরিক একনায়কদের সাথে তুরাবীর এই কাজকর্ম তাকে কিছুটা বিতর্কিত করে। তবে তুরাবীরও যুক্তি ছিল। এর ফলে সুদানে ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে সুবিধা হয়। অন্যদিকে নিমেরীর ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার সামাজিক ভিত্তি অনেক মজবুত হয়। এমনকি নিমেরীর পতনের পরও সুদানী সমাজে ইসলামী আইনের ভূমিকাকে বাতিল বলা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং সেই থেকে সুদানী রাজনীতিতে ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের ধারণা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে তুরাবী ও তার ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টের জন্য ইসলামী আইনের পক্ষে লড়াই সহজ হয়।

পাঁচ

ষাটের দশকে তুরাবী যখন সুদানের রাজনীতিতে পা রাখেন তখন সেখানকার মেয়েরা জেনানা মহল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং তাদের সমানাধিকার অর্জনের প্রক্রিয়াটিও জোরদার হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চাকরি জীবনে মেয়েদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। কমিউনিস্টরা এইসব শিক্ষিত মেয়েদের কাছে টানতে থাকে এবং তাদের ভোট পেতে থাকে।

তুরাবী ইসলামপন্থীদের সংকট মোচনে এগিয়ে আসেন। তার প্রভাবে নারীদের অধিকার বিষয়ক সুদানী মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী ধ্যান-ধারণা বাদ দিয়ে ব্রাদারহুড ইসলামের উদারনৈতিক শিক্ষার আলোকে নারী অধিকারের প্রতি সচেতন হয়। তুরাবীর

www.pathagar.com

কথা হচ্ছে ইসলামে নারীর সমানাধিকার স্বীকৃত। একই সঙ্গে তিনি আধুনিকীকরণের চ্যালেঞ্জ থেকে ইসলামপন্থীদের পিছিয়ে আসার প্রবণতার তীব্র নিন্দা জানান। তুরাবী বলেন আজকের মুসলিম সমাজে নারীদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার উৎস হচ্ছে অনৈসলামিক ও সামাজিক প্রভাব। এ প্রসঙ্গে সুদানে মহিলা ভোটারদের মন জয় করতে তখনকার ইসলামিক চার্টার ফ্রন্টের মহাসচিব তুরাবী ইসলামের উষালগ্নে উদীয়মান মুসলিম সমাজের অগ্রণী নারীদের ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের উপর জোর দেন। ইসলামী মর্মবস্তুকে বজায় রেখে নারী মুক্তি আন্দোলনের এই শ্লোগান ইসলামী নারীবাদী ধারাকে পুষ্ট করে তোলে। তুরাবী জোর দিয়ে বলেন ইসলামে নারী ও পুরুষে কোন মৌলিক তফাৎ নেই। তার এই অবস্থানের পক্ষে তিনি জোরালো মতামত দেন তার লেখা Women between the Teachings of Religion and the Customs of Society শীর্ষক বইয়ে। তুরাবী যেসব শক্তিশালী লেখা লিখেছেন এটা তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এমন মতামত অনেকের। এ বইয়ে ইসলামে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তুরাবী যে বিপ্লবী ভাষ্য দিয়েছেন তা রীতিমত মৌলবাদী, নারীবাদী, মার্কসবাদী সব তরফের কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তুরাবীর এই ভূমিকার ফলেই সুদানে মহিলা ভোটের হাওয়া ঘুরে যায় ইসলামী শক্তির পক্ষে এবং ইসলামিক আইডেন্টিটি ও নারীবাদী চেতনায় বিশ্বাসীরা সুদানে মার্কসবাদীদের ছাড়িয়ে যায়।

তুরাবী এ বইয়ে প্রথম যুগের মুসলিম সমাজে নারীদের ভূমিকার নজির দিয়েছেন এবং এই ভূমিকাকে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের সাথে সমন্বয় করে বলতে চেয়েছেন ঃ

... in the religion of Islam, a woman is an independent entity, and thus a fully responsible human being. Islam adresses her directly and does not approach her through the agency of Muslim males.[১২]

এর মানে হচ্ছে নারীর অধিকার ও দায়িত্বের সাথে পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বের কোন তফাৎ নেই ঃ

The verdict of Islamic jurisprudence is just the practical expression of the dictates of faith. Women, according to Shariah, are counterparts of men. And in Islamic jurisprudence, there is no seperate order of regulations for them ... The underlying presumption in the Shariah is that sex is immaterial.[১৩]

তুরাবী উল্লেখ করেছেন ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বে ইসলাম কবুল করেছেন, এমনকি বাড়ির পুরুষদেরও আগে। তারা সেদিন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কখনো যুদ্ধের ময়দানে, কখনো রাজনীতির অঙ্গনে। তুরাবী মনে করেন সমাজের মুক্ত অঙ্গন শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়নি, এখানে লৈঙ্গিক পার্থক্য টানা মূর্খতা। ইসলামের প্রথম যুগের এসব মুসলিম মহিলারাই কার্যত ইসলামী আচরণ করেছেন। সমাজ জীবনে যেরকম, তেমনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও একই কথা। নারী এককভাবে যে কোনো বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার নিজের সম্পত্তির পুরোপুরি দেখভাল করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে পূর্ণভাবে। তাহলে ইসলাম যদি নারীর সমানাধিকার দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে নারীর বর্তমান লাঞ্ছনা, অবমাননার কারণ কি? তুরাবী বলেছেন মুসলমানের

www.pathagar.com

বিশ্বাসে যখন অবক্ষয় শুরু হলো তখনই তারা তাদের নারীদের উপর জুলুম শুরু করলো। ইসলামের প্রতি দুর্বল আনুগত্যই তাদেরকে নারীদের প্রতি অসহিষ্ণু, বেইনসাফী আচরণ করতে প্রণোদিত করলো। পরিণতিতে যা দাঁড়ালো তা হলো নারীর মৌলিক ধর্মীয় দায়িত্ব ও অধিকারকে অস্বীকার করা হলো এবং মুসলিম সমাজের মধ্যকার সমতা ও ইনসাফের ধারণা যা কিনা শরীয়াহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাকে উপেক্ষা করা হলো। এর ফলে জন্ম হলো তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজের। ঐতিহাসিক অবক্ষয়ের ধাক্কায় যে তথাকথিত মুসলিম সমাজ তৈরি হয়েছে তুরাবী মনে করেন এটিকে আজ বদলে ফেলা দরকার এবং ইসলামপন্থীদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সংগ্রামে এগিয়ে আসা। তার কথা শোনা যাক ঃ

... a revolution against the condition of women in the traditional Muslim societies is inevitable and that it is the task of Islamists to close the gap between the fallen historical reality and the desired model of ideal Islam.[১৪]

তুরাবী অবশ্য সতর্ক এই কারণে যে সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একটি জটিল বিষয় বিশেষ করে এই যুগে যেখানে পশ্চিমী নীতি ও মূল্যবোধ মুসলিম সমাজের উপর আছড়ে পড়ছে এবং নির্যাতিত মুসলিম নারীদের কাছে তা একধরনের প্রলোভন ও মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পশ্চিমী মূল্যবোধ আত্তীকৃত হওয়ার আগেই ইসলামী সংস্কারকে এগিয়ে নেয়া চাই। সেজন্য নিছক পশ্চিমী মূল্যবোধের সমালোচনা করে লাভ হবে না। অতীতকে ধরে রাখার চেষ্টা শক্তির অপব্যয় মাত্র। ইসলামবাদীরাই নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন। আদর্শ ইসলামের দিকে যাত্রার শর্ত হচ্ছে এই প্রচেষ্টা। পশ্চিমী মতে আধুনিকতার প্রবক্তারা যাতে পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে না পারে সেদিকে নজর দেয়াই আমাদের কর্তব্য।

মুসলিম নারীদের নিয়ে তুরাবীর বিপ্লবী চিন্তাভাবনা এবং ইসলামী আন্দোলনে তুরাবীর প্রেরণায় আরো অধিক নারীর অংশগ্রহণ তার রাজনৈতিক সাফল্যের অন্যতম কারণ। বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ায় তুরাবীর নারী সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বিপুল প্রভাব পড়েছে এবং বিভিন্ন দেশের ইসলামবাদীরা তাদের আন্দোলনে নারীর অধিক অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে। ১৯৯২ সালে তুরাবী তার নিজের সূচনা করা কর্মসূচীর মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ

... in the Islamic movement I would say that women have played a more important role of late than men. They came with a vengeance because they had been deprived, and so when we allowed them in the movement, more women voted for us than men because we were the ones who gave them more recognition and a message and placed in society. They were definitely more active in our election campaigns than men. Most of our social work and charitable work was done by women. They are now even in the popular defense forces, and nobody raises questions about that ... of course. I don't claim that women have achieved parity ... but there is no bar to women anywhere, and there is no complex about women being present anywhere.[১৫]

www.pathagar.com

ছয়

তুরাবীর রাজনৈতিক জীবনের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যদিও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে ইসলামবাদীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একদল মনে করেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজ ও আইনের ইসলামীকরণ করতে হবে। অন্য দলের মতামত হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের ইসলামীকরণের পরিণত রূপ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। তুরাবী মোটামুটি দ্বিতীয় দলের পক্ষপাতী এবং নীতি ও তত্ত্বের দিক দিয়ে মোটামুটি একই চিন্তায় তিনি স্থিতিশীল। তার অবস্থান হচ্ছে ঃ

An Islamic state can not be isolated from society, because Islam is a comprehensive, integrated way of life. The division between private and public, the state and society, which is familiar in Western culture, has not been known in Islam. The state is only the political expression of an Islamic society. You can not have an Islamic state except in so far as you have an Islamic society. Any attempt at establishing a political order for the establishment of a genuine Islamic society would be superimposition of laws over a reluctant society.[১৬]

তুরাবীর কথা হচ্ছে এই ইসলামীকরণকে এগিয়ে নিতে হলে সুদানের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিতে হবে এবং তিনি তা করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের কালে তিনি সে প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছেন এবং সংসদের ভিতরে সুদানের সাংবিধানিক ও আইনী ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে ইসলামীকরণের স্বার্থে তিনি সামরিক শাসকদেরও সহযোগিতা করেছেন। যদিও এই সহযোগিতাকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখেছেন এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারকে বৈধতা দেয়ার জন্য তাকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা করলে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার বলতে কি বোঝায়? তুরাবী একটা মডেল খাড়া করেছেন, যদিও এ মডেল প্রশ্নোর্ধ্ব নয়। তবুও বলতে হবে ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল একালে তার মত দু' একজনই সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এখানেই তুরাবীর সাফল্য। ইসলামবাদীরা এ মডেল থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন। ভবিষ্যতের ইসলামবাদীরা এ মডেলের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো অতিক্রম করে নতুন মডেল উপস্থাপন করবেন এ আশা করা যায়।

তুরাবী বলেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল হবে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। কোনভাবেই এটা স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা নয়। এখানে সরকারের ভূমিকা অনেকখানি সীমিত। আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। নৈতিক বিধি, ব্যক্তির বিবেকবোধ - এসবেরও গুরুত্ব রয়েছে এবং এসবই স্বাধীন মতামতের ব্যাপার। ইসলামের প্রতি মননশীল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে তা মোটেই নিয়ন্ত্রিত বা বিধিবদ্ধ হবে না। মূল ধারণাটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু অমুসলিমের স্বাধীনতা নয়, মুসলমানদের মধ্যে চিন্তার বহুত্বকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

ইসলামের মূলতত্ত্বটা তৌহিদবাদী। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সেকুলার রাষ্ট্রের মতো নয়। ইসলামী রাষ্ট্রও সেকুলার নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ধর্মহীনতা আত্মবিভাজন ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার পথ পরিষ্কার করে। সুদানে তুরাবীর

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আসে ১৯৮৯ সালে উমর আল বশীরের নেতৃত্বে তুরাবীর অনুগত একদল সামরিক অফিসারের অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে। উমর আল বশীরের সরকারে তুরাবীর ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট প্রধান ভূমিকা রাখে এবং তুরাবী এই সরকারের প্রধান তাত্ত্বিক ও থিংক ট্যাংক হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর তুরাবী সুদান পার্লামেন্টের স্পীকার হন এবং ১৯৯৮ সালে প্রণীত সুদানী সংবিধানে তুরাবীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে। বিশেষ করে তার প্রিয় তাজদীদ বা ইসলামী পুনর্জীবনের ভাবনা এখানে স্পষ্ট। তাছাড়া এ যাবৎকাল তার লেখালেখি ও বক্তৃতায় যেসব বিষয় উঠে আসতো তাও এ সংবিধানে কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন তিনি মুসলিম দুনিয়ার জনপ্রিয় ধারণা খেলাফতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ ও ঐশী সার্বভৌমত্বের একটি সমন্বিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সংবিধানের ভাষাটা পরীক্ষা করা যাক ঃ

Supremacy in the state is to God the Creator of human beings and sovereignty is to the vicegerent people of the Sudan who practice it as worship of God, bearing the trust, building up the country and spreading justice, freedom and public consultation.[১৭]

অথবা ইসলামের ইজমার ধারণাকে তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জনগণের ঐকমত্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন - The consensus of the nation by referendum এবং এই প্রক্রিয়াকে তিনি আইনের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এই সংবিধানে ইসলামী আইনের সুনির্দিষ্ট ধারাগুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে যেমন সুদ, অ্যালকোহল ও জুয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা, রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাতের নীতি প্রবর্তনের মতো বিষয়গুলো। সাংবিধানিকভাবে এইসব নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তুরাবী তার লক্ষ্যের কথা খোলামেলা প্রকাশ করেছেন।

Those in service in the state and public life shall envisage the dedication thereof for the worship of God, wherein Muslims stick to the scripture and tradition, and all shall maintain religious motivation and give due regard to such spirit in plans, laws, policies and official business in the political, economic, social and cultural fields in order to prompt public life towards its objectives, and adjust them towards justice and up-rightedness to be directed towards the grace of God in The hereafter.[১৮]

এটা হচ্ছে সেকুলারিজমকে প্রত্যাখ্যান করার সাংবিধানিক ভাষা। কিন্তু এই সংবিধানের ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে একটি প্রশ্ন বরাবর ছিল। কারণ সুদান মূলত ইসলামিক ও খ্রিস্টিয় ধারায় বিভক্ত একটি জাতি রাষ্ট্র। সার্বিকভাবে সুদানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এর দক্ষিণাংশে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান ও আদিবাসীদের বাস। সুতরাং সংবিধানের ইসলামী ধারাগুলোকে অমুসলিমদের উপর ব্যবহার করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। সংবিধানের ধারাটা পরীক্ষা করা যাক ঃ

The effectiveness of some laws shall be subject to territorial limitations, considering the prevalence of certain religions or cultures in the areas

www.pathagar.com

at variance with the religion dominant in the country at large ... In these matters exclusive local rules can be established in the area based on the local majority mandate ... Thus the legislative authority of any region predominantly inhabited by non-Muslims can take exception to the general operation of the national law, with respect to any rule of a criminal or penal nature derived directly and solely from a text in the Shariah contrary to the local culture.[১৯]

সুতরাং একটা ইসলামী রাষ্ট্রেও অমুসলমানদের মূলস্রোতের সাথে আত্তীকরণ করা যেতে পারে বলেই তুরাবী মনে করেন।

সাত

উমর আল বশীরের সাথে দীর্ঘ এক দশক ধরে তুরাবীর এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল কি তা একটু বিবেচনা করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে তুরাবীর ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বে তেমন কোনো জোরালো প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে মনে হয়। এর কারণ তুরাবীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সময় বিশ্বপরিস্থিতি মোটেই তার অনুকুলে ছিল না। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ একযোগে তুরাবীর সাথে শত্রুতা শুরু করে পাশাপাশি তারাই সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের খ্রিস্টানদের মুসলিম প্রধান উত্তরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। মুসলমান-খ্রিস্টান দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ সুদানের ঐক্য ও সংহতি একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়। এ ছাড়া সুদানের প্রধান বিরোধী দলগুলোও তুরাবীর ইসলামীকরণের ধারণায় কখনো ঐকমত্যে পৌছাতে পারেনি। উল্টো নানা ইস্যুতে তারা তুরাবীর বিরোধিতা করতে ছাড়েনি। এসব কারণে তুরাবীর বিকশিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিচার করা বেশ কঠিন এবং শেষমেষ কার্যত আমেরিকার চাপে প্রেসিডেন্ট উমর আল বশীর তুরাবীকে তার পদ থেকে ১৯৯৯ সালে সরিয়ে দেন। একালে ইসলামী নবচেতনাবাহীদের অন্যতম পুরোধা তুরাবীর নেতৃত্বে সুদানে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল তার জন্য এটা একটি বড় বিপর্যয় বটে। অনেকের মতে তুরাবীর সামরিক শাসকদের সাথে মিলেমিশে ইসলামীকরণের দিকে না যেয়ে জনগণের সমর্থনে গণতান্ত্রিকভাবে তার লক্ষ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তাহলে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন হতো না।

তারপরও বলতে হয় তুরাবী আজীবন একজন সৃষ্টিশীল ও মননশীল মানুষ। মুসলিম বিশ্বে তার সুগভীর মনীষা ও মননসমৃদ্ধ ধ্যান-ধারণার একটা বড় প্রভাব পড়েছে এবং তার লেখালেখি ও চিন্তাভাবনার অনুসারী একদল মানুষও তৈরি হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পথ চলায় এটা একটি ইতিবাচক সংযোজন বলে ধরে নেওয়া যায়।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. NewYork ; Oxford University Press, 2001.

২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৩. প্রাগুক্ত।
৪. Abdel Wahab El-Affendi, Turabi's Revolution : Islam and Power in Sudan. London : Grey Seal, 1991.
৫. প্রাগুক্ত।
৬. Hasan Turabi, "The Islamic State", in Voices of Resurgent Islam. ed, John L. Esposito. NewYork : Oxford University Press, 1983.
৭. Quoted in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam.
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. Hasan Turabi, Women in Islam and Muslim Society. London : Mile Stones, 1991.
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. In Arthur L. Lowrie, ed., Islam, Democracy, the State and the West : A Roundtable with Dr. Hasan Turabi. Tampa, FL : World and Islam Studies Enterprise, 1993.
১৬. Hasan Turabi, "Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam", American Journal of Islamic Social Sciences 4,1 (1987) :1.
১৭. Quoted in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam.
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আলী শরিয়তি

এক

১৯৭৯ সালে ইরানী জনতার অভ্যুত্থান ও আন্দোলনের মুখে সেখানকার বহু বছরের পুরনো কর্তৃত্ববাদী রেজা শাহ পাহলভীর রাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে। এই বৈপ্লবিক ঘটনার ভিতর দিয়ে যেমন একদিকে স্বৈরাচারী রেজা শাহ্ পাহলভীর অপসারণ সম্ভব হয় তেমনি সেখানকার মানুষ পাশ্চাত্য ঘেঁষা সরকার পদ্ধতি বাদ দিয়ে ইসলামকে ভিত্তি করে একালে এক ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়ে দেখে পাহলভী জামানার অইসলামীকৃত পরিচয় বদলে ফেলে ইরানের মানুষ ইসলামী পরিচয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে এবং এই পুনঃইসলামীকরণের পিছনে ইরানের শিয়া উলেমাদের এক সম্মোহনী নেতৃত্ব কাজ করেছে। এইসব উলেমারা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বিপ্লবের মাধ্যমে একটি পূর্ণ পরিণতির দিকে পৌছে দিয়েছিলেন। ইরানের শিয়া উলেমারা নানা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বরাবর এক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে স্বাধীনভাবে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে তাদের কাজ করতে দেখা গেছে। পাহলভী জামানার ইরানের পশ্চিমনির্ভরতা, এর সংস্কৃতি-অর্থনীতি নিয়ে পশ্চিমের ষড়যন্ত্র, সর্বোপরি ইরানী মুসলমানদের আত্মপরিচয় নিয়ে টানাটানির বিরুদ্ধে এই সব উলেমারা এক সর্বাত্মক লড়াই শুরু করেন। ইরানী সমাজের এই আরোপিত পশ্চিমীকরণকে আলী শরিয়তি বলেছিলেন ঘারবজাদেগী - পশ্চিমের সম্মোহন।

এই সম্মোহন থেকে ইরানী সমাজকে আত্মরক্ষার জন্য শিয়া উলেমারা জনগণের ইসলামী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে আশুরা, কারবালা ও ইমাম হুসাইনের শাহাদৎ যা ইরানী সমাজে যুগ যুগ ধরে জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতীক হয়ে আছে সেটিকেই তারা রেজা পাহলভীর রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের অবসানের লক্ষ্যে কাজে লাগান। ১৯৭৮ সালের মোহররম মাসে ইরানী উলেমারা রেজা শাহর স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অবসান ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। একই সাথে তারা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। পরবর্তী মোহররমে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ইমাম খোমেনী এটিকে বিপ্লবের মহীমায় অভিষিক্ত করেন। এটা সত্য ইরানী বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিকল্পনা , নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার প্রধান স্থপতি ছিলেন ইমাম খোমেনী এবং তারই পরিচালনায় ইরানী উলেমারা এই বিপ্লবের ভিত প্রস্তুত করেন। কিন্তু এর প্রেক্ষাপট একদিনে তৈরি হয়নি। ইরানী জনগণের অগ্রসর অংশের মানস পরিবর্তনে এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ঐকমত্য সৃষ্টিতে অনেক চিন্তানায়কের ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। ফরাসী বিপ্লবের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন ভলতেয়র, কাদীদ, রবসপিয়েরের মত চিন্তানায়কেরা। তেমনি ইরানী

www.pathagar.com

বিপ্লবের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেন ড. আলী শরিয়তি, আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারী, ড. মাহদি বাজারগান প্রমুখ। এরা আধুনিক চিন্তাভাবনার সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। এই নবচিন্তার সাথে ইসলামী বিশ্বাসের সমন্বয় করে তারা ইসলামের জন্য এক নতুন পরিভাষা তৈরি করেন এবং সেকুলার শিক্ষায় শিক্ষিতজনের কাছে ইসলামকে উপস্থাপন করেন।

ড. আলী শরিয়তি ঠিক প্রথাগত শিয়া বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। অনেক শিয়া আলেমের মত তিনি শিয়াবাদের কথা না বলে ইসলামের কথাই বলেছেন বেশি। বৈশ্বিক ইসলামের পটভূমিতে বিচার করলে বলতে হয় ড. আলী শরিয়তির সবচেয়ে বড় ভূমিকা হচ্ছে শিয়া ও সুন্নী উভয়কেই তিনি মুসলমান মনে করতেন, এদের মধ্যে কোনো মৌলিক তফাৎ আছে বলে তিনি স্বীকার করতেন না। ইসলামের সর্বজনীনতা নিয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং এর আন্তর্জাতিক চরিত্রে তার পূর্ণমাত্রায় আস্থা ছিল। এটা সত্য ইরানী সমাজের ভিতরে কাজ করতে গিয়ে এবং ইরানী জনমানসের উজ্জীবনের জন্য তিনি শিয়াবাদের কথা বলেছেন কিন্তু তার শিয়া ইসলামের ব্যাখ্যা প্রথাগত চিন্তার থেকে সুস্পষ্ট ভাবে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে। তিনি তার চিন্তাভাবনার পুনর্নির্মাণে শুধুমাত্র শিয়া উৎসকে ব্যবহার করেননি। অনেক সুন্নী চিন্তাভাবনাকেও অকৃপণভাবে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে তিনি কবি ইকবালের চিন্তাভাবনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিলেন যিনি বলেছিলেন ইসলামী ব্যবস্থার আজ সংস্কার জরুরি হয়ে উঠেছে। এটিকে মনে রেখেই আলী শরিয়তি ইকবালের ধারণাগুলোকে আরো বিকশিত করার চেষ্টা করেন এবং তার স্বল্পায়ু জীবনে দেশোপযোগীভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেও যান। তিনি জীবদ্দশায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, এমনকি কিংবদন্তীতে পরিণত হন। তিনি লেখালেখি করেছেন, ইসলামের উপর বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা দিয়েছেন। এসব বক্তৃতা শুনবার জন্য হাজার হাজার মানুষ বিশেষ করে তরুণরা জমায়েত হতো এবং তার বক্তৃতার লক্ষ লক্ষ কপি বিতরণ করা হতো।

আলী শরিয়তি শিয়া ইসলামকে উদারীকরণের চেষ্টা করেন এবং আধুনিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে একে ব্যাখ্যা করেন। ফ্রান্সের সোরবোর্নে পড়া এই বুদ্ধিজীবী এমিল ডারক্হিম, ম্যাক্স ওয়েবারের মতো সমাজতাত্ত্বিক এবং ফ্রানজ্ ফ্যানন, চে গুয়েভারার মতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠকদের চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি এদের চিন্তাভাবনাকে প্রয়োজনমত ব্যবহারও করেন। এইভাবে ইরানে শুধু প্রাচীনপন্থী উলেমাদের কাছ থেকেই নয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের কাছ থেকেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ধ্বনি শোনা যেতে থাকে।

দুই

আলী শরিয়তির পরিবারের আদি নিবাস ছিল ইরানের খোরাসান প্রদেশে এবং পরিবারটির ধর্মীয় ঐতিহ্য, সমাজসেবা ও এলাকার জনগণের নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সুনাম ছিল। আলী শরিয়তির পিতা মোহাম্মদ তকি শরিয়তি ছিলেন আধুনিক ও ধর্মীয় উভয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ এবং পেশায় একজন শিক্ষক। খোরাসানের গ্রাম মাজিনান থেকে তিনি মাশাদ শহরে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। শরিয়তির পিতা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি ইসলামকে নিছক অতীতের এক অন্তর্মুখী চেতনা ও একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস

www.pathagar.com

হিসেবে মনে না করে একালের উপযোগী পুরোপুরি সামাজিক ও দার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করতেন। ১৯৪০ এর দশকে তকি শরিয়তি মাশাদে কানুন-ই-পশর-এ-হাকায়েক-এ-ইসলামী (Centre for the Propagation of Islamic Truths) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটির উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্টদের নাস্তিকতার ধ্যান ধারণাকে ঠেকানো এবং এদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানদের নতুন করে ইসলামী বৃত্তে ফিরিয়ে আনা। ১৯৫০ এর দশকে যখন রেজা শাহ্ পাহলভীকে স্বল্পকালের জন্য হঠিয়ে ইরানে ড. মোসাদ্দেকের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এটি মাশাদের মোসাদ্দেকপন্থীদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং মোসাদ্দেককে নিয়ে মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এর সদস্যরা সোচ্চার হয়। পিতার প্রেরণায় তরুণ আলী শরিয়তি তখন এটির সাথে যুক্ত হন।

আলী শরিয়তির জন্ম মাশাদ শহরে ১৯৩৩ সালের ২৪ নভেম্বর। এই শহরেই তার শৈশব ও যৌবনের দিনগুলো কাটে এবং এখানেই তার লেখাপড়ার হাতে-খড়ি। ১৯৪১ সালে আলী ইবনে ইয়ামিন স্কুলে ভর্তি হন, যেখানে তার পিতা শিক্ষকতা করতেন। স্কুলে তিনি ছিলেন নীরব, একাকী, কিছুটা অসামাজিক কিন্তু জ্ঞানী পিতার সাথে দীর্ঘরাত জেগে পড়াশুনায় তার ক্লান্তি ছিল না। স্কুলের পড়াশুনার চেয়ে তার পাঠ্যবহির্ভূত বই পড়ায় আগ্রহ ছিল বেশি। প্রাথমিক স্কুলে থাকবার সময়ই আলী ফারসীতে অনূদিত লা মিজারেবল পড়ে শেষ করেন এবং এসময় ভিটামিন ও সিনেমার ইতিহাসের মতো বিষয়ও তার পড়ার তালিকাভুক্ত হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়বার সময় দর্শন ও সুফীবাদের সাথে তার পরিচয় ঘটে। এসময় তার পিতার প্রতিষ্ঠিত Centre for the Propagation of Islamic Truths এর আলোচনায় আলীর অনেক বন্ধু-বান্ধব অংশগ্রহণ করলেও তিনি তার জ্ঞানী পিতার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতেই থাকা বেশী পছন্দ করতেন। যদিও পরবর্তীকালে আলী স্বীকার করেছেন তার ব্যক্তিত্ব নির্মাণে এবং তার ভিতরকার স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও বিশ্বাসের ধারণা তৈরীতে তার পিতার প্রেরণাই ছিল মুখ্য। একই সাথে বাসায় বসে নিজের মতো করে পড়াশুনা তাকে আরো স্বনির্ভর ও ভয়ানক রকম আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। পরবর্তীতে এসময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটু গর্বের সাথেই উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

In each of my classes I was 100 lessons ahead of the rest of the class and 99 ahead of my teachers.[১]

তার পড়াশুনার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়সমূহের চেয়ে সাহিত্য ও দর্শনই ছিল প্রিয় বিশেষ করে ইরানী ঔপন্যাসিক সাদেকী হেদায়েত, ইরানী কবি নিমা ইউশিজ, আখবানে সালেস ও বেলজীয় লেখক মরিচ মেটারলিংক এসে জায়গা করে নেয়। মেটারলিংকের একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি শরিয়তিকে কিভাবে দর্শনের ব্যাপারে আগ্রহী করেছিল তাও তিনি বিশদভাবে বলেছেন। উদ্ধৃতিটি ছিল এরকম ঃ When we blow out a candle, where does its flame go?[২]

শরিয়তির বর্ণনা থেকে জানা যায়, তার তরুণ বয়সে এই সর্বভুক পড়াশুনা তাকে এক ভয়ংকর আত্মা, মনন ও ব্যক্তিত্বের সংকটে ফেলে দেয়। বিশেষ করে মেটারলিংক, শপেনহায়ার, কাফকা ও সাদেকী হেদায়েত পড়তে গিয়ে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। তার নিজেকে দার্শনিকভাবে মৃত মনে হয় যার পরিণতি হয় আত্মহত্যা অথবা

www.pathagar.com

উন্মাদ হয়ে যাওয়া। আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই পৃথিবীর অস্তিত্ব ভাবা তার জন্য অবান্তর মনে হয় এবং তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই রকম মানসিক অবস্থায় মাশাদের এক রোমাঞ্চকর শীতের রাত্রিতে তিনি যখন আত্মঘাতী হওয়ার কথা ভাবছেন তখন তিনি মওলানা রুমীর মসনভীর মধ্যে প্রশান্তি, আশ্বাস ও নিরাপত্তা খুঁজে পান। রুমীর মসনভী হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের সারাৎসার। সেই রাতে মসনভীর বাণী ও চিন্তা শরিয়তিকে আত্মহনন থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং রুমীর আধ্যাত্মিকতা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় ও নির্দেশিকা হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে শরিয়তি যখন মানবমুক্তির বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তখন তিনি আধ্যাত্মিকতার সাথে সমতা ও স্বাধীনতা, এই তিন বৈশিষ্ট্যকে মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৯৫০ সালে শরিয়তি হাইস্কুল ছেড়ে মাশাদ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই দু'বছর পর তিনি স্নাতক হন। আগেই বলেছি রুমীর প্রভাবে এসময় তার মনের অস্থিরতা, কুয়াশা, দার্শনিক দ্বিধা, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের জ্বালামুখ শান্ত হয়ে আসে এবং ইসলামকে তিনি নতুন করে জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর বিচারে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার মুক্তিমন্ত্র হিসেবে আবিষ্কার করেন। একই সাথে রসুল (সঃ) এর বিপ্লবী সাহাবী আবু জর গিফারীকে নতুন ইসলামী সমাজের জন্য মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেন। শরিয়তির ইসলামে ফিরে আসা ও নব আবিষ্কৃত প্রশান্তির নমুনা দেখতে পাওয়া যায় ১৯৫৩ থেকে ৫৬'র মধ্যকার সময়ে তার লেখা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই তারিখ-এ-তাকামল-এ-ফালসাফা (History of the Development of Philosophy) ও আবু জর গিফারী-তে। দু'টি বইতেই তিনি ইসলামকে সমকালীন অন্যান্য দার্শনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং ইসলামকে তার অন্তর্মুখীনতা ও অতীতমুখীনতা থেকে বের করে এনে সমকালীন সামাজিক সমস্যার সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে এর আধুনিকায়ন ও রাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া তিনি এখানে একজন প্রত্যয়ী মুসলমানের উদ্দেশ্য ও তার রাজনৈতিক-সামাজিক ভূমিকার কথা বলেছেন। এ দু'টো বইতে নেহজাদ-এ-খোদা-পারাস্তান-এ-সোশালিস্ট (Movement of God-Worshipping Socialists) কর্মীদের চিন্তাভাবনার প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে পড়েছে, যারা এক সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও ড. মোসাদ্দেককে সমর্থনের সূত্রে তার পিতার Centre for the Propagation of Islamic Truths এর সাথে যুক্ত হয়েছিল এবং সেই সাথে শরিয়তিও তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

শরিয়তি তার বই আবু জর গিফারীতে নিজের জন্য একটি 'হিরো', 'মডেল' এবং একই সাথে 'সিম্বল' তৈরি করেছেন যে কিনা দরিদ্র, মজলুম অথচ সচেতন মুসলমানদের 'প্রকৃত ইসলামকে' রক্ষা করতে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা এমনকি ধর্মীয় কর্তৃত্বকেও অস্বীকার করতে পারে। এ বইতে দেখানো হয়েছে এক ব্যক্তি কিভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের ক্ষমতাবান শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আসলে আবু জর হচ্ছে শরিয়তির প্রতীকী সৃষ্টি। এটা তাদের জন্যই লেখা হয়েছিল যারা নাকি পরবর্তীকালে তার কাছাকাছি এসেছিল এবং একই সাথে তার চিন্তাভাবনা দ্বারাও উজ্জীবিত হয়েছিল। এ বই হচ্ছে সেই সব প্রত্যয়ী, অপরাজেয় ও বিপ্লবী মুসলমানদের জন্য যারা সমতা, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও মুক্তির বাণী প্রচার করে থাকে।

www.pathagar.com

এ বইয়ের ঐতিহাসিকতা বিচার মুখ্য নয়। এর মধ্যে আমরা দেখি ভবিষ্যৎ শরিয়তির পূর্ণ সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিকে যেখানে তিনি এক অবিশ্বাসের যুগে বসে ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের কথা দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন এবং সমকালীন জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণে ছিলেন অকপট ও দ্বিধাহীন। মোটকথা শরিয়তির আবু জর আবিষ্কার তাকে আশ্বস্ত করেছিল সামাজিক সুবিচার, সমতা, মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের যে ধারণা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের সূত্র ধরে ইরানে পৌঁছেছিল তা আসলে ইসলামের নীতি ও ঐতিহ্যের অংশ। এই কারণেই শরিয়তি গর্বের সাথে দাবি করতে পেরেছিলেন ঃ

Abu Zar is the fore father of all post French Revolution egalitarian schools.[৩]

এটা সত্য তরুণ বয়সে শরিয়তির আবু জরকে নিয়ে এক ধরনের বীর পূজা থাকলেও পরিণত বয়সে তা অবিমিশ্র শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয় এবং তার প্রতি আন্তরিকতায় তার কখনোই ঘাটতি হয়নি। তিনি তার বইতে আবু জরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন ঃ

... the righteous and responsible Muslim who resisted all deviations from the egalitarian and fraternal Islam of the Prophet.[৪]

এক সময় শরিয়তি নিজেকে আবু জরের অনুসারী হিসেবে দাবী করেন এবং বলেন তার ব্যাখ্যাত ইসলাম, শিয়াবাদ, আদর্শ ও কর্মসূচী আসলে আবু জরের দৃষ্টান্ত থেকেই পাওয়া। শরিয়তি নিজের সম্পর্কে বলেছেন তার আজকের অবস্থানের সাথে আবু জরের সংগ্রাম ও অবস্থানের মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। এই কারণেই শরিয়তির ইন্তেকালের পর তার অনুরাগীরা তাকে একালের আবু জর হিসেবে সম্মানিত করে। এমনকি আবু জর সম্পর্কে রসুলের (সঃ) বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শরিয়তির অনুসারীরা তার সম্পর্কে বলে ঃ

He lives alone, he dies alone and he shall be resurrected alone - তিনি একাকী জীবন ধারণ করেছেন, একাকী ইন্তেকাল করেছেন এবং একাকী তার পুনরুত্থান ঘটবে।

তিন

পঞ্চাশের দশকে ইরানে রেজা শাহ পাহলভীবিরোধী আন্দোলন রীতিমত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল এবং এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সেখানকার জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতা ড. মোসাদ্দেক। মোসাদ্দেকের স্বল্পকালীন গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সরকার তখনকার মতো হয়ে উঠেছিল ইরানের স্বাধীনতাকামী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে। সকল জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীর মতো তরুণ শরিয়তিও সেদিন মোসাদ্দেকপন্থী মিছিল, সমাবেশ ও আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেন। এসময় মাশাদে শরিয়তিসহ ১৬ জন তরুণ বুদ্ধিজীবী যারা মোহাম্মদ তকি শরিয়তির ইসলামী কেন্দ্রটির সাথে যুক্ত ছিলেন, আস্তিক সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলনের (Movement of God Worshipping Socialists) সাথে যুক্ত হন। আস্তিক সমাজতন্ত্রীরা ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের এক ধরনের মিল মিশাল দেন এবং দাবি করেন ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে তৌহীদভিত্তিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামান্তর। তাদের পত্রিকা সরাসরি সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ উৎখাতের আহ্বান জানায় এবং

www.pathagar.com

হযরত রসুল (সঃ) ও ইমাম আলীকে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রকৃত পূর্বসূরী হিসেবে উল্লেখ করে। আস্তিক সমাজতন্ত্রীদের এই আন্দোলন পরবর্তীকালে মোসাদ্দেকপন্থী জাতীয় ফ্রন্টের সাথে মিলিতভাবে হিজবে ইরান - Iran Party গঠন করে। তারও পরে এটি নাম বদলে প্রথমে জমিয়ত আজাদী-এ-মরদম-এ-ইরান (League for the Freedom of the Iranian People) এবং মোসাদ্দেক সরকারের পতনের পর হিজব-এ-মরদম-এ-ইরান (Party of the Iranian People) নাম নেয়। এসব আন্দোলনের সাথে আলী শরিয়তি কোনো না কোনভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে ড. মোসাদ্দেকের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটলে ইরানের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক বড় রকমের ধাক্কা খায় এবং মোসাদ্দেকের স্বল্পায়ু সংসদীয় গণতন্ত্রের এই পরিণতিতে জনপ্রিয় আন্দোলনের কর্মীরা হতাশায় ভুগতে থাকে। ইরানী সমাজের এই ধরনের পরিস্থিতিতে আলী শরিয়তি দ্বিতীয়বারের মতো ব্যক্তিত্বের সংকটে পড়েন এবং ১৯৫৬ থেকে ৫৮ সালের মধ্যে তিনি বারবার আত্মমূল্যায়ন করেন ও সমাধানের পথ খুঁজতে থাকেন। মোসাদ্দেকের পতনে তিনি এতখানি মর্মাহত হন যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে তার বিশ্বাস দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন তিনি স্বাধীনতার প্রতি গভীর অনুরাগ ও মোসাদ্দেককে এর প্রতীক হিসেবে খাড়া করেন পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটি দুর্বল রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবেও তিনি মূল্যায়ন করেন।

মোসাদ্দেকের পতনের পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকাতো ছিলই, এর সাথে যুক্ত হয়েছিল একশ্রেণীর সুবিধাভোগী দেশীয় সামরিক ও রাজতান্ত্রিক এলিট গোষ্ঠী ও সুযোগ সন্ধানী একদল দরবারী আলেম। এই ত্রয়ী শক্তিকে আলী শরিয়তি তার অসাধারণ মনন ও শ্লেষের মিশ্রণে জনপ্রিয় একটি ফারসী বাকরীতি নির্মাণ করে চিহ্নিত করেন। এটি হলো জার-ও-জুর-ও-তাজবীর যার অর্থ সম্পদ, জুলুম ও প্রতারণা। শরিয়তি সম্পদকে পুঁজিবাদের সাথে, সাম্রাজ্যবাদকে জুলুমের সাথে এবং সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকে প্রতারণার সাথে তুলনা করেছেন।

১৯৫৩'র অভ্যুত্থানের পর শরিয়তি মোসাদ্দেকপন্থী National Resistance Movement এর সাথে যুক্ত হন। এইসব দিনের কথা স্মরণ করে শরিয়তি পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন সেসময় তিনি স্বৈরাচারী পাহলভী সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও সমাবেশ সংগঠনের চেষ্টা করতেন এবং বই ও প্রচারপত্র প্রকাশ করতেন। এসব কারণে তিনি তখন স্বল্প মেয়াদে জেলও খাটেন। রাজনৈতিক কর্মসূচীর পাশাপাশি ১৯৫৪ সালে শরিয়তি ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়ে পাসও করেন। এ সময় তিনি খোরাসান পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন এবং এখান থেকেই তার কবি ও সাহিত্য প্রতিভার সত্যিকারের বিকাশ ঘটে। ১৯৫৪ সালে মাশাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিভাগে শরিয়তি ভর্তি হন। নিজের শিক্ষকতার চাকরির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমেও তিনি অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেন। সাহিত্যের প্রতি তার সহজাত অনুরাগ ও ভালবাসা, পাঠ্য বিষয়ের উপর তার অধিকার ও জ্ঞান তাকে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলে। মাশাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলেও তার একটি পরিচিতি গড়ে ওঠে। শুধু কবি হিসেবে নয় এসময় প্রথাবিরোধী, প্রগতিশীল ও ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যাতা হিসেবেও তার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৫৭ সালে পাহলভী

www.pathagar.com

সরকার National Resistance Movement এর নেতা কর্মীদের ধরপাকড় শুরু করে। আলী শরিয়তি ও তার পিতা তকি শরিয়তিসহ National Resistance Movement এর ১৪ জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে গ্রেফতার করে তেহরান নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে কারাবন্দী করা হয়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এরা মোসাদ্দেকপন্থী। এক মাস পর আলী শরিয়তিকে মুক্তি দেয়া হয়। কারামুক্তির পর মাশাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়তি ফারসী সাহিত্যে বিএ ডিগ্রি নেন। পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের কারণে বিদেশে পড়বার জন্য তাকে বৃত্তি দেয়া হয়। ১৯৫৯ সালে শরিয়তি প্যারিসে গমন করেন।

চার

প্যারিস কি শরিয়তিকে কাছে টেনেছিল অথবা শরিয়তি প্যারিসকে ভালবেসেছিলেন তা বলা শক্ত ব্যাপার । শরিয়তি যদি নিছক প্যারিসে লেখাপড়া করতেই আসতেন তবে তার এখানে পাঁচ বছরের অবস্থান নিছক বৈচিত্র্যহীন একটা ঘটনা হয়ে থাকতো। কিন্তু শরিয়তির প্যারিস জীবন কেটেছে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অন্যদিকে বিপ্লব ও মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখে। প্যারিসের সাথে তৈরি হয় তার এক দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক। শরিয়তি যখন প্যারিসে যান তখন তিনি ছিলেন ইরানের প্রাদেশিক স্তরের একজন তরুণ ভাবুক। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় পুঁজিবাদী অবক্ষয় ও নৈতিক বিচ্যুতির ছড়াছড়ি বিশেষ করে রাস্তার মেয়ে, ক্যাবারে, ক্যাসিনো তাকে হতচকিত করে দেয়। শরিয়তির মনে হয় এই সভ্যতার কাছে সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও যে কেউ ধরা দিক এটি তাকে গিলে হজম করে ফেলে এবং তার আধ্যাত্মিকতা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এক দুর্জ্ঞেয় বস্তুসভ্যতার পূজারী বানিয়ে দেয়। অন্যদিকে প্যারিসের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি, এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আলোকিত চেহারা তাকে সম্মোহিত করে। পরবর্তীকালে শরিয়তি স্বীকার করেছেন প্যারিসের শিক্ষকরা তাকে হাত ধরে জ্ঞানের রাজ্যের সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে আসে যেখানে তিনি মানবীয় উৎকর্ষতার এক উজ্জ্বল চেহারা দেখতে পান, যা ছাড়া তার মনে হয় তিনি অসম্পূর্ণ ও অপরিণত রয়ে যেতেন।

প্যারিসে বসে শরিয়তির মনে হয় পশ্চিমী আধুনিকতা, বস্তুগত সমৃদ্ধি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রভৃতির ধারণা এখানে আগত তৃতীয় দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের হতবুদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের বিশ্বাসকে পশ্চিমী বুর্জোয়া চিন্তাভাবনার আলোকে নতুন করে নির্মাণ করে। তারা যখন দেশে ফিরে যায় তখন তারা পশ্চিমী মডেলের উপর ভিত্তি করে তাদের স্বদেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়। শরিয়তির দৃষ্টিতে এইসব বুদ্ধিজীবীরা ঃ

... such intellectuals became the Trojan horse of colonialism and imperialism, further cementing the dependence and under development of third-world countries.[৫]

শরিয়তি পশ্চিমী সভ্যতার আলোকিত বা বিকৃত করার উভয় সামর্থ্যকে বিশ্লেষণ করেন। একই সাথে তিনি পশ্চিমের অভিঘাতে তৃতীয় দুনিয়ায় দুই দল বুদ্ধিজীবীর উত্থানকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। প্রথম দল নিজেদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি পশ্চিমী মূল্যবোধ ও আদর্শকে আপন করে নিয়েছেন। এই সব পশ্চিমীকৃত বুদ্ধিজীবীরা, শরিয়তির নিজের বুদ্ধিজীবীতার সংজ্ঞায় যারা পড়েন না তারা

www.pathagar.com

অহর্নিশ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনধারাকে 'অপ্রয়োজনীয়' ও 'অপর্যাপ্ত' হিসেবে বিবেচনা করেন এবং আধুনিকতা ও সভ্যতার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় দল শরিয়তি যাদেরকে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী বলেছেন তারা নবী রসুলদের ওহীর যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের ঐতিহ্যকে এই অবিশ্বাস ও যুক্তির যুগে বহন করে চলেছেন। আলী শরিয়তি মনে করেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হচ্ছে সেই যার থাকবে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনগণের চেতনা কেন্দ্রে টোকা দেয়ার ক্ষমতা। এই কাজ করতে হলে তার দরকার হবে নিজ সমাজ ও বিশ্বাস সম্পর্কে গভীর জানাশোনা। সেই হিসেবে বলা যায় আলী শরিয়তি ছিলেন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মডেল।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে ইসলাম মানে হচ্ছে কুসংস্কার, অচলতা, জীবন বিমুখতা ও প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা মৌলভীদের ধর্মের রক্ষক হিসেবে দাপাদাপি। এটির চরিত্র হলো প্রগতি ও পরিবর্তন বিরুদ্ধ। বুদ্ধিজীবী হিসেবে শরিয়তির ভূমিকা হচ্ছে ইসলামকে তিনি গতিশীল ও কর্মোদ্দীপক ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার কথা হলো ইসলামের প্রকৃত বাণী ও নীতিসমূহ আসলে মুক্তি, স্বাধীনতা, সমতা ও আধ্যাত্মিকতার ধারণা নিয়েই কাজ করে এবং এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ইসলামের আগমন। নিজের ব্যাখ্যাত ইসলাম চিন্তা থেকে শরিয়তি প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর ব্যাখ্যাত ইসলামকে পৃথকভাবে দেখেছেন, যারা নাকি ইসলামকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে অনেক সময় ব্যবহার করেছে। আলী শরিয়তি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন, এমনকি মুসলিম দেশগুলোর আধুনিকায়নের নামে তিনি অন্ধ পশ্চিমীকরণের বিপক্ষেও ছিলেন কিন্তু তার এই পশ্চিম বিরোধিতার মুড কখনো সাম্প্রদায়িকতার সীমা স্পর্শ করেনি। তিনি তার পশ্চিমী শিক্ষকদের ঋণ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন এবং তাদের কাছ থেকেই তিনি তাদের সমাজের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করেছেন। শরিয়তির পশ্চিমী শিক্ষা শিয়াবাদের উপর অশিয়াদের বৌদ্ধিক ও মননশীল লেখালেখি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে তার চোখ খুলে দেয়। শেষ পর্যন্ত তার শিয়াবাদ প্রথাগত শিয়া চিন্তাভাবনা থেকে ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। নিছক শিয়া আত্মপরিচয়ের বদলে তিনি বর্তমানের আর্থ-সামাজিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে আগ্রহী ছিলেন বেশি। সংস্কারক হিসেবে তিনি সেইসব ইসলামবাদীদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন যারা নাকি ইসলামের একটি সমতাবাদী, মানবিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও অপরাজেয় ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে। শিয়াবাদী বুদ্ধিজীবী ও আইনজ্ঞ ছাড়াও শরিয়তি নিজ প্রয়োজনে উদারভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছেন। যার ফলে সমালোচকরা তাকে সুন্নী বা ওহাবী হয়ে গিয়েছে এমন অভিযোগও করেছে। এমনকি তিনি ফরাসী ক্যাথলিক ইসলামবাদী লুই ম্যাসিগনন, ইহুদী বুদ্ধিজীবী ম্যাক্সিম রডিনসন, খ্রিস্টান চিকিৎসক ও লেখক সুলায়মান কাতানী ও জর্জ জুরডাকের লেখালেখির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এদের আগ্রহ, সচেতনতা ও উদারতার মূল্যচেতনা থেকে প্রথাগত শিয়া উলেমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

•

শরিয়তি তার ফরাসী শিক্ষক লুই ম্যাসিগননকে নিয়ে 'My Idol' বলে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। প্যারিসে অবস্থানকালে ১৯৬০-৬২'র মধ্যে তিনি এই শিক্ষকের অধীনে গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। ঐ নিবন্ধে তিনি ম্যাসিগননকে একজন

www.pathagar.com

সত্যিকারের মননশীল প্রতিভা, পূর্ণ মনুষ্যত্বসম্পন্ন ও প্রেমময় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শরিয়তি তার আত্মকথায় জানিয়েছেন ম্যাসিগননের স্পর্শে তার অন্তর্জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়।

প্যারিসে আসবার পর শরিয়তি রুমীর মসনভী পড়ে এই কামনা করেছিলেন তিনি যেন পশ্চিমী সমাজের ভয়াবহ বস্তুবাদিতা ও দুর্জ্ঞেয়তা থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন। ম্যাসিগননকে আবিষ্কার করে শরিয়তি সেই পশ্চিমী বিকল্প খুঁজে পান। রুমী যেমন করে তার প্রথম যৌবনে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা এনে দিয়েছিলেন তেমনি করে ম্যাসিগনন পরিণত যৌবনে তাকে আশ্বস্ত করেন। তার সম্পর্কে শরিয়তি লিখেছেন ঃ He taught me the art of seeing'।[৬] প্যারিসে বসে শরিয়তি ম্যাসিগননকৃত বই 'সালমান ফারসীর' ইরানী ভাষায় তরজমা শুরু করেন।

প্যারিসে ম্যাসিগননের পরে শরিয়তি সবচেয়ে উদ্বুদ্ধ হন রাশিয়ায় জন্ম ইহুদী পন্ডিত জর্জ গুরভিচের সাহচর্যে যিনি আমৃত্যু ফ্যাসিস্ট ও স্ট্যালিনবাদী স্বৈরাচারের সাথে লড়াই করেছেন এবং আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন। সমাজবিজ্ঞানে গুরভিচ ছিলেন শরিয়তির গুরু এবং এই গুরুর মধ্যে তিনি পশ্চিমের আবু জরকে আবিষ্কার করেছিলেন। পিতার কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছিলেন গুরভিচ যেভাবে মানুষের উপর সবরকমের অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন তাই আসলে শিয়াবাদের মূল চেতনা যার থেকে আজকালকার প্রথাগত আলেমরা সরে এসেছেন।

শরিয়তি প্যারিসে অবস্থানকালে যেমন নিত্য নতুন চিন্তাভাবনার মুখোমুখি হয়েছেন তেমনি বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, কবি ও শিল্পীদের বক্তৃতা শুনেছেন, তাদের বই পড়েছেন। কখনো তাদের সাথে ভাব বিনিময় করেছেন এবং সেখানকার শিল্পী ও স্থপতিদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই সময় আলজেরিয়ার মুসলমানরা ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে এক জীবন-মরণ জেহাদে লিপ্ত ছিল। আলজেরিয়ার মুসলিম জনতার উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই লড়াই থেকে শরিয়তি নিজেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারেননি। তিনি নিজেকে এর সাথে শরিক হিসেবেই পুরো ঘটনাপ্রবাহকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। এই উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের একটি সশস্ত্র চরিত্র ছিল অবশ্যই কিন্তু এ লড়াই বিশ্বের বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন ভাবুকদের সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত চরিত্র নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে ফ্রানজ ফ্যাননের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ফ্যানন আলজেরিয়ার উপনিবেশবিরোধী বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন এবং বহু লেখালেখি করেছিলেন। ফ্যাননকে ইউরোপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জাঁ পল সাত্রে। ফ্যাননের সাথে শরিয়তির যোগাযোগ হয়েছিল বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে তারা মতবিনিময় করেছিলেন যা ফ্যাননের একটি আগ্রহের বিষয় ছিল। শরিয়তি ফ্যাননের A Dying Colonialism ও Wretched of the Earth বই দু'টো ফারসীতে তরজমা করেছিলেন। বিশেষ করে শেষোক্ত বইটিতে আলজেরিয় বিপ্লবের যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে তাকে তিনি সাম্রাজ্যবাদনির্ভর পাহলভী সরকারের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

ফ্যানন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে তৃতীয় বিশ্বের সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর জোর দিয়েছেন এবং ইউরোপীয় উন্নয়নের মডেলের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের 'নতুন

www.pathagar.com

মানুষ', 'নতুন তত্ত্ব' ও 'নতুন ইতিহাস' নির্মাণের কথা বলেছেন। শরিয়তি এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি করে ইরানী জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এসময় শরিয়তির লেখালেখিতে ফ্যাননের বাকরীতির প্রভাব দেখা যায় ঃ

Come friends, let us abandon Europe; let us cease this nauseating, apish imitation of Europe. Let us leave behind this Europe that always speaks of humanity, but destroys human beings whenever it finds them.[৭]

শরিয়তি ফ্রানজ ফ্যাননের মতো আফ্রিকার বিপ্লবী চিন্তাবিদ উমর উজগানকেও ইরানীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তার বই আফজাল আল জিহাদ ফারসীতে তরজমা করেন। তখনকার মতো তার মনে হয়েছিল আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে জনপ্রিয় ইসলামী আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের ধরন ইরানী মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে সহায়ক হবে।

ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি ও সংস্পর্শ শরিয়তির চিন্তাভাবনাকে উন্মুক্ত করেছিল অবশ্যই কিন্তু তাকে বশীভূত করতে পারেনি। বরং এটি তার ধারণা ও চিন্তাগুলোর মৌলিকত্ব ও নতুনত্ব বিকাশে সহায়তা করেছে। কখনো কখনো তিনি ইউরোপীয় চিন্তাকে নিজের ছাঁচে গড়েও নিয়েছেন।

প্যারিসে শরিয়তি সমাজ বিজ্ঞানী জাক বারকির ক্লাস করেছেন এবং ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বুঝবার চেষ্টা করেছেন। সাত্রের কাছ থেকে তিনি মানবীয় স্বাধীনতা ও সবধরনের জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের দায়কে বুঝেছেন। জা ককতু তাকে দেখিয়েছেন মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের দিকটি। নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আলেক্স ক্যারেল তাকে দেখান কিভাবে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একসাথে কাজ করতে পারে।

শরিয়তির প্যারিস জীবন শুধুমাত্র পড়াশোনা, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও চিন্তাবিদদের সাহচর্যেই কাটেনি। তিনি রীতিমত সেখানকার মোসাদ্দেকপন্থীদের সাথে কাজ করেছেন এবং আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছেন। ইউরোপের মোসাদ্দেকপন্থীদের পত্র পত্রিকায়ও তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। আলজেরিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একবার পাহলভী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করবার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে ইরানের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে শরিয়তি সে পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন। ১৯৬৩ সালে তেহরানের রাস্তায় পাহলভীবিরোধী দাঙ্গায় ইরানী উলমারা নেতৃত্ব দেন এবং সেবারই ইমাম খোমেনী ইরানী জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের প্রধান নেতৃত্ব অর্জন করেন। শরিয়তি প্যারিসে বসে সে ঘটনা সামনে রেখে একটি উদ্দীপক প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল 'জাতীয় নেতা মোসাদ্দেক, ধর্মীয় নেতা খোমেনী'। ঐ বছরই সোরবোর্নে শরিয়তি তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ পেশ করেন ও তা গৃহীত হয়। তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল বলখের প্রতিভা (The Merits of Balkh)। সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ডিগ্রির কারণে ব্যক্তিগতভাবে শরিয়তির চাকরি বাকরির জন্য সুবিধা হয় সত্য কিন্তু তার প্যারিসের কর্মমুখর জীবন, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, লেখালেখি, স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ইরানী জনগণের

www.pathagar.com

জাগরণ ও মুক্তির পিছনে বড় ভূমিকা রেখেছে সন্দেহ নেই।

পাঁচ

পাঁচ বছর পর ১৯৬৪ সালে শরিয়তির দেশে ফেরার মুহূর্তে তার জন্য অপেক্ষা করছিল চরম উৎকণ্ঠা ও পাহলভী সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের লোকজনদের চাপিয়ে দেয়া লাঞ্ছনা। কোথায় ইরান তার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রত্যাবর্তনে তার যোগ্য সম্মান দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে, উল্টো ইরান সীমান্তে পৌঁছানোর সাথে সাথে স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। দীর্ঘদিন তার পিতার সাথে তাকে দেখা করতে দেয়া হয়নি। এমনকি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার উচ্চতর ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও তাকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকতা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আজীবন মাতৃভূমি তার জন্য কারাগার সদৃশ হয়ে উঠেছিল, কারণ নির্জনতা, ঘাত-প্রতিঘাত আর নানা রকমের জুলুম তার উপর নেমে এসেছিল। একই সাথে এই প্রক্রিয়া, শরিয়তিকে করে তুলেছিল দুর্ভেদ্য এবং তার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। বেশ কয়েক বছর পর তাকে মাশাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। নতুন পরিবেশে তরুণ প্রজন্মকে হাতে ধরে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়ে শরিয়তি কাজে নেমে পড়েন। তার ক্লাস করবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে নজিরবিহীন উৎসাহ সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার ক্লাস ছিল রীতিমত একটি ঘটনা। ইতোমধ্যে ক্যাম্পাসে ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুকে চয়ন করে তিনি তার যুক্তি পেশ করতেন। শরিয়তির পশ্চিমী শিক্ষার স্টাইল ও ভাষা তাকে একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষকে পরিণত করে এবং প্রতিদিনের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলোকে ইসলামের সাথে যুক্ত করে তিনি ইসলামী নীতির আলোকে এর সমাধান বাৎলে দিতেন। শরিয়তির শিক্ষাপ্রণালীর ধরন ও অন্তর্গত বিষয়বস্তু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাধারার মধ্যে রীতিমত বৈপ্লবিক ও নতুন মূল্যবোধ সম্পন্ন। তার শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের মধ্যে নতুন চিন্তার উদ্রেক করতে সাহায্য করতো এবং তার বিষয়বস্তুর অপ্রতিরোধ্য শক্তি ছাত্রদের নিত্য নতুনভাবে উজ্জীবিত করতো।

এই সময় শরিয়তি তার লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন এবং তিনি সম্ভাবনাময় তরুণ ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। শরিয়তি ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কার্যকারিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, বিপ্লবের বাহক হিসেবে বুদ্ধিজীবী ও জনতার সাথে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। শরিয়তি বলতে চান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যারা ইরানের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন চান তাদের উচিত হবে এখানকার মানুষের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে জানা এবং সেই ভাষায় কথা বলা। সমাজ পরিবর্তনের জন্য তারাই যেহেতু সচেতন অংশ, সুতরাং জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান তারা করতে পারবেন না যতক্ষণ না তারা তাদের জনগণের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষার মাধ্যমে তাদের সাথে যোগ স্থাপন করতে পারছেন। শরিয়তি জোর দিয়ে বলেছেন জনগণের এই ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষার মূল প্রোথিত আছে ইসলামের মধ্যে। শরিয়তি আরো বলেছেন ইরানের প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্য গৌরবের বিষয় কিন্তু তা আজ মৃত ও জনগণকে উজ্জীবিত করতে অসমর্থ্য। শরিয়তি তাই যুক্তি দেন ইরানের আত্মপরিচয় হবে পুরোপুরি ইসলামী। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের জনগণকে উজ্জীবিত করবার প্রয়োজনে ইসলামের ভাষা, প্রতীক, উপমা ও

www.pathagar.com

আদর্শকে তাই পুরোপুরি বোঝা ও ব্যবহার করা চাই। অবশ্য শরিয়তি ইসলামী আদর্শের সংস্কার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন যাতে একে আখেরাত উপযোগী নিশ্চল ও অন্তর্মুখী এক মতবাদের পরিবর্তে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম একটি বিপ্লবী ও বিদ্রোহী ধর্মে রূপ দেয়া যায়। শরিয়তি আজকের যুগে ইসলামের এই বিপ্লবী রূপান্তরকে বলেছেন রেঁনেসা।

আলী শরিয়তি এ সময় তার দুটো বিখ্যাত বই প্রকাশ করেন। একটি হচ্ছে কভীর-মরুভূমি, অন্যটি এসলাম শেনাসী - ইসলামী আদর্শ। কভীর হচ্ছে শরিয়তির এক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ কাহিনী যেখানে এক সুফী তার মনের ভিতরে চলা অনন্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ঠেলে ঠেলে এক গূঢ় রহস্যের জগত, যাকে তাসাউফের পরিভাষায় বলে মারিফাত, তার সন্ধানে ছুটে চলেছে। কভীরে মূলতঃ শরিয়তির গভীর বিশ্বাসের কথাই ফুটে উঠেছে, যেন তিনিই ছিলেন ইরানের বিশ শতকের মসীয়াহ। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের যুগে তার দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শোষিত মানুষের মুক্তি অর্জনই ছিল তার লক্ষ্য। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার নিজের ব্যক্তিগত ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি দুর্বলতাকে শক্তিতে, নৈরাশ্যকে আশাবাদে, সমাধানহীনতাকে সমাধানযোগ্য করে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তার অস্ত্র ছিল তার নিজের মত করে তৈরি করে নেয়া এক সুফীবাদী প্রশান্তি। কভীরের মধ্যে তার উদ্বেগ, একাকিত্ব, শূন্যতা, অস্থিরতা, বিমূঢ়তা এবং অনিশ্চয়তার ছায়া দেখা গেলেও শেষে আমরা খুঁজে পাই আশার আলো। কভীর হচ্ছে শরিয়তির আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক, সকল বিপত্তি উপেক্ষা করে যা তার বিপ্লবী লক্ষ্য ও কর্মসূচীর সফলতার ঘোষণা। শরিয়তি পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন যদি তাকে দুটো বই পছন্দ করতে বলা হয় তাহলে তিনি নিজের জন্য কভীরকে ও জনগণের জন্য এসলামশেনাসীকে নির্বাচিত করবেন। এসলামশেনাসী হচ্ছে মাশাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া ইসলাম সম্পর্কিত বিচিত্র বিষয়ের উপর শরিয়তির বক্তৃতাসমূহের একটি সংগ্রহ। সত্যিকার অর্থে এর মধ্যে তার চিন্তাভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে, যা তিনি পরবর্তীকালে প্রয়োজনানুসারে সম্প্রসারিত করেছিলেন। এসলামশেনাসীতে শরিয়তি যেমন একদিকে পশ্চিমীকৃত বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করেছেন তেমনি স্বার্থপর, সুযোগ সন্ধানী দরবারী আলেমদেরও তিনি ছাড় দেননি। পশ্চিমীকৃত বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন এরা দেশের বাস্তবতা ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে স্বাধীন চিন্তা করতে অক্ষম। পশ্চিমের চোখ দিয়ে চিন্তা, বিচার ও লেখালেখিতে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে তিনি দরবারী আলেমদের সামনে রেখে বলেছেন তার এ বই সত্যিকার ইসলামের রূপ উন্মোচন করবে যার থেকে বর্তমানের আলেমদের ব্যাখ্যাত ইসলামকে তিনি পৃথক করেছেন। শরিয়তি এখানে প্রকৃত ইসলামের ১৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যা তিনি ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক উৎস যেমন কুরআন, হাদিস, চার খলিফা, শিয়া ইমাম প্রভৃতি থেকে চয়ন করেছেন। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে শিয়া অশিয়া নির্বিশেষে সকল উৎসের ব্যবহার তার মুক্তচিন্তার প্রমাণ যা প্রথাগত ইরানী উলেমাদের বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এসলাম শেনাসীতে প্রথমতঃ শরিয়তি সত্যিকারের ইসলামের এক আধুনিক, সমতাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেহারা তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এখানে তিনি সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সবশেষে তিনি বলতে চেয়েছেন মুসলমানরা কেবল তৌহিদের নীতি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধাগুলো অপসারণ করতে পারে।
আলী শরিয়তি তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসলাম শেনাসীতে তার চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছেন। তার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার প্রতিবন্ধক হিসেবে যে অভিযোগ আনা হয় তার জওয়াব দেয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন ইসলাম ও আধুনিকতা কোন পরস্পরবিরোধী প্রত্যয় নয়। উল্টো আধুনিকতা ইসলামেরই মৌল চিন্তাভাবনার অংশ এবং তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যুক্তি ও ধর্ম একই সাথে বসবাস করতে পারে।
শরিয়তি ডারউইনীয় বিবর্তন চিন্তা প্রসঙ্গে বলেছেন কুরআনের নিজস্ব ধারার বিবর্তন চিন্তা আছে। কুরআনের বিবর্তন চিন্তা দিয়ে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে ব্যাখ্যা ও কখনো কখনো প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়।
রাজনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে বলা যায় ইসলামী নীতি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। কেননা শুরা, ইজমা, ইজতিহাদ, চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এগুলো পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতেই ইসলামে বিকাশ লাভ করেছে।
ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন এটি সমতা, শোষণ মুক্তি, শ্রেণী বিভাজন প্রতিরোধ ও জনভোগ্যতার ক্ষেত্রে সমানাধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী।
সকল মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে কুরআনের এই নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শরিয়তি বলেছেন এর থেকে ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে। নারী-পুরুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শরিয়তি বলেছেন ইসলাম ঠিক পশ্চিমী ধারণার লৈঙ্গিক সমতায় বিশ্বাস করেনা, ইসলাম নারী ও পুরুষকে তার প্রাকৃতিক অবস্থান (Natural Position) ও অধিকারের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে চায়। ইসলামী দর্শন প্রসঙ্গে শরিয়তি যুক্তি দেন মানুষ একই সাথে মুক্ত আবার পরাধীন। সে একই সাথে আত্মনিয়ন্ত্রণ কর্তা ও নিয়তির শিকল দ্বারা আবদ্ধ। হেগেলীয় সমাজ বিকাশের ধারণাকে উল্টিয়ে শরিয়তি বলেন মানুষের ইতিহাস হচ্ছে ঃ .. .. .. the progression of history towards the awakening of God in man.[৮]
একই সাথে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নয়-প্রতিনয়-সমন্বয়ের (Thesis-Antithesis-Synthesis) ধারণা দিয়ে তিনি ইতিহাসের ধারাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং সমাজ প্রগতি ও ইতিহাসের গতিমানতার পিছনে মানুষকেই নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।
শরিয়তি ইসলামের যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় আদর্শবাদ যেমন আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ওহীর ধারণার সাথে উদারনৈতিক চিন্তা যেমন যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার একটা সমন্বয় করার চেষ্টা আছে। শরিয়তির এই উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার পিছনে তার প্রথম জীবনে আস্তিক সমাজতন্ত্রীদের সাহচর্যের একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যা একদিকে পশ্চিমীকৃত বস্তুবাদী অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক উলেমা উভয়কেই ক্ষুব্ধ করে।
এসলাম শেনাসীতে শরিয়তির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল যারা খোদায়ী শাসন ও মানুষের উৎকর্ষতার প্রতিবন্ধক তাদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। মূলত এখানে তিনি রাজতন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক উলেমাদের দিকেই আঙ্গুল তুলেছেন। তিনি মনে করেন পৌত্তলিকতা মানে শুধু আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়, এর আধুনিক প্রকাশ হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি বা

www.pathagar.com

শক্তির কাজকর্ম যা কিনা আল্লাহকে কার্যক্ষেত্রে অপসারণ করে এবং তার একচ্ছত্র অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। শরিয়তি এই ধরনের পৌত্তলিকতাকে বলেছেন সামাজিক শিরক যার উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ব্যক্তিপূজা, চরিত্রপূজা এবং সেইসব মানবীয় সম্পর্ক যেখানে এক মানুষ আরেক মানুষের চূড়ান্ত বাধ্যগত, তার আদেশ নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। শরিয়তি লিখেছেন ঃ Anyone who .. .. .. imposes his will on the people and rules according to his own whim, has made a claim to being God and whoever accepts such a claim is a polythiest, since absolutist rule, will, power, dominance and ownership is only in God's monopoly.[৯]

শরিয়তি মনে করেন এই ধরনের সামাজিক শিরক যেমন রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, অভিজাততন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান তেমনি ধর্মীয় চরিত্র নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উলমাদের মধ্যেও একইভাবে অবস্থান করছে।

এসলাম শেনাসীতে শরিয়তি তার তৃতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন সত্যিকারের মুসলমানদের এই ধরনের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। শরিয়তি মনে করেন সকল প্রকারের অবৈধ কর্তৃত্ব যা নাকি সবরকমের বিকৃতি, অপরাধ ও দুষ্টচক্রের হোতা তাকে মোকাবিলা করতে হবে। তৌহীদের নীতিতে আস্থাবান হয়েই কেবল এই ধরনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। শরিয়তি তৌহীদের নীতিতে নির্ভরশীল মানুষকে বলেছেন মুবাহিদ যার চরিত্রের বর্ণনা তিনি এমনিভাবে দিয়েছেন ঃ .. .. .. independent, fearless, selfless, dependable and wantless individual, who bowed to no other authority than to God.[১০]

শরিয়তি বর্ণিত এই মুবাহিদ যারা নাকি ইসলামী বিপ্লবের তুর্যবাদক হিসেবে আবির্ভূত হবে তারাই পারবে একালের পৌত্তলিক শক্তি স্বৈরতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও দরবারী আলেমদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। শরিয়তির মূল্যায়ন হলো শোষক শ্রেণী সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এরা হয় নিপীড়ক শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে অথবা নিজেরাই নিপীড়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শরিয়তি তাই ইসলামকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে শোষক শ্রেণীর হাতে বন্দী অচল ও জীর্ণ ইসলাম যাকে তিনি বলেছেন Institutionalized Islam এবং যাকে তিনি সবসময় ঘৃণা করেছেন ; আর একটি হচ্ছে বিদ্রোহী ও সত্যিকারের ইসলাম যার কাজ হচ্ছে অনবরত জুলুম ও অপচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। শরিয়তি ছিলেন এই দ্বিতীয় দলেরই প্রবক্তা।

ছয়

মাশাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়তির অধ্যাপনা, ব্যাপক জনপ্রিয়তা বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে তার বিপ্লবী বাণীর প্রভাব কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তোলে । বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়তির ক্লাসকে তারা আর সহ্য করতে রাজি হয়নি এবং অকালে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে অবসর দিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসর প্রাপ্তির পর শরিয়তির জন্য আরো বিপুল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং তিনি ১৯৭১ সালে তেহরানে চলে আসেন। এখানকার বিখ্যাত হুসাইনিয়া এরশাদ মাদরাসাকে কেন্দ্র করে তিনি তার উদ্দীপক বক্তৃতা, ক্লাস ও

www.pathagar.com

লেখালেখি পুনরায় শুরু করেন যা তরুণদের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৭১ থেকে ইরানের রাজনৈতিক ঘটনাবলী অস্থির হয়ে ওঠে যা হুসাইনিয়া এরশাদে শরিয়তির ভূমিকাকে আরো বিপ্লবী করে তোলে। রেজা পাহলভীর স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ধুমায়িত হতে থাকে এবং বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র গেরিলারা সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এসব সশস্ত্র গেরিলারা কেউ কেউ মার্কসবাদী কায়দায় বিপ্লব করতে চেয়েছিল, কেউ কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিল। এসব গেরিলা নেতৃত্বের অনেকেই শরিয়তির পরিচিত ছিল। যদিও তিনি নিজে ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিপ্লবের জন্য তখনকার মত প্রস্তুত হয়নি বলে এই ধরনের সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তিনি নিজের মত করে এক ধরনের ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরপরেও দেখা যায় তিনি রেজা পাহলভীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন থাকতে পারেননি।

১৯৭১ সালে রেজা পাহলভী পারসিপোলিসে সম্রাট সাইরাসের সমাধির পাশে জাঁকজমকের সাথে ইরানী রাজতন্ত্রের ২৫০০ তম বার্ষিকী উদযাপন করেন এবং শাহ ইরানকে বিশ্বের মহান সভ্যতার দুয়ারে পৌছে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শরিয়তি হুসাইনিয়া এরশাদে বসে বক্তৃতা দেন পাঁচ হাজার বছরের শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার, শ্রেণী বিভাজনের বিরুদ্ধে। শরিয়তি প্রকাশ্যে শাহ'র মহান সভ্যতা তৈরি প্রসঙ্গে বলেন এই লোকটি জনগণকে শোষণ ও কিছু তেজস্বী বক্তৃতা দেয়া ছাড়া এদেশের জন্য আর কিছু করেনি। একই বক্তৃতায় শরিয়তি ইরানের মানুষের জন্য হযরত আলীর মত একজন ত্রাণকর্তার দরকার বলে তার বলিষ্ঠ মতামত দেন যে কিনা জনগণকে মুক্ত করে পুনর্বার সত্যিকার ইসলামী নীতির মাধ্যমে ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর শরিয়তি হুসাইনিয়া এরশাদে তার বিখ্যাত 'একজন প্রকৃত শিয়ার দায়িত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি শিয়াবাদকে আলাভী ও সাফাভী শিয়া এই দুই ভাগে ভাগ করেন। তার মতে সাফাভী শিয়া হচ্ছে কর্তৃত্বকামী জুলুমবাজ ব্যক্তিদের হাতে ব্যবহৃত শিয়াবাদ যা কিনা নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার প্রতীক। অন্যদিকে তিনি প্রকৃত শিয়া বলতে আলাভী শিয়া বা হযরত আলীর অনুসারীদের উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে বিপ্লবী বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তার মতে আলাভী শিয়ারা জীবনের বিনিময়ে হলেও অবিচার ও জুলুমের মোকাবিলা করে, ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও নির্ভীক শাসককে প্রতিষ্ঠা করে এবং সবধরনের জুলুম, শোষণ, স্বৈরাচার, অবিচার, শ্রেণী শোষণ, অজ্ঞতা, মূর্খামী ও ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে একজন প্রকৃত শিয়ার দায়িত্ব স্পষ্ট। শরিয়তি তাই নির্দ্বিধায় আহ্বান জানান বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার শীর্ষে শাহর অবস্থান তাকে পুরোপুরি উৎখাত করার। শরিয়তি তার শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন ইমাম হুসাইনের অসীম ত্যাগ ও শাহাদাতের কথা পাশাপাশি ইয়াজিদের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জুলুমের কথা। এই বক্তৃতায় শরিয়তি তার বিখ্যাত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্লোগান উচ্চারণ করেন ঃ

.. .. .. every month of the year is moharram, every day of the month is ashura and every piece of land is Karbala.[১১]

www.pathagar.com

শিয়া কালচারের সাথে যাদের পরিচয় আছে তাদের কাছে শরিয়তির এই উপমা ও বাণী অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন সময় উপস্থিত হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের এখন প্রয়োজন শাহ ও তার নিপীড়ক ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করা। তিনি ইরানকে ন্যায়-অন্যায়, পবিত্র-কলুষ, ভাল-মন্দের ঐতিহাসিক সংগ্রামের রণভূমি হিসেবে উল্লেখ করেন। ইরানের শিয়া ইতিহাসের স্মৃতি জাগিয়ে তিনি মোহররম, আশুরা ও কারবালার প্রতীক ব্যবহার করেন এবং ইরানীদের আবেগকে উজ্জীবিত করে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য ডাক দেন। আট বছর পর ইরানী বিপ্লবের মুহূর্তে শরিয়তির এই শ্লোগান সেখানকার লাখো জনতার মুখে উচ্চারিত হয়।

শরিয়তির এই সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বানের কয়েক সপ্তাহ পর কর্তৃপক্ষ হুসাইনিয়া এরশাদকে বন্ধ করে দেয় এবং তার বিপ্লবী কণ্ঠকে রোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শরিয়তির বিপ্লবী বক্তব্যের শক্তিকে ঠিকমত ওজন করতে পারেনি। কারণ শরিয়তির বক্তব্য আসলে ইসলামের বৈপ্লবিক বাণীর নির্যাস, যাকে নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের পক্ষে এত সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই শরিয়তির বিপ্লবী সাহিত্যের প্রভাবকে স্তব্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে কারারুদ্ধ ও অনুতাপ করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শাহর নিরাপত্তা কর্মীরা বুঝতে পারেনি একজন বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা যায় কিন্তু অনুতাপে বাধ্য করানো সম্ভব নয়।

অবস্থা আঁচ করে শরিয়তি গা ঢাকা দিয়েছিলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার বৃদ্ধ পিতা ও শ্যালককে জিম্মি করে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। শরিয়তিকে ১৯৭৩ সালে কুখ্যাত কোমিথ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অশেষ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয়। তিনি দুই বছর কারাবাস করেন। ১৯৭৫ সালে তার বিশেষ ব্যক্তিগত বন্ধু আলজেরিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল আজিজ বুতেফেলেকা, প্যারিসে থাকাকালে শরিয়তি যার সাথে আলজেরীয় মুক্তি সংগ্রামীদের পক্ষে কাজ করেছিলেন, তার মুক্তির জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে ইরান সরকার তাকে মুক্তি দিলেও কড়া নজরদারির মধ্যে রাখে।

সাত

এ সময়ের মধ্যে শরিয়তির সমস্ত বইপত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং কারো কাছে সেগুলো পাওয়া গেলে তারও গ্রেফতারের সম্ভাবনা থাকতো। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয় তার বই পত্রের উপর আইনী নিষেধাজ্ঞা তার পাঠকপ্রিয়তা ভয়ানক রকম বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে তার কারাবাস তার ভক্তদের কাছে তার খ্যাতিকে বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিতে উত্তীর্ণ করে।

শরিয়তির কারামুক্তির পর তার দিন কাটে কিছুটা নির্জনতায়, কিছুটা পুরনো ঘটনার রোমন্থনে এবং কিছুটা লেখাপড়া করে। ১৯৭৭ সালের ১০ জানুয়ারি ইরানের দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক নেতা ইমাম খামেনেই, আয়াতুল্লাহ মোতাহ্হারী, ফখরুদ্দীন হেজাজীসহ কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে একটি আকর্ষণীয় আলোচনায় বসেন তিনি। এখানে তিনি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে কথা বলেন। তিনি যুক্তি দেন বর্তমানের ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের ধারাকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বি দুটি পক্ষের আক্রমণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে রক্ষা করতে হবে। তিনি মনে করেন ইসলাম অন্যান্য

www.pathagar.com

আদর্শের জন্যও একটা বড় রকমের হুমকি কেন না এর রয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, স্বৈরাচারবিরোধী, পুঁজিবাদবিরোধী মূল্য চেতনা। শরিয়তির মতে ইসলামের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক সমন্বয় সাধক নয় বরং বিরোধিতা পূর্ণ। সেক্ষেত্রে মার্কসবাদের সাথে ইসলামের মতপার্থক্য একেবারে অবিরোধী নয়। শরিয়তি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ হচ্ছে ইসলামের সরাসরি শত্রু, মার্কসবাদীরা প্রতিদ্বন্দ্বী।

এমত পরিস্থিতিতে শরিয়তি ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী মেনিফেস্টো প্রণয়নের উপর জোর দেন এবং পুনঃনির্মিত একটি ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। উল্লেখ্য, শরিয়তি তার বাকি জীবন এ লক্ষ্য পূরণে কাজ করে গেছেন।

শরিয়তির এসময়কার লেখালেখি মূলতঃ তিনটি বিষয় নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন দুনিয়ার ইতিহাসের যতরকম আন্দোলন, আদর্শবাদ, দর্শন, ধর্ম ও বিপ্লব হয়েছে তা এই তিনটি প্রত্যয়কে অনুসরণ করে হয়েছে। শরিয়তির এই ত্রিতত্ত্ব হচ্ছে ঃ (১) প্রেম ও আধ্যাত্ম (২) স্বাধীনতা ও (৩) সামাজিক ন্যায়।

আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন এটি হচ্ছে মানুষের প্রাকৃতিক সত্তার সাথে মিশে আছে। এটি মানুষকে তার পার্থিব কলুষতার বাইরে এক স্বর্গীয় পরিশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

কারামুক্তির পর তিনি স্বাধীনতাকে নানাভাবে স্তব করেছেন। এমনকি কবির মত করে লিখেছেন ঃ Freedom, blessed freedom।[১২] অবশ্য স্বাধীনতা বলতে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই বুঝিয়েছেন এবং স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের হাত থেকে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন এর সীমা সরহদ থাকা দরকার। তিনি মনে করেন স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য থাকা চাই যথার্থ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক সচেতনতা ও পরিপক্বতা। এই ধরনের স্বাধীনতার জন্য শরিয়তি মনে করেন একজন বিপ্লবী রাজনীতিকের দরকার যিনি কিনা সমাজের অজ্ঞানতা ও অবিচারকে দূর করার জন্য জনগণের এক বৈপ্লবিক পরিশুদ্ধি ও শিক্ষার কর্মসূচী হাতে নিতে পারবেন। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে শরিয়তি বলেছেন আংশিক স্বাধীনতা। অন্যদিকে ইসলামী নীতি-নির্ধারিত স্বাধীনতাকে তিনি মনে করেন এটি মানুষের সকল রকমের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে।

শরিয়তির শেষ দিককার লেখালেখিতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের আভাস দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা চাই কারণ এটি শুধু অবিচার, শোষণ ও অসমতামূলক নয়, এটি একই সাথে অনৈতিক ও সবরকমের খোদায়ী মূল্যবোধের বিকৃতি সাধনকারী। শরিয়তির দৃষ্টিতে একমাত্র আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্র, সমতা ও ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই কারণেই শরিয়তির ব্যাখ্যাত ইসলামে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি তার ব্যাখ্যাত ইসলামী সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছেন এই কারণে যে এটি ঃ

.. .. .. founded on a socialist economic system governed by ethical and spiritual values firmly based on the Islamic belief in God.[১৩]

www.pathagar.com

আট

১৯৭৭ সালের মে মাসে আলী শরিয়তি শাহের নিরাপত্তা বাহিনী সাভাকের চোখ ফাঁকি দিয়ে ইরান ত্যাগ করেন এবং লন্ডনে পৌঁছান। শরিয়তির দীর্ঘ অনুপস্থিতি সাভাককে সন্দেহপরায়ণ করে তোলে এবং বিদেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে অনুরোধ করে শরিয়তি অবৈধভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। সুতরাং তাকে খুঁজে যেন নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। পরবর্তী মাসে তার দুমেয়ে সুসান ও সারা লন্ডনে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে নিয়ে লন্ডনের সাউদাম্পটনের একটি ভাড়া বাসায় ওঠেন। পরবর্তী দিন ১৯ জুলাই খুব সকালে সেই বাসার মেঝেতে শরিয়তির মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র ৪৪ বছরে এই বুদ্ধিজীবীর রহস্যময় মৃত্যুতে ইরানী জনগণ শাহের সাভাককেই প্রথম সন্দেহ করে এবং সাভাকই যে এ মৃত্যু ঘটিয়েছে তা ইরানীরা বলতে থাকে। কারণ এর মাধ্যমে শাহর সরকার তার এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বুদ্ধিজীবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

শাহের অনুচররা শরিয়তিকে হত্যা করেছে কিন্তু তার বিপ্লবী মতাদর্শ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। তার মৃত্যুর মাত্র দুবছরের মধ্যে ইরানী জনগণের জাগ্রত অভ্যুত্থানের মুখে সাম্রাজ্যবাদের এই শিখন্ডীর দুঃশাসনের পতন ঘটে এবং ইরানী জনগণ শরিয়তির দেখানো বিপ্লব ও রক্তের মধ্য দিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

একথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না ইরানী বিপ্লবের ঘটনাবহুল মুহূর্তগুলোতে শরিয়তির প্রভাব ও ছবি অনেক বড়ই মনে হয়েছে বিশেষ করে তার জনপ্রিয় শ্লোগানগুলো ইরানী জনগণের মনের গভীরে যেয়ে টোকা দিয়েছে। তার বিখ্যাত শিয়াবাদের ইসলামী ধারণা অবশ্যই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিশেষ করে তরুণদেরকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রাণিত করেছে। তার সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো তিনি ইসলামকে এক বৈপ্লবিক মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বিশেষ করে অন্যান্য বিপ্লবী আদর্শের সাথে ইসলামও যে বড় ভূমিকা রাখতে পারে এটা তিনি ধর্মহীন অন্যান্য সামাজিক গ্রুপগুলোকে বুঝিয়েছেন। বিপ্লবোত্তর ইরানের সকল উলামারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন শরিয়তি ছিলেন ইরানী বিপ্লবের অগ্রপথিক যিনি একটি জনগোষ্ঠীর মানস পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। ইরানী বিপ্লবের রাজনৈতিক শিল্পী যদি হন ইমাম খোমেনী, তাহলে আলী শরিয়তি হচ্ছেন এর বুদ্ধিবাদী শিল্পী।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. "Ali Rahnema, Ali Shariati : Teacher, Preacher, Rebel", in Pioneers of Islamic Revival. London : Zed Books Ltd., 1994.
২. প্রাগুক্ত।
৩. Shariati, Collected Works.
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. Quoted in Karen Armstrong, The Battle for God. New York : The Random House Publishing Group, 2001.

www.pathagar.com

৮. "Ali Rahnema, Ali Shariati : Teacher, Preacher, Rebel", in Pioneers of Islamic Revival.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. Quoted in Karen Armstrong, The Battle for God.
১২. "Ali Rahnema, Ali Shariati : Teacher, Preacher, Rebel", in Pioneers of Islamic Revival.
১৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মরিয়ম জামিলা

এক

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমের ঔপনিবেশিক জ্ঞান কাঠামোর শৃঙ্খল ভেঙ্গে বাইরে আসার জন্য যে পুনর্জীবনবাদী ইসলাম চিন্তার বিকাশ ঘটেছে সেখানে আমরা মূলতঃ পুরুষেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মওলানা জামালউদ্দীন আফগানী থেকে শুরু করে তার শিষ্যদের সূচিত সালাফিয়া আন্দোলন ঘুরে আজকের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পুনর্জীবনবাদী কর্মীদের নানারকম লেখালেখি, কাজকর্ম একই লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও সেখানে মেয়েদের উপস্থিতি এত প্রবল নয়। মরিয়ম জামিলা হচ্ছেন এক্ষেত্রে বড় রকমের ব্যতিক্রম যিনি ইসলামী পুনর্জীবনবাদীদের লিঙ্গ বৈষম্য ও পুরুষ প্রাধান্য অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন। কয়েক দশক ধরে মরিয়ম ইসলামের পক্ষে নিরন্তর লিখেছেন। তার লেখালেখি, বইপত্র পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তরজমা হয়েছে। মরিয়মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি পশ্চিমী সভ্যতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করেও এর আগ্রাসী, অমানবিক ও আধ্যাত্মহীন চরিত্রের কারণে একে গ্রহণ করতে পারেননি এবং সেই কারণেই তিনি ইসলামের মধ্যে এসে আশ্রয় খুঁজেছেন। ইসলাম কবুল করেই তিনি তার দায়িত্ব শেষ করেননি, তিনি ইসলামের উপরে আপতিত আক্রমণকে বুদ্ধিবৃত্তিক কায়দায় মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। ঔপনিবেশিকতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা একসময় ইসলামের নৈতিক ভিত্তিকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমন চালায়। মরিয়ম জামিলা সেই সব অসূয়াপরায়ন প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছেন পাশাপাশি পশ্চিমী চিন্তাভাবনায় প্রাণিত মুসলিম আধুনিকতাবাদীরা যারা ইসলাম নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন তাদেরকেও তিনি ছাড় দেননি। অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের লাল মুখো সাহেবদের গড়ে তোলা প্রাচ্যবিদ্যার গভীর বিশ্লেষণ করে তিনি এর বর্ণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিরোধী বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি খুলে ফেলেছেন। প্রাচ্যবিদ্যার এই সাম্রাজ্যবাদী মনস্তত্ত্ব নিয়ে আজকাল অনেকেই ভাবনা চিন্তা করছেন। এদিক দিয়ে মরিয়ম জামিলাকে এডওয়ার্ড সাঈদের পূর্বসূরী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দুই

মরিয়ম জামিলার জন্ম এক মার্কিন ইহুদী পরিবারে, তার পিতৃপদত্ত নাম ছিল মারগারেট মারকাস। তিনি ১৯৩৪ সালের ২৩ মে নিউইয়র্কের রশেলে (Rochelle) জন্মগ্রহণ করেন। মরিয়মের প্রপিতামহ উনিশ শতকে জার্মানী থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিজরত করেন। তিনি নিজে নিউইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টারে বড় হন। তার পিতামাতা ধর্মপালনে খুব বেশি মনোযোগী ছিলেন না (Non observant Jews)। পরে তারা ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মের ইউনিটারিয়ান চার্চ- (Unitarian church) এর সাথে যুক্ত হন।
ছোটবেলায় মারগারেটকে সবাই পেগি বলে ডাকতো। তার জীবনীকার লিখেছেন পেগি

www.pathagar.com

বরাবর মেধাবী ও উজ্জ্বল ছাত্রী হিসেবে বিবেচিত হলেও তার সামাজিকতা খুব কম ছিল। সব স্থানে, সব পরিবেশে খোলামেলাভাবে তিনি মিশতে পারতেন না।[১] স্কুল জীবন থেকেই তিনি 'প্রাচ্যকে' নিয়ে খুব আকর্ষণ বোধ করতেন। কখনো কখনো পশ্চিমের সংস্কৃতি ও জীবনধারা তার কাছে বেমানান মনে হতো। তার ছবি আঁকা, ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠ এবং সংগীত উপভোগ অনেকক্ষেত্রেই পশ্চিমী না হয়ে হতো বৈশ্বিক। চীন, জাপান, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক কিছু নিয়েই তিনি আগ্রহ দেখাতেন। ইহুদী পটভূমি থেকে উঠে আসার পরও তিনি তাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে খুব আগ্রহ বোধ করতেন না। খুব ছোট বয়সে তার অপেরা ও পশ্চিমের ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি আগ্রহ তাকে পরবর্তীকালে আরবী সংগীত এবং আরব ও মুসলমানদের ইতিহাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন এবং আরব ও মুসলমানদের অমর্যাদা করতে অভ্যস্ত এমন একটা সমাজে বড় হয়ে ওঠা মারগারেট কখনো জায়নিজম নিয়ে আশ্বস্থ হননি। উল্লেখ্য, আরব ও ফিলিস্তিনীদের দুর্দশায় তিনি মর্মাহত হয়েছেন। মাত্র বার বছর বয়সে তিনি আহমদ খলিল নামের ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু ছেলেকে নায়ক বানিয়ে এক উপন্যাস লেখেন যেখানে অসহায় ফিলিস্তিনীদের প্রতি তার সহানুভূতি স্পষ্ট। এই বয়সে যখন তিনি হেবরনে ইসরাইলীদের সাথে আরবদের শত্রুতার কথা তার স্বধর্মীদের কাছে শুনতে পেতেন তখন তিনি তাদের দার ইয়াসিনে আরবদের উপর ইসরাইলী নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করে এর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই বার বছর বয়সের কথা তিনি এভাবে লিখেছেন ঃ

But the trouble is, most of the books I read in the public library about the Arabs and Islam are written by Zionists and Christian missionaries are prejudiced against them in the same way.[২]

১৯৫৩ সালে মারগারেট নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বলা চলে এই সময় থেকে তার আত্মপরিচয় ও সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবল হয়ে ওঠে। তার আত্মপরিচয়ের সংকট এমন গভীর হয়ে দেখা দেয় যে তিনি একসময় পড়াশুনার পাশাপাশি নিজের ইহুদী পরিচয় নিয়ে বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন এবং একধরনের গোড়া ইহুদীবাদে (Orthodox Judaism) দীক্ষিত হন। কিছুদিন একটি ইহুদীবাদী তরুণ সংগঠনে তিনি যুক্ত থাকারও চেষ্টা করেন, পরে তার কাছে মনে হয় ঃ What had I in common with them? Nothing! Absolutely nothing.[৩]

এরপর মারগারেট কিছুদিন বাহাই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন, কিন্তু বাহাই নেতাদের জায়নিজমের প্রতি দুর্বলতায় তিনি বিরক্ত হয়ে তাদেরকে বলতে বাধ্য হন ঃ You are among those renegades who hate your own people more than the goyim (gentiles)[৪] এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বাহাইদেরও পরিত্যাগ করেন।

জায়নিজমের প্রতি বিরাগবশতঃ তিনি তার ইহুদী পরিচয় পরিত্যাগ করতেও একসময় প্রস্তুত হন। বোনের কাছে লেখা এক চিঠিতে তার এ সময়ের মনের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে ঃ

No people I have ever encountered are more intolerable, bigoted and narrow minded than the disagreeable jews I have had the misfortune to meet and that is why I find it impossible to identify myself as one of them.[৫]

www.pathagar.com

তার আত্মপরিচয়ের সংকট এত গভীর হয়ে ওঠে যে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এ ছিল তার জীবনের এক কঠিন সময়। সেই দিনের কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

Although I had just entered my nineteenth year, it seemed to me as if my life had already come to an end. I was discouraged, exhausted, depressed, and in despair at having met with nothing but one rebuff after another whenever I tried to find my place in society. I was simply adrift at sea, not knowing what to do next or where to go? Neither reformed Judaism, Orthodox Judaism, Ethical Culture or Bahai consoled me in my plight.[৬]

এই সংকটের দিনগুলোতে মারগারেট ইসলাম নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেন। তিনি গভীরভাবে ইসলামের ইতিহাস ও কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করেন। এই সময় দুজন ইহুদী বুদ্ধিজীবী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মারগারেটকে ইসলাম অভিমুখী করে তোলেন। একজন হলেন বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান মোহাম্মদ আসাদ যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন। আর একজন ছিলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাব্বি অধ্যাপক আব্রাহাম কাটশ। মারগারেট আসাদের Road to Mecca পড়ে অভিভূত হন এবং তার ইসলাম আবিষ্কারের এই কাহিনী মারগারেটের জন্য বিপুল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। অধ্যাপক আব্রাহাম কাটশ ছিলেন ইসলাম বিদ্বেষী। তিনি ক্লাসরুমে বোঝাতে চেষ্টা করতেন কুরআন ও ইসলামের আত্মবিকাশের মূলে আছে ইহুদী প্রভাব। কিন্তু মারগারেট কাটশের ক্লাসে প্রভাবিত না হয়ে বিপরীতটাই বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখছেন ঃ

Although Professor Katsh has tried to prove to his students why Judaism is superior to Islam, paradoxically, he has converted me to the opposite position.[৭]

মারগারেট ততদিনে ইহুদী পরিচয় ত্যাগ করেছেন এবং এভাবে তিনি তার কথার সমাপ্তি টানেন ঃ And here I am still a Jew – or atleast everybody considers me as such – but I am no longer a Jew in my heart.[৮]

কিন্তু মারগারেটের মুসলিম হওয়ার বাসনা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পূরণ হয়নি। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসার পর তিনি নিউইয়র্কের বিভিন্ন ইসলামী মিশন ও সংস্থার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তার পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদীর সাথে তার যোগাযোগ হয়। তার ইসলাম কবুলের সিদ্ধান্ত এবং মওলানা মওদুদীর সাথে তার যোগাযোগ তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা তার ভবিষ্যৎ নির্মাণে এবং ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে সবিশেষ ভূমিকা রাখে। মারগারেট ১৯৬১ সালের ২৪ মে ইসলাম কবুল করেন এবং মরিয়ম জামিলা নাম গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য তিনি এই নামেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। মরিয়ম তার ইসলাম কুবলের ঘটনাকে ইহুদী ধর্মকে প্রত্যাখ্যান হিসেবে দেখেননি, তিনি বরং ইসলাম গ্রহণকে হযরত ইব্রাহীমের বাণী ও ধর্মের পূর্ণত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। একালে ইহুদী ধর্ম তার মতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার বিষে কলুষিত হয়ে গেছে, তাই তিনি ইসলামের অধিকতর বিপ্লবী ও বৈশ্বিক বাণীতে প্রাণিত হয়েছেন ঃ

www.pathagar.com

I did not embrace Islam out of any hatred for my ancestral her it age or my people. It was not a desire so much to reject as to fulfil. To me, it meant a transition from a moribund and parochial to a dynamic and revolutionary faith content with nothing less than universal supremacy.[৯]

এর পরের বছর তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তাকে আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও একাকী করে ফেলে। ফলে তিনি আমেরিকা ত্যাগের এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে আমেরিকার সমাজে তার আত্মস্থ হতে অসুবিধা হওয়া বিশেষ করে সেখানে তার একটা চাকরি পাওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে পিতার চাকরিতে অবসর তার অর্থনৈতিক দুঃশ্চিন্তাও বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯৬২ সালে মওলানা মওদুদীর আমন্ত্রণে পাকিস্তানে চলে আসেন। তিনি লিখেছেন ঃ

I did not have the courage to break my ties with my past life but now that my situation here has become intolerable and I have found that I will never be able to function in this society ; I am now convinced that my only salvation is to go and live in a Muslim country.[১০]

মরিয়মের এরকম সিদ্ধান্ত নিতে তার নিউইয়র্কের মুসলমান বন্ধুরা বিশেষ করে মওলানা মওদুদী ও ইউরোপ প্রবাসী বুদ্ধিজীবী ড. সাঈদ রামাদান সাহায্য করেন। মরিয়ম তার পাকিস্তান চলে আসাকে আল্লাহর পথে হিজরত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই বিশ্বাসের কথা মূলতঃ কোরআনে উদ্ধৃত হয়েছে যা তিনি তার স্মৃতিকথার প্রথম দিকে উল্লেখ করেছেন ঃ যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল। করুণাময় (৪ঃ১০০)।

মরিয়ম পাকিস্তানে এসে প্রথমদিকে মওলানা মওদুদীর পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরে ১৯৬৩ সালে মূলতঃ মওলানা মওদুদীর উদ্যোগে জামায়াতে ইসলামীর একনিষ্ঠ কর্মী ইউসুফ খানের সাথে মরিয়মের বিয়ে হয়। মরিয়ম ইউসুফ খানের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আসেন এবং তার চারটি সন্তান হয়। এমনিভাবে প্রাচ্যের একটি একান্নবর্তী পরিবারে তার নতুন জীবন শুরু হয়। এই পরিবেশে থেকেই তিনি দুহাতে লেখা শুরু করেন এবং অচিরেই ইসলামের একজন ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যাতা (Traditionalist) হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন।

তিন

আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতা যে মুসলিম সমাজকে বড় রকমের ভাঙচুর ও টানাপড়েনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের অনেক মুসলিম চিন্তাবিদই সহমত পোষণ করেছেন কিন্তু এর থেকে মুসলিম সমাজকে বের করে আনার কৌশলের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যত ভিন্নতা। মরিয়ম জামিলার লেখাপত্র অনেকখানি মুসলিম সমাজের উপর পশ্চিমী আধিপত্যের প্রভাব ও কুফলের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে, বিশেষ করে নতুন পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও পুনর্জীবনের ভাবনাও তার

www.pathagar.com

লেখালেখিতে স্পষ্ট। বলা চলে পশ্চিমী সভ্যতা নিয়ে তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যে কোন ধরনের সংস্কার চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। মরিয়ম হচ্ছেন মনেপ্রাণে ঐতিহ্যবাদী। তিনি তাদের বিরোধিতা করেছেন যারা নাকি তার 'ধ্রুপদী' ইসলাম ভাবনার থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছে। তিনি মনে করতেন অতীতকে সমালোচনা কিংবা কাটাকুটি করা অথবা বদলে ফেলার তেমন দরকার নেই। এটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করা চাই। কারণ পুরো ইসলামী ঐতিহ্য হচ্ছে একটা বস্ত্রখন্ডের মতো যা আদৌ পরিবর্তনযোগ্য নয়। তার নিজের কথা উদ্ধার করছি ঃ

I agree with Maulana Maudoodi that is imperative to accept the whole of Islam, not only the Quran, Hadith and Sunna but the four Imams and their traditional interpreters, the heritage of Tasawwaf (Sufism, mysticism), along with all the arts and sciences developed under Islamic civilization, the entire aesthetic and cultural heritage of that culture, and Islamic history down to 1924 when Ataturk abolished the khilafat and made his country a throughly secular state.[১১]

একদিক দিয়ে বলা যায় মরিয়মের এই সব চিন্তাভাবনার সাথে আঠার-উনিশ শতকের মুসলিম সমাজে আবির্ভূত পিউরিটান আন্দোলনের প্রবক্তাদের যথেষ্ট মিল আছে। এ আন্দোলনের প্রবক্তারা নবযুগের আলোকে ইসলামী নীতির পুনঃব্যাখ্যাকে পছন্দ করেননি কিংবা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কার করতেও চাননি। তারা বরং কখনো কখনো বিশুদ্ধ অতীতে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন এবং রসুল ও তার পুর্ণ সাহাবীদের যুগকে অনুকরণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

মোহাম্মদ ইবনে আবদ আল ওহাবের সূচিত সংস্কার আন্দোলন যা পরবর্তীকালে ওহাবী আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে মরিয়ম তার কতকক্ষেত্রে প্রশংসা করেছেন কিন্তু সুফীবাদের প্রতি ওহাবীদের অনীহাকে এবং তাসাউফের চর্চা একালে মুসলিম সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ওহাবীদের প্রচারিত এই ধারণার সাথে তিনি একমত হতে পারেননি। অন্যদিকে মোহাম্মদ আসাদের মত মুসলিম আধুনিকতাবাদী যার ইসলাম কবুলের কাহিনী পড়ে মরিয়ম মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজেও ইসলামের প্রতি ঝুঁকেছিলেন সেই আসাদের মধ্যযুগের ফকীহদের কৃত ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের পরিবর্তন করে ইসলামের মৌলিক নীতিকে নির্ভর করে যুগোপযোগিতার ভিত্তিতে ফিকাহ প্রণয়নের আহ্বানকে তিনি সমর্থন করেননি। মোটের উপর মরিয়ম মুসলিম আধুনিতাবাদীদের পক্ষালম্বন করেননি বিশেষ করে তাদের মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা ও জড়তার কারন নির্ণয়, তকলীদকে বর্জন করে ইজতিহাদের আলোকে মুসলিম সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা এবং উলামাদের অনড় অবস্থানের সমালোচনাকে তিনি একরকম অগ্রাহ্য করেছেন। সেকুলার ও মুসলিম আধুনিকতাবাদী উভয়েই মরিয়মের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন এবং এদেরকে তিনি West worshipping- পাশ্চাত্য পূজার জন্য [১২] অভিযুক্ত করেছেন। সেকুলারবাদীদের তিনি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার জন্য এবং মুসলিম আধুনিকতাবাদীদের ইসলামকে পশ্চিমের মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা করার জন্য সমালোচনা করেছেন। মরিয়মের বিখ্যাত বই Islam and Modernism হচ্ছে মূলতঃ মুসলিম আধুনিকতাবাদীদের লেখালেখি ও চিন্তাভাবনার একটা সমালোচনামূলক গ্রন্থ। এখানে

www.pathagar.com

তিনি আধুনিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিচ্যুতির অভিযোগ করেছেন এবং তাদেরকে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের মিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

Our indigenous modernists who want to force Islam into the rigid mold of modern secularism and materialism are in alliance with the Christian missions and foreign imperialisms. Indeed they are the most effective agents for accomplishing their work.[১৩]

এক্ষেত্রে মরিয়মের ক্ষোভ অনেকখানি গিয়ে পড়েছে জাস্টিস আমীর আলী এবং মুফতী আবদুহুর উপর। আমীর আলীর বহুল পঠিত বই The Spirit of Islam কে তিনি সমালোচনার সূত্রে বলেছেন The Spirit of Unbelief । এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়কে তিনি ইসলামের বিকৃত উপস্থাপনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং উলামাদের এ বইকে ধর্মচ্যুত হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মুফতী আবদুহুকে বলা হয়ে থাকে মুসলিম আধুনিকতাবাদের জনক। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন জামালউদ্দীন আফগানীর শিষ্য। পরে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং মিসরের মুফতী হিসেবেও কাজ করেন। তিনি প্রথম মুসলিম দুনিয়ায় আধুনিকতাকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে মতামত দেন এবং তকলীদ বাদ দিয়ে ইজতিহাদের আলোকে মুসলিম সমাজকে সংস্কারের উপর জোর দেন। মরিয়ম যিনি ইসলামের ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট মনে করতেন তিনি আবদুহুকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মরিয়ম অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুসলিম আধুনিকতাবাদী উভয়কে একই পাল্লায় বিবেচনা করেছেন। এরা সবাই তার কাছে ঃ

.. .. .. pioneers of westernization in the Muslim world – Sir Sayyid Ahmad Khan, Shaikh Muhammad Abduh, Qassim Amin, Shaikh Ali Abd ar-Raziq, Dr. Taha Hussein, Ziya Gokalp, and Mustafa Kamel Ataturk. . . . . All of these men were merely the mediocre end product of their circumstances and more specifically the result of an over whelming sense of inferiority which engulfed the East after its humiliating capitulation under the feet of the imperialist West.[১৪]

আধুনিকতা ও পশ্চিমায়ন সম্পর্কে মরিয়ম যেভাবে সমালোচনা করেছেন এর একটা অসুবিধা হচ্ছে আধুনিকতার সমস্যাকে তিনি নির্বিশেষ করে ফেলেছেন। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ আধুনিকতা ও পশ্চিমায়নের ভিতরে একটা পার্থক্য টানতে চেয়েছেন। প্রগতি বা যুগোপযোগিতা অর্থে তারা আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যদিকে পশ্চিমায়ন বলতে মুসলিম সমাজে পশ্চিমী মূল্যবোধ, দর্শন ও আদর্শের কুফলকে চিহ্নিত করেছেন। এটা সত্য একালের মুসলিম চিন্তাবিদরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মহীনতার সাথে তুলনা করেছেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সুযোগ পেলেই ইসলামকে প্রান্তিক ও গুরুত্বহীন অবস্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের যে চিন্তাভাবনা তাও ইসলামের সাথে কোনক্রমে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চিন্তা ও মানসিক গঠনের দিক দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যেহেতু পশ্চিমের অনুকারী, সেক্ষেত্রে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে পশ্চিমের আধিপত্য কবুল

www.pathagar.com

করতেও রাজি। বিশেষ করে এরা মুসলিম সমাজে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরযোগ্য ও বশংবদ মিত্র হিসেবে বিরাজমান। এসব বিবেচনায় রেখে মরিয়ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের যেমন কামাল আতাতুর্ক, আলী আবদ আর রাজিক প্রমুখের সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তার সাথে মতান্তর হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তিনি সৈয়দ আহমদ খান, আমীর আলী বা মুফতী আবদুহু সম্পর্কে যে সব মতামত দিয়েছেন তা অনেকাংশে খন্ডিত মনে হয়। এরা কেউ আধুনিক পশ্চিমী অর্থে সেকুলার ছিলেন না এবং তারা মুসলিম সমাজের সত্যিকার হিতৈষী ছিলেন। এটা সত্য তারা বিভিন্ন সময় সাম্রাজ্যবাদকে সহযোগিতা করেছেন এবং সেই সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদের হাতকে অনেকাংশে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু তাদের সেই কর্মকান্ডকে মূল্যায়ন করতে হলে তাদের সময়, অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এটা না করা গেলে তাদের প্রতি অবিচারই করা হবে। একইভাবে মোহাম্মদ আসাদের ইজতিহাদকে ভিত্তি করে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন ভাবনার বিরুদ্ধাচরণ মরিয়মের চিন্তার যুগোপযোগিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাহলে কি মরিয়ম মুসলিম চিন্তার বিকাশ ও অগ্রগতি চাননি, এ ধরনের প্রশ্ন তার লেখা পড়তে গেলে পাঠকের মনে আসা অস্বাভাবিক নয়।

চার

মরিয়ম জামিলা আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতাকে রিফরমেশন উত্তর খ্রিস্টীয় জগতের সেকুলার দর্শন ও ইহুদী ঐতিহ্য থেকে পাওয়া সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের এক মিশ্রণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৫] পাশাপাশি আধুনিকতা বা আধুনিকায়নকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে ঐতিহাসিক খ্রিস্টবাদকে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক মূল্যবোধ-রূপান্তর, আবিষ্কার, নতুনত্ব প্রভৃতিকে যেমন তিনি অতীত ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে ফেলার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন তেমনি আধুনিকায়ন এমন একটা প্রক্রিয়া যা উন্নতি ও সাফল্যের চেয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি ধ্বংসে বেশি উদগ্রীব বলে তার কাছে মনে হয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে তিনি সংস্কৃতির আত্মহত্যা (Cultural suicide) হিসেবে দেখেছেন। আধুনিকতাকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের উল্টোপীঠ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এই আধুনিকতা মুসলিম দুনিয়ায় এক নজিরবিহীন মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে। আধুনিকতা নতুন মুসলিম প্রজন্মকে এক হীনমন্যতার খাদে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং শেষমেষ তাদেরকে সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তে এক অনুকারী জাতিতে পরিণত করেছে। মরিয়মের কাছে মনে হয়েছে এই পরিস্থিতিতে আধুনিকতা এক নতুন দেবতা হিসেবে হাজির হয়েছে এবং এই দেবতাকে খুশি করবার জন্য হীনমন্যতায় আক্রান্ত উপনিবেশিত মানুষেরা উদযোগী হয়ে উঠেছে। এটিকে তিনি ইসলামের অন্তর্গ[illegible] জন্য বড় রকমের আঘাত হিসেবে দেখেছেন। তার নিজের ভাষায় ঃ

. . . . a direct threat to the very life, faith, and cultural values of the Muslim community, spawning inferiority complexes and self hatred (religious, cultural, and historical).[১৬]

মরিয়ম আধুনিকতা প্রসঙ্গে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা

www.pathagar.com

তাদের মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিকতাকে শক্তি ও ক্ষমতার জোরে একটা বৈশ্বিক ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে এবং ঐ একই যুক্তিতে আধুনিকতাকে অইউরোপীয় দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। তিনি আধুনিকতাকে একটা ইউরোপীয় ঘটনা হিসেবেই দেখেছেন এবং এই ইউরোপীয় মূল্যবোধ মুসলিম সমাজকে জবরদস্ত এক গোলামী মানসিকতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদের মত মরিয়মও একালে এই জরুরী প্রশ্নটা তুলেছেন Why were Muslims so easily overcome and subdued by the West and why do they continne in a subordinate position? Is it Islam that is inherently inadequate?

এর প্রথম কারণ হিসেবে তিনি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও তার শোষণকে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে মুসলমানদের নিজেদের ভুলকেই তিনি দায়ী করেছেন। তার ভাষায় ঃ

Our present plight is the direct and inevitable result of prolonged colonial exploitation. The Muslims must be held primarily responsible for their decline and downfall, but the imperialist powers set about the task of deculturizing us in a methodical, scientific manner to ensure that we should not ever be able to recover and reorganize ourselves into a vital force. A liberal elite was created who regarded their own faith, historical and cultural heritage with indifference which quickly developed into unconcealed contempt.[১৭]

মরিয়মের কাছে মনে হয়েছে আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সাথে ইসলামের নীতির অমিল যেমন প্রকট তেমনি মুসলিম দেশনেতারাও তাদের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কে বিলীন করে দিয়ে স্রেফ পশ্চিমের শিখন্ডীতে পরিণত হয়েছেন। মরিয়মের ইতিহাস চেতনা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর খ্রিস্টান ইউরোপ ও ইসলামের ভিতরকার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্বে বিশ্বের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তথা আধুনিকতার জয় নিশ্চিত হয়েছে। আধুনিকতা তার কাছে পুরো অপশ্চিমী বিশ্বের পরাজয় এবং পশ্চিমের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নাম। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগেই পাশ্চাত্যের নীতি-নির্ধারক ও তার দেশীয় মতাদর্শিক মিত্ররা ইসলামের নৈতিক-ভিত্তিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে। মরিয়ম তাই মনে করেন পশ্চিমের রাজনৈতিক আধিপত্যের চেয়ে এর সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ অনেক বেশি ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষমতা-সম্পন্ন। মুসলিম সমাজের এই সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতাকে তিনি সাংস্কৃতিক দাসত্ব হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। পশ্চিমের আধিপত্যের কারণ হিসেবে তিনি এর উন্নত সাংগঠনিক শক্তি, প্রযুক্তি ও গতিশীলতার কথা বলেছেন। তিনি অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তি White man's burden অথবা Mission to civilize কে অগ্রাহ্য করেছেন এই বলে পাশ্চাত্য, এশিয় সভ্যতা থেকে উত্থিত ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, আইন ও সংস্কৃতির তুলনায় অগ্রসর তেমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি। আবার মুসলমানদের অবক্ষয়ের জন্য তিনি পশ্চিমের চিরাচরিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন কথা বেশি, কম কাজ, অলস ও কর্মবিমুখ, কোন কিছুই শেষ করতে পারে না, পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব প্রভৃতি। তারপরেও মরিয়মের কথা

www.pathagar.com

হচ্ছে মুসলিম সমাজের স্থবিরতার জন্য মূলতঃ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনই দায়ী। সেই হিসেবে মরিয়ম পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে গ্রহণ করেননি এবং বলেছেন পাশ্চাত্য ও তার দেশীয় মিত্রদের পশ্চিমীকৃত হবার যুক্তি গ্রহণ করবার কোন কারণ নেই।

পাঁচ .

মরিয়ম জামিলা ইসলামী ইতিহাসে উলামাদের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন এবং তাদের বিরোধিতাকারীদের তিনি সমালোচনা কচ্ছেন। ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতার সূত্রে মুসলিম সমাজের অবক্ষয়ের জন্য পাশ্চাত্যমুখী এলিট এবং মুসলিম উভয়ে যুগপৎভাবে উলামাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন এই বলে যে তাদের শিক্ষাদান প্রণালী ও ধ্যান ধারণা স্থবির, অপরিবর্তনযোগ্য এবং সমকালীন মুসলিম সমাজের প্রয়োজন মেটাতে তা ব্যর্থ। এদের কথা হলো যুগোপযোগিতার ভিত্তিতে উলামারা ইসলামের নীতির পুনঃব্যাখ্যা করতেও রাজি নন। সেই কারণে উলামাদের এই ক্ষমতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তন করারও সুপারীশ করেছেন তারা। অন্যপক্ষে মরিয়ম উলামাদের পক্ষ নিয়ে বলেছেন এইসব ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক কাল ধরেই ইসলামের আইনকে শুধু ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করছেন না, তারা ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্য স্বৈরাচারী নিষ্ঠুর শাসকদের জুলুমকেও সহ্য করেছেন। মরিয়মের ইসলামকে উপস্থাপনার মত, উলামাদের পক্ষে লড়াই বাস্তবতার চেয়ে বিশুদ্ধবাদী চৈতন্য ও আদর্শের প্রতি তার অনুরাগকে প্রমাণ করে। তিনি প্রখ্যাত আলেম ও বুদ্ধিজীবী ইমাম ইবনে হাম্বল ও ইমাম শফীর মহান আত্মত্যাগ ও ইসলামের জন্য কষ্ট স্বীকারের কথা স্মরণ করেছেন কিন্তু উলামাদের অনেক ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থেকেছেন। তিনি উলামাদের প্রতি জনগণের একাংশের শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করেছেন, কিন্তু অপরাংশের (শহুরে এলিট ও তার সমর্থকরা) অনীহার কথা বিবেচনায় নেননি। উল্টো তিনি বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন - If the intelligentsia are not to meddle in religious matters but leave them to the expertise of the ulama, what then is the task of the intelligentsia? মরিয়মের ঐতিহ্যবাহী মন আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে এইভাবে সাড়া দিয়েছে ঃ

Muslim intellectuals had better concentrate their attention on finding a remedy for the most acute malady afflicting every Muslim country- the curse of modernism. They must recognize that our indigenous modernist movement, which under the slogan of "Changing with the changing times" threatens to destroy every trace of the faith in the Quran and the Sunnah, is even a greater menace than the Zionist occupation of Palestine.[১৮]

মরিয়ম জোরের সাথে বলেছেন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাজ হবে ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট উত্তর যুক্তিবাদী (rationalistic) জ্ঞান কাঠামোকে প্রতিহত করা। বিশেষ করে এর মন্ত্রগুরু ডারউইন, মার্কস, ফ্রয়েড প্রমুখকে অগ্রাহ্য করা। তিনি আরো বলেছেন মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন শিক্ষাবিদদের হাত থেকে মুক্ত করে ইসলামপন্থী শিক্ষক ও সংস্কারকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে

www.pathagar.com

ইসলামের মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো না গেলে প্রচলিত ব্যবস্থা মুসলিম সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে আসতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিকুলামে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন দর্শন, মানববিজ্ঞান, অর্থনীতিতে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের কথা বলেছেন। মরিয়ম ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন পশ্চিমী জ্ঞান কাঠামো চালু রেখে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে তার দ্বারা পশ্চিমের স্বার্থই রক্ষা হবে মাত্র। পশ্চিমের দর্শন ও মূল্যবোধকে সাথে নিয়ে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারকে মোকাবিলা করা যাবে না।

নতুন পরিস্থিতিতে মরিয়ম জামিলাও তাই ইসলামের মধ্যে এক ধরনের সংস্কারের কথা বলেছেন যা অবশ্য আধুনিকতাবাদী সংস্কারকদের মত ইসলামী নীতির পুনঃব্যাখ্যার মাধ্যমে পাওয়া যাবে না। তার কথা হচ্ছে দীর্ঘ হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা ধ্রুপদী ইসলামের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে এবং সেই পথেই ইসলামের সংস্কার আসবে। মরিয়ম তার এ সংস্কার চিন্তার পক্ষে ইমাম গাজ্জালী ও ইবনে তাইমিয়ার নমুনা হাজির করে বলেছেন এরা যেমন সমকালীন দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের নতুন ধরনের ইসলামী সংস্কার প্রচেষ্টাকে মোকাবিলা করেছেন তেমনি আজকের দিনের আধুনিকতা ও প্রগতির ফাঁদকে মোকাবিলা করতে হলে নতুন ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম তাইমিয়াকে প্রয়োজন। এই আলোকেই ইসলামের বিবাহ, পর্দা, তালাক, জিহাদ সম্পর্কে আধুনিকতাবাদীদের মতামতকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন আধুনিকতাবাদীরা ইসলামের নৈতিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তির পুনঃমূল্যায়নের নামে মুসলিম সমাজের এক ধরনের পশ্চিমীকরণে মেতে উঠেছে। এই সূত্রেই তিনি আধুনিকায়নের নামে নারীর ইসলাম নির্দেশিত অধিকারের সীমানাকে যারা মুছে দিতে চায় তাদেরকে তিনি সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর সেইসব সেকুলার এলিটরা যারা উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করতে চায় তাকে তিনি বলেছেন mental slavery to the values of Western civilization। তিনি বলেছেন মুসলিম পারিবারিক আইন কুরআন ও সুন্নার নীতির ভিত্তিতে চালিত। পর্দা, বিবাহ, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং এর প্রতি সেকুলারবাদীদের ঘৃণার কারণ হচ্ছে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। মরিয়ম মনে করেন পাশ্চাত্য নারীকে ঠিক ইসলামী সমাজের মত স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকায় সম্মান দিতে আগ্রহী নয়। তারা পুরুষের কাজ সমভাবে নারীরা করতে পারে এই বিচারে নারীকে মূল্যায়ন করে। একই সাথে নারীর শারীরিক সৌন্দর্যকে তারা গুরুত্ব দেয়। একে তিনি ইসলামী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেননি। তার কথা হলো ঃ

. . . . the role of a woman is not the ballot box but maintenance of home and family . . . . While men are the actors on the stage of history, the function of the women is to be their helpers concealed from public gaze behind the scenes.[১৯]

এখানে মরিয়ম সম্ভবতঃ নারীকে পুরুষের helper হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, co-worker হিসেবে নয়। এই মতের সাথে শুধু সেকুলারবাদীরা নয় অনেক মুসলিম

www.pathagar.com

আধুনিকতাবাদীরাও সম্ভবতঃ একমত হবেন বলে মনে হয় না। কারণ এইসব মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কুরআনী নীতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন স্ত্রী ও মায়ের সম্মানতো মেয়েদের জন্য অবশ্য প্রাপ্য, উপরন্তু তারা ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে থেকে পুরুষের co-worker ও ।

ছয়

মরিয়ম জামিলার লেখালেখি একালে মুসলমানদের আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধির উন্মেষে এক বিরাট ভূমিকা রেখেছে। আধুনিকতা নামক প্রপঞ্চ মুসলিম সমাজের জন্য অনেকক্ষেত্রেই এক বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম জ্ঞানকাঠামো ও নৈতিক ভিত্তিকে দূষিত ও বিকৃত করতে এর কোন জুড়ি নেই। পাশ্চাত্য থেকে এই আধুনিকতা এসেছিল ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সার সাথে। কিন্তু এই আধুনিকতাকে এমন এক সুদৃশ্য মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে পশ্চিমীদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ প্রাচ্যে তৎপর থাকলেও ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম জনগণের কাছে অনেকক্ষেত্রেই এই আধুনিকতা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য এই পশ্চিমী চিন্তাভাবনায় প্রাণিত মুসলিমরাই ইসলামী দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসে। আশার কথা সাম্প্রতিককালে অনেক মুসলিম পন্ডিত আধুনিকতার এই চরিত্রগত নৈর্ব্যক্তিকতাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছেন এবং আধুনিক তাকে মুসলিম সমাজের 'অনুন্নত', 'অনাধুনিক' মানুষকে শোষণের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোন সন্দেহ নেই মরিয়ম জামিলা তার অজস্র লেখালেখির মাধ্যমে আধুনিকতার এই গোপন অথচ কুশ্রী চেহারা মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন এবং আধুনিকতার চোখ ধাঁধানো আলো যে আদপে অতখানি আকর্ষণীয় নয় নতুন প্রজন্মের কাছে সেটাও তিনি স্পষ্ট করেছেন। এক্ষেত্রে মরিয়মের সাফল্য হচ্ছে একজন নারী হিসেবে তিনি তার যুক্তিকে মুসলিম সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন এবং বলাবাহুল্য তার অনেক গুণগ্রাহীও আছে। এটা সত্য মুসলিম সমাজে আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতার হস্তক্ষেপকে তিনি নিপুণভাবে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এই আধুনিকতার অশুভ হস্তক্ষেপ মোকাবিলার তার কৌশলের সাথে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। বিশেষ করে যে যুগে মুসলিম মেয়েরা নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সাম্যের মত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে উদযোগী হয়েছে সেই সময় তার ধ্রুপদ ও পিউরিটান ইসলামের ব্যাখ্যাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা জটিল কাজ বৈকি। তারপরেও বলতে হবে মুসলিম সমাজে আধুনিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক কুয়াশা ছিন্ন করতে তার উদযোগ অতুলনীয়।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Quoted in Maryam Jameelah in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. NewYork : Oxford University Press, 2001.

২. Maryam Jameelah, The story of One Western Convert's Quest for the Truth. Lahore : Muhammad Yusuf Khan, 1982.

www.pathagar.com

৩. Quoted in Maryam Jameelah in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam.
৪. প্রাগুক্ত।.
৫. Maryam Jameelah, The story of One Western Convert's Quest for the Truth.
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. Maryam Jameelah, Islam in Theory and Practice. Lahore : Muhammad Yusuf Khan, 1976.
১০. প্রাগুক্ত।
১১. Maryam Jameelah, The story of one Western convert's Quest for the Truth.
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. Maryam Jameelah, Islam and Modernism. Lahore : Muhammad Yusuf Khan, 1971.
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. Maryam Jameelah, Islam in Theory and Practice. Lahore : Muhammad Yusuf Khan, 1976.
১৬. Maryam Jameelah, Islam and Western Society. New Delhi : Adam Publishers, 2006.
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. Maryam Jameelah, Islam in Theory and Practice.
১৯. Maryam Jameelah, Islam and the Muslim Woman Today. Lahore : Muhammad Yusuf Khan, 1976.

www.pathagar.com

রশিদ আল ঘানুশী

এক

তিউনিসিয়ার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক রশিদ আল ঘানুশী একালের অন্যতম ইসলামবিদ হিসেবে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তিধর পন্ডিত যেমন একদিকে তিউনিসিয়ার রাজনীতিতে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছেন তেমনি সেখানকার মুসলিমপ্রধান সমাজের ইসলামী আত্মপরিচয় আবিষ্কারেও অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছেন। রশিদ ঘানুশীর মতামত হচ্ছে উপনিবেশ উত্তর মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়ের সংকট এক দীর্ঘ ও অমীমাংসিত সমস্যা হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিকতাজাত এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে হলে মুসলিম সমাজগুলোকে তার ইসলামী ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে এবং এই পুনরাবিষ্কৃত আত্মপরিচয় নিয়েই কেবল সে যুগের সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারবে।

রশিদ ঘানুশীর পরিচয় হলো তিনি তিউনিসিয়ার প্রধান ইসলামবাদী দল আন নাহ্‌দা বা রেনেসাঁ পার্টির মূল সংগঠক ও তাত্ত্বিক। দীর্ঘ ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন এবং উপনিবেশ উত্তর পাশ্চাত্যবাদী হাবিব বরগুইবার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা তিউনিসিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজদেহকে ঝাঁঝরা করে ফেলে। ১৯৫৬ সালে ফরাসীদের হাত থেকে স্বাধীনতা পেলেও বরগুইবা তিউনিসিয়াকে পাশ্চাত্যমুখী করে তোলার চেষ্টা চালান এবং তিউনিসিয়ার জনসমাজে জোর করে পাশ্চাত্যকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এইভাবে তিনি পাশ্চাত্যের নির্ভরযোগ্য মিত্র হয়ে ওঠেন। মুসলিম দুনিয়ায় তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের পর বরগুইবাই তার দেশে এত দীর্ঘ সময় ধরে পাশ্চাত্যের মদদে জনগণের অনুমোদনবিহীন স্বৈরাচারী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখেন। তিউনিসিয়ার আরব-ইসলামী ঐতিহ্যকে বরগুইবা কাটছাঁট করে সেখানে ফ্রাঙ্কিশ কালচার অনুপ্রবেশ করানোর সব ব্যবস্থা হাতে নেন। আরবীর বদলে ফরাসী হয় রাষ্ট্রভাষা ও উচ্চতর শিক্ষা মাধ্যম। ইসলামী আইন দূরে থাক, ইসলামের পারিবারিক আইনকেও তিনি বাতিল করেন। মেয়েদের হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করেন। এমনকি পবিত্র রমজানের দিন বরগুইবা প্রকাশ্যে টিভিতে কমলার রস পানরত অবস্থায় হাজির হয়ে রোজার সমালোচনা করেন এই বলে এটি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে এবং জনগণকে রোজা পালন না করার পরামর্শ দেন। তিউনিসিয়ার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র জয়তুনা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সামাজিকভাবে উলামাদের লাঞ্ছিত করা হয়। বরগুইবার কাছে ইসলাম ছিল একটি অতীতের বিষয়। তিউনিসিয়াকে পশ্চিমমুখী করে তোলাই ছিল তার আরাধ্য এবং তাতেই তিউনিসিয়ার ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে বলে তিনি মনে করতেন। বরগুইবার এই মতামত ও সিদ্ধান্ত আশির দশকে এসে তিউনিসিয়ার নবজাগ্রত ইসলামী শক্তির কাছে প্রথম ধাক্কা খায় এবং এই শক্তি

www.pathagar.com

তিউনিসিয়ার জনগণকে পশ্চিমা মডেল বাদ দিয়ে তাদের আরব-ইসলামী ঐতিহ্যের কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। ১৯৮৭ সালে বরগুইবার পতনের পর তিউনিসিয়ায় এযাবৎকালের প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামী শক্তি ভালো ফল দেখিয়ে বিশ্বকে চমকে দেয় এবং তিউনিসিয়ার এককালের প্রভাবশালী সেকুলার শক্তির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তিউনিসিয়ার জনমানসের মধ্যে এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের স্থপতি হলেন রশিদ আল ঘানুশী।

দুই

তিউনিসিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে কাবিস প্রদেশের আল হামা নামের ছোট্ট গ্রামে ১৯৪১ সালে এক কৃষক পরিবারে রশিদ আল ঘানুশীর জন্ম। রশিদের আব্বা ছিলেন ধার্মিক এবং গ্রামের একমাত্র কুরআনের হাফেজ। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তার দশ ছেলেমেয়েই কুরআন অধ্যয়ন করুক এবং তা তারা করেছিল। ঘানুশীর মা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব তিনি বুঝতেন এবং বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষাই তার ছেলেমেয়েকে নতুন যুগের দুয়ারে হাজির করবে। এই বুদ্ধিমতী মায়ের প্রেরণায় ঘানুশী পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং এক প্রজন্মের মধ্যে এই পরিবারের সদস্যরা তাদের পারিবারিক কৃষিবৃত্তি ছেড়ে দেয় ও শহরের আধুনিক শিক্ষিত পেশাজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঘানুশীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় স্বগ্রামের স্কুলে, যেখানে তাকে আরবী ও ফ্রেঞ্চ শিখতে হয়। কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতেই ছেদ পড়ে। তার আব্বা ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক উভয় কারণেই ঘানুশীকে স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেন। ঘানুশীর আব্বা তিউনিসিয়ার ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষা শেখার ব্যাপারে আপত্তি করেন যাদের তিনি ইসলামের শত্রু বিবেচনা করতেন। তাছাড়া এ সময় পারিবারিক বিশেষ করে বৃদ্ধ পিতাকে সাহায্য করবার জন্য ঘানুশীর প্রয়োজন ছিল। ঘানুশীর ভাইয়েরা লেখাপড়া শেষ করলে তার পরিবার কৃষিকাজ ছেড়ে দেয় এবং এসময় ঘানুশীর বাড়িতে সাহায্য করার প্রয়োজনও কমে যায়। তখন নতুন করে তার লেখাপড়া শুরু হয়। ঘানুশী ১৯৫৬ সালে গাব্বাস শহরে জয়তুনা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। জয়তুনা হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার মাদ্রাসা শিক্ষার একটি ধারা যার মূল কেন্দ্র হচ্ছে তিউনিসের জয়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়। ইজিপ্টের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটি উত্তর আফ্রিকার একটি প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, যা নাকি ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করতো। ঘানুশী এখানে কুরআন, ইসলামী আইন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন, পাশাপাশি আরবীতে আধুনিক বিষয় ও বিজ্ঞান নিয়েও পড়াশোনা করেন। কিন্তু মোটের উপর জয়তুনার শিক্ষাপ্রণালী ছিল প্রাচীন ও ঐতিহ্যপন্থী। পরবর্তীকালে ঘানুশী জয়তুনার শিক্ষাপদ্ধতিকে মৃত বলে সমালোচনা করেছিলেন এই কারণে যে, এখানে যারা ইসলাম নিয়ে পড়তে আসে তাদের যেন মনে হয় তারা একটা জাদুঘরে এসেছে। কারণ এখানে ইসলামের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার চেয়ে অতীতের আইনশাস্ত্রের উপরই আলোচনা বেশি হয়। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী প্রভাবিত তিউনিসিয়ার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণজীবনে জয়তুনা থেকে বেরিয়ে আসা স্নাতকরা কোন রকম চাকুরী বা সামাজিক

www.pathagar.com

সুযোগ সুবিধা তেমন একটা পেতো না। জয়তুনার ইসলামকে ঘানুশী তাই বলেছিলেন Museum Islam - জাদুঘরে আবদ্ধ ইসলাম।[১]

১৯৬২ তে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ঘানুশী আরো কিছুদিন জয়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন কিন্তু পশ্চিমা দর্শন পড়া ঘানুশী তার শিক্ষকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলায় তাকে জয়তুনা ছাড়তে হয়। এরপর তিনি কিছুদিন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন, সাংবাদিক হওয়ার চেষ্টা করেন এবং শেষমেষ তিনি ১৯৬৪তে ইজিপ্টে এসে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু ঘানুশীর কায়রো অবস্থান বেশিদিন সম্ভব হয়নি। কারণ নাসেরের প্যান আরব সমাজতন্ত্রের প্রভাববলয় বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়ে প্রেসিডেন্ট বরগুইবা তিউনিসীয় ছাত্রদের মিসর থেকে প্রত্যাহার করেন। চার মাস পরেই ঘানুশী মিসর ত্যাগে বাধ্য হন এবং সিরিয়ার দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি দর্শনে স্নাতক ডিগ্রী পান।

দামেস্ক অবস্থানকালে তিনি পশ্চিমা দর্শনে ডুব দেন, চিন্তাভাবনায় আরব জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন এবং নাসেরীয় চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত সিরিয়ান ন্যাশনালিস্ট সোশালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

দামেস্ক থাকাকালে ঘানুশী সাত মাসের জন্য ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তার জীবনে এটা ছিল অনেকটা সাইয়েদ কুতুবের আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মতো। এই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা তার জীবনের এতকালের অনেক চিন্তাভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই যাত্রায় ঘানুশী অন্য এক ইউরোপকে দেখেন। 'অডজব' করেন এবং ইয়ুথ হোস্টেলে রাত কাটান। এখানে তিনি প্রথমবারের মতো পশ্চিমকে তার ভিতর থেকে অবলোকন করেন এবং বিশেষ করে অবাক হন এখানকার মানুষ এত সমৃদ্ধিশীল বা সুখী নয় যা তিনি ভেবেছিলেন। ইউরোপ তাকে পুরোপুরি মুগ্ধ করতে পারে না এবং তিনি আশ্বস্ত হন ইউরোপীয় সভ্যতা কখনো আরব জগতের মডেল হতে পারে না। ঘানুশীর ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা ও দামেস্কের জীবন শুধু পশ্চিম সম্পর্কেই তার ধারণা পাল্টায় না, আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কেও তার সংশয় বৃদ্ধি করে। তিনি প্রশ্ন করতে থাকেন পশ্চিমী আদর্শবাদ ও আরব জাতীয়তাবাদের পিছনের ধারণা ও বাস্তবতার উৎস কি ? আরব জাতীয়তাবাদের অর্থ কি ? এর অন্তর্গত আদর্শই বা কি ? কি ধরনের স্বাধীনতার কথা নাসের বলতে চান ? শেষমেষ তিনি সিদ্ধান্তে আসেন আরব জাতীয়তাবাদ মূলতঃ পশ্চিম থেকেই আমদাণীকৃত এবং আদতে এর দেয়ার কিছু নেই। নাসেরীয় ও বাথিস্ট আরব জাতীয়তাবাদীদের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন ইসলামপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মীরাও সক্রিয় ছিল। আরব জাতীয়তাবাদ নিয়ে ঘানুশীর সংশয় ও সন্দেহের দিনগুলোতে ব্রাদারহুডের কর্মীরা তাকে বিকল্প পথের সন্ধান দেয়। সেটি হলো ইসলাম। ঘানুশী নতুন এক ধরনের ইসলামকে আবিষ্কার করেন যা নাকি 'জীবিত'এবং এটি 'মিউজিয়াম' ইসলামের প্রতিনয় (Anti-thesis), যাকে তিনি জয়তুনা থাকতে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন। তিনি এসময় উনিশ ও বিশ শতকের মুসলিম সংস্কারক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক বিপ্লবীদের চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হন। তিনি ইকবালের Reconstruction of Religious Thought in Islam পড়ে মুগ্ধ হন এবং সেখানে এমন এক ইসলামের আবিষ্কার করেন যা ইসলামী বিশ্বাস ও পশ্চিমী দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় যা কিনা পশ্চিমকে তার নিজের ভূমিতেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি মোহাম্মদ কুতুবের

www.pathagar.com

Man between Materialism and Islam পড়েন এবং একে একে হাসান আল বান্না, মওলানা মওদুদী, সাইয়েদ কুতুব, সাঈদ আল হাওয়ার লেখালেখির সাথে পরিচিত হন। এখানে তিনি একটি 'মজবুত' ইসলামের সন্ধান পান যার উপস্থাপনা শুধু বিশ্বাস নির্ভর নয়, যুক্তি দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে ঘানুশী ইসলামী বিকল্পের দিকে ঝুকতে থাকেন এবং আরব জাতীয়তাবাদ তার কাছে একান্ত পশ্চিমাশ্রিত ধারণা বলে মনে হয়। এখন থেকে তার সিদ্ধান্ত হয় আদর্শিকভাবে আরব-ইসলামী সভ্যতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে আরবদের শোচনীয় পরাজয় পুরো আরব জগতকে নাড়া দেয়। যুদ্ধে আরবদের হার হলেও আরব জনগণের চোখ খুলে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত আরব নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং আরব জাতীয়তাবাদ যে মস্তবড় মাকাল ফল তা বুঝতে কারো বাকি থাকে না। যুদ্ধের সময় ঘানুশী সিরিয়ায় ছিলেন এবং ইসরাইলী যুদ্ধবিমান দামেস্কে আঘাত হানে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসময় আরব জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী ছাত্রদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক হতো এ যুদ্ধে আরবদের ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে। ইসলামবাদীদের মতামত ছিল ইসরাইলকে পরাজিত করতে হলে যা দরকার তা হলো সামরিক জয়ের চেয়ে অতিরিক্ত আরো কিছু জিনিস। তা হলো ইসরাইলীদের মতো আরবদেরও এক গভীর আদর্শবাদ ও বিশ্বাসের শক্তি। যুদ্ধের পরাজয় ঘানুশী ও তার মতো অন্যান্যদের আরব জাতীয়তাবাদের মতিভ্রম থেকে ফিরিয়ে এনে আশ্বস্ত করে একমাত্র ইসলামই তাদের মুক্তি দিতে পারে।

১৯৬৮ তে ঘানুশী সিরিয়া ত্যাগ করে প্যারিসে আসেন সোরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি নেয়ার জন্য। বিশেষ করে ফ্রান্সে পড়াশোনা ও ফরাসী ভাষায় দক্ষতা তিউনিসিয়ায় ফিরে গিয়ে বড় কোন সুযোগ পেতে সুবিধা হবে বলে তার মনে হয়েছিল। দামেস্কে ঘানুশী ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করলেও কোন রকম ইসলামী আন্দোলনে তিনি যুক্ত হননি। প্যারিসের পরিবেশে এসে নতুন সংস্কৃতির মধ্যে ঘানুশী ও তার মতো প্রবাসীদের আত্মপরিচয় ও বিশ্বাস বাঁচানো একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এখানকার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্ত জীবন যাপনের ধারণা ঘানুশীর মতো পটভূমি থেকে আসা মানুষের কাছে নৈতিকভাবে বিসদৃশ মনে হতে পারে। সব দিক বিবেচনা করে প্যারিসে ঘানুশী অরাজনৈতিক তবলিগী জামাতের সাথে যুক্ত হন। তবলিগ হচ্ছে তার প্রথমবারের মতো সাংগঠনিকভাবে ইসলামের কাজ করার অভিজ্ঞতা। তবলীগের সাথে ঘুরে তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গরীব মুসলমানদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানবার দাওয়াত দেন, মসজিদে আসতে বলেন, কুরআন শরীফ পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রয়োজনে ইসলামের নীতি, নিয়ম, নৈতিকতার প্রথম পাঠও শিখিয়ে দেন। প্যারিসে উত্তর আফ্রিকানদের মধ্যে তিনি যেহেতু ছিলেন শিক্ষিত, তাই তার উপরই নিজের লোকজনকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পড়ে। এমনকি তাকে মসজিদে ইমামতিও করতে হয়। এ সময়টা ঘানুশীর জন্য সুখকর ছিল না। অর্থনৈতিক সংকট, চাকরির স্বল্পতা, তদুপরি ধর্মীয় নেতৃত্ব সব মিলিয়ে তাকে একটা কঠিন সময় পার করতে হয়। পরবর্তীকালে ঘানুশী এ সময়টা স্মরণ করে বলেছিলেন, এটা ছিল তার কারাবাসের দিনগুলোর চেয়েও কষ্টকর।

www.pathagar.com

তিন

৬৭ সালে আরবদের পরাজয়ের ধাক্কা তিউনিসিয়ায় এসেও লাগে এবং এই পরাজয় যে আরব জাতীয়তাবাদের ফল ও ইসলাম থেকে সরে আসার পরিণাম সে কথা নতুন করে মানুষ উপলব্ধি করে। এর সাথে তিউনিসিয়ায় হাবিব বরগুইবার দুঃশাসন, অর্থনীতির বেহাল অবস্থা, সামাজিক অস্থিরতা প্রভৃতি মিলে জনগণের মধ্যেও বিকল্প মুক্তির চিন্তা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে এবং ইসলামকে তারা নতুন যুগের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায়। তিউনিসিয়ার এই নতুন ইসলামী পরিচয়ের পিছনে মুসলিম ব্রাদারহুডের কিছুটা প্রভাব আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিউনিসিয়ার মানুষ তার ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক ফোরাম, কুরআন সংরক্ষণ ফোরাম প্রভৃতি গড়ে ওঠে বিশেষ করে জয়তুনাকে কেন্দ্র করে এই ফোরাম আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একই সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ভাবধারার ছাত্র সংগঠন বিস্তৃত হতে থাকে। তিউনিসিয়ার এমনি যখন আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঘানুশী তখন পাঁচ বছর পর ১৯৭০ এ দেশে ফেরেন এবং সরাসরি মায়ের সাথে দেখা করেন। এরপর তিনি তিউনিসে তার আস্তানা গাড়েন এবং একটি বৃহৎ মাধ্যমিক স্কুলের দর্শনের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এখন থেকে ঘানুশী একই সাথে শিক্ষকতা ও ইসলামের দাওয়াত এই দুই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং কুরআন সংরক্ষণ সমিতি (Quran Preservation Society) যা ইতিপূর্বে জয়তুনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাতে তিনি যোগ দেন। এই সমিতি ছিল একটি অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন যার কোন আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না কিন্তু এই সমিতির মাধ্যমে ঘানুশীর প্রচার, বক্তৃতা, লেখালেখি একধরনের নীরব বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতিকরণ করে চলছিল। রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকায় বরগুইবা সরকারও এর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে তেমন কিছু বলেনি। উল্টো বামপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এটিকে সরকার একটা ঢাল হিসেবে ধরে নেয়। ঘানুশী তার প্রচার প্রচারণায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রদের আকর্ষণ করেন বেশি এবং তারাও তার আলোচনাগুলোতে বেশি বেশি করে উপস্থিত হতে থাকে। ঘানুশী মনে করতেন তিউনিসিয়ার সমস্যা হচ্ছে তার আত্মপরিচয়ের সমস্যা। তার শিক্ষাদান, প্রচার প্রপাগান্ডা ও সমিতির মাধ্যমে তার কার্যক্রম প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ছিল তিউনিসিয়ার আরব-ইসলামী ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ। ঘানুশী কুরআন সংরক্ষণ সমিতির মুখপত্র আল মারিফায় নিয়মিত লেখেন এবং তার প্রচারপত্র What is the West ও Our Path to Civilization এ তিনি আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদদের বিশ্বভাবনার প্রতিধ্বনি করেন। এসবের মাধ্যমে তিনি বলতে চান মুসলিম সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কথা, আত্মপরিচয়হীনতা ও নীতিহীনতার কথা এবং এর কারণ হিসেবে নৈতিকভাবে দেউলিয়া ও সংকটজর্জর পাশ্চাত্যের উপর মুসলিম সমাজের নির্ভরশীলতার কথা। ঘানুশীর দৃষ্টিতে তিউনিসিয়া তথা মুসলিম সমাজের সমস্যার সমাধান হচ্ছে ইসলাম। প্রথম দিকে ঘানুশীর কার্যক্রম অরাজনৈতিক থাকলেও তিউনিসিয়ার সংকটজর্জর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে তা বেশিদিন দীর্ঘায়িত হয়নি। বরগুইবার স্বৈরাচারী শাসন তিউনিসিয়ার জনগণের ধুমায়িত অসন্তোষকে ধামাচাপা দিতে পারে না বিশেষ করে ১৯৭৮ সালে খাদ্যের দাবিতে দাঙ্গা ও সেই দাঙ্গা দমনে সামরিক শক্তির প্রয়োগ ও রক্তপাত সেখানকার পশ্চিমবাদী ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের ফোপরা চেহারা

www.pathagar.com

একেবারে খুলে দেয়। সরকারের সাথে শ্রমিকদের বিরোধও প্রচুর রক্তপাত ঘটায়। এসব শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে থাকে মূলতঃ বামপন্থীরা এবং তারাই বরগুইবার অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। প্রথম দিকে ঘানুশী বামপন্থীদের থেকে দূরে থাকলেও পরে স্বীকার করেন ঃ

The social confrontation between rich and poor is a Marxist formula that did not correspond to our understanding of life. Later on, we realized that Islam also has a say in the confrontation, and that, as Muslim, we could not stay indifferent to it. Islam gives support to the oppressed.[২]

এরকম অবস্থায় ঘানুশী ও অন্যান্য ইসলামবাদী নেতারা আরো বৃহত্তর রাজনৈতিক প্লাটফরমে কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং ইসলামকে দৈনন্দিন সমস্যার সাথে যুক্ত করার কথা ভাবতে থাকেন। এখন থেকে ইসলামকে আর শুধু আত্মপরিচয়ের প্রতীক হিসেবে নয়, ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তির লক্ষ্য হিসেবেও নির্ধারণ করা হয়। এই নতুন রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে ঘানুশী অরাজনৈতিক কুরআন সংরক্ষণ সমিতি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ১৯৭৯ সালে জামা ইসলামিয়া (Islamic Association) দল গঠন করেন। তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে সরাসরি নতুন দলের বক্তব্য জনগণের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। ঘানুশী জনগণের সামনে ইসলামের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। মজলুমের অধিকার, শ্রমিকের অধিকারের কথা বলেন। সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও পশ্চিমীকরণ নিয়ে সোজাসাপ্টা তার মতামত তুলে ধরেন। এই ভাবে তিনি 'জাদুঘরের ইসলাম' নয়, জীবন্ত এক ইসলামের ছবি তিউনিসিয়ার জনগণের মানসপটে এঁকে দেন। ঘানুশীর এই আন্দোলন তিউনিসিয়ার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগায় বিশেষ করে বিভিন্ন পেশার লোকজন এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। ঘানুশীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে মতামত এবং গরীবদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বৈপ্লবিক নীতির ব্যাখ্যা বামরাজনীতি প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সাড়া জাগায় এবং তিউনিসিয়ার প্রেক্ষাপটে বরগুইবার অপশাসনের বিরুদ্ধে বাম ও ইসলামবাদীদের সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়।

১৯৮১ সালে ঘানুশী জামা ইসলামিয়াকে পূর্ণাঙ্গ একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত করেন এবং জামা ইসলামিয়ার পরিবর্তে এর নামকরণ করেন Islamic Tendency Movement (MTI)। ঘানুশী MTI কে তিউনিসিয়ার অনেক ধারার যেমন বাম, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতির একটি উল্লেখ করেন। নতুন দল হিসেবে এটি ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, ইসলামী নৈতিকতার ধারণা, পশ্চিমীকরণ প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক বহুত্ব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের নীতি গ্রহণ করে। বরগুইবা এই নতুন দলের জনপ্রিয়তায় ভীত হন এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে এর পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। উল্টো তিনি MTI এর উপর সরকারী নির্যাতন চাপিয়ে দেন ও ঘানুশীকে গ্রেফতার করা হয়। পুরো ১৯৮০ র দশক জুড়ে MTI এর উপর চলে জেল, জুলুম, হুলিয়ার খাঁড়া। বরগুইবা MTI এর 'ইসলামী হুমকি' নির্মূল করবার জন্য ঘানুশীকে ফাঁসী দেয়ারও পাঁয়তারা করেন। কিন্তু MTI এর নেতৃত্বে প্রবল

www.pathagar.com

গণআন্দোলনের মুখে ত্রিশ বছরের বরগুইবার স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। নতুন পরিস্থিতিতে তিউনিসিয়ার ক্ষমতা দখল করেন বরগুইবার প্রধানমন্ত্রী বেন আলী।
প্রাথমিকভাবে বেন আলী রাজনৈতিক উদারীকরণের কথা বললেও MTI যা তার আমলে নাম পরিবর্তন করে হয় আন নাহদা বা রেনেসাঁ পার্টি তার প্রতি তিনি কখনোই খোলা মনে অগ্রসর হতে পারেননি। কারণ বেন আলীর মতো স্বৈরশাসকদের ভয় ছিল পুরো আরব জগতে ইসলামী শক্তি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করলে এরা নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় চলে আসবে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে বেন আলীও পূর্বসূরী বরগুইবার মতো আন নাহদাকে দমন পীড়নের মাধ্যমে খতমের চেষ্টা চালান। নতুন পরিস্থিতিতে আন নাহদার রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে এবং নতুন প্রজন্মের নেতা আলী লারিদ আন নাহদার দায়িত্ব পান। কিন্তু এতে ঘানুশীর অবস্থার পরিবর্তন হয় না। তিনি তিউনিসিয়ার ইসলামবাদীদের প্রধান তাত্ত্বিক রয়ে যান।

চার

পাশ্চাত্য দর্শনে প্রবুদ্ধ ও ইসলামী চিন্তার জগতে আত্মসমাহিত রশিদ ঘানুশী তার ইসলামভাবনা ও বিশ্বভাবনার ফসল তৈরি করেছেন নানা অভিজ্ঞতা, কর্মতৎপরতা ও উৎসের ভিতর দিয়ে। ঘানুশীর জীবন ও চিন্তাভাবনার মূলে ইসলাম যেমন ক্রিয়াশীল তেমনি এটি তার কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিরও পথ নির্দেশক। আজকের ইসলামী আন্দোলনকে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কার আন্দোলন হিসেবে মনে করেন। এ আন্দোলন মুসলিম সমাজের পুনঃনির্মাণ, পুনর্জীবন ও পুনঃইসলামীকরণ করতে চায়। একই সাথে এ আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের পাশ্চাত্যকরণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও নৈতিক দূষণ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা। ইসলামী পুনর্জীবনের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা মিলিয়েই ঘানুশীর চিন্তার জগত পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বিশেষ করে বিশ শতকের ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাভাবনা, আদর্শবাদ ও কর্মপদ্ধতি তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সমকালীন অন্যান্য মুসলিম পুনর্জীবনবাদীর মতো তিনিও মনে করেন মুসলিম দুনিয়ার সমস্যার জন্য ইউরোপীয় উপনিবেশের অভিজ্ঞতার ভিতর ও তৎপরবর্তী পশ্চিমবাদী মুসলিম সরকার ও এলিট শ্রেণী এই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে জিইয়ে রেখেছে। এর ফলে মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়, সংহতি ও উন্নয়ন বিপর্যস্ত হয়েছে। একালের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সেকুলার পরিচয় জনগণের চর্চিত ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সংস্কৃতিকে অস্বীকার করেছে এবং এটা করতে যেয়ে তারা জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এমনকি মুসলিম জনগণকে তার একান্ত নিজস্ব আত্মপরিচয় থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। ঘানুশী মনে করেন তিউনিসিয়ায় এই ধরনের আত্মপরিচয়হীনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিউনিসিয়ার আরব ইসলামী ঐতিহ্যকে পুনর্বাসিত করা দরকার। তার ভাষায় ঃ

We need to define our identity. Tunisians are not tourists who live in a hotel. They have a history and background that form their identity. The rules on which they live should come from that background. One of the biggest problems that Tunisians had during the rule of Bourghiba was that he tried to link them with the West and make them

www.pathagar.com

forget their Arab-Islamic identity. He believed that Islam was an obstacle to change and modernization. He tried to interpret Islam in a way that would make Islam serve his purposes, his government and his program of Westernization. In effect, he tried to destroy Tunisian-Arab-Islamic identity.[৩]

ঘানুশীর মতামত হলো তিউনিসিয়া ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পশ্চিমবাদী উন্নয়নের মডেল কাজ করেনি, ব্যর্থ হয়েছে। কারণ পশ্চিমবাদী মডেল পশ্চিমের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত এবং পশ্চিমের সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছিল। মুসলিম সমাজে তাই এই মডেল টেকসই হয়নি। ঘানুশী তাই পাল্টা যুক্তি দেন মুসলমানদের তাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাকে ভর করে নিজেদের মত উন্নয়নের মডেল তৈরি করে নিতে হবে।

পাঁচ

ঘানুশীর কথা হচ্ছে একালের রূপান্তর ও উন্নতি এক ধরনের সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে চলে। ভিন্ন সংস্কৃতির থেকে ধার করলেও তিউনিসিয়াকে নির্ভর করতে হবে তার আরব ইসলামী ঐতিহ্যের উপর। তার ভাষায় ঃ

While we should try to keep this (Tunisia's Islamic Civilization) identity, we do not refuse to interact and learn from other civilizations. We should do this while also keeping our own identity. The way to civilization is not to completely follow the Western way or become completely Westernized. We have our identity and we learn from modern life and science and try to improve within the framework of Islamic civilization.[৪]

এর মানে হলো একালে মুসলমানের আত্মপরিচয় ও শক্তির পুনর্জীবন হতে পারে এমন এক ধরনের রূপান্তরের ভিতর দিয়ে যা নাকি ইসলামী কাঠামোর মধ্যে আধুনিক পরিবর্তনগুলোকে, যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণীয় করে তুলতে পারে। ঘানুশী মনে করেন মুসলমানদের নিজস্ব বিশ্বচিন্তা আছে, আছে ইসলামী নৈতিকতাভিত্তিক ইতিহাস, আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধের চেতনা এবং নিজেদের সমস্যা উত্তরণের উপায় উপকরণ। তাই তাদেরকে অন্ধের মতো পাশ্চাত্যকে অনুকরণের দরকার নেই। এখানে ঘানুশীর সাথে সাইয়েদ কুতুবের মতান্তর লক্ষণীয়। ঘানুশীর দেশজ ইসলামী সংস্কৃতি ও উন্নয়নের মডেলের ক্ষেত্রে পশ্চিমকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। যা করা হয়েছে তা হলো ইসলামের সাথে পশ্চিমের সম্পর্ককে নতুনভাবে মূল্যায়ন ও সংজ্ঞায়িত করে দেখানো হয়েছে। ঘানুশীর মত হচ্ছে মুসলমানকে আত্মনির্ভর ও স্বাধীন হতে হবে, পশ্চিমের উপর থেকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরতা কমাতে হবে, আত্মসচেতন হতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরতে হবে। ঘানুশী একই সাথে যেমন ইসলামের আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন তেমনি পশ্চিমের অর্জনেরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। ঘানুশী সব সময় স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও নিরাপদ অবস্থান থেকে কথা বলেন, যে অবস্থান অন্যান্য ইসলামবাদীদের মত নয় যারা স্রেফ পশ্চিমের অবক্ষয় ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে উন্মুখ। উল্টো ঘানুশীর কথা হলো

www.pathagar.com

পশ্চিম ইসলামের তুলনায় উত্তম বা অধম কিছুই নয়। তিনি মনে করেন মুসলমানদের পশ্চিমকে নিয়ে একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন পশ্চিমের সাথে এই সহযোগিতা হতে হবে সমতার এক নতুন অবস্থান থেকে। কখনোই পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল হয়ে নয় এবং সেটিও হবে সমালোচনা ও যথার্থ নির্বাচন (Critical and Selective) সাপেক্ষ।

মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন বিষয়ে ঘানুশীর মত হলো ইসলামী নীতিকে মুসলিম সমাজের বর্তমান চাহিদার সাপেক্ষে নতুন করে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু মুসলিম সমাজের এই পুনঃইসলামীকরণ অতীতের আদর্শায়িত কোন মডেলকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে চলবে না। উনিশ ও বিশ শতকের মুসলিম সংস্কারক যেমন আফগানী, আবদুহু, ইকবাল প্রমুখের প্রতিধ্বনি করে ঘানুশী বলতে চান একালের মুসলিম জীবনের জন্য ইসলামী নৈতিক কাঠামোর নবমূল্যায়ন প্রয়োজন যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় ইজতিহাদ। পুনর্জীবন (তাজদীদ - Renewal) হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যা অতীতকে পুনর্বহাল করবে না, কিন্তু পুনর্গঠন করবে। ঘানুশীর বিশ্বভাবনা বা ইসলামী বিকল্পের সারমর্ম এরকম ঃ

১. কুরআন ও হযরত রসুল (সঃ) এর জীবনে প্রতিবিম্বিত ইসলামের সর্বার্থসাধক রূপ।
২. ইসলামের সমগ্রতাকে যেমন ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে এবং বিশ্বাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পথ নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ।
৩. ইসলাম প্রধান সমাজের রাজনীতিক ও সামাজিক সমতাবাদী রূপ যার আবেদন শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে স্পর্শ করে।
৪. আত্মনির্ভর ও স্বাধীন ইসলাম যা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা নির্ভরশীল নয় কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রতি উদার ও খোলামেলা।
৫. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়করণ।
৬. জাতীয়তাবাদকে ইসলামী বিশ্বজনীনতার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি।
৭. নতুন ইসলামী ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অংশ গ্রহণ।

এখন কথা হলো ঘানুশীর এই ভাবনা-চিন্তাকে কিভাবে কার্যকরী করা যাবে যেখানে অমুসলিমরাই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ঘানুশীর মতামত হলো এর জন্য পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও কর্তৃত্বপরায়ণ মুসলিম বিশ্বের স্বৈর শাসকরাই শুধু দায়ী নয়, ইসলামবাদীদের একালের পরিবর্তনের ধারা বুঝে উঠার ব্যর্থতাও এর অন্যতম কারণ। ইসলামবাদীরা অহেতুক সাধারণ নীতি নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে তাদের কোন কাজ নেই। তিনি মনে করেন মুসলিম দুনিয়ার বাস্তবতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে শুধু শুধু একমার্গী আদর্শ উপস্থাপন করে লাভ হবে না। ইসলাম সকল মানুষের জন্য এটা সত্য কিন্তু এর আদর্শবাদ স্থান ও কাল সাপেক্ষে ব্যবহার করা চাই। এজন্য ইসলামবাদীদের যা দরকার তা হলো ভাবনার সাথে বাস্তবতার যোগ স্থাপন করা, স্থান, কাল বা সংস্কৃতির সাপেক্ষে সংস্কারের কাঠামো গড়ে তোলা। শুধুমাত্র অতীতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর অন্ধ নির্ভরশীলতা একালের ইসলামবাদীদের বিপর্যয় ডেকে আনবে। ঘানুশীর ভাষায় ঃ

The Islamists of Tunisia and other countries ought to stop repeating a bundle of ideas worked out by the former generation of men of

www.pathagar.com

Islamic dawa .. .. .. We must achieve our goals .. .. .. to do that we must be contemporaneous and live in our time.[৫]

সুতরাং ঘানুশী মনে করেন আমাদের যা দরকার তা হলো ঃ

What we need is a realistic fundamentalism (Uusuliyah Waqiyah), or if you like, an authenticated realism (Waqiyah Muasalah).[৬]

ইসলাম নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে ঘানুশীর চিন্তার গতিশীলতা একটা বড় ব্যাপার এবং স্থান ও কালের সাপেক্ষে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরাও তার চিন্তার বৈশিষ্ট্য। এই কারণে ঘানুশী সাইয়েদ কুতুবের মত পথিকৃৎদের সম্পর্কেও বলেছেন তিনি তার স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে হয়তো ঠিক ছিলেন কিন্তু আজকের নতুন পরিস্থিতিতে কিংবা ইজিপ্ট ভিন্ন অন্য কোন মুসলিম সমাজে তার চিন্তার ব্যবহারযোগ্যতা প্রশ্নোর্ধ্ব নাও হতে পারে কারণ ঘানুশী মনে করেন ইসলাম এক এটা সত্য কিন্তু যখন বিভিন্ন স্থানে বা সময়ের ভিন্নতায় একে প্রয়োগ করা হয় তখন বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা কিংবা প্রয়োগ-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এই কারণে ঘানুশীর মূল্যায়ন হলো হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব কিংবা মওলানা মওদুদীর সময় আমরা অতিক্রম করে এসেছি। ইসলামের এইসব পথিকৃৎরা তাদের সময় তাদের দলীয় সংগঠনে কিংবা ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য মানুষ তৈরিতে প্রচুর সময় দিয়েছেন। ইসলামের রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক প্রয়োগ তারা তেমন একটা দেখিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের সাথে ইসলামকে যুক্ত করা দরকার। ইসলামের এই বাস্তবমুখী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে একালের পথিকৃৎরা হলেন ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী, সুদানের হাসান আল তুরাবী এবং আলজেরিয়ার আব্বাস মাদানী। এরা ইসলামকে আরো বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যুর সাথে যুক্ত করেছেন যেমন অর্থনৈতিক শোষণ কিংবা নব্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের ভূমিকাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ঘানুশীর কথা হলো ইসলামকে আজ জনগণের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে হবে এবং নতুন যুগে এসে ইসলামবাদীদের এই ভূমিকাই পালন করা দরকার।

ছয়

ইসলামিক সংস্কারের সাথে ক্ষমতার একটা যোগ রয়েছে। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া ইসলামের অনেক নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এটা সত্য নানা রকম অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় কারণের ফলে ইসলামবাদীরা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতায় আসতে পারছেন না। কিন্তু ঘানুশী ইসলামবাদীদের নিজস্ব কিছু দুর্বলতার দিকেও ইংগিত করেছেন যে কারণে তারা পুরোপুরি জনচিত্ত স্পর্শ করতে পারছেন না। ইসলামবাদীদের বড় দুর্বলতা হলো তারা ইসলামকে মসজিদের বাইরে এনে জনগণের প্রতিদিনের জীবনের সাথে যুক্ত করতে পারছে না এবং ইসলামের সকল শক্তি ও ক্ষমতাকে একত্রিত করে জনগণের পরিচালক শক্তিতে রূপান্তর করা যাচ্ছে না। ঘানুশী তাই এই বলে শেষ করেছেন ঃ

The problem is that societies have evolved while the Islamists have not.[৭]

www.pathagar.com

এটা অস্বীকার করা যাবে না সাম্প্রতিককালে ইসলামবাদীরা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তারপরেও ঘানুশী মনে করেন অতীতের মডেলকে তারা পুরোপুরি অতিক্রম করতে না পারার জন্যই এই অসচলতা এসেছে ঃ

models from the age of decline (whose) only connection to reality is through texts whose understanding became petrified, whose concepts crystallized centuries ago under circumstances quite different from our time. Thus a Muslim of this mentality is afflicted with what resembles paralysis in understanding reality and in appropriating the strategies and energy necessary to progress.[৮]

ঘানুশী ইসলামবাদীদের ব্যর্থতার দুটো বড় নজির তুলে ধরেছেন। একটা হচ্ছে তারা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার পক্ষে যথাযথভাবে দাঁড়াতে পারছেন না। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধেও তাদের ভূমিকা সীমিত হয়ে আছে। ইসলামবাদীদের তাই দরকার, নীতি ও আদর্শের শ্লোগান অতিক্রম করে জনগণের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখা এবং ইসলামের সামাজিক সুবিচারের নীতিকে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের আহ্বান তখনি কার্যকরী হবে যখন নাকি তারা জনচিত্তকে দোলা দিতে পারবে।

মুসলিম মেয়েদের নিয়েও একই কথা বলা যায়। পাশ্চাত্যে এমনকি মুসলিম দুনিয়ায় একটা ভীতি ও প্রচারণা আছে যা হলো ইসলামবাদীরা ক্ষমতায় এলে নারী নির্যাতন ও অবরোধ বৃদ্ধি পাবে। এই প্রচারণার বিপরীতে ইসলামবাদীরা শক্তভাবে তুলে ধরতে পারেননি ইসলামে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হলো নারী মুক্তি এবং সমাজে নারীর অধিকার ও সম্মানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ঘানুশী ইসলামবাদীদের অভিযুক্ত করেছেন তারা যথাযথভাবে মুসলিম মেয়েদের সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারেনি বিশেষ করে সমাজে তাদের উপর চলমান অত্যাচার, অবহেলা ও অধিকার অস্বীকৃতির ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম মেয়েরা যদি তাদের মুক্তির জন্য পশ্চিমের দিকে তাকায় তাহলে তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় চলে না কারণ ঃ

Since they were suffering under the yoke of an oppressive, false Islam, sustained by the silence of the men of religion .. .. .. it had been inculcated in the minds of women that .. .. .. Islam meant only the veil, seclusion within the house, fulfilling the desires of men, lack of freedom.[৯]

ঘানুশীর কথা হলো ইসলাম যে নারী পুরুষের সমতার কথা বলেছে এর মানে হচ্ছে অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের মতো যেমন নারীর সমান ভূমিকা আছে তেমনি পুরুষের মতো নারীও তার সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে সমান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবে।

ঘানুশী এর পরে স্বাধীনতাকে (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অর্থে) ইসলামবাদীদের দ্বিতীয় প্রধান চালকশক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ স্বাধীনতা ইসলামী আদর্শবাদের পুনর্জীবনে এমন একটা পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে নাকি এর নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্ভব। স্বাধীনতার অনুপস্থিতি অবিচার, ক্ষোভ ও প্রত্যাখানের বেদনা জন্ম দেয়।

www.pathagar.com

সাত

ঘানুশীর চিন্তা-ভাবনা ও লেখালেখিতে মুসলিম সমাজের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। ক্রুসেড ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের স্মৃতি খুব বেশি দূরের ঘটনা নয় বরং এর উত্তরাধিকার আজও কোন কোন মুসলিম দেশের সরকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়ে বহন করে চলেছে। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের এই সম্পর্কের ব্যাপারটা তাই ঘানুশীর চিন্তা-ভাবনার অন্যতম প্রতিপাদ্য কেননা ইসলামবাদী দলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাকে এহেন প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেন মুসলিম সমাজ এত সহজে পাশ্চাত্যের আধিপত্যের শিকার হচ্ছে ? পাশ্চাত্যের উন্নতি ও শক্তির উৎস কোথায় ? মুসলিম সমাজের দুর্গতির কারণ কি এবং এর হাত থেকে প্রতিকারের বা উপায় কি ? মুসলিম সমাজের দুর্গতি ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এর উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে ঘানুশী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি কোনভাবেই পাশ্চাত্যের অন্ধ সমালোচক নন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পাশ্চাত্য মধ্যযুগে যেমন করে মুসলিম জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে হাত বাড়িয়েছিল তেমনি করে আজ মুসলমানরাও তাদের অবক্ষয়ের উত্তরণে পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। ঘানুশী পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা করেননি বিশেষ করে এর বিজ্ঞান ও কারিগরি, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণা এবং সরকার যে জনগণের জন্য ও জনগণ ইচ্ছা করলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে যে সরকার কিনা জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে বঞ্চিত করতে চায় - এইসব মূল্যমানগুলোকে তিনি ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পশ্চিমের চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে তিনি পছন্দ করেননি এবং তার মতামত হলো এটি সেখানকার মানুষকে স্রেফ ভোগ-বিলাসের দাসে পরিণত করেছে। পশ্চিমের গণতন্ত্র সম্পর্কে তার মত হলো এটি বড়লোকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে তিনি মুসলিম সমাজে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি করেছেন। তিনি মনে করেন মুসলিম সরকার ও এই সব দেশের এলিট সম্প্রদায় যদি কোন রকম বাছবিচার ছাড়াই পশ্চিমকে অনুকরণ করে তবে তাদের পশ্চিমনির্ভরতাই শুধু বাড়বে এবং পরিণতিতে তারা আত্মপরিচয়হীন হয়ে পড়বে। ঘানুশীর মত হচ্ছে আজকের মুসলিম দুনিয়ার দুর্গতির কারণ মুসলিম সরকার ও তার পশ্চিমবাদী এলিটরা তাদের জনগণের জন্য একালের উপযোগী সংস্কৃতির দেশজ একই সাথে ইসলামী কোন বিকল্প হাজির করতে পারেননি। মুসলিম জনগণের এই দুর্গতির শুরু ইসলামী পরিচয় থেকে সরে গিয়ে যখন তারা পুরোপুরি পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বাস্তবতা হলো মুসলিম দুনিয়া এখন তার বিশ্বাসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেকে পাশ্চাত্যমুখী করে তুলেছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে ঘানুশী মুসলিম দুনিয়ার চলমান সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। এই শিক্ষা এখানকার জনগণের স্বকীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনা বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, পশ্চিমী সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছে এবং দেশজ ও ধর্মজ মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে পদদলিত করার চেষ্টা করছে। এই শিক্ষা মুসলিম জগতে একটি পশ্চিমবাদী প্রজন্মের সৃষ্টি করেছে যারা আপন সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ পশ্চিমবাদী সংস্কৃতির সাথে সংলগ্ন হয়ে চলতে তৃপ্তি বোধ করে।

www.pathagar.com

ঘানুশী মনে করেন মুসলিম জগতে বিদ্যমান বর্তমানকার দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সেকুলার ও ইসলামী, মূলতঃ মুসলিম সমাজকে ঐক্যের বদলে বিভক্ত করে ফেলছে এবং মুসলিম সমাজের চাহিদার অনুপযোগী নেতৃত্ব সৃষ্টি করছে। সেকুলারবাদীরা চেয়ে থাকেন পশ্চিমের দিকে অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামবাদীরা এক অতীতের মধ্যে যেয়ে আশ্রয় নেন যাকে তিনি বলেছেন Museum Islam । ঘানুশী এই দুই ধারার কাউকেই সমাজের জন্য কল্যাণকর ভাবতে পারেননি। কারণ সেকুলারবাদীরা ক্ষমতা ও ভোগবাদ চর্চায় ব্যস্ত অন্যদিকে উলামারাও এক ধরনের আমলাতন্ত্রের জন্ম দিয়েছেন যা কিনা ক্ষমতাবানদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত হয় মাত্র। এই কারণেই তারা কোন কালোপযোগী ইসলামী মডেল হাজির করতে পারেননি বা মুসলিম সমাজের জন্য কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেননি।

এসব কারণে ঘানুশী লক্ষ্য করেছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ইতি ঘটলেও অন্য এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু আজও এখানে রয়ে গেছে। একে বলা যায় মনোজাগতিক সাম্রাজ্যবাদ। আজও এসব দেশে পাশ্চাত্যের প্রভাব রয়ে গেছে মানুষের আচার-আচরণে, পোশাকে-আসাকে, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায়, শিক্ষা ব্যবস্থায়, আইন-কানুনে সর্বোপরি পশ্চিমবাদী এলিট শ্রেণীর মধ্যে। দুঃখজনক হলেও সত্য পশ্চিম নির্ভরতা ও পশ্চিমীকরণ মুসলিম দেশগুলোর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকেও নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে কেননা প্রতিনিধিত্বহীন একটি পশ্চিমবাদী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী প্রায় ক্ষেত্রেই ক্ষমতা দখল করে কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠা করছে। ঘানুশী ঔপনিবেশিকতার নিষ্ঠুর রূপ সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু অন্যান্য ইসলামবাদীদের মতো তিনি পাশ্চাত্যকে ইসলাম দিয়ে ঠেকানো বা প্রতিহত করার কথা বলেন না। কারণ তিনি মনে করেন এটি দুটি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিজাত পার্থক্য। পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে মানবকেন্দ্রিক, মানুষ এই সভ্যতার চূড়ান্ত নিয়ন্তা। অন্যদিকে মুসলিম সভ্যতা এক ঐশী বিধি-বিধানকেন্দ্রিক, এর বিশ্বাস বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ হচ্ছেন চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের কর্তা। এই জীবন দৃষ্টিই দুটি সভ্যতার মৌলিক লক্ষ্যের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে।

আট

যদিও মুসলিম জগত জুড়ে আজকাল ইসলামবাদী দলগুলোকে বিশেষ করে তিউনিসিয়ার ক্ষেত্রে আন নাহদাকে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো মৌলবাদী দল হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু আন নাহদার প্রধান তাত্ত্বিক ও নেতা রশিদ ঘানুশী পশ্চিমের দেয়া এই ইমেজকে চ্যালেঞ্জ করেছেন নিজেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রবক্তা ও সমর্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আন নাহদা প্রথম থেকেই আর পাঁচটা গণতান্ত্রিক দলের মতোই কাজ করতে চেয়েছে কিন্তু পশ্চিমবাদী স্বৈরাচারী বরগুইবা পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারী বেন আলী সরকার তা হতে দেয়নি। পরে আন নাহদার সদস্যরা নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন করে। ঘানুশীর চিন্তা-ভাবনার বিকাশ হয়েছে তার নিজের তিউনিসিয়ার অভিজ্ঞতা এবং মুসলিম দুনিয়ার নানা রকম ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে। গণতন্ত্র সম্পর্কে ঘানুশীর মত হলো এটা পাশ্চাত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ঘানুশী এই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নীতি সমষ্টি যেমন ইজতিহাদ, ইজমা (ঐক্যমত), বায়া (আনুগত্য) এবং শুরা (পরামর্শ)

www.pathagar.com

প্রভৃতির মধ্যে বড় কোন বিরোধ দেখেন না যা কিনা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। ঘানুশী তাই মনে করেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব ঃ

Islam, which enjoins recourse to Shura (consultation) .. .. .. finds in democracy the appropriate instruments (elections, parliamentary system, separation of powers, etc.) to implement the Shura.[১০]

ঘানুশীর কথা হচ্ছে ইজমা-ঐকমত্যের মাধ্যমে ইসলাম প্রধান সমাজে অংশীদারিত্বের সরকার বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চালু করা সম্ভব। ঘানুশী মনে করেন পশ্চিমের মত গণতন্ত্র মুসলিম দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে তিনি নিজে বহুদলীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ঘানুশী মনে করেন আইনের শাসন, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার হচ্ছে একালের সভ্যতার মৌল উপাদান। তিনিও বিশ্বাস করেন এগুলো মুসলিম জগতের তুলনায় আজ পশ্চিমেই ভালোমতো টিকে আছে। তিনি এমন কথাও বলেন, স্বাধীনতা নেই অথচ শরীয়া হচ্ছে সরকারি আইন এমন দেশে থাকার চেয়ে স্বাধীনতা আছে এমন সেকুলার রাষ্ট্রে থাকা অনেক ভালো। একই ভাবে একজন মুসলমান অমুসলিম কোন দেশে বিশেষ করে ইংল্যান্ড বা যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারবে কিনা এর উত্তরে তিনি বলেছেন যে কোন সেকুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে সেটাকে দার-আল-ইসলাম বলাই সঙ্গত, দার-আল-হারব নয়।

ইরান বিপ্লবের সময় পশ্চিমে এমন একটা ধারণা প্রচার করা হয় যার মানে হচ্ছে ইসলামী সরকার হচ্ছে এক ধরনের মোল্লাতন্ত্র। ঘানুশী এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন ইসলামী সরকারের মধ্যকার ব্যবস্থা জনগণের কাছে জবাবদিহিতার ধারণায় পূর্ণ শ্রদ্ধাবান। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

If by democracy is meant the liberal model of government prevailing in the West, a system under which the people freely choose their representatives and leaders, and in which there is an alternative of power, as well as all freedoms and human rights for the public, then the Muslims will find nothing in their religion to oppose democracy, and it is not in their interest to do so anyway.[১১]

ঘানুশী এ প্রেক্ষিতে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন আলজেরিয়া বা তিউনিসিয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামবাদীরা ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপট তৈরি হলে সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইসলামবাদীদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া হয় না। তিনি মনে করেন এ প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দেবে মাত্র। তার ভাষায় ঃ It as if there is a plan to force the Islamic movements to lose faith in democracy and resort to violence.[১২]

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যে আধুনিকতার মানে হলো স্বাধীনতা, সমানাধিকার, রাজনৈতিক বহুত্ব এবং নিয়মিত ক্ষমতার আবর্তন। সেক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর স্বঘোষিত আধুনিকতাবাদীদের কাজকর্ম পুরোপুরি উল্টো। তার ভাষায় ঃ

None of the self-proclaimed modernist elite, neither in our country nor in any other Muslim nation, have proven to be democratically

www.pathagar.com

inclined, let alone instruments of civil, industrial and scientific progress on a scale even marginally near that of the West.[১৩]
তারপরেও ঘানুশীর গণতন্ত্র মুগ্ধতা পুরোপুরি সমালোচনাবিহীন নয়। এর শক্তির দিক স্বীকার করেই বলতে হয় পশ্চিমা গণতন্ত্র খুব বেশিদিন আগেও নারীর ভোটাধিকার মেনে নেয়নি। সব সময় দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও মিডিয়া লবিস্ট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও সংখ্যাগুরুর স্বার্থকে প্রভাবিত করে। একালের গণতন্ত্র নানা সময়ই ক্ষুদ্র জাতিকতা ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছে। এমনকি তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের তাগিদে একালে দুই প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি বৃটেন ও ফ্রান্সকে ঔপনিবেশিক জুলুমবাজ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে এবং একই কারণে আজকালকার যুক্তরাষ্ট্রকে মুসলিম জগতে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছলচাতুরী ও মোনাফেকীর আশ্রয় নিতে দেখা যায়। ইসলামের নীতিতে শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্কের সীমানা নির্দিষ্ট। ঘানুশী এই ইসলামী নীতিকে পুনর্মূল্যায়ন করার পর বলেছেন ইমামাহ (নেতৃত্ব), পরামর্শ (শুরা) ও ঐকমত্যের (ইজমা) ধারণার ভিতর দিয়ে মূলতঃ জনগণের সাথে শাসকের এক ধরনের চুক্তি হয়। এই চুক্তির মানে হচ্ছে জনগণ এমন শাসককে পছন্দ বা নির্বাচন করবে, যে শাসক তার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। অবশ্য এই নির্বাচন প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম হতে পারে। ঘানুশী মনে করেন ইসলামী রাষ্ট্র পশ্চিমের উদারনৈতিক চিন্তাভাবনাকে ব্যবহার করে ইসলামের শুরার (পরামর্শ সভা) ধারণাকে পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে এবং একালের নির্বাচিত সংসদ বা কাউন্সিল, গণভোট এবং পশ্চিমের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের ধারণাকে আত্তীকরণ করতে পারে। যদিও ইসলামী গণতন্ত্র তিনি মনে করেন সমতা ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত তদসত্ত্বেও এর ইসলামী চরিত্র সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনে ধর্ম কোন বাধা নয়, মুসলিম ও অমুসলিম একত্রে একই জাতীয়তার অংশীদার। ঘানুশী কুরআন, হাদিস ও ইসলামী আইনশাস্ত্রের সূত্র ধরে বলেন এ ধরনের অধিকার ইসলামও দিয়েছে। ইসলামে সমানাধিকার ও স্বাধীনতা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রযোজ্য হলেও ইসলামে অমুসলমান নাগরিকদের 'জিম্মি করা প্রসঙ্গে ঘানুশী এমনতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুসলমানরা হচ্ছে শর্তহীন নাগরিক (মুয়াতানাহ আম্মাহ) ও অমুসলমানরা হলো শর্তাধীন নাগরিক (মুয়াতানাহ খাস)। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানরা পূর্ণ নাগরিকত্ব ভোগ করবে কিন্তু অধিকাংশের মত নাগরিকের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে বিশেষ করে রাষ্ট্র প্রয়োজনে অমুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়োগ নাও দিতে পারে।
আবার ইসলামী আইন বা শরীয়াহ সমাজেরও সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু শরীয়াহ যেহেতু সাধারণ নীতির কথা বলে, কালোপযোগী সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না সেক্ষেত্রে অস্থায়ী আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। ইজতিহাদের নীতি ব্যবহার করে আইন প্রণেতারা ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণের জন্য আইন তৈরি করতে পারেন। একইভাবে নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার যেমন ব্যক্তিগত সম্পদের যদৃচ্ছা ব্যবহারকে ইসলামের সামাজিক সুবিচারের নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। আজকাল রাজনৈতিক বহুত্ব (Pluralism) ও সুশীল সমাজের ধারণা মুসলিম সমাজে নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ঘানুশী বহুত্বকে ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অংশ বলে দাবি

www.pathagar.com

করেছেন এবং আন্দালুসিয়ার নজির তুলে বলেছেন সেখানে মুসলিম শাসনাধীন অমুসলমানরা সব রকমের নাগরিক অধিকার নিয়েই বাস করতো। একালের বহুত্বকে একটা শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে নিয়ে পরামর্শ সভাকে (শুরা) শক্তিশালী করা যেতে পারে যাতে আরো ভালোভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়। এমনকি এটা হতে পারে সমতা, সংখ্যাগুরুর শাসন, সংখ্যালঘুর বিরোধিতা, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি নীতির নিয়ামক।

একই ভাবে সুশীল সমাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঘানুশী বলেছেন ইসলামবাদীরা আজকাল শিক্ষা, আইন, অর্থনীতির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ফেলেছে এবং এসব প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য তাদের যথেষ্ট সংখ্যক জনশক্তিও তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পেশাজীবী যেমন শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিকতার জগতে তাদের একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন পেশার নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। তিনি বরং অনুযোগ করেছেন মুসলিম রাষ্ট্রের তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরা সুশীল সমাজকে অনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম রাষ্ট্রের কোন কোন কর্তৃত্বপরায়ণ অথচ আধুনিকতাবাদীর স্বেচ্ছা দাবিদার শাসকরা গণতন্ত্রকে তার নিজের মত করে চলতে দেননি। উল্টো আইনের শাসন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। তার ভাষায় ঃ

Ironically, in their hands, modernization destroyed civil society as the state took control of the administration of education and religious endowments (Waqf) and absorbed or eliminated religious courts (Shariah). At the same time, the modernization programs of autocratic regimes did not promote democracy, the rule of law, and Western values of freedom, including freedom of assembly and association.[১৪]

এখানে ঘানুশীর সতর্কীকরণ লক্ষণীয়। যদিও তিনি পশ্চিমের উদারনৈতিক চিন্তাপ্রসূত সুশীল সমাজের ধারণা গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি মনে করেন সুশীল সমাজ সেকুলারিজমকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ এটি বিভিন্ন মুসলিম দেশে ধর্মের স্থানকে খাটো করেছে অথবা নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। তিনি অবশ্য বলেন মুসলিম দেশের সেকুলারিজম একটা ভুয়া ব্যাপার কারণ এটি অনেক সময় ধর্মীয় প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। ঘানুশী অবশ্য সেকুলারিজমকে এ্যাংলো স্যাক্সন ও ফরাসী এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এ্যাংলো স্যাক্সন সেকুলারিজম ধর্ম ও রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য করে না। কিন্তু ফরাসী ধারা করে এবং ধর্মকে পুরোপুরি নির্বাসনে পাঠাতে চায়।

নয়

রশিদ ঘানুশীর চিন্তা-ভাবনা তৈরি হয়েছে তার নিজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে। তার দীর্ঘ ইসলামী ঐতিহ্য, আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা, স্বৈরাচারী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জীবন যাপন, অন্যান্য মুসলিম দেশ ও তার নেতাদের অভিজ্ঞতা এবং তার পশ্চিমের প্রবাস জীবন ঘানুশীর চিন্তাভাবনার একটি রূপ দিতে সাহায্য করেছে। ঘানুশীর কৃতি হলো তিনি নিছক তাত্ত্বিক হিসেবেই

www.pathagar.com

কাজ করেননি, বাস্তববাদী ইসলামী রাজনীতিক হিসেবেও তার অভিজ্ঞতা প্রচুর। এসব মিলিয়ে তিনি আধুনিককালের উপযোগিতা ও সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন এবং এই কালকে মোকাবিলা করার জন্য তিনি বিকল্প ইসলামী মডেল নির্মাণ করেছেন।

ঘানুশী স্বাপ্নিক তবে অবশ্যই তা বাস্তববর্জিত নয়। এই কারণে তিনি মুসলিম সমাজকে তার অতীত থেকে বের করে বর্তমানের মুখোমুখি করাতে চান। তিনি ইসলামের অতীত নিয়ে চিন্তার পরিবর্তে বর্তমানের ইসলাম ও ইসলাম প্রধান সমাজকে নিয়ে বেশি করে ভেবেছেন এবং তাদের সমস্যা উত্তরণে পথ বাৎলে দেবার কথা চিন্তা করেছেন। একই সাথে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করে তাদের শক্তি ও ক্ষমতার উৎসকেও বুঝবার চেষ্টা করেছেন। নতুন যুগের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে তিনি অস্বীকার করেননি বরং এর ইতিবাচক দিকগুলোকে ইসলামী নীতির আলোকে পুনর্মূল্যায়ন করে মুসলিম সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করার কথাও ভেবেছেন। তার এসব চিন্তার সাথে অনেকের মতান্তর হতে পারে তবে মুসলিম সমাজের সমস্যাকে বুঝে তার থেকে উত্তরণের পথ বের করার ক্ষেত্রে ঘানুশীর প্রচেষ্টাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. New York, Oxford University Press, 2001.
২. Abdel Wahhab El-Effendi, "The Long March Forward", Inquiry (October 1987) : 50.
৩. John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam.
৪. প্রাগুক্ত।
৫. Rachid Ghannoushi, "What We Need is a Realistic Fundamentalism", Arabia (October 1986), 13.
৬. প্রাগুক্ত।
৭. Rachid Ghannoushi, "Deficiences in the Islamic Movement", Middle East Report (July-August, 1988) : 23.
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. Quoted in John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam.
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. Rachid Ghannoushi, "The Battle against Islam", Middle East Affairs Journal 1,2 (Winter 1992) : 7.
১৪. Rachid Ghannoushi, "Secularism in the Arab Maghreb", in Islam and Secularism in Middle East. New York : New York University Press, 1999.

www.pathagar.com

আকবর এস আহ্মদ

এক

একালে মুসলিম বিশ্বের বোদ্ধা যারা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্যদের একজন হলেন আকবর এস আহমদ। এই শক্তিমান পন্ডিতকে এখানে আমরা বিশেষ চিনি না। এডওয়ার্ড সাঈদ বাংলাদেশে পরিচিত, তাকে নিয়ে এখানে তার সহমর্মীদের উচ্ছ্বাসও আমাদের অজানা নয়। সেই তুলনায় আকবর এস আহমদকে নিয়ে এখানে হৈচৈ কম হয়েছে। তার মননশীল লেখালেখি নিয়ে এখানে তেমন একটা আলোচনা হয়নি।

এডওয়ার্ড সাঈদ পাশ্চাত্যের স্থূল সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদের ভিতরে যে ধনতন্ত্রের দর্শন কাজ করছে, যে সুপার মার্কেটজাত কালচার ও ভোগ্যপন্যবাদ মানুষের জীবনে যারপরনাই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই নীতিশূন্য, ভাবশূন্য পাশ্চাত্যের সম্পর্কে সাঈদ উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের মত মৌনতা অবলম্বন করেছেন। সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো আকবর এস আহমদ মৌনি থাকেননি। তিনি যা বিশ্বাস করেন তা তিনি খোলামেলা ব্যক্ত করেছেন। আজকের বিশ্বব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও শান্তিকামিতার জন্য সাম্রাজ্যবাদের দর্শনের বিপরীতে একটি বিকল্প দর্শনের উত্থানের যে গভীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে তিনি নিঃসংশয়। এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির অভ্যুত্থানের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন আজকের পৃথিবীতে অন্য কোন সভ্যতার এরকম কোন নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি নেই যা দিয়ে মানবজাতির উপর ধেয়ে আসা ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের এই ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধ করা যাবে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম ও সভ্যতা একই সাথে নীতিপ্রধান ও সংস্কৃতিপ্রধান, অতএব এটিই হতে পারে ধনতন্ত্রের বিকল্প ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়তি। আকবর এস আহমদের এসব কথার সাথে সকলেই একমত হবেন এমন নয় এবং সে রকম আশা করাও ভুল। কিন্তু তার অপূর্ব ও মনোরম রচনাশৈলী, তার গভীরতর উপলব্ধি অনেক ক্ষেত্রেই কবিতাকে ছাড়িয়ে যায়। সন্দেহাতীতভাবে পাঠক ভিন্নমত সত্ত্বেও তার লেখায় পেতে পারেন অপূর্ব সুস্বাদ।

এডওয়ার্ড সাঈদের সাথে আকবর এস আহমদের এক জায়গায় মিল আছে। এরা দুজনেই নির্বাসিত, মুহাজীর। সাঈদ বিতাড়িত হয়েছেন ফিলিস্তিন থেকে, বড় হয়েছেন মিসরে, পরে কর্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিকানা বেছে নিয়েছেন। আকবরের জন্ম এলাহাবাদে, ১৯৪৩ সালের ১৫ জানুয়ারি। তার পিতা সালাহউদ্দীন আহমদ ছিলেন জাতিসঙ্ঘের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সাতচল্লিশের দেশবিভাগ ও দাঙ্গা মাত্র চার বছর বয়সে তাকে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে গৃহহারা করেছিল। তারা দেশান্তরী হয়ে আসেন পাকিস্তানে। আকবর তার স্মৃতি থেকে জানিয়েছেন তারা যে ট্রেনটিতে দিল্লী থেকে লাহোরে আসেন তার মাত্র আগের ট্রেনটি শিখদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং উপদ্রুত ট্রেনটি লাহোর পৌছে মুসলমানদের লাশ নিয়ে। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে নতুন রাষ্ট্র

www.pathagar.com

পকিস্তানে আরও অনেক মুজাহীরের মত তারা নাগরিকত্ব নেন।

সাঈদ ফিলিস্তিন ছেড়েছিলেন কিন্তু ফিলিস্তিনকে কি তিনি ভুলতে পেরেছিলেন? ফিলিস্তিন ছিল তার কাছে এক তীব্রতম যন্ত্রণার নাম। সাঈদের মত আপন জন্মস্থান থেকে উৎখাত হওয়া আকবর এস আহমদও তার অন্তর্জগতে নির্বাসনের বেদনা বহন করে নিয়ে বেড়ান। এ তার লেখালেখিতে অনেকটা স্পষ্ট। ফিলিস্তিনীদের দুর্দশা সাঈদকে যেমন ভাবিয়েছে তেমনি ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা ও বেদনাও আকবরকে পীড়িত ও জর্জরিত করেছে।

ভারতীয় মুসলমানদের মনঃকষ্টকে আকবর গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। মুসলমানরা ছিল একসময় ভারতের শাসক। তারা ছিল একটা বিরাট ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নির্মাতা। ভাগ্যের ফেরে এই নির্মাতা ও স্রষ্টার অবস্থান থেকে তারা আজকের ভারতে সংখ্যালঘুত্বের পর্যায়ে নেমে এসেছে। ভারতীয় রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির কোন পর্যায়েই তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা আজ দৃশ্যমান নয়। এই অবস্থা তাদেরকে ভারতীয় সমাজ জীবনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এই বিচ্ছিন্নতা আনছে বিষাদ ও হতাশা। এভাবে সেখানকার মুসলমানরা হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ অবস্থাকে আকবর এস আহমদ বলেছেন Andalus Syndrome। আন্দালুসিয়ার মুসলিম সভ্যতার সাথে ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার সাদৃশ্য টানার পিছনের যুক্তি প্রসঙ্গে আকবর বলেছেন আন্দালুসিয়ার মুসলিম সভ্যতা আজ নেই, সেটি আজ স্পেন। ভারতের মুসলিম সভ্যতাও আজ ক্ষয়িষ্ণু, বিবর্ণ। আকবরের ভাষায় শোনা যাক এখানকার মুসলমানদের মনোবেদনা ঃ

A forlorn nostalgia, a pain, an emotion sometimes too deep for words, haunts these societies. Andalusians in Morocco prominently displayed the keys of their former homes as symbols of the lost land. Hyderabadis in Karachi continue to eat Hyderabadi food and wear Hyderabadi clothes on special occasions, preserved as a part of their lost, cherished civilization. The Andalus syndrome creates a neurosis, a perplexity, in society. It is a yearning for a past that is dead but will not be buried, a fear of an unreliable future which is still to be born.[১]

মুহাজীরের হৃদয়ের এই অনন্ত রক্তক্ষরণ আকবরের মানসগঠনের পশ্চাৎভূমি হিসেবে কাজ করেছে। এই রক্তক্ষরণের বেদনা বুঝতে না পারলে আকবরকে বোঝা যাবে না। দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভারত তিনি ছেড়ে এসেছেন কিন্তু সেখানকার মুসলমানদের তিনি একদম ভুলেননি। তারপর শুধু ভারত নয়, কাশ্মীর, প্যালেস্টাইন, বসনিয়া সারা দুনিয়ার নিপীড়িত মুসলমানদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছেন-তাদের অধিকার আদায়ের পক্ষে লেখালেখি করেছেন। একজন দেশান্তরী মুহাজীরের পক্ষে প্রথমে পাকিস্তান, পরে কেমব্রীজ ও ওয়াশিংটনে বসে নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষে লেখালেখি-এ ঘটনার রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করার বিষয়।

দুই

পাকিস্তানে আসবার পর পিতার চাকরি সূত্রে অ্যাবটাবাদে স্থিত হয় আকবর পরিবার। এখানেই তার লেখাপড়ার হাতে খড়ি। এখানকার ইংরেজী স্কুল থেকে আকবর

www.pathagar.com

ডিসটিংশনসহ ১৯৫৯ সালে সিনিয়র কেমব্রীজ পাশ করেন। পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বি এ পাস করেন এবং তার মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদক পান। ১৯৬৫ সালে আকবর কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসটিংশনসহ শিক্ষায় ডিপ্লোমা নেন এবং ১৯৭৮ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিনি পিএইচডি করেন। এর মধ্যে ষাটের দশকের শেষ দিকে (১৯৬৬) আকবর পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। সেই সুবাদেই তিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমে জামালপুর, পরে নড়াইলে এসডিও হিসেবে পদায়ন পান। এই বুদ্ধিজীবী প্রশাসকের (Scholar-adminstrator) মনঃশ্চক্ষে তখনই প্রতিভাত হয় তিনি এমন এক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছেন যখন পাকিস্তান ভাঙ্গার সব কাজই শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা বাকি।

আকবর এস আহমদ কর্ম ও পেশাসূত্রে প্রশাসক হলেও পড়াশোনার দিক দিয়ে ছিলেন একজন নৃবিজ্ঞানী, যার কাজের মধ্যে পড়ে সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কগুলো খতিয়ে দেখা। অন্যদিকে আকবর নিজে ছিলেন মুহাজীর। মুহাজীর ও নৃবিজ্ঞানীর চোখ দিয়েই তিনি হয়তো তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ও সংস্কৃতিকে দেখেছেন। দেশান্তরী উর্দুভাষীরা আকবরের নজরে আসে, যারা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে বিহারী হিসেবে যতখানি পরিচিতি পায়, মুসলমান হিসেবে ঠিক ততখানি পরিচিতি পায় না। আবার বাঙ্গালী-বিহারীর পারস্পরিক সম্পর্ক স্বার্থবুদ্ধি ও হীনম্মন্যতার দ্বারা পরিচালিত হয়, ধর্মের ঐক্য ঠিক এখানে কাজ করে না। আকবর এই অপরিচয়ের মধ্যে পাকিস্তান ভাঙ্গার সূত্র খোঁজেন।

আকবর একাত্তর সালের ঘটনাকে শুধুমাত্র প্রচলিত ধারণা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর উপর পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতনের ফল মনে করেন না। এ ধরনের ঘটনার পিছনে যে ঘটনা পরম্পরা কাজ করেছে সেটাও বিবেচনার কথা বলেন। বাংলাদেশের তত্ত্বীয় ভিত্তি দাঁড় করানোর জন্য অনেক রকমের যুক্তি দেয়া হলেও, এটাও সত্য পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ছাড়া বাংলাদেশ আন্দোলনের ইতিহাস কোনক্রমেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। সারা ভারতের মুসলমানদের মিলিত সংগ্রামের ফসল ছিল পাকিস্তান, তখন বাংলাদেশের মুসলমানরা কোন বিচ্ছিন্ন সত্তা ছিল না। মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু পাকিস্তানের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। একাত্তর সালের ঘটনাকে আকবর মনে করেন পাকিস্তানের দুঅঞ্চলের মুসলিম নেতৃত্বের 'ঐতিহাসিক ব্যর্থতা' হিসেবে, যারা কওমের স্বার্থের চেয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে এই বিবাদের সুযোগ নিয়েছিল ইসলামের শত্রুরা।

একাত্তর সালে আকবর প্রাণ হাতে নিয়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যান যেমন তিনি একবার শৈশবে পালিয়েছিলেন ভারত থেকে। কিন্তু ততদিনে প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। প্রথমবার পালান অমুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, এবার নিজের মুসলমান ভাইই হন্তারক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। আকবর গভীরভাবে এ অবস্থাগুলোকে বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলমানদের এই চিন্তার রূপান্তর ও পর্বান্তরকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

www.pathagar.com

তিন

একাত্তরে প্রাণ ফিরে পাওয়া আকবর দমে যাননি। পাকিস্তানে ফিরে তিনি তার প্রশাসনিক চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। একই সাথে তিনি তার বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পূর্ণ উৎসাহের সাথে চালিয়ে যান। প্রশাসনিক চাকরির সুবাদেই তিনি পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলগুলোর মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনধারার কাছাকাছি চলে আসেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরিস্তানে প্রশাসক (১৯৭৮-৮০) হিসেবে কাজ করেন। এখানে তিনি তার নৃবিজ্ঞানের পটভূমিকে ব্যবহার করেন। তার নজরে আসে পশ্চিমের নৃবিজ্ঞানীরা অনেক মেধাবী কাজকর্ম করা সত্ত্বেও বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চল ও বসতি সম্পর্কে তাদের মতামতের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদী মানসিকতার বৃত্ত অতিক্রম করতে পারেননি। মুসলিম জনপদ, তাদের বিশেষ চরিত্র বৈশিষ্ট, জীবনধারা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এইসব নৃবিজ্ঞানীরা কখনো কখনো খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তারা সেই পুরনো প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের কাঠামোকে ব্যবহার করে একপেশে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। সেটা করতে গিয়ে কোন বিশেষ মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তারা আকবরের ভাষায় একটা প্যারোডী করতে পেরেছেন, নৃবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বৃত্ত স্পর্শ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আকবর আরো উল্লেখ করেছেন এই সব সাম্প্রদায়িক নৃবিজ্ঞানীরা নিজেদেরকে সভ্য অবস্থানে স্থিত রেখে কোন কোন মুসলিম উপজাতি সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন এমনিভাবে ঃ Tribesmen ar constantly killing each other or engaging in war. আর নিজেদের সম্পর্কে তাদের মতামত রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক ঃ Civilized nations, on the other hand, live in 'peace'.[২]

এই তুলনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আকবর লিখেছেন ঃ The comparison never fails to amuse me. It is made by members of the civilized nations who in this century alone have plunged the entire world into wars that lasted for years at a toll of millions of lives.[৩]

পশ্চিমের তথাকথিত সভ্যতার এই সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আকবর একালে দাপটের সঙ্গে লিখেছেন, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের তথাকথিত পন্ডিতদের এই সব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রোপাগান্ডা ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই যে জরুরী হয়ে উঠেছে এ সম্পর্কেও তিনি সদাসচেতন। আজকে পশ্চিমের এই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক লড়াইয়ের বিপক্ষে নীতি ও কৌশল প্রণয়নে আকবর মনে করেন মুসলিম বুদ্ধিজীবিতার জগতকে সতেজ ও ফলবান করে তুলতে হবে। বহুদিন হলো মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দৈন্যদশা ও ঊষরতার কারণে ইসলাম প্রধান দেশগুলোকে নিয়ে পশ্চিমের রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা এক ভয়ানক মাত্রা অর্জন করেছে। আকবরের অনুভব, আমাদের জন্য অনুধাবনীয় বটে ঃ

The Muslim intellectual confronting the world today is sometimes moved to despair. He is ill-equipped to face it. His vulnerability diminished him in his own eyes. He wanders between two worlds, one dead, the other powerless to be born. His wounds are largely self inflicted. At the root of his intellectual malaise lies him incapacity to come to terms with Islam in the twentieth century.[৪]

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে আকবরের একটা বড় কাজ হচ্ছে আধুনিক নৃবিজ্ঞানকে মুসলিম হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা। এতকাল মুসলিম সমাজকে খ্রিস্টান ইউরোপের পন্ডিতরা তাদের মত করে নির্মাণ করেছেন, আকবর কিছুটা হলেও এর জওয়াব দিয়েছেন। বিশেষ করে পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিদের জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসগুলো নিয়ে তার মৌলিক ও গবেষণাধর্মী লেখালেখি উল্লেখ করবার মতো। এসব লেখার বিশেষ কয়েকটি হচ্ছে ঃ

১. Millenium and Charisma among Pathans : A Critical Essay in Social Anthropology.
২. Pakhtun Economy and Society : Traditional Structure and Economic Development in a Tribal Society.
৩. Religion and Politics in Muslim Society : Order and Conflict in Pakistan.
৪. The Social Structure and Organization of Early Muslim Society.

আকবর এস আহমদ আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে নজর টেনে ধরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন আধুনিক নৃবিজ্ঞান পড়লে মনে হতে পারে এটি বুঝি পশ্চিমের সৃষ্টি, বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটিকে মর্যাদাবান করে তোলা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানী বলতে আমরা আজকাল এমিল ডারকহিম, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, ইভানস প্রিটকার্ড, এডওয়ার্ড টাইলর, ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ প্রমুখকেই বুঝি। প্রকৃতপক্ষে নৃবিজ্ঞানের স্রষ্টা মুসলমানরা এবং আলবেরুনী হচ্ছেন নৃবিজ্ঞানের জনক। তার কিতাবুল হিন্দ হচ্ছে সেকালের দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সমাজ সংস্কৃতির এক অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণের নাম। আকবরের ভাষায় ঃ

If anthropology is a science based on extended participant observation of (other) cultures using the data collected, for value-neutral, dispassionate analysis employing the comparative method, then al Biruni is indeed an anthropologist of the highest contemporary standards.[৫]

আকবর দুঃখ করেছেন মুসলিম বুদ্ধিজীবিতার এই উচ্চাঙ্গের মান, মননশীলতা, সজীবতা পরবর্তীকালে হারিয়ে যায় এবং ইবনে খলদুন, ইবনে বতুতা, আল মাসুদী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর মতো নৃবিজ্ঞানের জগতে মেধাবী অবদান রাখার মতো আর কাউকে দেখা যায় না। আকবর নৃবিজ্ঞানের এই গৌরবোজ্জ্বল ধারার পুনর্জীবনের কথা বলেছেন এবং একালে নৃবিজ্ঞানের ইসলামী পরিপ্রেক্ষিত তৈরির ব্যাপারে জরুরী অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে তার বই Toward Islamic Anthropology একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা। পশ্চিমের নৃবিজ্ঞানীরা যে রকম করে সাম্প্রদায়িক ঔচিত্যবোধে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম সমাজের সমালোচনা করেছেন, আকবর মনে করেন মুসলিম নৃবিজ্ঞানীরা এই ত্রুটি দূর করতে পারবেন। কেননা ইসলামের বিশ্বচেতনায় তাদের চোখ দৃষ্টিমান হয়ে উঠবে। তার ভাষায় ঃ

We may define Islamic Anthropology loosely as the study of Muslim groups by scholars committed to the universalistic principles of

www.pathagar.com

Islam-human knowledge, tolerance-relating micro village tribal studies in particular to the larger historical and ideological frames of Islam. Islam is here understood not as theology but sociology. The definition thus does not preclude non-Muslims.[৬]

একালে Islamic Anthropology'র এই নবযাত্রায় আকবরকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন, বরেণ্য চিন্তাবিদ, জ্ঞানের ইসলামীকরণের ধারণার অগ্রনায়ক অধ্যাপক ইসমাইল রাজী আল ফারুকী।

ইসলামী নৃবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে আকবর আর একটা জরুরী কথা বলেছেন। সেটা হলো মুসলিম সমাজের একান্ত কতকগুলো শব্দ যেমন উম্মাহ, জিহাদ, মোল্লা, হালাল, হারাম, ফতোয়া, হিযাব যা তার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক প্রভৃতিকে পশ্চিমী প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষন করলে চলবে না। মুসলিম পটভূমি থেকেই এর ব্যাখ্যায়ন জরুরী, নয়তোবা এটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সংহতি দুর্বল করে দেবে। মোটকথা ইসলামী নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় মানবিক দৃষ্টিকোণটা খুবই জরুরী, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ নয়। একজন মুসলিম নৃবিজ্ঞানী আকবরের ভাষায় শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবেন ঃ

In the end the anthropologist must transcend himself, his culture, his universe, to a position where he is able to speak to and understand those around him in terms of his special humanity irrespective of color, caste or creed.[৭]

আকবরের এ কথাটা যে গভীরভাবে বোঝার বিষয়, তা বলাই বাহুল্য।

চার

আকবর এস আহমদের মতো শক্তিশালী পন্ডিত ও মানববিজ্ঞানী শেষ পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকেননি। ২০০০ সালে তিনি নিজেকে পূর্ণরূপে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। বিভাগীয় কমিশনার, সেন্টার ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোশাল সায়েন্সের পরিচালক, সীমান্ত প্রদেশের সমবায় ব্যাংকসমূহের রেজিস্ট্রার, পাকিস্তান সরকারের অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্র সচিব এবং শেষমেষ বৃটেনে পাকিস্তানের হাইকমিশনার এই ছিল তার দীর্ঘ চাকরি জীবনের উজ্জ্বল ধারাবাহিকতা। এর মধ্যে তিনি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল ফেলো ও পরে ওয়াশিংটনের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইবনে খলদুন চেয়ারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এর আগেই তিনি পশ্চিমের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন প্রিন্সটন, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে দাপটের সঙ্গে পড়িয়েছেন। আকবর চাকরি ও শিক্ষকতার পাশাপাশি এক নবঅভ্যুত্থানকামী ইসলামের ছবিও এঁকেছেন। তার মতে ইসলাম ধর্ম হিসেবে বরাবর সাবলীল, স্পর্শকাতর এবং সক্রিয় এক রাজনৈতিক চেতনা। এই সাবলীল ধর্ম, যার শক্তির উৎস হচ্ছে নৈতিক ঐশ্বর্য, তা আজকের পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিপজ্জনক ও উদগ্র প্রচারণায় এক ভয়ানক চেহারা নিয়েছে। আকবর মিডিয়ার এই বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আকবর মনে করেন কমিউনিজমের পতন, বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধনতন্ত্রের অসফল চেহারা পুরো ইসলামী বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে এবং তৃতীয় বিকল্প হিসেবে

www.pathagar.com

ইসলামের পদধ্বনি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। নতুন রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাস, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবোধের নীরব প্রয়াস, মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ইসলামী বিশ্বকে নতুন পরিমন্ডলে জাগিয়ে তুলেছে। এরই প্রেক্ষিতে আদর্শিকভাবে অবক্ষয়িত পাশ্চাত্য ইসলামের সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং ইসলামপ্রধান দেশগুলোকে নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আকবর এস আহমদ এইকালের প্রেক্ষিতেই ইসলামকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যে কাল কিনা ইসলাম বৈর, নীতিশুন্য, ভাবশূন্য, বস্তুবাদের নর্দমায় পুরোপুরি নিমজ্জমান। ইসলামকে আজ এমন একটা সময়ের সাথে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে যখন কিনা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে আন্তঃসাংস্কৃতিক সীমানা আর আগেকার মত থাকছে না, লিঙ্গ পার্থক্যের আগেকার ধারণাটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, শত্রুমিত্রের সীমানা মুছে গিয়ে নতুন রকমের শক্তি বিন্যাস তৈরি হচ্ছে। এই নতুন সময়ের আলোকে ইসলামের অবস্থানকে তিনি তুলে ধরেছেন তার বিখ্যাত বই Post Modernism and Islam : Predicament and Promise-এ। এ বই আকবরের ম্যাগনাম ওপাস, তার দুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতার নজির। এ বইয়ে আকবর দেখাতে চেষ্টা করেছেন একালে ইসলাম তার অন্তর্গত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অবিকৃত রেখে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে, কিভাবে শক্তিশালী পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় দাঁড়াবে আর কিভাবেইবা তার ভবিষ্যৎ নিয়তি নির্মিত হবে?

আকবর বলেছেন পশ্চিমের মূল্যবোধ মানবজাতির জন্য যতনা উপকারী, তার চেয়ে অনেকবেশী ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। পশ্চিমের সুপারমার্কেটজাত কালচার, তার ভোগ্যপণ্যবাদী চৈতন্য, তার সর্বনেশে ও আপত্তিকর সবজীবন ধারা, বিবাহ বিচ্ছেদ, ড্রাগ, এ্যালকোহল, লুপ্তপ্রায় পারিবারিক জীবন এই পৃথিবীর মানবকুলের অবধারিত ঠিকানা হতে পারে না। মানুষের জীবন এর চেয়ে বেশি মুল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধময়। পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা এই সর্বনাশ থেকে রক্ষার জন্য আকবর এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির অভ্যুত্থানের কথা বলেছেন, যা কিনা ইসলামের মধ্যে আশ্চর্য রকমের সজীব। পশ্চিমী সভ্যতা ও ইসলামের ভিতরকার জীবনদৃষ্টি ও চৈতন্যের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে আকবর একটা সুন্দর তুলনা দিয়েছেন। আকবর Shopping Mall গুলোকে বলেছেন পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণভোমরা কারণ এর মধ্যেই সেখানকার ভোগ্যপণ্যবাদী কালচারের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ, বিশ্বাস, ও প্রশান্তি যাকে অবিরত ঘিরে রাখে। আকবরের ভাষায় শোনা যাক এই প্রতিতুলনার ধ্বনি ঃ

In the present post modernist era the mall for the Americans is the contemporary equivalent of the mosque. It acts as a social focus, and people go to it faithfully, daily, for renewal and companionship. The mall represents an explosion of consumerist images which appeal to the senses. It is the consumerist pleasure-dome and its seductive charms are available round the clock .. .. ..The mall is the 'total experience', a metaphor for the hyperreality of post modern life .. ..

www.pathagar.com

In contrast, the mosque brings the believer away from the maelstrom of daily life, suspending it. Calmness and peace characterize it. The believer is encouraged to think of the timelessness of God and the perishability of life on earth. However, like the mall,the mosque has been a remarkable growth, in its numbers in recent years . ... . . The mall and the mosque, one a paradise of colour and fun,the other a paradigm of piety, suggest alternative life-stlyles, opposing philosophies.[৮]

আকবরের এই কথার সাথে না হয় একমত হওয়া গেল, কিন্তু অবক্ষয়িত পশ্চিমের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য ইসলামের অন্তর্গত শক্তিইবা এখন কতটুকু অবশিষ্ট আছে সে আলোচনাটাও জরুরী। জনসংখ্যা, ধর্মবিশ্বাসের বিস্তারের ধরন, সাংস্কৃতিক ঐক্য এগুলো অনেকখানিই আছে কিন্তু যে নৈতিক শক্তির বলে ইসলামকে পাশ্চাত্যের বিকল্প মনে করা হচ্ছে, সেই নৈতিক শক্তি আজ ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে কতটুকু বর্তমান? একটা আদর্শের শক্তি অনুমিত হয় তার অনুসারীদের ব্যবহারিক জীবনে। এককালে ইসলাম অনুসারীরা বিশ্বব্যবস্থার চালকের আসন গ্রহণ করেছিল। কেননা ঐ আদর্শের ভিত্তিতে তারা একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পেরেছিল। আজকের মুসলিম সমাজ কি সেরকম কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিক শক্তি রাখে? আকবর নিজেই লিখেছেন ঃ

The modern period had led Muslims in to a cul-de-sac. Dictators, coups, corruption and nepotism in politics ; low education standards ; an intellectual paresis ; the continuing oppression of women and the underprivileged and grossly unequal distribution of wealth were some of its characteristics . . . . The reality of Muslim life was a far cry from the edifying and noble Islamic ideal .. ... [৯]

ইসলাম বলতে তাহলে আমরা কি বুঝব? আর ইসলাম অনুসারীদের এই অবক্ষয়ের জন্যই বা কাকে আমরা দায়ী করব? আকবর এসব প্রশ্নে বলতে চেয়েছেন মুসলমানের এই বিপর্যয়ের জন্য সে নিজেই দায়ী। সে যখন ইসলাম ছেড়েছে, প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি ত্যাগ করেছে তখন থেকেই তার উপরে নেমে এসেছে যাবতীয় রকমের জুলুম ও নৈরাজ্য। আকবরের ভাষায় ঃ These are Muslim lapses, a sign of social decay, not Islamic features.[১০]

তাহলে ইসলাম অনুসারীরা কোন প্রত্যয় নিয়ে আজ ঘুরে দাঁড়াবে? আকবর লিখেছেন মুসলমানদের ইসলামের আয়নায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়তি লিখতে হবে। অপরের আয়নায় মুখ দেখলে চলবে না। একজন মুসলমানকে তার জীবনের সাথে ধর্মের সাযুজ্য রক্ষা করে চলতে হবে। দুনিয়া ও দীনের মধ্যে সমতা রক্ষা করা চাই। অর্থাৎ কেবল ধর্ম কিংবা কেবল কর্ম নয়- দুটিরই সমান প্রয়োজন আছে, এটি যেন মনে থাকা চাই। আকবরের নিজস্ব জবানীতে শোনা যাক ঃ

Balance is essential to Islam and never more so than in society ; and the crucial balance is between din (religion), and dunya (world) ; it is a balance, not a separation, between the two. The Muslim lives in the

www.pathagar.com

now, in the real world, but within the frame of his religion, with a mind to the future after life . .. . Islam is essentially the religion of equilibrium and tolerance . ... . [১১]
এর সাথে আকবর যোগ করেছেন কুরআনের সেই বিশ্ববিক্ষার কথা। মুসলমান যদি সেটা পুনরায় গ্রহণ করে তাহলে তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কুরআনের এই গোপন সূত্রটি কি? আকবরের ভাষায় ঃ
Contral Quranic concepts of adl and ahsan, balance and compassion, of ilm, knowledge, and sabr, patience.[১২]
মুসলমান কি আজ সেরকম কিছু করবার জন্য প্রস্তুতি নেবে?

পাঁচ

আকবর এস আহমদ আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। এগুলো হলো ঃ

১. Discovery of Islam : Making Sense of Muslim History and Society.
২. Islam Today : A short Introduction to the Muslim World.
৩. Living Islam : From Samarkand to Stronway.

এ বইগুলোর অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যে যেমন একটা ঐক্য আছে, তেমনি এর রচনাশৈলীর মাধুর্যতাও লক্ষণীয়। আকবরের লেখার মধ্যে তার যন্ত্রণার উপলব্ধি ও রক্তক্ষরণের চিহ্ন স্পষ্ট। এই রক্তক্ষরণের উৎস যে একালের ইসলাম তাতে সন্দেহ নেই। আকবর নিজেই লিখেছেন ঃ As a Muslim I can not write this book as a neutral spectator or observer. I am also a participant, an actor in the drama. Muslim triumphs stir me, Muslim failures create despair in me.[১৩]
এই যন্ত্রণা সম্ভব উপলব্ধি নিয়েই আকবর আজকের দিনে ইসলামের অবস্থানকে চিহ্নিত করার জন্য উদগ্রীব। এই আকাঙ্ক্ষার ফসল হচ্ছে এ বইগুলো।
আজকের মিডিয়া, প্রকাশনা ও বুদ্ধিজীবিতার সর্বত্রই ইসলামের একটি বিবর্ণ, নেতিবাচক চেহারা উন্মোচিত। পশ্চিমেতো এটি একটি ভয়ানক সর্বনাশা ধর্ম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ইসলাম বলতেই এখন বুঝায় ধ্বংস, হত্যা, মারণযজ্ঞ, ধর্মান্ধতা, ঘৃণা ও বিশৃঙ্খলার প্রতিরূপ হিসেবে। ইসলামের এই ছবি বেড়ে উঠেছে পশ্চিমের ইসলাম বিষয়ে ভয়ানক এক বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। আকবর লিখেছেন এটি ইসলামের নিয়তি হতে পারে না। ইসলাম হচ্ছে কুরআনের ভাষায় মধ্যপন্থা, উম্মাহ-ই-ওয়াস্ত। এটি হচ্ছে নিপীড়িতের শরণ, জালিমের মৃত্যুঘন্টা। বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতার কোন স্থান নেই ইসলামে অথচ বৈরী মিডিয়া ইসলামের উপর সেই অপবাদই নিরন্তর আরোপ করে চলেছে। আকবর মনে করেন আজকের যুগ যেমন ইসলামকে অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি এ যুগের আত্মার সাথেও ইসলামকে এক সাথে কাজ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে যুগের অনাচার, অপবাদের জঞ্জালের তলা থেকে ইসলামের পুনরাবিষ্কার চাই। ইসলামের প্রকৃত রূপ, ছবি বিশ্ব সমাজের কাছে বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরা চাই। এ বইগুলোতে আকবর সে কাজটিই করেছেন। এখানে তার লেখার ধরনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কখনো ঐতিহাসিকের মতো, কখনো সমাজবিজ্ঞানীর মতো, কখনোবা

www.pathagar.com

নিজের জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে তিনি ইসলামের একটি মানবিক, কল্যাণপ্রদ চেহারা তুলে ধরেন। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে তার লেখার ধরনের সাথে মনস্বী ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খলদুনের লেখার অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। অধ্যাপক আকবর এস আহমদ উঁচু মননশীলতা ও মেধার প্রশ্রয়ে যেমন ইসলামের ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করেন তেমনি সমাজবিজ্ঞানীর মতো সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেন। আকবর যেমন একদিকে মুসলমানদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-প্রপাগান্ডা ও যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে আপোসহীন লেখালেখি করেন তেমনি নিজ সমাজের সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। এভাবে আকবর মুসলিম সমাজের ভিতর-বাহির এই উভয়কার সংগ্রামের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেন।
ইসলামের রূপ-রঙ, শক্তি ও সৌন্দর্য মনোরম ভাষায় ও মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলতে আকবরের যেন ক্লান্তি নেই। ইসলামের বিশ্বজনীনতা, শক্তিমানতা, কল্যাণকামিতার দিকে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বারবার। সাম্রাজ্যবাদী প্রোপাগান্ডার জাল ছিঁড়ে ফেলে তিনি বারবার আমাদেরকে ইসলামের উপযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ফ্রি ট্রেড, ফ্রি ট্রাভেল, ফ্রিডম অব থট এবং এক্সপ্রেশন, যুক্তি, বিজ্ঞান ইত্যাকার আধুনিকতার কোন elements ইসলামের মধ্যে নেই। এমনকি ইসলামে মুসলিম নারীর অবস্থান নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে তিনি তার শানিত যুক্তিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে তার শত্রুদের নিষ্ঠুর প্রচারনা। আকবর বলেছেন মুসলিম মানসের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার পরিবার, তার প্রিয় সংসার। এই সংসার যার কর্তৃত্বে সেই নারীর অধিকার ইসলামে যেরকমভাবে স্বীকৃত হয়েছে পাশ্চাত্যের ভোগ্যপণ্যবাদী সমাজে সে অধিকার কি একইরকমভাবে দেওয়া হয়েছে? সেখানকার সমাজে নারীর জীবন ভোগ্যপণ্যবাদের গলগ্রহে নিমজ্জিত। নারী সেখানে বিজ্ঞাপনের মডেল, রমরমা ব্যবসা ও বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের হাতিয়ার। কিন্তু ইসলামে চিরন্তন নারীর মর্যাদা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম সমাজে নারীর ঃ

have the right to inherit property, to divorce, to demand a say in the house and in public life, to conduct business and to have access to information and knowledge.[১৪]

এ যদি আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্য না হয়, তবে আর কাকে আধুনিকতা বলবো ?
আকবরের লেখা পড়লে আমাদের চক্ষু দৃষ্টিমান হয়ে ওঠে, আমাদের মনের সব কালিমা ও হীনম্মন্যতা কেটে যায়। বছরের পর বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে ইসলাম সম্পর্কে যে অনৈতিহাসিক ইমেজ গড়ে তুলেছে আকবরের লেখা এর বিরুদ্ধে এক তুমুল প্রতিবাদ। তার লেখা পশ্চিমের তৈরি এই মিথ্যা ইমেজের বিরুদ্ধে এক দুধারী তলোয়ার, যা কিনা এই মিথ্যার বুক এফোড় ওফোড় করে দিয়েছে।

ছয়

আকবর এস আহমদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও মননশীল কাজ হচ্ছে এ বইটি ঃ Jinnah, Pakistan and Islamic Identity : The Search for Saladin। কায়েদে আযমের উপর যতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে, এ বই নির্দ্বিধায় বলা যায়

www.pathagar.com

সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আকবর ঘটনার গভীরে গিয়ে ঘটনার নিরপেক্ষ ও দরদী বিশ্লেষণ করেছেন।

কায়েদে আযমকে তার জীবনের শেষদিকে এসে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও আবাসভূমির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। এ কারণে তাকে এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জেহাদে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং তার প্রতিপক্ষ ছিল একদিকে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে তার সহযোগী হিন্দু কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবে এ যাবৎকাল সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী মিডিয়া কায়েদে আযমের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি নানাভাবে খাটো করার চেষ্টা করেছে এবং তার চরিত্র হননের সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করেনি। দুর্বল মুসলিম মিডিয়ার সাধ্যে কুলোয়নি এর প্রতিবাদ করা। সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের সৃষ্ট কুয়াশা ও চক্রান্তের তলা থেকে কায়েদে আযমের প্রকৃত রূপটি আকবর তুলে এনেছেন তার বইয়ে অসীম মমতা ও মনস্বিতার সাথে।

পলাশী এবং পরবর্তীকালে ১৮৫৭'র ব্যর্থ বিপ্লবের পর ভারতে মুসলমানদের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। তাদের শৌর্য ও গৌরবের দিন বিলীয়মান হয়ে আসে। সেই কালে ইঙ্গ-হিন্দু যৌথ বৈরিতার মুখে তারা একটি প্রান্তিক অবস্থানেও চলে আসে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জনের কাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে এই সব জীর্ণ, শীর্ণ, লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত মুসলমানদের প্রাণের কথাকে যথার্থ অর্থেই প্রতিবিম্বিত করেছিলেন কায়েদে আযম, বিশেষ করে তাদের নিশ্চিত অবক্ষয় ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন। মুসলমানরাও এমনি একজন মুক্তিদাতাকে সেদিন খুঁজে ফিরছিল। এ কারণেই আকবর কায়েদে আযমকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সালাদীন হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন। সালাদীন যেমন করে ক্রুসেডের অভিশাপ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন, তেমনি করে কায়েদে আযম ভারতীয় মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আমাদের এখানে নানা রাজনৈতিক বিকার ও কুয়াশায় আটকে কায়েদে আযম রীতিমত অচ্ছ্যুৎ জীবে পরিণত হয়েছেন। মুসলমানদের জন্য তার হিমালয়সম অবদানকে কোন প্রকার বিবেচনায় না এনে আমাদের আত্মঘাতী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে এই মনস্বী রাজনীতিবিদের নাম নেয়াও যেন রীতিমত আতঙ্ক এবং উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানের জাতীয় আন্দোলনে তার চেয়ে অনমনীয় ও আপোসহীন ভূমিকা আর কে রেখেছে? সেসব কথা না মনে রেখে তার প্রতি আমরা যে আচরণ দেখিয়েছি তা আমাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক হীনম্মন্যতার বর্বর দৃষ্টান্ত বৈ অন্য কিছু নয়। আকবর এস আহমদের এই গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী বই আমাদের অতীত ও শিকড় সন্ধানী গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আমাদের চলমান রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বর্বরতা নির্মূলীকরণের জন্য জরুরী পাঠ্য।

আকবর, কায়েদে আযমের উপর আর একটি বই লিখেছেন, এটির নাম The Quaid : Jinnah and the Story of Pakistan। বইটি উপন্যাসের ভঙ্গিতে লেখা। এটিকে তিনি চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, আকবর একজন খ্যাতনামা চিত্রনির্মাতা। তিনি বিবিসিতে দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রচারিত মুসলিম সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনধারা নিয়ে

www.pathagar.com

একটি সিরিজ চিত্রেরও নির্মাতা ও প্রযোজক। এই জনপ্রিয় টিভি সিরিজটিই পরে Living Islam নামে প্রকাশিত হয়।

সাত

নাইন ইলেভেনের পর মুসলিম সমাজ ও সভ্যতার অন্তর্গত সংকট ও টানাপড়েন নিয়ে আকবরের একটি মূল্যবান গ্রন্থ হলো Islam Under Siege। এর উপশিরোনাম হচ্ছে Living Dangerously in a post-Honor World। নাম পড়লেই বোঝা যায় এর পিছনে নৃতাত্ত্বিকের হাত ও মন সক্রিয় রয়েছে। বইটিতে আকবরের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ মুসলিম সমাজ নিয়ে তার যন্ত্রণা সম্ভব উপলব্ধির পরিচয়।

আকবর এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের বর্তমান বিপর্যয়কে বিশ্লেষণ করে এটিকে বলেছেন Post Honor World, যেখানে নাকি আজ আমরা বাস করছি। এর থেকে বের হওয়ার জন্য তিনি একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছেন যাতে বৈশ্বিক কল্যাণ অর্জিত হতে পারে। সন্ত্রাস আর চরমপন্থা দূর করার জন্য তিনি সভ্যতার সংঘাত নয়, সভ্যতায় দেয়া নেয়া, আদান প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন। আর মুসলমানদের তিনি আহ্বান করেছেন আত্মবিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণের, যাতে নিজেদের সংকটের জন্য নিজেরা কতটুকু দায়ী এটা তারা বুঝতে পারে।

মুসলিম দুনিয়ার বর্তমান বিপর্যয়কে বুঝতে আকবর মধ্যযুগের প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী ও সভ্যতা বিশ্লেষক ইবনে খলদুনের চিন্তাভাবনাকে ব্যবহার করেছেন। আকবর এখানে ইবনে খালদুনের আসাবিয়া তত্ত্বকে ঘিরে তার চিন্তাভাবনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন। আসাবিয়া মানে হচ্ছে সামাজিক সংহতি। আকবর মনে করেন মুসলিম সমাজের এই সংহতি গড়ে উঠেছে আদল (ন্যায়বিচার), ইহসান (মানবিকতা) ও ইলমের (জ্ঞান) সক্রিয় চর্চার ভিতর দিয়ে। এগুলোর উপস্থিতি আজকাল ক্ষীয়মান হতে থাকায় মুসলিম সমাজের সংহতিও দুর্বল হয়ে পড়ছে। মুসলিম সমাজে কেন এই আসাবিয়া কাজ করছে না এবং কেন আসাবিয়া একটি বিপজ্জনক ধারায় অগ্রসর হচ্ছে আকবর তার কারণ খুঁজেছেন। তার ভাষ্য উদ্ধার করছি ঃ

Asabiyya is breaking down in the Muslim world and taking new and sometimes dangerous forms. A similar process can be identified within other traditional societies, which are non-Muslims. However I will focus on Muslim societies where asabiyya is collapsing for the following reasons : massive urbanization, dramatic demographic changes, a population explosion, large scale migrations to the West, the gap between rich and poor (which is growing ominously), the widespread corruption and mismanagement of rulers, the rampant materialism coupled with the low premium on education, the crisis of identity, and perhaps most significantly, new and often alien ideas and images, at once seductive and repellant, and instantly communicated from the West, ideas and images which challenge

www.pathagar.com

traditional values and customs. This process of breakdown is taking place at a time when a large percentage of the population in the Muslim world is young, dangerously illiterate, mostly jobless, and therefore easily mobilized for radical change. The consequence is the difficulty of creating a society based on justice, knowledge and compassion. Most Muslims interpret this difficulty as denying their society, honor and dignity.[১৫]

মুসলিম সমাজের এই চলমান সংকটকে অনেকে নিজেদের গৌরব ও মর্যাদা হারানোর সাথে সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। এই কারণে সেই হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য অনেকে আসাবিয়াকে এক বিপজ্জনক ধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। এই বিপজ্জনক, বিকৃত ও বিবর্তিত আসাবিয়াকে আকবর বলেছেন Hyper-asabiyya-উত্তেজক আসাবিয়া।

আসাবিয়ার ভাঙ্গন মানে হচ্ছে ঐ সমাজ থেকে আদল, ইহসান ও ইলমের পশ্চাৎপসরণ। আর এই পশ্চাৎপসরণের অর্থ হচ্ছে ইসলামের মূল্যবোধেরও অপসারণ। সমাজ যদি আদল, ইহসান ও ইলমকে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে তার পরিণতি হিসেবে যেমন শাসকের প্রতি মানুষের অনাকর্ষণ বাড়ে (শাসককে মুসলমানরা মনে করে আল্লাহ্ প্রদত্ত আদল ও ইহসানের ধারণার বাস্তবায়নকারী), তেমনি ঐ সমাজের প্রতিও আনুগত্য হ্রাস পায়।

আকবর বলতে চান আদল আর ইহসানের সাথে আসাবিয়ার সম্পর্ক গভীর এবং সেই গভীরতা না থাকলে আসাবিয়াও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। আসাবিয়ার বিপর্যয়ের ফলে কতকগুলো সমাজতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হয়। সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বাড়ে। একজন আরেকজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই রকম দ্বন্দ্ব সমাজে ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) ও শার (সংঘাত) বাড়িয়ে দেয়। আজকের মুসলিম বিশ্ব তার নমুনা। ফিতনা আর শার ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। এই উত্তেজক আসাবিয়া আদতে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন সংহতির প্রকাশ যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার। গৌরব হারানোর বেদনাই কাউকে কাউকে গৌরব পুনরুদ্ধারের উদগ্র নেশায় ভাসিয়ে নেয়। তার মানে আসাবিয়ার পতনই জন্ম দেয় উত্তেজক আসাবিয়ার। আকবর লিখেছেন মুসলিম সমাজের এই উত্তেজক আসাবিয়াকে নিষ্ক্রিয় করা দরকার। নিজেদের উপর আপতিত দুর্যোগকে কাটাতে উত্তেজক আসাবিয়ার পরিবর্তে আসাবিয়াকে ফিরিয়ে আনা দরকার। সমাজে পুনরায় ন্যায়বিচার, মানবিকবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, পাশাপাশি মুসলমানদের জ্ঞানচর্চায় উজ্জীবিত হওয়া জরুরী। নিজের বুনিয়াদকে যতক্ষণ না শক্তিমন্ত ও পয়মন্ত করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী প্রতিপক্ষকে নিবৃত করা যাবে না। অন্যের করুণার উপর ভর করে কেউ কখনো আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। উত্তেজক আসাবিয়ার বিপজ্জনক দিক হচ্ছে এটি এক ধরনের অবিচার চাপিয়ে দেয় যা কিনা ইসলামের আদল আর ইহসানের সমার্থক নয়।

তাহলে কি করে আসাবিয়াকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব? আকবর মনে করেন মুসলিম দুনিয়ায় আজ নেতৃত্বের সংকট চলছে। বর্তমান মুসলিম নেতৃত্ব তাদের সমাজে আদল ও

www.pathagar.com

ইহসানের পরিবেশ তৈরি করতে পারছে না। তেমনি তারা পারছে না জ্ঞানচর্চার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে। এই সংকট মোচনে আকবরের পরামর্শ হচ্ছে মুসলিম নেতৃত্ব যদি ইসলামী আদর্শের কাছ থেকে সত্যিকার অর্থেই প্রেরণা গ্রহণ করে তবে তাদের সমাজের অস্থিরতা ও সহিংসতা কমে যাবে। আকবরের নিজের কথা উদ্ধার করছি ঃ

Our thesis in that if the political leadershhip in its behavior, ideas, and politics is close to the Islamic Ideal – as laid out in the Quran and in the life of the Prophet-friction in society is minimal ; the further from the Islamic ideal, the greater the tension in society.[১৬]

আট

আকবর এস আহমদ আমাদের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করেছেন। তার লেখা আমাদের চিত্তকে আকাশছোঁয়া করেছে। তার সব লেখা মন্থন করে তার উদ্বেগ উৎপাদনকারী মাত্র একটি শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে ইসলাম। কি করে ইসলাম আবার ঘুরে দাঁড়াবে, কি করে ইসলাম অনুসারীরা বিশ্বের চালকের আসনে গিয়ে বসবে- এই তার চিন্তা ও মানসকে দখল করে আছে। মার খেতে খেতে আর পরাজয়ের মুখ দেখতে দেখতে এখন আমাদের এমন অবস্থা যে দেওয়ালেও পিঠ ঠেকানোর জায়গা নেই। আকবরের লেখা প্রকৃত অর্থেই এই মার খাওয়া মুসলমানদের জন্য অমৃতস্বরূপ। তারা অন্ততঃ ভাঙ্গাবুক নিয়েও স্বপ্ন দেখতে পারবে। আকবর এদের হাতেই অস্ত্র তুলে দেন, যে অস্ত্র নিয়ে তারা একালের মুখামুখি হবে। এ অস্ত্রের নাম আদল আর ইহসান, ইলম, সবর ও তাওয়াক্কুল। সুফীর সুলহি কুল (সকলের সাথে শান্তি), এই হবে তার ঠিকানা। এই অস্ত্র, এই মানবসম্পদ দিয়েই তারা একদিন বিশ্বের চালকের আসনে বসেছিল। আবারও আকবর পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন এই অস্ত্রের বুনিয়াদেই মুসলমানরা আবার বিশ্বশাসনের অধিকার অর্জন করবে। আকবরের এসব চিন্তা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। তার সংকল্প ও যুক্তির যথেষ্ঠ ভিত্তি আছে, যা মুসলিম সমাজকে নাড়া দিয়ে চৈতন্য ফেরাবে, আশা করা যায়।

গ্রন্থঋণ ঃ

১. Akbar S. Ahmed, Discovering Islam : Making Sense of Muslim History and Society. London : Routledge and Kagan Paul Ltd., 1995.
২. Quoted from Akbar S. Ahmed, Toward Islamic Anthropology : Definitions, Dogma and Directions. Virginia : International Institute of Islamic Thought, 1986.
৩. Akbar S. Ahmed, Toward Islamic Anthropology.
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৭. প্রাগুক্ত।
৮. Akbar S. Ahmed, Post Modernism and Islam : Predicament and Promise. London : Routledge, 1992.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. Akbar S. Ahmed, Discovering Islam.
১৪. Akbar S. Ahmed, Living Islam : From Samarkand to Stornoway. London : BBC Books, 1993.
১৫. Islam Under Siege : Living Dangerously in a Post-Honor World. Cambridge : Polity Press, 2003.
১৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com